

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড



সম্পাদনা
শর্মিলা ঘোষ



নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৩ মাঘ ১৪১০

প্রকাশক : শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার,
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

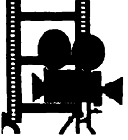
মুদ্রক : শ্রীবরুণচন্দ্র মজুমদার, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি.
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

রবীন্দ্র অনুরাগী সকল কে

সূচিপত্র

বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগে
রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ

শোধবোধ



❑ ১৯৪২ সাল।

শোধবোধ—রবীন্দ্রনাটক। ১৩৩২ সালের বার্ষিক 'বসুমতী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ 'শোধবোধ' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয। এটি ১৩২০ সালে লেখা 'কর্মফল' গল্পেব নাট্যরূপান্তব। 'শোধবোধ' নাটকটি ১৯২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। সবাক। ৩৫ মি. মি.।

চিত্রনাট্য ও পবিচালনা—সৌমেন মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজনা—নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড।

চিত্রগ্রাহক—সুধীন মজুমদার।

শব্দগ্রহণ—অতুল চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদনা—হরিদাস মহলানবীশ।

কণ্ঠসঙ্গীত পবিচালনা—অনাদি দস্তিদার।

যন্ত্র সঙ্গীত পবিচালনা—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—নেলী—শ্রীলেখা, মাসীমা—সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, বরুণ নন্দী—ছবি বিশ্বাস, সতীশের মা—মলিনাদেবী, সতীশ—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়. নেলীব বান্ধবী—শীলা হালদাব, এছাড়া ইন্দু মুখোপাধ্যায, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) শৈলেন চৌধুরী, রেবা বোস, শ্যাম লাহা, খগেন পাঠক, কালী ঘোষ, সুধীর মিত্র, লীলা ঘোষ। প্রমুখ।

মুক্তি—শনিবার, ২৮ মার্চ, ১৯৪২; চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে।

প্রথম দৃশ্য

মিস্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

তাঁর কন্যা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবালা

চারু। ভাই নেলি, তোর হয়েছে কী বল্‌ তো।

নলিনী। মরণদশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখছি।

নলিনী। কী রকম বল্‌ তো।

চারু। তা বলতে পারব না। রাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই ; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নলিনী। শিলাবৃষ্টি না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আন্দাজ করছিস বল্‌ তো।

চারু। তোমার আলিপুরের ওয়েদার রিপোর্ট্‌, ভাই, আমার হাতে নেই। আজ পর্যন্ত তোমাকে বুঝতেই পারলুম না।

নলিনী। তবে বুঝিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হয়েছে। ধৈর্য আর রাখতে পারছি নে। ওরে পত্তুলাল, ডেকে দে তো লালবাজার থেকে কে চিঠি নিয়ে এসেছে।

চারু। মিস্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেছে।

নলিনী। গান

সে আমার গোপন কথা, শুনে যা ও সখী
ভেবে না পাই বলব কী।

চারু। হাঁ ভাই, বল্‌ ভাই বল্‌, কিন্তু সাদা কথায়।

নলিনী। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বকি।

চারু। তুই ভাই এই-সব সখীকে-ডাক-পাড়া সেকেলে ধরনের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস্‌ বল্‌ তো।



নলিনী। খুব একেলে ধরনের কবির কাছ থেকেই।

চারু। মিস্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নলিনী। বাংলা সাহিত্যে কোন্‌টা একেলে কোন্‌টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত মডার্ন্‌ কালটা আছে—

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

চারু। তোর মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখি নি—সবই উলটো-পালটা। তুই যদি ভাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস, তা হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠতিস। মিস্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস বলেই বুড়ি ঠাকুরমার চাল প্র্যাকটিস চলছে। কোন্‌দিন এসে দেখব জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলি ধরেছিস।

নলিনী। তাতে আগাগোড়া ছুবিয়ে রাখব—মিস্টার নন্দী বার-অ্যাট-ল—

চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সাবকো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউঙ্গী।—

[সেলাম করিয়া চাপরাশির প্রস্থান

দেখলি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখলি?—গিলটি তক্‌মার ঝল্‌মলানিতে চোখ ঝলসে গেল।

চারু। ভয় করিস্‌ নে নেলি। গিলটি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে, কিন্তু—

নলিনী। হাঁ গো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ পরবেন মিসেস নন্দী। তাঁর কী সৌভাগ্য!

চারু। দেখ নেলি, ন্যাকামি করিস্‌ নে। মিস্টার নন্দীর মতো পাত্র যেন অমনি—

মিসেস লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় প'রে মিস্টার নন্দীর বেয়ারার—

নলিনী। কেন এ তো মন্দ কাপড় নয়।

মিসেস লাহিড়ি। কী মনে করবে বল্‌ তো। ওদের বাড়িতে সব—

নলিনী। বেহারা হয়ে জন্মেছে বলেই কি এত শাস্তি দিতে হবে। বেচারা মনিববাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুশি হল যে বকশিশ চাইতে ভুলে গেল।

মিসেস লাহিড়ি। চিঠি দিতে এসে আবার বকশিশ চাইবে কী। তোর সব অদ্ভুত কথা।

নলিনী। এমন আশ্চর্য চিঠি, মা, তাতে এত—

মিসেস লাহিড়ি। এত কী।

নলিনী। সোনালি ক্রেস্ট আঁকা—আর তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আসবেন—আমাকে—

মিসেস লাহিড়ি। কী করতে।

নলিনী। বেশি আশা করে বোসো না, মা। প্রোপোজ করতে না, আমার জন্মদিনের জন্যে কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে। সেই বা কজনের ভাগ্যে—

মিসেস লাহিড়ি। যা, আর বকিস্‌ নে—শীঘ্র যা, ড্রেস করে নে—এখনি লোক আসতে আরম্ভ হবে। মিস্টার নন্দী তোর সেই ধূপছায়া রঙের শাড়িটা খুব অ্যাড্‌মায়ার করেন, সেটা—



নলিনী। সে হবে, মা, আমি এখনি যাচ্ছি।

মিসেস লাহিড়ি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এল কি না দেখিগে।

[প্রস্থান

নলিনী। দেখবি? এই দেখ চিঠি। সশরীরে আসবেন তার অ্যানাউন্স্‌মেণ্ট। সেকালে বিশু ডাকাত এইরকম খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত।

চারু। ডাকাতি?

নলিনী। নয় তো কী। একজন সরলা অবলার হৃদয়ভাণ্ডার লুঠ! তার সিঁধকাঠিটা দেখবি? এই দেখ।

চারু। ইস্। এ যে হীরে-দেওয়া ব্রেস্‌লেট! 'যা বলিস, তোর কপাল ভালো। এ বুঝি তোর জন্মদিনের—

নলিনী। হাঁ হাঁ, জন্মদিনের উপহার—আমার জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিরে ফেলবার সুদর্শন চক্র।

চারু। সুদর্শন চক্র বটে। যা বলিস, মিস্টার নন্দীর টেস্ট্ আছে।

নলিনী। ব্রেসলেটও তার প্রমাণ, আর ব্রেসলেট পরাবার জন্য যে মৃণালবাহু বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ।

চারু। আজ যে বড়ো ঠাট্টার সুর ধরেছিস।

নলিনী। তা হলে গম্ভীর সুর ধরি।

গান

সে যেন আসবে আমার মন বলেছে।
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্ লো তাই দেয় ইশারা
তারায় তারা ;
চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি।
শুনে যা ও সখী।

চারু। আমি যদি পুরুষ হতুম নেলি, তা হলে তোর ঐ পায়ের কাছে প'ড়ে—

নলিনী। জুতোর লেস লাগাতিস বুঝি? আর ব্রেসলেট পরাত কে।

মিস্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিস্টার লাহিড়ি। আজ বরুণ নন্দীর আসবার কথা আছে না?

নলিনী। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিস্টার লাহিড়ি। তা হলে এখনো যে ড্রেস কর নি?

নলিনী। কী ড্রেস পরব, তাই তো এতক্ষণ চারুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম।

মিস্টার লাহিড়ি। দেখো, ভুলো না, সার হার্‌কোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছন, সেইটে বরুণ নন্দী দেখতে চেয়েছিল—সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বের করে রাখব, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিল, সেটাও—

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আর সেই যে—

নলিনী। বুঝেছি, গবর্মেণ্ট্ হাউসে নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম, তার নাচের প্রোগ্রামটা।



মিস্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো।

নলিনী। সেই যে ঐটে—

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ, ফর্স্ট্ক্লাস। ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে তো? In the gloaming, O my darling.

নলিনী। আছে।

মিস্টার লাহিড়ি। আর সব-শেষ গেয়ো Goodbye, sweetheart ।

নলিনী। কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান।

মিস্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী, নেলি—আজকাল মেয়েরা তো—

নলিনী। ভুলতে আরম্ভ করেছে যে তারা মেয়ে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্ছে না।

মিস্টার লাহিড়ি। Bravo, well said । যাও এবার ড্রেস করতে যাও। অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী। বুঝিছি, যেটাতে লর্ড্ বেরেস্ফোর্ডের কার্ড্ আঁটা আছে। আচ্ছা, বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হওগে, আমি এখনি যাচ্ছি।

[লাহিড়ির প্রস্থান

লাহিড়ি। (ফিরিয়া আসিয়া) দেখো, একটা জিনিস নোটিস করছি নেলি, সেটা তোমাকে বলা ভালো। তুমি অনেক সময়ে বরুণের সঙ্গে এমন টোনে কথা কও যে সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াস্লি নিচ্ছ না, তাই সে ভেবে পায় না যে তুমি—

নলিনী। বুঝেছি বাবা। সুবিধে পেলেই বুঝিয়ে দেব আমি খুব সীরিয়াস।

লাহিড়ি। আর-একটা কথা। আমি ঠিক বুঝতে পারি নে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটুখানি ইন্ডাল্জেন্স্ দাও।

চারু। না মিস্টার লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। পৃথিবীতে ওর কুকুর টম্কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একটুও ইন্ডাল্জেন্স্ দেয়, এ তো আমি দেখি নি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সেদিন চা-পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিল যে তার মচ্ মচ্ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক-এক সময় ভারি অক্ওঅর্ড্ হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজার্গুলো—থাক্গে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সঙ্গে ও একসঙ্গে পড়েছিল, ওকে আমি কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু যেদিন বরুণরা আসবে, সেদিন বরঞ্চ ওকে—

নলিনী। ভয় কী বাবা, সেদিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধুতি পরে আসতে বলব, আর দিল্লির জুতো—সে মচ্ মচ্ করবে না।

লাহিড়ি। ধুতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।

চারু। ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। এ দিকে লোক আসবার সময় হয়ে আসছে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পরে আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সামলাব।

[নলিনীর প্রস্থান



লাহিড়ি। এই বুঝি ওর সব জন্মদিনের প্রেজেন্ট্? বরুণের ব্রেস্‌লেটটা কি এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে?

চারু। থাক্‌-না, আমি ওর উপর চোখ রাখব।

লাহিড়ি। এটা কার? একটা মক্‌মলের মলাটের অ্যাল্‌বম। এ দেখছি সতীশের! দাম লেখা আছে,মুছে ফেলতেও হুঁশ ছিল না। এক টাকা বারো আনা। ইন্‌সল্‌ভেন্সির মামলা আনতে হবে না। সেকেণ্ড্‌হ্যাণ্ড সেলে কেনা। এটাও কি এখানে থাকবে নাকি।

চারু। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখবে না।

লাহিড়ি। থাক্ তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ড্রেস করে আসি।

[প্রস্থান

সতীশেব প্রবেশ

চারু। এত সকাল-সকাল যে?

সতীশ। (লজ্জিত হইয়া) দেখছি আমার ঘড়িটা ঠিক চলছিল না। যাই, বরঞ্চ আমি একটু ঘুরে আসিগে।

চারু। না, আপনি বসুন, সময় হয়ে এসেছে। নেলির প্রেজেন্ট্‌গুলো দেখুন-না। এই দেখেছেন?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেস্‌লেট! এ কে দিয়েছে।

চারু। মিস্টার নন্দী। চমৎকার না?

সতীশ। তাই তো। বেশ।

চারু। এই মুক্তো-দেওয়া হেয়ার্‌পিনটা আমার ভাই অমূল্যর দেওয়া। আর এই রুপোর দোয়াতদান—ও কী সতীশবাবু, যাচ্ছেন নাকি?

সতীশ। ভাবছি এইবেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চারু। আপনার অ্যাল্‌বমটি নেলির কাজে লাগবে। এই দেখুন-না মিস্টার নন্দী ওকে তাঁর সই-করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সতীশ। হাঁ, তাই তো দেখছি। আমার কিন্তু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন, এখনকার মতো এই অ্যাল্‌বমটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—তার পরে—

চারু। কী করবেন।

সতীশ। না, ওটা·· একবার—একটুখানি ঐ—আপনি দয়া করে নেলিকে বলবেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মতো—তার পরে আবার—এখন যাই—কাজ আছে।

[প্রস্থান

চারু। যাক, বিদায় করে দেওয়া গেল। মা গো, কী টাই প'রেই এসেছে। অ্যাল্‌বমটাও-গেল। এই-যে মিস্টার লাহিড়ি, শুনে যান, সুখবর আছে, বকশিশ চাই।

নেপথ্যে। একটু পরেই যাচ্ছি, আমার বাট্‌ন্‌হুক্‌টা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চারু। ও কী, নেলি, তোর ভালো করে তো সাজা হল না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি করতে হল। ড্রেসিংরুমের জানলা দিয়ে দেখি, চোর পালাচ্ছে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনই নেমে গিয়ে বমালসুদ্ধ গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছি।



চারু। বাস্ রে, কী কড়া পাহারা। মালটা কি খুবই দামি, আর চোরটাও কি খুবই দাগি।

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনই পালাচ্ছিলে যে—আর আমার একখানা অ্যাল্‌বম নিয়ে?

সতীশ নিরুত্তর

চারু। ওঃ বুঝেছি, প্রাইভেট কামরায় বিচার হবে। নেলি, আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসিগে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে তো?

নলিনী। আছে।— [চারুর প্রস্থান

তোমার এ কী রকম দুর্‌বুদ্ধি। আমার অ্যাল্‌বম নিয়ে—

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পৌঁছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিসটা তার নয়, আমি এই বুঝি।

নলিনী। আর বগলে করে যে নিয়ে যায় সেটা যে তারই, এই-বা কোন্ শাস্ত্রে লেখে?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীরু, বেশ জোরের সঙ্গে কিছুই দিতে পারি নে। সেইজন্যে দিয়ে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই অ্যাল্‌বমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখলে। এ তো টক্‌টকে লাল।

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হয়েছিল, এই অ্যাল্‌বমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পুরে দিই, 'আমাকে মনে রেখো' এই করুণ দাবিটুকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হল তুমি মনে করবে ওটা আমার স্পর্ধা ; খালি রেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে যার ছবি রাখবে ওর মধ্যে তারই স্থান থাক্।

নলিনী। খুব ভালো বলছ, সতীশ, ইচ্ছে করছে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-একজনের কথা মনে পড়ছে। সে দিয়েছিল একখানা খাতা—তোমার অ্যাল্‌বমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিয়েছিল—শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিয়েছিল—

পাতাখানি শূন্য রাখিলাম
নিজের হাতে লিখে রেখো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে, লোকটা কে।

নলিনী। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবে নাকি। আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিত্বে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছ—তোমার এ যে আন্‌হার্ড মেলডি। আমি শুনতে পাচ্ছি—

এই অ্যাল্‌বম শূন্য রইল সবি,
নিজের হাতে ভরে রেখো শুধু আমার ছবি।—

কিন্তু তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয় নি। বলি তা হলে। এসে দেখলুম—সবাই আমার মতো ভীরু নয়। যার জোর আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সংকোচ করে না। মনে বুঝলুম, আমি দিয়েছি শূন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ করবার জিনিস।

নলিনী। তোমাকে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি ভুল করেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি



রাখবার জায়গা দিতে কজন পারে। ভুরু, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিত থাক্। (নন্দীর ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিল) ও কী, অমন করে লাফিয়ে উঠলে কেন। মৃগীরোগে ধরল নাকি।

সতীশ। কোন্ রোগে ধরেছে তা অন্তর্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পষ্ট করে—

নলিনী। এই বুঝি নাটক শুরু হল? চোখের সামনে দেখলে তো যে-ছবি চেঁচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে মানুষ চুপ করে থাকতে জানে না, তারও—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জানো না।

নলিনী। ভয় যদি কর তা হলে অ্যাল্‌বম চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসিগে।

সতীশ। একটি অনুরোধ। আন্‌হার্ড মেলডি আমার মুখে খুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব।

নলিনী। আচ্ছা।

গান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা,
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র, তারে বুকে ক'রে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে—
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে,
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস,
নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

চারুর প্রবেশ

চারু। এ কী করেছিস, নেলি। মিস্টার নন্দীর ফোটো—

নলিনী। যে-মাটির গর্ভে হীরে থাকে, যে-মাটির বুকে ভুঁইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটির হাতে ওকে সমর্পণ করে দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে?

চারু। ছি ছি, নেলি, মিস্টার নন্দী জানতে পারলে কী মনে করবেন। এ যে একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছিস।

নলিনী। ইচ্ছে করিস তো তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস।



দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনোমতে টাকাটা পেয়েছি, নেক্‌লেসও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গুড়গুড়িটা সিদুঁরেপটির মতি পালদের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলুম, নিশ্চিন্তি হতে পারছি নে।

বিধুমুখী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ-সব জিনিসের 'পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ওঁর ঠাকুরদাদার জিনিস বলেই আজ পর্যন্ত লোহার সিন্দুকে ছিল। একদিনের জন্যে খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কি গেছে। সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভারি ভয় হচ্ছে,যারা বন্ধক রেখেছে তারা হয়তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ করবে। তুমি কোনোমতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে দাও।

বিধুমুখী। হায় রে কপাল, গহনাপত্র কিছু কি বাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে। যাই হোক, আমি ভয় করি নে—প্রজাপতির আশীর্বাদে নলিনীর সঙ্গে আগে তোর কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাক, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ্য হবে। কথাবার্তা কিছু এগিয়েছে?

সতীশ। সর্বদা যে-রকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কব কখন্। জান তো সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাঁটাগাছের বেড়া। তার বুলিগুলো সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উদ্ধার করি কী উপায়ে।

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়ের মন বুঝতে পারি—মনে মনে সে তোকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানি নে। কিন্তু বরুণ নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া করলেই কোনো ভাবনা ছিলনা। কিন্তু—

বিধুমুখী। তোর কী চাই বল্‌-না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সুট। চাঁদনির কাপড় পরলেই ভরসা কমে যায় ; নন্দীর মতো করে সজোরে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারি নে। বাড়িসুদ্ধ সব্বাই আমার দিকে এমন করে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নর্দমার পাঁক।

বিধুমুখী। আমি তোর কাপড়ের দুর্দশা তোর মাসিকে আভাসে জানিয়ে রেখেছি। আজ এখনই তাঁর আসবার কথা। আজই হয়তো একটা কিনারা হয়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে মেসোমশায়কে নিয়েই তিনি আসছেন মা, যেমন করে পার আজই যেন—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি—বাবা যদি জানতে পারেন, মেরে ফেলবেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কী—কোনো ছুতোয় সেই নেক্‌লেসটা যদি নলিনীর কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হলেই আমার লজ্জা পুরো হয়। এক-একবার মনে করি, সংসারে যত মুশকিল সব আমারই? বরুণ নন্দীর বাপ কি কোনোকালে ছিল না। যে-রকম দেখছি, একটা কোনো গল্প বলে নেক্‌লেসটা ফিরিয়ে আনতে হবে, তার পরে আমার নিজের গলায় পরবার জন্যে গয়না মিলবে।

বিধুমুখী। সে আবার কী।

সতীশ। একগাছা দড়ি।

বিধুমুখী। দেখ্, আমাকে আর রোজ রোজ কাঁদাস্ নে। আমার রক্ত শুকিয়ে গেল, চোখের



জলও বাকি নেই। এক দিকে তোর বাবা, আর-এক দিকে তুই—উপরে সরার চাপ আর নীচে আগুন, আমি যে গুমে গুমে—

সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায় শশধরবাবুর প্রবেশ

এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল। দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কী কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম ধুতি পরে কলেজে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে লাউঞ্জ সুটটা কিনে দিয়েছিলেম, সে কী হল।

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমাবী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেকে। তা, তাই বলে কি আর নূতন সুট তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি।

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুনসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো, এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারও দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বৈ ছেলে নয়, একটু সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না? এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, আমি তোর জন্য একসুট কাপড় র‍্যাম্‌জের ওখানে অর্ডার দিয়ে রেখেছি। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক সুটে আমার কী হবে, মাসিমা! লাহিড়ি-সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছুতো করে কাটিয়ে দিই। আমার তো কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবাব অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত, তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা চোখ বুজে কল্পনা করাই ভালো।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কর্তাবাবু লোহার সিন্দুকের চাবি চেয়েছেন।

সতীশ। (কানে কানে) সর্বনাশ মা, সর্বনাশ। নিশ্চয় গুড়গুড়ির খোঁজ পড়েছে।

বিধুমুখী। একটু চুপ কর্ তুই। কেন রে, চাবি কেন।

ভৃত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক-বইটা চান।



বিধুমুখী। আচ্ছা, একটু সবুর করতে বল্, চাবি নিয়ে এখনই যাচ্ছি।

[ভৃত্যের প্রস্থান

সতীশ। মা, লোহার সিন্দুক খুললেই তো—

বিধুমুখী। একটু থাম্। আমাকে একটু ভাবতে দে।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেন, বিধু।

বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্।

সতীশেব প্রবেশ

—তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ক্রিম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা। ওগো যাও-না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। চাপকান তো পেলেটির খানসামাদেরও আছে। বেমালুম দলে মিশে যাব।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিংবা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না?

শশধর। সর্বনাশ! কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ো না—বরঞ্চ আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।

সুকুমারী। এই-যে মন্মথ আসছেন। এখনই সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে অস্থির করে তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই।

[প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব।—শোনো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধুমুখী। তুমি একলা বসে বসে রাগ করো। আমি চললুম, আমি আর সইতে পারছি নে।

[প্রস্থান

মন্মথ। শশধর, সে-ঘড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।



শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দুক খুলতে যাচ্ছিলে, যাও-না।

মন্মথ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনই তুমি নিয়ে যাও।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। ঘড়ি তো নিয়ে গেলুম ; তার পর থেকে আমার সময়টা কাটবে কী রকম? ঘরের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে আমাকে যে ঘরছাড়া হতে হবে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্মথ। নিজের সম্বন্ধে হলে নিঃশব্দে সহ্য করতেম। ছেলেকে মাটি করতে পারি না।

শশধর। সে তো ভালো কথা। কিন্তু স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উলটোমুখে চলতে গেলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকান্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয়, তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট! তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎপরামর্শ— গোয়ার্তমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে। আমি চললেম, যা ভালো বোঝ করো।

[শশধবেব প্রস্থান

বিধুমুখীব প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধুমুখী। পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চলবে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে করলে কেন।

বিধুমুখী। তুমি যদি একমাত্র নিজের মতেই চলবে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধুমুখী। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে— কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আবার সংসারমরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধুমুখী। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

মন্মথ। লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাই, তোমরা এখানে ভালো হয়ে বসেই কথা কও-না। দাঁড়িয়ে কেন। আমি পাশের ঘরে আছি বলে বুঝি আলাপ জমছে না? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান



সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধুমুখী। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধুমুখী। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাখাব, আর গায়ে কাস্টর-অয়েল।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাস্টর-অয়েল গায়-মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধুমুখী। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার শখের খরচ চলবে না।

বিধুমুখী। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপনি পরানো অভ্যাস করাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি। তোমার ভগিনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেইজন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি ; কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

বিধুমুখী। ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি, সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাবলুম এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবার ঘরে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুরোল না। মেজোবউ, তোদের ধন্য। আজ সে তোর ন-বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে, তবু তোদের কথা যে আর ফুরোল না! রাত্রে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুই জনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনরাত্রি জোগান কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না।

বিধুমুখী। না দিদি, আমাদের মধুরালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়েই করতে হবে, নইলে সবাই দৃষ্টি দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে রাখি। তুমি আবার নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কাদ্বীপে যাচ্ছ—এখানকার হাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না?

[উভয়ের প্রস্থান



সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ!

সতীশ। বাবা কাল ভোরে জাহাজে করে কলম্বো যাবেন, তাই কালই লাহিড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ-কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার ঐ সামনের ঘরটাতেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ-বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার ও-ঘরেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার ঐ বঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। বঁটি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাইবোনে মিলে গল্প করতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে, জেঠাইমা—আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি-গায়ে ফস করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি-গায়ে—

সতীশ। তিনি তো কাল কলম্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

[জেঠাইমার প্রস্থান

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। পারলুম না।—জানো তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্নিং সুট তো মাসি অর্ডার দিয়েছেন, আর একটা লাউঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধুমুখী। বলো কী, সতীশ। এ তো আড়াইশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—



সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তো খরচ করতে হবে। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে বনের বাঁদররা ড্রেস কোট পরে না।—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বলো যে কাল রাত্রে তোমার লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

বিধুমুখী। দেখ্ সতীশ, এদিকে তোর বাবার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই—কিন্তু ওঁকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে যাবি।

সতীশ। ধরা তো এক সময়ে পড়বই। আপাতত কোনোরকম ক'রে—তা ছাড়া কাল তো উনি কলম্বোয় যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেক্‌লেসটা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখলুম শেষকালে—ঐ যে বাবা আসছেন। মা, এখনই, আর দেরি কোরো না।

[সতীশের প্রস্থান

শশধব ও মন্মথেব প্রবেশ

বিধুমুখী। ওগো শুনছ, সর্বনাশ হয়েছে, কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

শশধর। সে কী কথা, বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে করলে এমন কাজ।

বিধুমুখী। তাই তো ভাবছি, হয়তো নতুন বেহারাটা—

শশধর। মন্মথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ করে দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধর। কী গেল না-গেল, সেটা তো একবার দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছু নিশ্চয় গেছে, শুধু চাবি নিয়ে ঝম্‌ঝমিয়ে বেড়াবে, চোরের এমন শখ প্রায় থাকে না।

শশধর। কিন্তু কে চোর, সেটাও তো বের করা চাই।

মন্মথ। সাধুর চেয়ে যার দরকার অনেক বেশি, সেই হয় চোর।

শশধর। আমি কি তোমার কাছে চোরের ডেফিনিশন চাচ্ছি। বলছি—সন্ধান করা চাই তো?

মন্মথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাই নে, চাই নে। ভিতরে যে আছে তাকে বাইরে সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধর। কী বলছ, মন্মথ। চলো-না একবার দেখেই আসা যাক।

মন্মথ। নিষ্ফল, নিষ্ফল, আমার দেখাশোনা হয়ে গেছে।

শশধর। অন্তত কালকে কলম্বো যাওয়াটা স্থগিত রাখো, একটা পুলিস-তদন্ত করাও।

মন্মথ। কলম্বোর চেয়ে আরো অনেক দূরে যাওয়া দরকার—সাউথ পোলে যেখানে থাকে পেঙ্গুয়িন পাখি, যেখানে থাকে সিন্ধুঘোটক—সেখানে চাবিও চুরি যায় না আর পুলিস-তদন্তর ঠাট বসাতে হয় না।

শশধর। বউ, তুমি যে একেবারে চুপ, মুখ হয়ে গেছে সাদা। চলো, বরঞ্চ তোমাতে আমাতে একবার—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড় নিয়ে যা, এখনই নিয়ে যা।

[ভৃত্যের প্রস্থান



শশধর। আহা, আহা, করছ কী মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে তুমি আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গুলোতেই আছে চাবি-চুরির ব্যাকটিরিয়া—টাকা-চুরির বীজ—এই আমি তোমাকে বলে গেলুম।

[মন্মথেব প্রস্থান। বিধুমুখীব মেজের উপর উপুড় হইয়া কান্না

শশধর। বউ, ছি ছি, এমন করে কাঁদতে নেই। ওঠো ওঠো।

বিধুমুখী। রায়মশায়, আমার বেঁচে সুখ নেই।

শশধর। কিছুই বুঝতে পারছি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ করছে? সতীশকে নাকি?

বিধুমুখী। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না করবে, তবে বাপ কিসের। যদি মা হত, ছেলেকে গর্ভে ধারণ করত, তা হলে বুঝত ছেলে বলতে কী বুঝায়। গেছে তো গেছে, না হয় সোনার গুড়গুড়িটাই গেছে, আমার সতীশ কি ওঁর সোনার গুড়গুড়ির চেয়ে কম দামের।

শশধর। সোনার গুড়গুড়ির কথা কী বলছ। সিন্দুক থেকে কী গেছে, দেখেছ নাকি।

বিধুমুখী। হাঁ, তা—না দেখি নি। আমি বলছি ওঁর সিন্দুকে সেই গুড়গুড়ি ছাড়া আর তো দামি জিনিস নেই—তা সেটা যদি চুরি হয়েই থাকে, তাই বলেই কি ছেলেকে সন্দেহ।

শশধব। তোমার সন্দেহটা কাকে, বউ।

বিধুমুখী। কেন। ওঁর তো সেই বড়ো ভালোবাসার উড়ে বেয়ারা আছে—বনমালী। তার হাতেই তো ওঁর সব। সে হল ভারি সাধু, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। একটু ইশারাতেও বলো দেখি পুলিস দিয়ে তার বাক্স তল্লাস করতে, হাঁ-হাঁ করে মারতে আসবেন—সে তো ওঁর ছেলে নয়, ওঁর বেয়ারা, তাই তার 'পরে এত ভালোবাসা।

শশধর। কিছু মনে কোরো না বউ, আমি যাচ্ছি, ওকে বুঝিয়ে বলছি।

[প্রস্থান

সতীশের দ্রুত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ।

বিধুমুখী। আবার কী হল। বুকের ধড়্‌ধড়ানি এক মুহূর্ত থামতে দিল না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখলুম—এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধুমুখী। সর্বনাশ! যা, তুই রায়মশায়কে শিগগির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

[সতীশের প্রস্থান

মন্মথেব প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখো চিঠি। পড়ে দেখো।

বিধুমুখী। না, আমি পড়তে চাই নে।

মন্মথ। পড়তেই হবে।

বিধুমুখী। (চিঠি পড়িয়া) তা কী হয়েছে।

মন্মথ। বেশি কিছু না, চুরি হয়েছে, আমার গুড়গুড়ি চুরি।

বিধুমুখী। নিজের ছেলে নিয়েছে, তাকে বল চুরি? বলতে তোমার জিব টাক্‌রায় আটকে গেল না?



মন্মথ। যে কথা বলতে জিব আটকে যাওয়া উচিত ছিল, সে কথা তুমিই বলেছ।

বিধুমুখী। কী বলেছি।

মন্মথ। সেই চাবি-চুরির মিথ্যে গল্প।

বিধুমুখী। বেশ করেছি। নিজের ছেলের জন্যে বলেছি—তার বাপের হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বলেছি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাঁচানো হল।

বিধুমুখী। অনেক হয়েছে ; আর ধর্ম-উপদেশ শুনতে চাই নে। এখন ছেলের উপর কোন্ জল্লাদি করতে চাও, খোলসা করে বলো।

মন্মথ। পুলিসে খবর দেব।

বিধুমুখী। দাও-না। চাবি আমার হাতে ছিল, আমিই তো চুরি করে ওকে দিয়েছি। যাক আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি সুখে থাকব। অনেক সুখে, এর চেয়ে অনেক সুখে ; মনে হবে স্বর্গে গেছি।

মন্মথ। দরকার নেই ; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেকদিন আগেই যার যাওয়া উচিত ছিল, সে-ই একলা যাবে।

[প্রস্থান

শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ-বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। ওর আবার বুকের ব্যামো, ভয় হয় পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, আজ এ ব্যাপারটা কী হল। তুমি বললে চাবি-চুরি, যে-রকমটা দেখা যাচ্ছে তাতে কথাটা—

বিধুমুখী। সবই তো শুনেছ। বলতে গেলে সতীশেরই জিনিস, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আসত, সেইটে নিয়েছে বলেই—

শশধর। তা যা বল বউ, কাজটা ভালো হয় নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধুমুখী। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে রেখেছেন, সেও কি চুরি নয়। এ-গুড়গুড়ি কি ওঁর আপন উপার্জনের টাকায়।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি? ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত।

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস্ নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মা'র সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।



সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে রাখি, আমি যেমন করে পারি সেই নেক্‌লেসটা ফিরিয়ে এনে বাবার গুড়গুড়ি উদ্ধার করে তাঁর হাতে দিয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেব। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমার প্রাণটা তো আমার, এটা তো বাবার লোহার সিন্দুকে বাঁধা পড়ে নি, এটা তো রাখতেও পারি ফেলতেও পারি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধুমুখী। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্ দিন কী করে বসে। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল, এমন-সব কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কত বড়ো পেয়াদা ; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশাই, সে-ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্‌জামিনে ফেল করেছি, তার উপর দেনা ; এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায়, তবে বাবা আমার সে-অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধুমুখী। সত্যি দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমিই না হয় ওকে মানুষ করি? কী বলো গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন ; বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধুমুখী। দিদি!

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্ তোর চুল বেঁধে দিইগে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

[শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—



মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। তা জানি নে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। প্রাপ্যের চেয়েও বড়ো জিনিস আছে, তার 'পরেও মানুষের দাবি থাকা অন্যায় নয়।

মন্মথ। মিথ্যে আমাকে বলছ। হয়তো সব দোষ আমারই, একলা আমারই! তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও, তো নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান

সতীশেব বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা, মা!

বিধুমুখীব প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে।

সতীশ। ঠিক করেছি, যেমন করে হোক নেক্‌লেসটা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবই।

বিধুমুখী। কী ছুতো করবি।

সতীশ। কোনো ছুতোই না। সত্যি কথা বলব। নেলির কাছে আমি কিছু লুকোব না।

বিধুমুখী। না না, সে কি হয়।

সতীশ। বলব গুড়গুড়ির কথা—বলব আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বিধুমুখী। সতীশ, আমার কথা শোন্, বিয়েটা আগে হোক, তার পরে সত্যি মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পারব না। আমি জানি, নেলি একটুও মিথ্যে সইতে পারে না। আমি কিচ্ছু লুকোব না। আগাগোড়া সব বলব।

বিধুমুখী। তার পবে?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল!

তৃতীয় দৃশ্য

মিস্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস্‌পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস্‌সুট পরে আসি নি।

নলিনী। জন্‌বুলের যত বাছুর আছে সকলেরই তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি।—মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন-না—আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিস্‌সুট প'রে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিস্‌সুট না প'রে এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিস্‌সুটটা মিস্টার সতীশকে



দান ক'রে তাঁর এই—এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী সুট, সতীশ। খিচুড়ি-সুটই বলা যাক—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি-সুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তবু লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস লাহিড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পারো। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক-ডাচেস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন্ নি! মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ সতীশ, রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা কবলে পারবে। টেনিস্‌সুট সম্বন্ধে তোমার যে-রকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়।

অন্যত্র গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেম না।

চারুবালা নন্দীব কাছে আসিয়া

চারু। মিস্টার নন্দী, সুশীলের সঙ্গে আমার একটা কথা নিয়ে ঘোর তর্ক হয়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে দিতে হবে—আমি বাজি রেখেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে তা হলে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন।

চারু। না না, আগে কথাটা শুনুন—তার পরে বিচার ক'রে—

নন্দী। যাদের ফেথ্ নেই সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে—কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিস আছে, শাস্ত্রে যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-ওয়ারশিপার, অন্ধভক্ত।

চারু। আপনার কথা শুনলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আপনি অক্স্‌ফোর্ডে পড়েছেন। এখন আমাদের বাজির কথাটা শুনুন। সুশীল বলতে চায়, আমার এই শাড়ির রঙের সঙ্গে আমার এই জুতোর রঙ মানায় না।

নন্দী। সুশীল নিশ্চয় রঙকানা। আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর চমৎকার ম্যাচ হয়েছে। যদি মাপ করেন তো বলি, আপনার এই রুমালটার রঙ—

চারু। এ বুঝি আমার রুমাল? এ-যে নেলির—সে জোর করে আমাকে দিলে—বহরমপুর না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানি ফেশানের রুমাল কিনেছে। আমাকে বললে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশি জিনিস থাক।

নন্দী। আই সী—মিস বোস, আপনি টেনিসের নেক্স্‌ট্ সেটে পার্টনার ঠিক করেছেন?

চারু। না।

নন্দী। আমাকে যদি সিলেক্ট্ করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর যে-রকম ম্যাচ হয়েছে, টেনিসে আপনার সঙ্গে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।



চারু। আপনাকে পার্টনার পেলে তো জিতবই। আমি ভেবেছিলেম, নেক্স্‌ট্‌ সেটে আপনি বুঝি নেলির সঙ্গে এনগেজ্‌ড্‌।

নন্দী। না, she wanted to be excused।

চারু। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সঙ্গে কথা আছে। আমি তো বুঝতে পারি নে সতীশের মধ্যে নলিনী কী-যে দেখেছে!

নন্দী। দেখেছে ওর মনুমেণ্টাল অ্যাব্‌সার্ডিটি, আর তার চেয়ে অ্যাব্‌সার্ড ওর—থাক্‌, সে-কথা থাক্‌।

চারু। কিন্তু ওর মতো অতবড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্ছে শূন্যপেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

চারু। শুধু কেবল কৃপা! ছিঃ! শ্রদ্ধা কি তার চেয়েও বড়ো নয়। চলুন খেলতে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভারি বিশ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হারতে পারেন, কিন্তু বিশ্রী খেলতে কিছুতেই পারেন না।

চারু। থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

[উভয়ের প্রস্থান

নলিনীব প্রবেশ

নলিনী। কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস্‌কোর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায় হায়, কোর্তাহারা অভাগা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দরজির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জানতে, তা হলে খুব বেশি দূরে তাকে খুঁজে বেড়াতে হত না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) ব্রাভো! মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি শুরু হয়েছে। উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো একটু কেক খেয়ে যাবে ; মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিস্‌কোর্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা বলতে এসেছি—

নলিনী। না না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে হোক বলতেই হবে, নইলে বাঁচব না, তার পরে যদি বিদায় করে দাও তবে মাথা হেঁট করে জন্মের মতোই—

নলিনী। সর্বনাশ! সহজে বলবার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না বললেও সময় কেটে যায়। আমারও বলবার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে তুমি বোলো।

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে নাও, কিন্তু আমার কথা শুনতেই হবে।

নলিনী। বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি, বলে নিই ; রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমি এতো বড়ো স্যাভেজ?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে। সেই তোমার নেক্‌লেস?



সতীশ। নেক্‌লেস? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল বুঝো না—জিনিসটা খুব ভালো। কিন্তু তুমি যে ঐটে কেনবার জন্যে—

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে-কথা শুনতে পারব না। কে তোমাকে কী বলেছে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন খেপে উঠলে কেন। কী মিথ্যে কথা? নেক্‌লেসটা তুমিই আমাকে দিয়েছ,সেও কি মিথ্যে কথা।

সতীশ। না, না। হাঁ, তা হতেও পারে, এক রকম করে দেখলে হয়তো—

নলিনী।নেক্‌লেস এক রকম করে ছাড়া আর ক'রকম করে দেখা যায়? কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন—

সতীশ। আচ্ছা, তা বলো, কী বলছিলে বলো।

নলিনী। কিচ্ছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামি জিনিস আমাকে কেন দিলে।

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখো, আবার অভিমান।

সতীশ। আমার মতো অবস্থার লোকের অভিমান কিসের। দাও তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। অমন সুর কর যদি তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়াই শক্ত হয়। একটু শান্ত হয়ে শোনো আমার কথা। মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। সেটা বোঝবার শক্তি থাকলেই তো মানুষের কোনো মুশকিল ঘটে না। যে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার একেবারে জানা নেই বলে তুমি রাগ কর, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও-নেক্‌লেস তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে-দান, আমার কাছে সে-দানের মূল্য নেই।

সতীশ। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে! এমন কথা তুমি বললে? অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছু বলি নি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস।

সতীশ। আচ্ছা, তবে নিলুম।

হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধুলায় ফেলিয়া দিল

নলিনী। ও কী হল।

সতীশ। ভেবেছিলুম ওর দাম আছে, ওর কোনো দাম নেই।

নলিনী। (তুলিয়া লইয়া) তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমার যা বলবার তোমাকে বলবই। আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।



সতীশ। (চমকিয়া উঠিয়া) কে বললে ধার হয়েছে। কে বললে তোমাকে। একজন কেউ আছে, সে লাগালাগি করছে। তার নাম বলো; আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো।

সতীশ। বলতেই হবে তোমাকে কে বলেছে আমার ধারের কথা। আমি তাকে দেখে নিতে চাই।

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে ; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার ভদ্র উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধার করার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে-সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা মৃত্যুর চেয়েও দুঃসাধ্য, আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একে যদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল, তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম—এখন এ-জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা বুঝে থাক, তা হলে—

নলিনী। থাক্ থাক্, অন্তরের কথা অন্দরমহলেই থাক্। নেক্‌লেসটা এই নিয়ে যাও।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া করো নেলি, দয়া করো—যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ থেকে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে। সতীশ, তোমার এই নেক্‌লেসটা হাতে করে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে নিয়েছি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে। নইলে কখনোই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতুম না। দিলে অপমান করা হত। বুঝতে পারছ?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান-করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিসকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। মনে করো না, এটা হারিয়ে গেছে ; সেই হারানোতে তোমার দান তো একটুও হারায় না।

সতীশ। ঠিক বলছ, নেলি?

নলিনী। ঠিক বলছি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তা হলে আমি ভারি খুশি হব।

সতীশ। খুশি হবে? তবে দাও। (নেক্‌লেস লইয়া) কিন্তু যে-হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর-একজনের ব্রেস্‌লেট পরেছ, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্তার হাত। বাবা বিশেষ করে বলেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ ব্রেস্‌লেট চিরদিনই তোমার হাতে থাক্—এই নেক্‌লেস কেবল কিছুক্ষণের জন্যে গলায় পরো, তার পরে আমি নিয়ে যাব।



নলিনী। পরলে বাবা রাগ করবেন।

সতীশ। কেন।

নলিনী। তা হলে এই ব্রেসলেট পরার দাম কমে যাবে—ফের মুখ গম্ভীর করছ?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবার মতো।

নলিনী। নয় তো কী। তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই? অকৃতজ্ঞ! মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে কইতে পারতুম? এবার কিন্তু টেনিস্‌কোর্ট্‌ থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে বলছ, নেলি। এখানে আমাকে মানায় না?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে?

নলিনী। সে একটা কারণ বৈকি।

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা বললে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুশি হোয়ো, অন্যে বললে রাগ করতে পার।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে জান, এতে আমি খুশি হব?

নলিনী। এই টেনিস্‌কোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে লজ্জা পাও? এতেই আমি সব চেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে পায়ের ধুলো নিয়েই তাঁকে বলতুম, ভগবান, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিস্‌কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিস্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশি মানায়? শুনে কি তখনই তিনি হার্মানের বাড়ি ছুটতেন টেনিস্‌সুট অর্ডার দিতে।

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি বলতে চাই, টেনিস্‌কোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনির কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় প'রে যদি এখনই ইন্দ্রলোকে যাও তো উর্বশী হয়তো একটা পারিজাতের কুঁড়ি ওর বাট্‌নহোলে পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না—অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাট্‌ন্‌হোল তো এই রয়েছে, গোলাপের কুঁড়িও তোমার খোঁপায়—এবারে পছন্দর পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে নিতে পারি।

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্ছ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিস্‌কোর্ট।

সতীশ। এটা যে স্বর্গ নয়,সেইটে ভুলতে পারি নে বলেই তো—

নলিনী এইবার তো নন্দীর সুর লাগছে গলায়—

সতীশ। তার একটিমাত্র কারণ—আমি টেনিস্‌কোর্টেরই যোগ্য হতে চাই। উর্বশীর হাতের পারিজাতের কুঁড়ির 'পরে আমার একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দুঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ—স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্তিককে নিয়ে, চাঁদকে নিয়ে—এখানে আছেন স্বয়ং মিস্টার নন্দী। পেরে উঠবে না, কন্যাকর্তাদের সব দামি দামি অর্কিড ওঁরই বাট্‌ন্‌হোলে গিয়ে পৌঁচ্ছচ্ছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। অর্কিডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা করেছিলেন, ওর সদগতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—



নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে ততটা অর্থ নেই?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকর্তাদের অমরলোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বর্গপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে। চললেম তবে সেই তপস্যায়।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। হ্যালো সতীশবাবু! ও কী ও! সেই নেক্‌লেসটা নিয়ে চলেছ যে! সেদিন তো অ্যাল্‌বম নিয়ে সরে পড়েছিলে, আজ নেক্‌লেস? Bravo! You know how to eat your pudding and yet to keep it.

সতীশ। বুঝতে পারছি নে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে পাই নে। দেবার হাত, নেবার হাত, দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যাবসা ক'রে এত এনর্মাস প্রফিট।

নলিনী। ও কী সতীশ, হাতের আস্তিন গুটোচ্ছ যে, মারামারি করবে নাকি। তা হলে মাঝের থেকে আমার নেক্‌লেসটা ভাঙবে দেখছি। দাও ওটা গলায় পরে নিই।—

নেক্‌লেস লইয়া গলায় পরা

অমনি নেব না, সতীশ, এর দাম দেব।—

গোলাপেব কুঁড়ি সতীশেব বাট্‌ন্‌হোলে পবাইয়া

মিস্টার নন্দী, আপনার ব্রেস্‌লেট আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন।

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই তো আমি—

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্মসম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদের দুজনের লড়াই দেখবার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।

[উভয়েব প্রস্থান

চারুবালার প্রবেশ

চারু। মিস্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে বললে নেই।

চারু। সাকার দেবতার কথা বলছি, নিরাকারের খবর জানি নে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা হলে করকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন নাকি। আমি তো—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছই—

চারু। তার পরে রিডাইরেক্টেড্ হয়ে—

নন্দী। ঘুরে আসতে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারই ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা হলে কলঙ্কের চিহ্নটাই জাগবে; ঠিকানাটাই পড়বে চাপা।



চারু। আপনার মতো আলাপ করতে আমি কাউকে শুনি নি—চমৎকার কথা কইতে পারেন।

নন্দী। শুধু যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল, তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ করতে দিন।

চারু। আপনি বাংলাতেও pun করতে পারেন—ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিস্টার নন্দী, ও ব্রেস্‌লেট তো নেলির—

নন্দী। সেইটেই তো হয়েছিল মস্ত ভুল। শোধরাবার অপরচুনিটি যদি না দেন, তা হলে উদ্ধার হবে কী করে।

চারু। ঐ নেলি আসছে, চলুন আমরা ঐদিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

নলিনী ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী। যথেষ্ট হয়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা বলবার চেষ্টা কর তা হলে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখতে চাও, তা হলে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নলিনী। কোন্‌টা।

সতীশ। সেই যে—উজাড় করে দাও হে আমার সকল সম্বল।

নলিনীর গান

উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্ররাতের বেলায়
নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরমদিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

লাহিড়িসাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শুনে যাও। (জনান্তিকে) সতীশের বাপ মারা গেছেন।

নলিনী। সে কী কথা।

লাহিড়ি। মাদ্রাজে। সেও আজ তিন দিন হল। হার্টের উইক্‌নেস থেকে।

নলিনী। সতীশ জানে না?

লাহিড়ি। না—মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাকতে মানা করেছিলেন। সেখানে ওঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানত না। দৈবাৎ পুজোর ছুটিতে একজন বাঙালি উকিল সেখানে ছিল, মৃত্যুশয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরি করেছে। সে আজ এসে পৌঁচেছে। আমাকে সে



জানে—আমার কাছেই প্রথম এসেছিল, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র রওনা করে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

[প্রস্থান

নলিনী। সতীশ, চা পড়ে রয়েছে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে করছে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও রুটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরিব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখো, ও-কথা আজ থাক্। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্ছ কেন—আমার তো আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না খাও। আর-একটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আর পারছি নে—আমার হয়েছে। আমার খাবার রুচি চলে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা হলে এসো—শোনো। তোমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সৌভাগ্য তো আর কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চলে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

লাহিড়ি ও লাহিড়ি-জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি-জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে?

লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে বললে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ-আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ। এখন কী করা যায়।

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখতে পাও না। তোমার নেলি এ দিকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া করে দিয়েছে। নন্দী তো ভয়ে ওর কাছেই ঘেঁষতে চায় না। জানো বোধ হয় চারুর সঙ্গে সে এন্‌গেজ্‌ড্।

লাহিড়ি। সেদিন টেনিস্‌কোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিল।

জায়া। এখন উপায় কী করবে।

লাহিড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর কোনোদিন নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির উপর নির্ভর করে বসেছিলে। অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

লাহিড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে ; তাতে ক্ষুধাশান্তি হয় না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা। ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চটপট নিক্-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।



জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

লাহিড়ি। ব্যস্ত হোয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার আমাদের নেলি যে-রকম জেদালো মেয়ে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময় আমি ভাবতুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব— সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো-না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীব। প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর ঃ সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি মা, এখনো ছাড়ে নি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে বসে আছেন।

বিধুমুখী। আমাদের যা করবার তা তো করেছি, গয়াতে তাঁর সপিণ্ডিকরণ হয়ে গেল— তোর মাসির কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হয়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসির কপালেই ফলল। নইলে—

বিধুমুখী। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।

সতীশ। অন্যায় অন্যায়! বাবার সম্পত্তি পেতে পারতুম, তার থেকে বঞ্চিত হলুম ; তার পরে আবার—কী অন্যায়।

বিধুমুখী। অন্যায় নয় তো কী। নিজের বোনপোকে এমন করেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খাটল ; আমরা কালীঘাটে এত মানত করলুম, তার কিছুই হল না। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবানকে ডাক্—তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা, এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল—কিন্তু যে-রকম অন্যায় হল, তাতে—ঈশ্বরের কাছে—তিনি দয়া করে যেন—

বিধুমুখী। আহা, তাই হোক—নইলে তোর উপায় কী হবে, সতীশ। হে ভগবান, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় ঈশ্বরকে আমি আর মানব না ; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধুমুখী। আরে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে।—সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্ছিস?



সতীশ। হাঁ।

বিধুমুখী। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস্‌ নি যে বড়ো?

সতীশ। সে-সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধুমুখী। সে আবার কবে হল।

সতীশ। অনেক দিন। টেনিস্‌পার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলেম।

বিধুমুখী। সে যে অনেক দামের!

সতীশ। নইলে পোড়াবার মজুরি পোষাবে কেন। স্বর্ণলঙ্কারও তো অনেক দাম ছিল।

বিধুমুখী। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম নয়। যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

[প্রস্থান

সুকুমারীব প্রবেশ

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী মাসিমা।

সুকুমাবী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল লাহিড়িসাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়িসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মানুষ ; তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলাম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিঙ পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। এ দিকে একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে। কিন্তু সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জন ক'রে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো অনেক আগেই তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝছি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই যত দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই নাহয় যত দোষ, তবু যে-কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ, দরকারমতো দুটো কাজই নাহয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনই করছি।

সুকুমারী। আজ তোমার আপিসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার সুট।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জুতো চাই।

[সতীশ প্রস্থানোন্মুখ



অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও। আজও বুঝি লাহিড়িসাহেবের রুটি-বিস্কুট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে? খোকার জন্য স্ট্র-হ্যাট এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

[সতীশের প্রস্থান। পুনরায় ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলাম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি নূতন সুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত-খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সা লাহিড়িসাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। স-টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখনো দোকান খুলতে দেরি আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরত দিয়ো যেন। একটা হিসাব বাখতে ভুলো না।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু'পা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায়-মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুনবাজার থেকে মাছ কিনে আনতেন—মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে—

[সুকুমাবীব প্রস্থান

সেই চিঠিটা এইবেলা শেষ করি, নইলে সময় পাব না। [চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত

হবেনেব প্রবেশ

হরেন। দাদা, ও কী লিখছ, কাকে লিখছ, বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে-খবরে কাজ কী, তুই খেলা করগে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ—আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি—যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা—ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ, বলো-না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। আঁ্যা, মিথ্যা কথা বলছ! ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার—ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ-যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস্ নে—হাত দিস্ নে, ছিঁড়ে ফেলবি।



হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা। আমি তোমাকে লজঞ্চুস আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বৈকি, আরেকজনের জিনিস বৈকি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, একটুখানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্চুস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি। (স্লেট লইয়া চীৎকার স্বরে) ভয়ে আকার ভা—

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস্ নে।—আঃ, থাম্ থাম।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, খবরদার ছিঁড়িস্ নে।—ও কী করলি। যা বারণ করলেম তাই, ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি। এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি। (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা এখান থেকে—যা বলছি! যা!

[হবেনের চীৎকারস্ববে ক্রন্দন ও সতীশেব সবেগে প্রস্থান

বিধুমুখীব ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস্ নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, চুপ কর্, চুপ কর্, আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধুমুখী। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।—[হরেনের ক্রন্দন] এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একেবারে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজেরছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্জনে) খোকা, চুপ কর্ বলছি, ঐ হাম্‌দোবুড়ো আসছে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না।—আর, তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।



বিধুমুখী। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না, তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে-পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার কব্‌রাজের বোতল-বোতল ওষুধ গিলছে, তবু দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল!

[সকলেব প্রস্থান

সতীশ ও নলিনীব প্রবেশ

সতীশ। এ কী, তুমি যে এ-বাড়িতে?

নলিনী। শশধরবাবু বাবাকে কী একটা আইনের কাজে ডেকেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে'

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। যে লোক সন্ধান জানে সে-তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিই।



সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে-দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যে-রকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দীসাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই—কলার নই—দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান।

নলিনী। ঐ-যে, বাবা ডাকছেন। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। যাই

[উভয়ের প্রস্থান

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী। দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, আমার হরেনকে মারবার জন্যেই ওরা মায়ে-পোয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে।

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি।

সুকুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না।

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোলো। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে-কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-



না, আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কী রকম, সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ, তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো—পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়। আর, যার সামর্থ কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে! সব দোষ আমারই। তুমি তো আর কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন—আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি— অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো। কিন্তু আমি বলছি সতীশ যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকবে খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। এ তো আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে-অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে।

কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ও মা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি!

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে-দুধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্যকথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস্ নে? আমি তোর মা, সতীশ?



সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক।

শশধর। আঃ সতীশ। চলো চলো—কী বক্‌ছ, থামো।

সুকুমারী। নাও, তোমরা বোঝাপড়া করো—আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে দিতে না পারি তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ—একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো তোমার সম্বন্ধে আমরা যে-অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব, সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি—পরশু শুক্রবারে রেজেস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধুলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধব। আচ্ছা, থাক্ থাক! ও-সব স্নেহ-ফেহ আমি কিছু বুঝি নে, রস-কস আমার কিছুই নেই। যা কর্তব্য তা কোনোরকমে পালন করতেই হবে, এই বুঝি। সাড়ে-আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে যাও।—সতীশ একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিস্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমনকি আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন। আরো-একটা সুখবর আছে সতীশ তোমাকে যে-আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি সেখানকার বড়োসাহেব তোমার খুব সুখ্যাতি করছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন বলেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

[প্রস্থান

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মাঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো!

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করেছ তো।

শশধর। তাই যদি না করব, তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে আমাদের



তরফ মানিকপুর লিখে-পড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মুগ্ধ। না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না। আমি বলে দিলাম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না?

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করো-না কেন তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝি নে—তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—এই আমি বলে গেলেম!

[প্রস্থান

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায় আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন সতীশ।

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ, বুঝেছ—সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—যদিই বা—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বৈকি। বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে—ধৈর্য ধরে থাকলেই—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা, মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি যে অন্ন খাইয়েছেন তা উদগার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদসুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই, সতীশ। তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনই তাঁর কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জলগ্রহণ করব।

[প্রস্থান



পঞ্চম দৃশ্য

বাগান

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরোনো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। ভালোই তো, যা মাইনে পাবে তাতেই বেশ চলে যাবে। তার উপরে যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে ব'স, তবে একদিন সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি চলতে তবে সতীশ এতদিনে মানুষের মতো হত।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন ; আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন—আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে-টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত, তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। রইল। সে তো বরাবরই ঐরকম লম্বাচৌড়া কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ?

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ঐ-যে তোমার সতীশবাবু আসছেন। আমি যাই।

সতীশেব প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখে, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্, এ যে একতাড়া নোট। যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে, তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পবিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কাণ্ড, সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুনচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনাফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ-যে জুয়োখেলা।

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ-টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।



সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ, তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্জির হাতে দাও-না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

নোটগুলি তুলিয়া গুনিয়া দেখা

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ, সে কী কথা। বেলা-যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আর নূতন করে ফাঁদতে পারব না।

[প্রস্থান

সুকুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দুপয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ? কৃতজ্ঞতা এমনই বটে! ঘোর কলি কিনা!

[উভয়ের প্রস্থান

সতীশেব প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি—এই যথেষ্ট আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও? হরেন! কী করছিস? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারি দিকে কেউ নেই—পালা, পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কী ভাবছিস তুই—ওরে সর্বনেশে, চুপচুপ—না না না, এ কী বকছি। আমি কি পাগল হয়ে গেলুম—কে আছিস ওখানে। বেহারা, বেহারা! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা! শুনতে পাচ্ছ? ইঃ, একেবারে লুটোপুটি করতে থাকবে। আঃ। হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী কবি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

[ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সবেগে আঘাত করিল, কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না, শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।]

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা নাকি! তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কাঁচা পেয়ারা পাড়ছিলুম, বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়, মেসোমশায়, এই বেলা রক্ষা করো, আর দেরি কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি, মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কী রকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসৃষ্টি। দেখো দেখি! আমার বুক এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ, মদ ধরেছে বুঝি!

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।



হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত থেকে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো, এই দেখো, মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতাল্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা। হায় ভগবান, আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ করছ, তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, তুমি শুনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্তি পুরো হল। এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়ো-সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জানো না—

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে ক্ষমা করো।

বিধুমুখী। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে, নাই থাক্, ভগবান তোকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তাঁর পায়ে ধরি গে।

[প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উলটো হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক



করবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর শ্রদ্ধা আছে।

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা—ছি ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে-কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না ব'লে চুরি করেই এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে ; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে ; এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে-ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না।—সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি। ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসৎকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

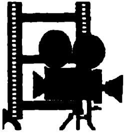
———



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....



শেষরক্ষা



❑ ১৯৪৪ সাল।

শেষরক্ষা—রবীন্দ্র কৌতুকনাট্য। 'শেষরক্ষা' ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'শেষরক্ষা' 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের পুনর্লিখিত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

সাদা-কালো। সবাক। ৩৫ মি. মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পশুপতি চ্যাটার্জী।

প্রযোজনা—চিত্র ভারতী (প্রতিভা শাসমল প্রযোজিত চিত্র ভারতীর প্রথম ছবি)।

চিত্রগ্রাহক--বিভূতি লাহা।

শব্দগ্রহণ—যতীন দত্ত।

শিল্প নির্দেশক—বংশী অ্যাশ।

সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত — অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণা মোহন ঠাকুর।

কণ্ঠসঙ্গীত—সুপ্রীতি ঘোষ, বিজয়া দাস।

অভিনয়ে—পদ্মা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রভা দেবী, অমর মল্লিক, রেবা বসু, বিজয়া দাশ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবেন বোস, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায়, হীরেন বোস প্রমুখ।

পরিবেশনা— কোয়ালিটি ফিল্মস।

মুক্তি—১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।

○ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সকাল ১০.৩০ রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে 'শেষরক্ষা' ছবিটির উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

❑ ১৯৭৭ সাল।

শেষরক্ষা—রবীন্দ্র কৌতুকনাট্য 'শেষরক্ষা' অবলম্বনে নির্মিত দ্বিতীয় সবাক চলচ্চিত্র।

সাদা কালো। ১৪ রিল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য—জ্যোৎস্নাময় চৌধুরী।

পরিচালনা—শঙ্কর ভট্টাচার্য।

প্রযোজনা—দিলীপ সরকার /নিউ থিয়েটার্স (?)।

চিত্রগ্রাহক—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও পিন্টু দাশগুপ্ত।

শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা—গঙ্গাধব নস্কর।

সঙ্গীত পবিচালনা— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কণ্ঠদানে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বোস, সুমিত্রা রায়।

অভিনযে—অনিল চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, সন্তু মুখার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, মহুয়া রায়চৌধুরী, সত্য ব্যানার্জী, সন্তোষ দত্ত, ভাবতী দেবী, দীপঙ্কব দে, পদ্মা দেবী প্রমুখ।

মুক্তি—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৭, শ্রী, ইন্দিবা।

❍ ১৯৪৪ ও ১৯৭৭ সালে নির্মিত দুটি 'শেষরক্ষা' ছবিতেই পদ্মা দেবী অভিনয কবেছিলেন। তবে দুটি ভিন্ন চবিত্রে।

নাটকের পাত্রগণ

চন্দ্রকান্ত
বিনোদ
গদাই
নিবারণ
শিব
ভৃত্য
নলিনাক্ষ
শ্রীপতি
ভূপতি
দরজি
ললিত

ক্ষান্তমণি
ইন্দু
কমল
বুড়ি
ঠাকুরদাসী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিবারণবাবুর বাসা

ক্ষান্তমণি ও ইন্দু

ক্ষান্তমণি : কী আর বলব আমি তোকে, আমার তো হাড় জ্বালাতন। আমার ঘরে যতগুলো লোক জোটে সবচেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ বিনোদ :

ইন্দু : সেইজন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সবচেয়ে তার পসার ভারী—লক্ষ্মী যে ছাড়ে লক্ষ্মী তারই পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্তমণি : কেন ভাই, তোর ওকে পছন্দ নাকি?

ইন্দু . আরেকটু হলেই হতে পারত। কিন্তু সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্ষান্তমণি : কী ক'রে কাটল?

ইন্দু : দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্তমণি : বলিস কী! কমল নাকি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দু : দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামায়ণে শোন নি?

ক্ষান্তমণি : শুনেছি।

ইন্দু : সবচেয়ে শক্ত বাণ হল সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বুকে বেঁধে, কেউ দেখতেই পায় না।

ক্ষান্তমণি : একটু ভাই, বুঝিয়ে বল্। তোদের মতো আমার অত পড়াশুনো নেই।

ইন্দু : সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখাশোনার দরকার হত না। তোমার বিনোদবাবু যে কবি তা জান না!

ক্ষান্তমণি : তা হোক-না কবি, হয়েছে কী?

ইন্দু : কমলদিদি ওর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদবাবুর 'আঙুরলতা' বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তার 'কাননকুসুমিকা' রেখেছে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।



ক্ষান্তমণি : কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদবাবুর নামও শুনি নি।

ইন্দু : নামটা বুকের মধ্যে বাসা করেছে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্তমণি : কী যে বলিস, বুঝতে পারি নে—ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বল্ তো! আমাকে একটু নমুনা দে দেখি।

ইন্দু . তবে শোনো—

বসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,
অন্তরে জোগায় সে যে বাণী।
সময় পায় না আঁখি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্তমণি : হায় রে, কী শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু : কমলদিদি খাতায় লিখে রেখেছে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

ক্ষান্তমণি : চাই বৈকি, জেনে রাখা ভালো।

ইন্দু : (নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি! দিদি!

সেলাই হাতে কমলের প্রবেশ

কমল · কেন? হয়েছে কী?

ইন্দু : এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দানশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপ্নকে মূর্তি দিচ্ছেন।

কমল : সে খবব দেবাব জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দু : তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনিই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সেজন্যে ভাবিও নি। সখীপরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেছে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেছ আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্তদিদিও সেইজন্যেও বসে আছেন—আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটি জুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্তমণি : ইন্দুর কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বললুম!

ইন্দু : তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েছে, তার চেয়ে নাহয় কিছু নীরসই হল। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও।

কমল : *গান*

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে
প্রভাত হল আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশি তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখনরেখা দিয়েছে লেখি!



মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দু : ক্ষান্তদিদি, ঐ চেয়ে দেখো, বাণ পৌঁচেছে!

ক্ষান্তমণি : কোথায়?

ইন্দু : আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেছে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্তমণি : ইন্দু, তুই স্বপ্ন দেখছিস নাকি?

ইন্দু : ঐ দেখো-না, তোমাদের বন্ধ দরজার খড়খড়ে খুলে গেছে।

ক্ষান্তমণি : তা তো দেখছি।

ইন্দু : কমলদিদি, বুঝতে পেরেছ?

কমল : আঃ, কী যে বকিস তার ঠিক নেই!

ইন্দু ঐ খোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কবিকুঞ্জবনের দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়খড়ির পিছনে একটা ধড়ফড়ানি দেখতে পাচ্ছ?

কমল : কিসের ধড়ফড়ানি?

ইন্দু : সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

গান

হায় রে,
ওরে যায় না কি জানা!
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়,
পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা।
কেমন ক'রে জানাই তারে,
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা
আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,
ঝ'রে-পড়া বকুলদলে
বিছায় বিছানা।

ক্ষান্তমণি : ওলো ইন্দু, দেখ্ দেখ্ খড়খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠল যে!

ইন্দু : এবার তুমি যদি গান ধর তা হলে দেয়ালসুদ্ধ ফাঁক হয়ে যাবে!

ক্ষান্তমণি : আর ঠাট্টা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনে ভেবেছিলুম, একা কমলই বুঝি শব্দভেদী বানের তীরন্দাজ। বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করেছেন! হাতের কাছে এত বিপদ জমা আছে, এ তো জানতুম না।

ইন্দু : সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে—তারই সহায়তায় নারীদের



ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে; কারও বা কুটিল হাস্য, কারও বা কুঞ্চিত কেশকলাপ; কারও বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনাযোগে বুক-জ্বালানি রান্না।

ক্ষান্তমণি : কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়্খড়ে দিয়ে গলবে নাকি?

ইন্দু : কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারও লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্তমণি : তা যেন হল, তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধবে না?

ইন্দু : তাই তো বলে রেখেছি, আমি দাবি করব না।

কমল : এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কী?

ইন্দু : কমলদিদি, জীবনের অঙ্কশাস্ত্রে পুরুষেরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দুভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি—নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়্খড়েটার কব্জা এতদিনে ঝর্ঝরে করে দিতুম।

কমল : কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানি নে?

ইন্দু : আমি ওঁর কবিতাবিছানো রাস্তায় এক পা চলতে পারব না। মানেই বুঝতে পারি নে—হুঁচট খেয়ে মরব।

ক্ষান্তমণি : তোরা দুজনে মিলে রফানিষ্পত্তি করে নে, আমার কাজ আছে, যাই।

ইন্দু : বেলা গিয়েছে, এখন আবার তোমার কাজ?

ক্ষান্তমণি : যত বেকারের দল, কখন কী খেয়াল যায় ঠিক নেই। হয়তো হঠাৎ হুকুম হবে, তপ্‌সি মাছ ভাজা চাই; নয়তো কড়াইশুটির কচুরি, নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু : একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কর্মবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব চেখে দেখবার কঠিন কাজে। কমলদিদি, ঐ দেখো, খড়্খড়েটা লুব্ধ চকোরের চঞ্চুর মতো এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দুঃখ হচ্ছে।

কমল : এত দয়া যদি তো সুধা তুমিই ঢালো-না। আমি চললুম।

ইন্দু : না, দিদি।

গান

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে।
চপল লীলা ছলনাভরে
বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে।

হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা
হায় রে অভিমানিনী নারী,
বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে।



আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়খড়ের পিছনে কোন্ মানুষটি বসে আছে আন্দাজ করো দেখি। চন্দরবাবু?

ক্ষান্তমণি : না, ভাই, তার আর যাই দোষ থাক্ তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পৌঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েছি।

ইন্দু : অর্থাৎ, আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো-দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি।

ক্ষান্তমণি : আর-একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দু : আবে, ছি ছি, ছি ছি! অমন নাম যার তার খড়খড়ে চিরদিন যেন বোজা থাকে।

ক্ষান্তমণি : নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দু : নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে গদাই যদি 'কাননকুসুমিকা'র কবি হত তা হলে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মুশকিলেই পড়ত। ভক্তি হত না, সুতরাং মুক্তিও পেত না।

কমল : দিদির মুক্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েছে।

ইন্দু : সেইজন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট করতে চাই নে। আমার স্বয়ম্বর সভার নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল : তা হলে এইবেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ করা যাক। কুমুদ কিরকম?

ইন্দু . চলে যায়।

কমল নিকুঞ্জ?

ইন্দু : চলতেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল : পরিমল?

ইন্দু : মালাবদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দু আমি হব পরিমল। যা হোক এগুলো চলতেও পারে—কিন্তু গদাই? নৈব নৈব চ।

ক্ষান্ত : কী যে পাগলামি করছিস ইন্দু! চল্, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র : ভাই বিন্‌দা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা-কিছু হল বলে, কিংবা হয়েই বসেছে।

বিনোদ : তাই নাকি?

চন্দ্রকান্ত : আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেছে যেন কোন্ মায়ামৃগীর পিছু পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে! ওহে, আজকের হাওয়ায় তোমার গায়ে কারও ছোঁয়াচ লাগছে নাকি?

বিনোদ : কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্রকান্ত : মুখের ভাবে।

বিনোদ : ভাবটা কিরকম দেখছ?

চন্দ্রকান্ত : যেন ইন্দ্রধনু উঠেছে আকাশে, আর তারই ছায়াটা শিউরে উঠছে নদীর ঢেউয়ে।

বিনোদ : বলে যাও।



চন্দ্রকান্ত : যেন আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় জুঁইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধরল বলে, আর দেরি নেই।

বিনোদ : আরো কিছু আছে?

চন্দ্রকান্ত : যেন —

নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

বিনোদ : থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত : যেন বাঁশিটি আজ ঠেকেছে এসে গুণীর অধরে। সত্যি করে বল্ ভাই, লুকোস্ নে আমার কাছে।

বিনোদ : তা হতে পারে। একটা কোন্ ইশারা আজ গোধূলিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে ধরতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত : ইশারা উড়ে বেড়াচ্ছে! সেটা প্রজাপতির ডানায় নাকি?

বিনোদ : যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইশারা।

চন্দ্রকান্ত : হায় হায়, হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে বইছে, তার ঠিকানাই পেলে না?

বিনোদ : পোস্ট-আপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা! কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্রকান্ত : সর্বনাশ করলে। এরই মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেছে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্ছে পণের টাকা—তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হলে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের দিক থেকেই এল বুঝি?

বিনোদ : ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরোল! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবছি?

চন্দ্রকান্ত : আজকালকার দিনে কোন্টা তুচ্ছ, কন্যাটা না পণটা, তার হিসেব করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ : যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের করতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে সে কি বুঝবে তার ভরি ওজন করে?

চন্দ্রকান্ত : এটা বেশ বলেছ, তোমার কবিতায় লিখে ফেলো হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এল, তুমি কবি, তার পাদপূরণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই,
কোন্ সোনা তোর সোনা।

বিনোদ : কেনাবেচার দেনালেনায়
যায় না তারে গোনা।

চন্দ্রকান্ত : ভ্যালা মোর দাদা! আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, বল্ সে সোনা
কেমন করে গলে।

বিনোদ : গলে বুকের দুখের তাপে,
গলে চোখের জলে।

চন্দ্রকান্ত : বহুৎ আচ্ছা! আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর
কোন খনিতে পাই?



বিনোদ :
সেই বিধাতার খেয়ালে যার
ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্রকান্ত : ক্যা বাৎ। আচ্ছা, আর-এক লাইন—
ও ভোলা মন, সোনার সে ধন
রাখবি কেমন করে?

বিনোদ :
রাখব তারে ধ্যানের মাঝে
মনের মধ্যে ভরে।

চন্দ্রকান্ত : বাস্, আর দরকার নেই, ফুল মার্ক পেয়েছ—পাস্‌ড্ উইথ্ অনার্স। আর ভয় নেই, সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক—

সোনার স্বপন ধরুক-না রূপ
অপরূপের হাটে।
সোনার বাঁশি বাজাও, রসিক,
রসের নবীন নাটে।

বিনোদ চন্দরদা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্রকান্ত : ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে—তোমরা না থাকলে আমিও কবি বলে চলে যেতে পারতুম, কবিসম্রাট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে, কিন্তু তার ধারাটা মাসিকপত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না।

বিনোদ : ঘরে আছে রসসমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হয়ে যায়।

চন্দ্রকান্ত। এক্‌সেলেন্ট্। কবি না হলে এই গূঢ় খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো। ঐ যে আসছে আমাদের মেডিকাল্ স্টুডেন্ট।

গদাইয়ের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত : এই যে, গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে? তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই : না ভাই, প্যাথ্‌লজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আইঢাই করছে, সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধ-পেটা করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে; জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট্-অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

চন্দ্রকান্ত : হৃদযন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই : ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো, তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্রকান্ত : হবে বৈকি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে—'হৃদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহনিবারণী বটিকা; রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।'



আচ্ছা, ভাই বিনু, এক কথায় বলে দে দেখি কিরকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ : আমি কিরকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্রকান্ত : বুঝেছি। যে কোনো কালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে ; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্ ঢল্ করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ। আচ্ছা, সে যেন হল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ · ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্রকান্ত : আর বেশি বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাছাঁদা, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার টিকে-ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিন্‌দা, চাইলেই তো পাওয়া যায় না।

বিনোদ : কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত : মন্দ বলতে সাহস করি নে, কিন্তু ভাই, সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢিল কলমে লেখা।

গদাই : আর ছাঁদে কাছ নেই ভাই! আবার তোমার কিরকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে।

চন্দ্রকান্ত : তোরা বুঝবি নে, গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বলত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিবপিত ভেল

নেহাত অসহ্য হত না। প্রেয়সী সর্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা এমনটি হয় না—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গদাই : দেখো চন্দরদা, বিয়ে করবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হল মনোথিইজ্‌ম আর পছন্দটা হল পলিথিইজ্‌ম। দুটোর থিওলজি একেবারে উলটো। বিয়ের ডেফিনিশন্‌ই হচ্ছে জন্মের মতো পছন্দ-বায়ুটাকে খতম করে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন করা।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদ : ঐ শোনো, গান।

গদাই : কার গান হে?

চন্দ্রকান্ত : চুপ করে খানিকটা শোনোই-না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিল, পাশে
হল না যাওয়া।



চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া।
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া।

যেখানে হল না খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া।

চন্দ্রকান্ত : বিন্‌দা, আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেছে, কলির কৃষ্ণগুলোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখো-না নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চলছে।

বিনোদ : চন্দ্র আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত : কী বলো দেখি।

বিনোদ : চলো, যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

চন্দ্রকান্ত : বলো কী!

বিনোদ : আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না।

চন্দ্রকান্ত : কিন্তু দেখাশুনা তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিলুম চোখ বুঝে বড়ি গেলার মতো, মুখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পৌঁছে খুব কষে ক্রিয়া করতে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চলবে না।

বিনোদ : না, তাকে দেখতে চাই নে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ করব।

চন্দ্রকান্ত : বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্‌-না। এ যে ভাই মানুষ, দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ : মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তারপরে হয় রাজা নয় ফকির; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত : উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মরচে-পড়া বুকেও ঝলক মারে, ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমনতরো মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই : তা বলি, যদি বিয়ে করতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই ভালো। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত : আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্যবাবু আর নিবারণবাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।



গদাই : তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখো নি তো?

চন্দ্রকান্ত : আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তুখতি সীলমোহর করা, অন্ হার্ ম্যাজিস্টি্স সার্ভিস্। তবে শুনেছি বটে, দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই : আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্রকান্ত : তোমরা একটু বোসো ভাই, আমি অমনি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[*প্রস্থান*

পাশের ঘরে

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত : বড়োবউ, ও বড়োবউ! চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি : কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত : ও আবার কী! যাত্রার দল খুলবে নাকি? আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখুনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি : (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম, তা আদর করছি।

চন্দ্রকান্ত : (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে, ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি : নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্রকান্ত : ও! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বলো, আত্মীয়তা বলো, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি : ঢের হয়েছে গোঁসাইঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত কে বললে, পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি : আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আম শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফুলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকান্ত : আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি : কী বললে?

চন্দ্রকান্ত : আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়—পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি : যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না।

চন্দ্রকান্ত : (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই? কেবল রাগই করলে। শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি—

ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিন মাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে 'ভালোবাসি নে' সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে সাবনর্মাল। যখন বলে 'ভালোবাসি' সেটা হল নাইন্টিএইট পয়েন্ট ফোর, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ



নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শুরু করেছে 'পোড়ারমুখি', তখন চন্দ্রবদনাটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ। বড়োবউ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না বলবার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ডিলিরিয়ম, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না; গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইস্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়, বিশ্রী রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। নাড়ী রসস্থ হলে তাতে ভাষা যে কিরকম এলোমেলো হয়ে ওঠে, তা সেই ডাক্তারই বোঝ রসবোধের যে একেবারে এম.ডি.।

ক্ষান্তমণি : রক্ষে করো, আমার অত ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্রকান্ত : সে তো ব্যবহারেই বুঝতে পারি নইলে লয়াল্‌টিকে সিডিশন বলে সন্দেহ করবে কেন। কিন্তু নিশ্চয় রুগির দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা, কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্মঠাকুরঝিকে বলো নি—আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না? আমার কানে যদি সে কথা আসত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্তমণি : আমি পদ্মঠাকুরঝিকে কখ্‌খনো অমন কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত : আচ্ছা, তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্তমণি : (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একটু বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

চিরুনি ব্রুস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত : হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি : না হয় নি. একদণ্ড মাথা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত : তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই—একটা ললিতলবঙ্গলতা খোঁজ করে আনো গে, আমি চললুম।

[*চিরুনি ব্রুস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান*

চন্দ্রকান্ত : এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে বাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদ : (নেপথ্য হইতে) : ওহে, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি?

চন্দ্রকান্ত : এইমাত্র যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি।

[*প্রস্থান*

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ : তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়।



শিবচরণ : সে বেটার আবার পছন্দ কী! বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তারপর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ : না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ : তা হোক-না কালের গতি, অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিনবে কী করে? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও, তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে, যা হোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি, আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ : নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ : আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না। এখন এই বুড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ : তাহলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ : হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ : তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ : তাই তো। তাঁব হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যা হোক, আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকি আছে।

[*প্রস্থান*

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু : ও বুড়োটি কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ : কেন মা 'বুড়ো বুড়ো' করছিস—তোরও বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দু : (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা? কিন্তু ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ : ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু : আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ : তোর এ বাবা পুরোনো ঝর্‌ঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখনি নে ইন্দু?

ইন্দু : তবে আমি চললুম।

নিবারণ : না না, শোন্‌-না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার একটি বাপের পদ খালি আছে—তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা।

ইন্দু : তুমি কী বকছ বুঝতে পারছি নে।



নিবারণ : নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কিনা। সব বুঝতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুমি!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য : তিনটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দু : তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে।

নিবারণ : না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দু : তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ : একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না।

ইন্দু : তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ : তোব শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি?

[*ইন্দুর প্রস্থান*

নিবারণ : (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ : এই যে চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা সকলে বসুন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত : আজ্ঞে না, তামাক থাক।

নিবারণ : তা ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত : আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ : আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ : আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত : মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ : (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত : মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে তাঁর একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে। যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ : অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্রকান্ত : বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি।

নিবারণ : বিলক্ষণ! তা আর শুনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। 'জ্ঞানরত্নাকর' তো তাঁরি লেখা?

চন্দ্রকান্ত : আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ : তবে তাঁব একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত : 'কাননকুসুমিকা' দেখেছেন কি?

নিবারণ : 'কাননকুসুমিকা'! না, দেখি নি। নামটি অতি সুললিত। বাংলা বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম। তখন অবশ্যই 'কাননকুসুমিকা' পড়ে থাকব, স্মরণ হচ্ছে না। তা বিনোদবাবুর পত্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাস করেছেন তিনি?

চন্দ্রকান্ত : মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম.এ.পাস করে



সম্প্রতি বি.এল উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো, এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ : আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখত পারনে।

চন্দ্রকান্ত : তা এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে আপত্তি না থাকে—

নিবারণ : আপত্তি। আমার পরম সৌভাগ্য।

চন্দ্রকান্ত : তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ : যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্রকান্ত : তবে অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ : এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কী। আর-একটু বসুন-না।

চন্দ্রকান্ত : আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি—

নিবারণ : সে এখন ঢের সময় আছে। বেলা তো সবে—

চন্দ্রকান্ত : আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি। এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি।

নিবারণ : তবে আসুন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ঐ-যে কুসুমকানন না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো।

চন্দ্রকান্ত : কাননকুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়।

নিবারণ : তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত : প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ : আঃ, থামো-না! তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং নতুন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ : দেখুন, বিনোদবাবুর একখানি ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি? তা হলে কমলকে একবার -

চন্দ্রকান্ত : ফোটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেছি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে।

নিবারণ : তা হোক, ছবিটি দিব্যি উঠেছে, এতেই কাজ চলবে।

চন্দ্রকান্ত : তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি।

[*প্রস্থান*

নিবারণ : নাঃ, লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড় ভাবনা ছিল।

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু : বাবা, তোমার হল?

নিবারণ : ও ইন্দু, তুই তো দেখলি নে—তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস. তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু : আমার তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো



লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর-একটি যে লোক এসেছিল—বদ্‌-চেহারা লক্ষ্মী-ছাড়ার মতো দেখতে, চোখে চশমা-পরা, সে কে?

নিবারণ : তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস্‌ নে? বদ্‌-চেহারা আবার কার দেখলি? বাবুটি তো দিব্যি ফুটফুটে কার্তিকের মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দু : তাকে আবার ভালো দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা। এখন নাইতে চলো।—

[*নিবারণের প্রস্থান*

নাঃ ওঁর নামটা জানতে হচ্ছে। নিশ্চয় ক্ষান্তদিদি বলতে পারবেন।—বাবা, শোনো শোনো।

নিবারণের পুনঃপ্রবেশ

ওরা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে গেল না?

নিবারণ : হাঁ, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু : তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও-না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ : ভেবেছিলুম, আমি নিজে দেখাব।

ইন্দু না বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ . এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে ঠাট্টা করিস নে।

ইন্দু বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করছে, আর যাই হোক ঠাট্টায় ওর আর বিপদেব আশঙ্কা নেই।

[*নিবারণের প্রস্থান*

ইন্দু : কমলদিদি, কমলদিদি।

কমলের প্রবেশ

কমল : কী ইন্দু?

ইন্দু : আর দেরি কোরো না।

কমল : কেন, কী করতে হবে বল্‌-না।

ইন্দু : এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে।

কমল : কেন বল্‌ তো।

ইন্দু : খড়্‌খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই দিনমণি উঠে পড়েছেন তোমার ভাগ্যগগনে।

কমল : তুই খবর পেলি কোথা থেকে?

ইন্দু : স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল : একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক।

ইন্দু : আমার চেয়ে ঢেব বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি রচনা করেন, সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল : কী কারণে?

ইন্দু : তোমার উপর করক্ষেপ করবার দাবি জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের শোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে



গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সুখবর কিনা বলো, দিদি!

কমল : এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু : বলিস কী ভাই। কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল : দামের তুলনা করব কী করে? দুটো জিনিস এক জাতের নয়, যেমন মধু আর মধুকর।

ইন্দু : সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি যেরকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীতভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তা হলে কী করা কর্তব্য এইবেলা বলো। এখনো সময় আছে। নাহয় বাবাকে বলে আসি যে, কাব্যের মধ্যে শুধু মিল চাই, সেটাতে মুল হলেও চলে; কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখে শুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল : এর মধ্যে তো একজন দেখছি চন্দরবাবু।

ইন্দু : বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদবাবু আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেই বা কোকিল কেই বা কাক, কেই বা কবি কেই বা অকবি বল দেখি।

কমল : তোর মতন এমন সুক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই।

ইন্দু : আচ্ছা, এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ্, চেয়ে দেখতে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে . দয়মন্তী ছজনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দুজন।

কমল : অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু : বলিস কী দিদি।

কমল : আমি তো স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছি নে বোন। তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে? আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি।

ইন্দু : তুই ভাই, কথায় কথায় বড়ো গম্ভীর হয়ে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না।

কমল : সেজন্য নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দু : তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি, এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস, যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কিরকম লাগে, কে জানে।

কমল · মনে হয়, আমার নাম করে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু : তুই কেন, সে আমি নিজে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ্।

কমল : ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু : নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্বস্বত্ব ত্যাগ করলে?

কমল : কেন বল্ দেখি। এত উৎসাহ কেন তোর?

ইন্দু : সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল . অর্থাৎ?

ইন্দু : অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুমুদ কিংবা পরিমল, কিংবা কিশলয় কিংবা কোকনদ, কিংবা কপিঞ্জল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল : তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দু : একেবারে চুকে না যাক, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্ পাওয়া যাবে তো?

কমল : আচ্ছা, তোর স্পেসিমেন্ জমা কর্—আপাতত চুল বেঁধে দিই গে চল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু : তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি।

ক্ষান্তমণি : না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারি নে। আর সত্যি হবারই বা আটক কী? নিজে তো জানি নিজের গুণ কত।

ইন্দু : তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর-একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি : কী জানি ভাই! বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু : এই দেখ্-না তার ছবি। (কাপড় খুঁজিয়া) এ কী হল! এই যাঃ, কোথায় ফেললুম!

ক্ষান্তমণি : কী ফেললি?

ইন্দু : ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্তমণি . কার?

ইন্দু : বিনোদবাবুর। নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই খুঁজে আনি গে।

ক্ষান্তমণি : ছি ছি, রাস্তার মাঝে ছবি খুঁজতে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবি যে! সে ছবির এতই কিসের কদর?

ইন্দু : হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে-কেটে অনর্থপাত করে?

ক্ষান্তমণি : তোর দিদি? কমল?

ইন্দু : হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করে?

ক্ষান্তমণি : সে আবার কী?

ইন্দু : যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।



ক্ষান্তমণি : আমি যেন কমলকে জানি নে—তুই হলেও বা সম্ভব হত। কেন ভাই, আসল জিনিস যখন ধরা দিয়েছে তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন?

ইন্দু : আসল জিনিসকে ডেস্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিসের মেজাজের ঠিক নেই—বেশি খিদে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির করে তোলে—কিন্তু—

ক্ষান্তমণি : আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই 'কিন্তু' এত বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দু : ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো-না।

ক্ষান্তমণি : খুব সম্ভব গদাই : সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দু . বাজি রাখতে পারি, সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তা হলে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

ক্ষান্তমণি : তা হলে ললিত।

ইন্দু এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্তমণি : চেহারাটা সুন্দর তো?

ইন্দু : সুন্দর বৈকি।

ক্ষান্তমণি : পাতলা, চোখে চশমা আছে?

ইন্দু · হাঁ হাঁ, চশমা আছে। আর, সব কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে।

ক্ষান্তমণি : তবে আমাদেব ললিত চাটুজ্জে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু · ললিত চাটুজ্জে না হয়ে যায় না। বাজি রাখতে পারি।

ক্ষান্তমণি : কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই। এম.এ. পাস কবে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দু : জলপানি পাবার মতোই চেহারা বটে। তা ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন?

ক্ষান্তমণি : স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কী হয়? ওর তো তবু নেই। বলে যে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করবে না।

ইন্দু : জানিস. ক্ষান্তদিদি, ওদের তিন জনের ছবিতে যেন তিন কাল মূর্তিমান। চন্দ্রবাবু অতীত, বিনোদবাবু বর্তমান, আর ললিতবাবু ভাবী।

ক্ষান্তমণি : ভাবী? কার ভাবী লো?

ইন্দু : সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্তমণি : দেখ্ ইন্দু, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বঙ্কিমবাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও বুঝতে পারব না—কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দু : এই দেখ্, মুশকিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওজনমত জগৎসিংহ পাবি কোথা?

ক্ষান্তমণি : তা বলিস নে ইন্দু : আমি যেকরম মাপের আয়েষা সেরকম মাপের জগৎসিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু : চাল-চলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েছে, ব্যবহারে আয়েষাগিরি করে উঠতে পারছ না।

ক্ষান্তমণি : কতকটা তাই বটে।

ইন্দু : প্র্যাক্‌টিকাল্ এডুকেশনটা হয় নি আর-কি। কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ চাই

ক্ষান্তমণি : তোর ইংরিজি আমি বুঝতে পারিনে, ভাই।



ইন্দু : আমার বক্তব্য হচ্ছে, বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েছ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্তমণি : তোমার কাছ থেকে?

ইন্দু : আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক হাতে-খড়ি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো, আমি চন্দ্রবাবু, আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—তার পর তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না।

আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তর উচ্চহাস্য

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করে না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইলে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনুসংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি, এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি : প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু : আচ্ছা, তবে আর-একবার চেষ্টা করো। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি : (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দু : ও কী করছ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো—বলো, 'নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে, করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।'

ক্ষান্তমণি : (যথাশিক্ষিত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দু : কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি : (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দু : এই দেখো, সব মাটি করলে। অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো, 'লুচি?' কই লুচি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ এসো এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—'

চন্দ্র : (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ।

ইন্দু : ঐ চন্দ্রবাবু আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও।

[*পলায়ন*

পাশের ঘর

গদাই আসীন। চাপকান-শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ

গদাই : একি।

ইন্দু : ও মা, এ যে ললিতবাবু! আর তো পালাবার পথ নেই। (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা আর এই



চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শীগগির দেখে এসো দেখি, বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

গদাই : (হাসিয়া) যে আজ্ঞা। [*প্রস্থান*

ইন্দু · ছি ছি! ললিতবাবু কী মনে করলেন। যা হোক, আমাকে তো চেনেননা। ভাগ্যিস, হঠাৎ বুদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই? ঐ আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই : ঠাকুরুন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন?

ইন্দু : এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আসছেন। ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে।

[*প্রস্থান*

গদাই : কী চমৎকার! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি। বা বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালীর ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে? নিলর্জ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত : তুমি এ ঘরে ছিলে নাকি? তবে তো দেখেছ?

গদাই : চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই : ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত : ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই : মরেছে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ তো—

চন্দ্রকান্ত : বিধবা নয় হে—কুমারী। যদি হঠাৎ ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

গদাই : তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত : তা হলে চলো, একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস, সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে—যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বাপ-পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি।

গদাই : মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে, তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্রকান্ত : বলো কী গদাই? বিধাতার আর্শীবাদে জন্মালুম পুরুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি সাহসের কথা? গদাই, যেয়ো না হে! তোমাকে দরকার আছে, এখনি আসছি।

[*প্রস্থান*



গদাই : (পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া) আর তো পারছি নে। মাথার ভিতরটা যেরকম ঘুলিয়ে গেছে, আজ বোধ হয় একটা দুষ্কর্ম করব। কবিতা লিখে ফেলব। বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাণুগুলি কেবলই চোদ্দ অক্ষর খুঁজে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

লিখিতে প্রবৃত্ত

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরো। কিন্তু কাকে ফেলে কাকে রাখি। (চিন্তা) 'আমায়'-কে 'আমা' বললে কেমন শোনায়? কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে— কানে তো নেহাত দেওয়া যায়? পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। কাদম্বি—না ঠিক, শোনাচ্ছে না। কদম্ব—ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
—কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

উ হুঁ, ও হচ্ছে না। 'কেমন করে' কথাটাকে তো কমাবার জো নেই। 'কেমন করিয়া'— তাতে আবো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। 'তখনি চিনিলে'র জায়গায় 'তৎক্ষণাৎ চিনিলে' বসিয়ে দিতে পাবি, কিন্তু সুবিধে হয় না। দূর হোক গে! ছন্দে লেখাটা বর্বরতা। যে সময় পুরুষমানুষ কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ পরত, পদ্য জিনিসটা সেই যুগের; ডিমক্রাটিক যুগের জন্যে গদ্য। হওয়া উচিত ছিল—'বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল অমনি আমাকে গোলাম বলে চিনে নিলে কেমন করে খুলে বলো তো।' এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার সীলমোহরের ছাপ নেই—একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখী-বির্নিগত।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ : কী হচ্ছে গদাই?

গদাই : আজ্ঞে, ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি।

শিবচরণ : ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই : হার্টের ফাংশন নিয়ে।

শিবচরণ : দেখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছু—

গদাই : আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেসট্ থিওরি নিয়ে—বোধ হয় মাসখানেক হল এর ডিস্‌কভারি হয়েছে। এখনো সকলে জানে না।

শিবচরণ : সত্যি নাকি? আমি আবার চশমাটা আনি নি। সব্‌জেক্‌টটা ইণ্টারেস্টিং. পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে। কিন্তু, এখানে করছিস কী?

গদাই : এক্‌জামিনটা খুব কাছে এসেছে—চন্দ্রবাবুর বাসাটা নিরিবিলি আছে, তাই এখানে—

শিবচরণ : দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।



গদাই : (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শিবচরণ : নিবারণবাবুকে জানো বোধ করি—

গদাই : আজ্ঞে হাঁ, জানি।

শিবচরণ : তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির।

গদাই : একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ : কেন বাপু?

গদাই : এক্‌জামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ : তা হোক-না এক্‌জামিন। বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, এক্‌জামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই : ডাক্তারিটা পাস না করেই কি—

শিবচরণ : কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু আপত্তিটা কিসের জন্যে?

গদাই : উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ : উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হয়েছ যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে?

গদাই নিরুত্তর

তোমার হল কী' বিয়ে করবে, তার আবার এত ভাবনা কী! আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

গদাই : বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ : (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা! হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

গদাই : আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ : (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে! তোর বাপ পিতামহ, তোর চৌদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু পাতা ইংরিজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে!

গদাই : আমি মিনতি করে বলছি বাবা, একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই এ প্রস্তাবে—

শিবচরণ : তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এত বড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যক।

গদাই : আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ : আচ্ছা।

[*পস্থান*

গদাই : আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল; এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।



চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত : আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই?

গদাই : তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত : তোমার স্মরণশক্তির যেরকম অবস্থা দেখছি, এক্‌জামিনের পক্ষে সুবিধে নয়। এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসিগে।

গদাই : আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্‌—

চন্দ্রকান্ত : বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না গদাই : যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

গদাই : চলো।

[*প্রস্থান*

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু : বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিনকুলে আর কেউ নেই নাকি?

ক্ষান্তমণি : বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে—তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো। আবার বলে কী, এ তো আর শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এত শোরশরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কী?

ইন্দু : একবার হাতে পড়ুক-না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কিরকরম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি : এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ্‌-না ভাই, ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দু : তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই, দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি : কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জুটেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

ইন্দু : এগুলো?

ক্ষান্তমণি : কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জুটেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

ইন্দু : এগুলো?

ক্ষান্তমণি : এগুলো মকদ্দমার কাগজ—হারাতে পারলে বাচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু : এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেল আছে—তারও আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি—এ কি দরকারি।

ক্ষান্তমণি : ওর মধ্যে দরকারি আছে অ-দরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জো নেই।



খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারি দিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দু : এ-সব কী। কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কাননকুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট ক্ষান্তমণি—এই দেখো। এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব। এই চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধহয় চলবে না? আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উপাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধাব নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ঐ ভাই, ওরা আসছে, চলো ও ঘরে পালাই।

[*প্রস্থান*

বিনোদ চন্দ্রকান্ত গদাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ভূপতির প্রবেশ

বিনোদ : (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক, মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত : এরই মধ্যে? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড় নি?

বিনোদ : আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কী হবে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত : মহারানীর বিদূষক।

বিনোদ : সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজাদের যে ফুল্‌গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্রকান্ত : সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত-কিছু শিক্ষাদীক্ষা, যত-কিছু আশা-আকাঙক্ষা—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু উঁচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল সেগুলো ঐ টোপর চাপা পড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি : চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে। হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি 'বিয়ে-বিয়ে' মনে হয়?

চন্দ্রকান্ত : সে তো ভাই, স্টোন্‌-এজ্‌, আইস্‌-এজের কথা। সে যুগে না ছিল পূর্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি : শালীর হাতের কানমলা?

চন্দ্রকান্ত : হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাকলে তবু বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরই মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদ : বাস্তবিক, বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে কটি পাস আছে কনে পছন্দ করবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত কটি ভগিনী আছে।

চন্দ্রকান্ত : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি চৈতন্য হল? নিতান্ত বঞ্চিত হবে না; তোমার কপালে একটি আছে, নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী।

গদাই : (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে—সর্বনাশ আর-কি।



শ্রীপতি : বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ : না ভাই, তা হলে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজচাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি : এসো তবে, বর-কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্‌স্‌ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে—

চন্দ্রকান্ত : দেখো, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকমই অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না

নলিনাক্ষ : এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে, আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকা : বিনু, তুই বল্‌, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

[*সকলে উলুর চেষ্টা ও প্রস্থান*

ইন্দু ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি : শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দু : কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি : তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে—

ইন্দু : তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি : তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু : তুমি এগোও ভাই, তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে যাই।

[*ক্ষান্তর প্রস্থান*

ললিতবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন। এটা না দেখে আমি যাচ্ছি নে। (খাতা খুলিয়া) ওমা! এ যে কবিতা। কাদম্বিনীর প্রতি। আ মরণ। সে পোড়ারমুখি আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ। জলও না, বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার।

আর কিছু দাও না না-দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর-একবার দেখিলে।

আহাহাহা! অবলে সরলে! পুরুষগুলো ভারি বোকা! মনে করলে, ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ



করে সে হেসে গেল। হাসতে না কি সিকি পয়সা খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না! অবলে সরলে! সতি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি! এ কবিতা তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব; পৃথিবীর একটা উপকার করব; কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এব মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা। এবার বুঝেছি, পোড়ারমুখি কাদম্বিনী কে! (হাস) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব। এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন)

গদাই : ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম।

ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন

জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক। কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই : আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে, ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছু সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না? না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি। ও কী করছে? একটা ভিজে শাড়ি শুকুতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার



স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন!

[এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারির ঝুড়ি পড়িয়া গেল।]

গদাই : (ছুটিয়া নিকটে গিয়া ধরিয়া উঠাইয়া) আহাহাহা, কী তোমার নাম গো?

বুড়ি : আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই : এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগে কি তো?

বুড়ি : না, কিছু লাগে নি।

গদাই : আলুগুলো সব যে ছড়িয়ে পড়েছে। রোসো, কুড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি বুঝি এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি : হাঁ বাবু।

গদাই : চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বুড়ি : হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই : আহাহা, ভাঁড়টা উলটে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেলে। তোমার দিদিঠাকরুন হয়তো রাগ করবেন।

বুড়ি : না, দিদিঠাকরুন কথাটি কবেন না, কিন্তু গিন্নি মা—

গদাই : কথাটি কবেন না। আহা! (দীর্ঘনিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকাটি দিচ্ছি, না হয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারি আগলাচ্ছি। তোমার দিদিঠাকরুন। বুঝি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ ঠাকুরদাসী?

বুড়ি : তিনি বড়ো লক্ষ্মী!

গদাই : লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদিঠাকরুন কী খেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বুড়ি : ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভরু ফুলুরিওয়ালা গরম গরম বেগ্‌নি ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমের আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব শখ।

গদাই : বটে! তা এই নাও, ঠাকুরদাসী, একটাকার বেগ্‌নি কিনে আনো তো।

বুড়ি . একটাকার বেগ্‌নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই : তা হোক, নাহয় কিছু বেশিই হল।

বুড়ি : তা আমি কিনে নাহয় আনব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই : তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা শখ।

বুড়ি : দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা!

গদাই : না, না, ঐ যে তোমার বেগ্‌নি—ঐ যে তুমি বললে না—

বুড়ি : নাহয় দিদিঠাকরুনকে বেগ্‌নি খাওয়াব, তাই ব'লে কি—

গদাই : আমি এইরকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক বললেই হয়। বিশেষত গরম বেগ্‌নি। বেগ্‌নির ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

বুড়ি : তা হলে দাঁড়াও, দেরি করব না।

[*প্রস্থান*

মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি : সরকারমশায় বুঝি?

গদাই : কেন বলো তো



ঐ ব্যক্তি : এই বাড়ির কোন্ মাঠাকরুন সাত জোড়া সিল্কের মোজা রিফু করতে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি এনেছি।

গদাই : অ্যাঁ, পায়ের মোজা! ঐ জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দরজি : দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই : কত?

দরজি : আড়াই টাকা।

গদাই : এই নিয়ে যাও। তোমার রেট তো খুব সস্তা হে! [*দরজির প্রস্থান*

হায় হায়, আজ কী শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলাম! (বুকের কাছে চাপিয়া) সেই পা দুখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগুলি ভরা। আহাহা, গা শিউরে উঠছে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড়ো শক্ত। এই সময়ে থাকত বিন্দা!—

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ
সদাই করিতেছ খোঁজা।

কথা আসছে। কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্ছে—

বিনা পায়েই প্রাণেই ভিতরে
চলে গিয়েছ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল্।

তিনটে লাইন হল, সাত জোড়া মোজা আছে ; ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন চাই। (উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অনুদ্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগুলি আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে—য়ুরোপের ট্রুবেডোরদের মতো।

(আপন মনে) আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ সদাই করিছ খোঁজা?

কিন্তু আর তো মিল দেখছি নে, এক আছে 'মুসলমানের রোজা'—মোজাকে বললে দোষ নেই যে ঈদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না না, ওতে আমার লেখার ক্লাসিকাল গ্রেসটা চলে যাবে। তা ছাড়া দিন খারাপ, হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভঙ্গ হতে পারে—ওটা থাক্।

নেপথ্যে : হিঁয়া রোখো।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ : বেটার তবু হুঁশ নেই। দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না। যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইঁটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী! খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

গদাই : কী সর্বনাশ। এ যে বাবা!

শিবচরণ : শুনছ? কালেজ কোন্-দিকে? তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের



গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে?

গদাই নিরুত্তর

মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর এক্‌জামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

গদাই : খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ : বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে-খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্‌জামিনের তাড়াইতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

গদাই : আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্সেসাইজ্ করে নিই—

শিবচরণ : রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ্ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই : অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম, তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ : শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার গাড়িতে। যা, এখনই কালেজে যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

গদাই : সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ : আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

গদাই · অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি, এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ : না সে হবে না—তুই ওঠ্, আমি দেখে যাই—

গদাই : আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবশরণ। সেজন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই ওঠ্ গাড়িতে। এ ঝুড়িটা কিসের। তুই কি বাগবাজাবে তরকারি ফেরি করে বেড়াস নাকি?

গদাই : তাই তো, ওটা তরকারিই তো বটে। কী আশ্চর্য! কেমন করে এল! এতো মুলো দেখছি, নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা—গেরস্তর জিনিস, ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি-না।

শিবচরণ : আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। এ ঝুড়ির কিনারা আমি করে দিচ্ছি, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্।

গদাই : (স্বগত) সর্বনাশ! বুড়িটা এর মধ্যে বেগ্‌নি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আসছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী! কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবচরণ : তোর হাতে ওটা কিসের মোড়ক রে?

গদাই : আজ্ঞে ওটা—

শিবচরণ : দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কী ব্যাপার!

গদাই : আজ্ঞে, উপহার দেবার জন্যে।

গদাই : আজ্ঞে, উপহার দিবি?

শিবচরণ : কাকে উপহার দিবি?

গদাই : আমার একটি ক্লাস-ফ্রেন্ড্—



শিবচরণ : ক্লাস্-ফ্রেন্ডকে মেয়েদের মোজা দিবি।

গদাই : তার বিয়ে হচ্ছে কিনা, তাই—

শিবচরণ : তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া।

গদাই : সেকেন্ড্হ্যান্ড্ নিলেম থেকে সস্তায় কিনেছি, আপনার কাছ্ থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিবচরণ : চাইলেই পেতিস কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি। ঐ নোংরা মোজাগুলো নিয়ে বেড়াচ্ছিস। কী জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই : আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিচ্ছু বলবার জো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই নাহয়—

শিবচরণ : সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি—পাকপ্রণালী দু খন্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ্।

গদাই : আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিচ্ছু বলবার জো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই নাহয়—

শিবচরণ : সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি—পাকপ্রণালী দু খন্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ্। (সহিসের প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

গদাই : (জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুরবাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল।

শিবচরণ : আজ রুগি দেখা হল না। আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে।

[*প্রস্থান*

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত : নাঃ, এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই : কী হচ্ছে চন্দরদা?

চন্দ্রকান্ত : না গদাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিস নে।

গদাই : কেন বলো দেখি। তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভুত চাপল নাকি?

চন্দ্রকান্ত : এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নোস। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা কবি আর কবিতা লিখবি, তাতে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

গদাই : কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক, এত রাগ কেন?

চন্দ্রকান্ত : শুনেছ তো সমস্তই! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।



গদাই : বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত : বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম। একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই।

গদাই : আমি জানি, কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ।

চন্দ্রকান্ত : আমি ওর মুখদর্শন করছি নে।

গদাই : তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত : না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশছি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকার সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর সয় না।

গদাই : সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত : যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

গদাই ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত : (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

গদাই : বাগ্‌বাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত : (উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব। তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে।

গদাই : তা আছে ভাই। বোধ হয়, একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে যে শিগগির আমাব একটা সদ্‌গতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত : বুঝেছি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করসি নে।

গদাই : কিছু ভেবে না ভাই। পাপ করেছে বিনোদ, তার রিডেম্‌প্‌শন্‌ আমার দ্বারা।

চন্দ্রকান্ত : ভ্যালা মোর দাদা। আমি এক্‌খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো।

[*প্রস্থান*

অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া

চন্দ্রকান্ত : বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোদের সংসর্গ লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ—আমার ঘটল মুকুতার বদলে শুকুতা।

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ : চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই। আমি আর থাকতে পারলুম না!

চন্দ্রকান্ত : না ভাই, তোদের উপর কি রাগ করতে পারি? তবে দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ : কী করব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত : কেন বল্‌ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী? মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে।

বিনোদ : চন্দরদা, কী জানি ভাই বিয়ে না করাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত : তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্‌, নিদেন আমার খাতিরে



তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ : চন্দরদা, যাকেই হোক, বিয়ে যে করেছি সেটা বুঝতে তো বাকি নেই। মুশকিল হয়েছে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করছিলেম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড়্ মড়্ করে উঠছে। আজ অভাবগুলো চারদিক থেকে বড়ো বেআব্রু হয়ে দেখা দিল—সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই : তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ : ভালোবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝারি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্ছি— যেখানটাতে পাঁক।

গদাই : বিনোদ, তোমার কবিতা যেমন তেমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্বোধ।

বিনোদ : রেগেছ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে ডেকে আনলুম ছাতার আর-এক শরিক—আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে।

গদাই : কিন্তু ভুলটা তো তোমারই।

বিনোদ : ভুলটা হচ্ছে ভুল, আর অ-ভুলটা হচ্ছে অ-ভুল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পাগড়িই হচ্ছে পাগড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগড়ি করেই পরি তা হলে আমি ভুল করেছি বলেই মোজাটা কি পাগড়ি হয়ে উঠবে।

গদাই : (স্বগত) সর্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল করে তার পরে 'ঐ যাঃ' বলে সবে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্রকান্ত : বকাবকি করে লাভ কী গদাই? এখন বলো বিনোদ, কর্তব্য কী।

বিনোদ : আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত : তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ : না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত : যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পার বিনু। আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে।

[*প্রস্থান*



তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল : না ভাই, ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দু : কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই শৌখিন কবি! তার বড়োজোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিংবা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবছি তোর মতো মেয়েকেও সইতে পারল না ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পারছিস তোর রুচিকে বাহাদুরি দিই।

কমল : তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব, ওদের আর-এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন পৃথিবী সবুব করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু : ইস! কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব—মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমল : ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু : আচ্ছা নাহয় গদাই গয়লা না হল—পৃবীতে গদাইচন্দ্রে তো অভাব নেই।

কমল : তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দু : কক্‌খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল : আসল জানিস, ইন্দু? ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ : মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমরা দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল : কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তা হয়েছে—

ইন্দু : বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ : থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে



তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ : চন্দরদা, যাকেই হোক, বিয়ে যে করেছি সেটা বুঝতে তো বাকি নেই। মুশকিল হয়েছে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করছিলেম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড়্ মড়্ করে উঠছে। আজ অভাবগুলো চারদিক থেকে বড়ো বেআব্রু হয়ে দেখা দিল—সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই : তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ : ভালোবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝারি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম, দারিদ্রের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্ছি— যেখানটাতে পাঁক।

গদাই : বিনোদ, তোমার কবিতা যেমন তেমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্বোধ।

বিনোদ : রেগেছ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে ডেকে আনলুম ছাতার আর-এক শরিক—আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে।

গদাই : কিন্তু ভুলটা তো তোমারই।

বিনোদ : ভুলটা হচ্ছে ভুল, আর অ-ভুলটা হচ্ছে অ-ভুল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পাগড়িই হচ্ছে পাগড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগড়ি করেই পরি তা হলে আমি ভুল করেছি বলেই মোজাটা কি পাগড়ি হয়ে উঠবে।

গদাই : (স্বগত) সর্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল করে তার পরে 'ঐ যাঃ' বলে সরে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্রকান্ত : বকাবকি করে লাভ কী গদাই? এখন বলো বিনোদ, কর্তব্য কী।

বিনোদ : আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত : তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ : না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত : যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পার বিনু। আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে।

[*প্রস্থান*



তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল : না ভাই, ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দু : কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই শৌখিন কবি! তার বড়োজোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিংবা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবছি তোব মতো মেয়েকেও সইতে পারল না ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পারছিস তোর রুচিকে বাহাদুরি দিই।

কমল : তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব, ওদের আর-এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন পৃথিবী সবুব করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু : ইস। কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব—মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমল : ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু : আচ্ছা নাহয় গদাই গয়লা না হল—পৃবীতে গদাইচন্দ্রে তো অভাব নেই।

কমল : তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দু : কক্‌খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল : আসল জানিস, ইন্দু? ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ : মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমরা দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল : কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তা হয়েছে—

ইন্দু : বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ : থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল, মন দিয়ে শোনে। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে



তোমার পাবার কথা। সময় হয়েছে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয়তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল : কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ : কেন বলে দেখি মা?

কমল : একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ : আচ্ছা

[*প্রস্থান*

ইন্দু : তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমল : আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দু : সে তো বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু ববাবর রাখতে পারবি তো?

কমল : বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই, বোন—

ইন্দু : ফের আবার একদিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি?

কমল : হ্যাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়। ঐ শিবচরণবাবু বোধ হয় আসছেন, চলো পালাই।

[*উভয়ের প্রস্থান*

গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ।

শিবচরণ : দেখ, নিবারণকে আজ শেষ কথা বলব বলেই এখানে এসেছি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট করেই বল্।

গদাই : আমি তো সব কথা স্পষ্ট করেই বলেছি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারছি নে।

শিবচরণ : এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি, তা কে জানত!

গদাই : বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল!

শিবচরণ : আরে বাপু, সামান্য না তো কী। বিয়ে করা বই তো নয়। রাস্তার মুটে-মজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাশ করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকলে।

গদাই : আপনি তো সব শুনেছেন, আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ : আরে তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে নাহয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি, আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে।

গদাই : নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললে সব—

শিবচরণ : আরে, আমি নিজে বুঝতে পারি নে; নিবারণকে বোঝাব কী? আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত? পড়েছিস ভালো মানুষের হাতে—



গদাই : শুনেছি, আমার ঠাকুরমশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ : কী বলিস বেটা। মেজাজ ভালো ছিল না। তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে ব'লে, বটে! সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

গদাই : আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ : একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস? ঠিক করে বলিস। এক কথা!

গদাই : সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ : বড়ো উত্তম কাজ করেছ—এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

গদাই : বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ : কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা—

গদাই : না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচবণ · আরে মলো! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কী। আমি ভাবছি নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ : এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পাবলে হয়।

ঘোমটা পরিয়া কমলেব প্রবেশ

বিনোদ : (স্বগত) আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত। (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমল : হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ : কিছু-কিছু শুনেছি। (স্বগত) গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল : সে কথা থাক্। আমার যা-কিছু সমস্তর কর্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ : আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল : আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ কবে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ : না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমল : কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বুঝে-পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।



বিনোদ : নিবারণবাবু!

কমল : আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদ : (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমল : আপনি বরঞ্চ নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণবাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেব। আর-একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাটুজ্জেকে একবার এখানে আনতে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

বিনোদ : সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই।

কমল : তবে আমি আসি।

[*প্রস্থান*

বিনোদ : হায় হয়, এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খুললে বাঁচা যেত, তা হলেই চোখদুটি দেখতে পেতুম। কিন্তু নিবারণবাবুকে নিয়ে কী করা যায়। [*প্রস্থান*

নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ

কমল : আমার জন্যে আপনি আর ভাববেন না। এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ : তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কর্থাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্জেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল : সেজন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে, এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ : ওদের দেখাশোনা হয় কী করে?

কমল : সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ : তুমি কী করে ঠিক করলে মা?

কমল : আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, ওঁর বন্ধু ললিতবাবুকে এখানে নিয়ে আসবেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ : তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমল : ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

[*প্রস্থান*

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ : এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

নিবারণ : কেন বাপু, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ : আজ্ঞে, আমাকে লজ্জা দেবেন না—আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ : না বাপু, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।



বিনোদ : আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ : তা অবশ্য—তাকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে।

বিনোদ : আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ : বাপু, আবার কেন পালকি-ভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ : আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে—তা যাই হোক—তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো—তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ : বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে, এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ : আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবাবণ : আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বলব।

[*প্রস্থান*

বিনোদ : বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি! যা হোক এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদ : কী হে চন্দর! তুমি এখানে যে!

চন্দ্রকান্ত : নিবারণবাবু এই বাড়িতে কী কাজে এসেছেন শুনলুম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, বুড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। খিদে পেয়েছে। তুমিও বুঝি নিবারণবাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ : সে কথা পরে হবে। কিন্তু, তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে তো বুঝতে পারছি নে চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত · আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ : কেন, কী হয়েছে?

চন্দ্রকান্ত : কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদ : বলো কী দাদা! তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত · না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি নে।

বিনোদ : এখন তা হলে তোমার ছুটি চলছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেস্‌টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্রকান্ত : হ্যাঁ রে, কিন্তু উইদাউট পে। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বুঝতেই পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি, বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। ঐ স্ত্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনি জগৎটা যেন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

বিনোদ : এখন উপায় কী?



চন্দ্রকান্ত : মনে করেছি, আমি উলটে রাগ করব। আমি ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস!

বিনোদ : তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত : কার শ্বশুরবাড়ি?

বিনোদ : আমার নিজের আবার কার।

চন্দ্রকান্ত : (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদ : স্ত্রীকে আনতে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রকান্ত : কিন্তু, এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সৎসংকল্পের প্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দুদিন আমার দেখা পাস নি আর তোর ধর্মবুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনোদ : কিন্তু, চন্দরদা, বিপদ কী হয়েছে জান? নিবারণবাবুর যে-রকম মেজাজ দেখলুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্ছ, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত · নিশ্চয় করব। কিন্তু, ওরা যে বললে নিবারণবাবু এখানে এসেছেন।

বিনোদ : এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[*প্রস্থান*

ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল : তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু! তুই আবার এ কী জট' পাকিয়ে বসে আছিস! ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে নাকি?

ইন্দু : তা কী করব দিদি! কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল : ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি, তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দু : তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই।

[*প্রস্থান*

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ · মহারানী, আমার বন্ধু এলে কোথা তাঁকে বসাব?

কমল : এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ : ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী?

কমল : কাদম্বিনী—বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ : আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে, এমন বোধ হয় না।



কমল : আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ : তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমল : মাপ করেন যদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ : এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমল : আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ : কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কমল : আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ : আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগের কথা।

কমল : আজ সন্ধ্যার সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ : আমি বিশেষ চেষ্টা কবব।

[*কমলের প্রস্থান*

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য : একটি সাহেব বাবু এসেছেন।

বিনোদ : এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত : (শেক্‌হ্যান্ড করিয়া) Well ! How goes the world ? ভালো তো?

বিনোদ : একরকম ভালোয়-মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে?

ললিত : Pretty well ! জানো? I am going in for studentship next year.

বিনোদ : ওহে, আর কতদিন এক্‌জামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি? এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত : Halloo ! You seem to have queer ideas on the subject কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry, I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ : আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি, তুমি তোমার নিজের হাত-পাগুলোকে বিয়ে করবে। অবিশ্যি, মেয়ে একটি আছে।

ললিত : I know that ! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদ : আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কী বলো?

ললিত : I admire your cheek বিনু! তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't seem any rhyme or reason in such cooperation. পোলিটিক্যাল



ইকনমিতে division of labour আছে, কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ : তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না।

ললিত : My dear fellow, you are very kind, কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness, আমার বিশ্বাস, আমি যদি কখনো কোনো girl-কে love করি, I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form.

বিনোদ : আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত : The idea ! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe propostion.

বিনোদ : আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী।

ললিত : কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good, কিন্তু I must confess, তার, নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter.

বিনোদ : (স্বগত) এর মানে কী! তবে যে রানী বললেন, কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল—আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আবো আমাকে নিদেন দু ঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত . I say, it's infernally hot here—চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দু

ইন্দু : দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

কমল : তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু?

ইন্দু : আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। ছি ছি! ছি ছি দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে। ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটির হয়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী। কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে, সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমল : যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবি? এখন কাকা যাকে বলছেন, তাকে বিয়ে কর। [*ইন্দুবতীর প্রস্থান*

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ : কী করি বলো তো মা। ললিত চাটুজ্জে যা বলেছে সে তো সব শুনেছ। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে। অপমান যা হবার তা হয়েছে—



কমল : না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি। আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ : ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি, তাকেই বা কী বলি। তুমি মা, ইন্দুকে ব'লে ক'য়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পারো তো ভালো হয়।

কমল : গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো?

নিবারণ : সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল : তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব। [*নিবারণের প্রস্থান*

ইন্দুর প্রবেশ

কমল : লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোর রাখতে হবে।

ইন্দু : কী, বল্‌-না ভাই!

কমল : একবার গদাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্‌।

ইন্দু : কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে?

কমল : তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দু : রাখব, তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমল : তবে চল্‌, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস্‌ নে।

[*প্রস্থান*

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই : চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা নাহয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে—তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু : (স্বগত) বাবা যখন বলছেন তখন তখন দেখা করতেই হবে, কিন্তু কারো অনুরোধে তো পছন্দ হয় না! বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই : (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু : একি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন?

গদাই : একি! এ যে কাদম্বিনী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম



না। আমি মনে করেছিলুম, নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি—কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু : ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

গদাই : আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু : না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে!

গদাই : এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দু : আপনার নাম কি ললিত বাবু নয়?

গদাই : যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি, কিন্তু বাপ-মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই :

ইন্দু : গদাই!— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন!

গদাই : তা হলে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দু : আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই : দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু : আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই . এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু : না সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই : আপনার নাম তবে—

ইন্দু : ইন্দুমতী।

গদাই : হায় হায়, এতদিন কী ভুলটাই করেছি! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু-বেলা বাপান্ত করেছেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা-ভাঙাভাঙি করতে।—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমার ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—
কিংবা
কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত!

ইন্দু : তবে এখন ভ্রমসংশোধন করুন—এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম।

[*প্রস্থান*

গদাই : (উচ্চস্বরে) শুনে যান, আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন—সুবিধে আছে, আপনাকে সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে



হবে না। —হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হয়ে আমার অ্যানাটমির নোট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই রিফু-করা মোজা ক-জোড়া। আজও যে প্রাণ ধরে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তার উপরে সেদিন থেকে ভরু ফুলুরিওয়লার তেলে-ভাজা বেগ্‌নি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার জো হল। ঠাকুরদাসীকে খুঁজে বের করতে হবে। সে বুড়িটাকে—ইচ্ছে করছে— থাক্‌, সে আর বলে কাজ নেই।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ : দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু—আমার বড়ো ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

গদাই : আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ : (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে, যুবাদের শাস্ত্রই এক আলাদা। (প্রকাশ্যে) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই : তা অবশ্য।

নিবারণ : তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[*প্রস্থান*

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ : তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবী-সুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গদাই : কেন বাবা?

শিবচরণ : তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই : কারা?

শিবচরণ : বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই : কেন!

শিবচরণ : কেন! না দেখে-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না?

গদাই : বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিবচরণ : ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস, তা তো জানতুম না। তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোমার বিয়ে স্থির করে এসেছি।

গদাই : সে কী বাবা! আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে—বিশেষ আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ : (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি, আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্‌, আমি ভালো করে বুঝি।



গদাই : আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ : চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি?

গদাই : নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ : (উচ্চস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে, নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

গদাই : আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ : ভুল কী রে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি মিনতি করে এলুম যেন আমারই কন্যাদায় হয়েছে। তারপরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আর্শীবাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা 'বিয়ে করব না'! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত : (গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।—এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ : ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম, যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল তখন বলে কিনা 'তাকে বিয়ে করব না'। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই : বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ : তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে, আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি আস্ত খেপা—তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত : আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ : সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত : সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ : যদি পার চন্দর, তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত : সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[*প্রস্থান*

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ : আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ : ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?



শিবচরণ : সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মরজি হলেই হয়।

নিবারণ : আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ : তবে আর কি, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ : সে-সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ : না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্—অসময়ে খেয়েছি কি আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ : না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

[প্রস্থান

কমল ও ইন্দুর প্রবেশ

কমল : ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি?

ইন্দু : তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল : এখন পুরুষ জাতটাকে কীরকম লাগছে।

ইন্দু : মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমল : তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবি নে!

ইন্দু : না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বলো। তোমার কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলিকণ্ঠ, সুস্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। গদাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল : কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দু : বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো-গজি সমাসের মধ্যে। গদাই বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার জো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মা দুর্গা কার্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকার্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল : কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দু : আমি তো ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি!

কমল : তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি! তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দু : আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল : ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু : সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল : সবাই প্রশংসা করবে, ঐ আশঙ্কাটা তাকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দু : ঐ বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ইন্দুর প্রস্থান



বিনোদের প্রবেশ

কমল : তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ : তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমল : আমার বোধ হচ্ছে, তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ : আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়।

কমল : আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না।

বিনোদ : তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি স্ত্রী তবু একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল : ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধহয় না।

বিনোদ : আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল : খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদ : আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমল : কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ : এ তাঁর ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে ব'লে নয়।

কমল : তবে আর-একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি

বিনোদ : (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমল : তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ : বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল : তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদ : তবে এত মিনতি করছি, তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমল : আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চান, এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন।

মুখ উদ্‌ঘাটন

বিনোদ : আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু : মাপ করিস নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তারপরে মাপ।

বিনোদ : তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।



ইন্দু : দেখেছিস ভাই, কত বড়ো নির্লজ্জ! এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওঁদের একটু আদর দিয়েছিস কি, আর ওঁদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাকত কোথায়!

বিনোদ : তা হলে ভূ-ভার-হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

ইন্দু :

গান

এবার মিলন-হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।
ওগো পথিক, পথের টানে
চলেছিলে মরণ-পানে—
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে।

মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে,
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুই জনারে—
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে।

ইন্দু : এখন কবি সম্রাট, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ : এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু : হাঁ, এখুনি।

বিনোদ . আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও। *(নোটবই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত)*

কমল : এ বার তুই কী খেলা বের করিল ইন্দু!

ইন্দু : কমলদিদি, তুমি যে-খেলা খেলে নিলে এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধছেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল : ওগো শিকারী, তুমি আর কথা কোয়ো না। তোমর নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বুঝি? একবার তাকে হল অস্বীকার, আবার হল স্বীকার—মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েছে!

ইন্দু : অকবিটিকে আমি কবি বানিয়েছি, এর বেশি কিছু না—কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি, মধ্যে হলেন অকবি, আবার অন্তে উলটো রথে ফিরছেন কবিত্বে, এ কী কম কথা! আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েছি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দুদিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।— লেখা হল কবিবর?

বিনোদ : হয়েছে। *(ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ)*

ইন্দু : পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে, এও যে তাই।

বিনোদ : অর্থাৎ?

ইন্দু : অর্থাৎ, এ তো শুধু কাব্যরস নয়, এ যে রসতত্ত্ব। দিদি, তোমার এ কবিটি যে-



সে কবি নয়—কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেলজাতীয়। তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে।

কমল : আর তোর ভাগ্যে ইন্দু?

ইন্দু : শুধু ছোবড়া।

বিনোদ : ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সংকীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দু : কবিবর সংকীর্ণতার দর বেশি, ঔদার্যেই সস্তা করে। হীরের টুকরো সংকীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই, তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটি মাত্র মধ্যমণি হয়ে থাকো—সরকারি হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিলনোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ : তাই সই, কিন্তু ঐ যে গানটা তৈরি করলেম ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠ কি স্থান দেবে না?

ইন্দু : আচ্ছা, আজ তোমার গুড কন্‌ডাক্টের প্রাইজ স্বরূপে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্ সুর তোমার পছন্দ বলো।

বিনোদ : তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু : আচ্ছা, সখা, তবে শ্রবণ করো।

গান

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে যে যে হৃদয়-ভরা।

আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চ'লে,
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই যে ধরায় ফেরে পিপাসাহারা।

কমল : ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

(বিনোদের প্রস্থান)

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি : তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু : সে বুঝি আর বাকি আছে? স্বামী রত্নটিকে আগে-ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি : আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে?

ইন্দু : ক্ষান্তদিদি, তুমি যে ভর-সন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি : আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে, শুনলুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা,



ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেছে? দুদিন সেখানে থাকতে পাব না? যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দু : আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি?

ক্ষান্তমণি : তা, ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?

ইন্দু : ঐ যে ওঁরা আসছেন। এসো এই পাশের ঘরে।

[*প্রস্থান*

শিবচরণ গদাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত : সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ : কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত : ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিবচরণ : সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত : সহধর্মিনীকে না। বিয়ে করছে টাকা-কল্পলতিকাকে; সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্পবৃষ্টি করবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের গদাইবাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ : (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে প'ড়ে চেপেচুপে ধ'রে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে।

(নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই!

নিবারণ : এসো।—

[*গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান*

চন্দ্রবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে।

[*প্রস্থান*

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি : এখন বাড়ি যেতে হবে না কী?

চন্দ্রকান্ত : (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি : তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে নাকি?

চন্দ্রকান্ত : বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি : বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা। বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত : (জিব কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়। বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি, এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি : আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা তোমার তো অযত্ন হয় নি—আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।



চন্দ্রকান্ত : বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম? যে-বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে-বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্তমণি : আমি বলছি, আমার একশোবার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত : তবে একটু বোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন—উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি : আমি সেখানে সব ঠিক রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত : বলো কী, নিবারণবাবু—

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে)। চন্দরদা!

ক্ষান্তমণি : ঐ রে, আবার ওরা আসছে। ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত · ওদের হাতে তুমি আমি দু জনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, অতএব এ স্থলে অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি : তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।

[*প্রস্থান*

বিনোদ গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত . কেমন মনে হচ্ছে বিনু?

বিনোদ : সে আর কী বলব, দাদা!

চন্দ্রকান্ত : গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

গদাই : অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে, দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত : ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল, কোথায় মির্জাপুর—কোথায় বাগবাজার!

গদাই : এখন ঠিক পথেই চলেছি, যাচ্ছি বাসরঘরের দিকে; এই যে সামনেই।

[*প্রস্থান*

চন্দ্রকান্ত : সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখে আমারও ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈবি, ঘরেও আহার প্রস্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

বিনোদ : ওহে চন্দরদা, চুপ চুপ!

চন্দ্রকান্ত : কেন হে?

বিনোদ : ঐ-যে সুর বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্রকান্ত : তাই তো, বিপদ কাছে আসছে। ছিল গলির ও পারে, এখন এল পাশের ঘরে—ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ : চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরো বেশি ছিল যখন সেটা গলির ও পারে ছিল—যতই কাছে আসছে ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা কমছে।

নেপথ্যে গান

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,



ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে?
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে।

গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফেরো নি আপন দেশে,
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে?

চন্দ্রকান্ত : ওরে বিনু, এখনো মামলা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চলছে। তোর তরফের কৌসুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? 'প্লীড্ গিলটি' নাকি।

বিনোদ : একরকম তাই। কিন্তু দাদা, অমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সুর জোটে না।

চন্দ্র : তা হোক হার মানতে পারব। আচ্ছা, দে দেখি কথাটা; কোনোমতে সবাই মিলে চেঁচামেচি করে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ : এই যে, আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্রকান্ত : ধন্য কবি, ধন্য—নিদেন উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছ! কাফি সুরে ঠিক লাগবে—

গান

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে!
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে!
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা
ঝরিলে মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে?
যদি-বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে?



তৃতীয় দৃশ্য

বাসরঘরের বাহিরে

লোকারণ্য। শঙ্খ। হুলুধ্বনি। সানাই

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ : কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ : তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য : বাবু, আসন এসে পৌঁছেছে, সেগুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ : এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ : ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা! কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই নাকি?

ভৃত্য। আসন এসেছে, সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ : আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না। চল্, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না। এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই—সমস্ত বেবন্দোবস্ত। নিবারণ, ভাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দেখি—ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সব পালিয়েছে দেখছি, আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ : পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়?

শিবচরণ : ব্যস্ত হোয়ো না ভাই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পইপই করে বললুম 'তুমি নিজে দাঁনিয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ো', কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ : বলো কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ : ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ : আহার প্রস্তুত চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত : আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ : না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি গে। নিবারণ, তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে

নিবারণ : তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ : ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল



সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে, ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ : বলো কী ভাই!

শিবচরণ : ব্যস্ত হোয়ো না। আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[*শিবচরণ ও নিবারণের প্রস্থান*

চন্দ্রকান্ত : ওরে বিনু, খাবার লোভে চলেছিস বুঝি?

বিনোদ : কেন, তোমার লোভ একেবারে নেই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। কাজ আছে যে।

বিনোদ : কাজ তো ফতে হয়ে গেছে, আবার কী?

চন্দ্রকান্ত : যে কাজ হয়ে গেছে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে হিউম্যানিটির জন্যে।

বিনোদ : বাস্ রে, এই অর্ধেক রাত্তিরে শেষকালে হিউম্যানিটি নিয়ে পড়তে হবে?

চন্দ্রকান্ত : হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্ধেক রাত্তিরেই।

বিনোদ : কোন্ দুঃসাধ্য কাজ করতে হবে বলো শুনি।

চন্দ্রকান্ত : বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা স্টর্ম্ করব।

বিনোদ : আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র—আমাদের দ্বারা কি এত বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে।

চন্দ্রকান্ত : নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরো না বিনোদ। ভেবে দেখো, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন করেছিল জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই—এমন-কি এক-আধটা বাহ্য বাহুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল; মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হল। আর, আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রীপুরুষের যে বিচ্ছেদসমুদ্র বিরাজ করেছে কেবল একটি মাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙঘন করবার অধিকারী; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এ পারে পড়ে থাকতে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি তা হলে ধিক্ আমাদের পৌরুষ!

বিনোদ : হিয়ার হিয়ার!

চন্দ্রকান্ত : এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সকল পুরুষ এককণ্ঠে বলো দেখি, 'নাহি কি বল এ ভুজ-অর্গলে?'

বিনোদ : আছে আছে!

চন্দ্রকান্ত : নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর-অফিসঘরের সামনে ফেমিনিজ্‌ম-এর আক্রমণ চলছে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা ম্যাস্‌কুলিনিজ্‌ম্ প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনোদ : জয়, পুরুষজাতিকী জয়!

চন্দ্রকান্ত : অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক। আবার বল, জয় পুরুষজাতিকী জয়। গদাই, গদাই গদাই, গদাধর, ভীরু ট্রেটর্, এসো তুমি, খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা।



বিনোদ : চন্দরদা, ওকে স্পেশ্যাল, কনসেশন দিয়ে এরা কিনে নিয়েছে—ডিভাইড অ্যান্ড রুল্ পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রকান্ত : সে কিছুতেই হচ্ছে না। আজ অসম্মানিত পুরুজাতির আহ্বান তার মুগ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবেই। গদাই! গদাধর! বিশ্বাসসঘাতক! স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ।

গদাই ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল : এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করছেন কী?

চন্দ্রকান্ত : সিডিশন্।

ইন্দু : আপনাদের সাহস তো কম নয়!

চন্দ্রকান্ত : শর্‌ট্‌হ্যান্ড-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হয়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা বলছিলুম, 'ভাগ্যদেবীগণ, রুদ্ধদ্বার খোলো—পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব, মর্তেরও পরিত্রাণ।'

ইন্দু : যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত : এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী? দেবী, আমিই পাপিষ্ঠতম? এদের দুজনের চেয়েও অধম?

ইন্দু : তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকান্ত : দেবী, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি-তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা পাপীর বরাদ্দ না থাকে তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে, আনএমপ্লয়েমেন্ট প্রব্লেম্! বড়োবউ, তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হয়ে যায়, তোমার জন্যে সবুর করতে না পারি, যদি পরিত্রাণের দোসরা পথ জুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারই যশ না আমারই!

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি : আঃ, কী মিছেমিছি চেঁচাচ্ছ!

চন্দ্রকান্ত : মিছেমিছি নয় দেবী! পৃথিবীদ্ধ লোক চেঁচাচ্ছে পরিত্রাণের দরবারে— কেউ-বা ধর্মে, কেউ-বা কর্মে, কেউ-বা পলিটিক্‌সে, আর আমিই যদি চুপ করে থাকব তা হলে নিতান্তই ঠকব যে। এই দুটি ভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু চেঁচিয়েছি, ফলও পেয়েছি—এখন যবনিকাপতনের পূর্বে দয়ময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

গান। প্রথমে চন্দ্রকান্ত পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ-বা ম্লান ছলছল—
কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,

পুরাতনে অম্ল-মধুর—একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ-বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ-বা দিব্যি কালো।

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা......

প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি করতে এসে রবীন্দ্রনাথের লেখাকে অবলম্বন করা বেশ সাহসের পরিচায়ক। ১৯৭৭ সালে পরিচালক শঙ্কর ভট্টাচার্য এটাই করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক শেষরক্ষা চলচ্চিত্রায়িত করেন। ..... ছবিটিতে সময় উপযোগী আধুনিকতার দৃশ্য ক্যামেরার চলাচলে, পরিবেশ রচনায়, অভিনয়ে পিরিয়ড ফিল্ম হিসেবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় পাওয়া যায়।..... তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেকেই ভাল অভিনয় করেছেন। ছবিটির মধ্যে নাটকের মতো অনেকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে পরিচালক একদিকে যেমন কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন অন্যদিকে রবীন্দ্রকাহিনীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। অনেকগুলি গানের শুধুমাত্র সুর ব্যবহার করেছেন। আবার কয়েকটিতে সমবেত কণ্ঠস্বরকে কাজে লাগিয়েছেন। নাটকের নাটকীয়তাকে যতটা সম্ভব দূর করে চলচ্চিত্রোপযোগী একটি কাহিনীর আদল দেওয়ার যে প্রচেষ্টা পরিচালকের এই ছবিতে পাওয়া যায় তাতে তাঁর এই প্রথম ছবি থেকেই বোঝা গিয়েছিল পরিচালকের এই মাধ্যম সম্বন্ধে দক্ষতার ও সযত্ন প্রয়োগের লক্ষণ।....

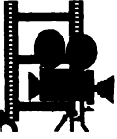
—রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র : অরুণ কুমার রায়।



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....



দৃষ্টিদান



❑ ১৯৪৮ সাল।
দৃষ্টিদান—রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'দৃষ্টিদান' ছোট গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের (১৮৯৮ সালের) পৌষ সংখ্যায়।
সাদা কালো। ৩৫ মি.মি।
চিত্রনাট্য—সজনীকান্ত দাস।
পরিচালনা—নীতিন বসু।
প্রযোজনা—এস. বি. প্রোডাকসন্স।
চিত্রগ্রাহক—বাধু কর্মকার।
শিল্প নির্দেশক—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদনা—কালী রাহা।
গীতবচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দ দাস।
সঙ্গীত পরিচালনা—তিমির বরণ।
রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিচালনা—অনাদি দস্তিদার।
কণ্ঠদানে—কৃষ্ণচন্দ্র দে।
অভিনয়ে—অসিতবরণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, কেতকী দত্ত, সন্ধ্যারাণী, অরুণকুমার (উত্তমকুমার) প্রমুখ।
পরিবেশনা—সেন্ট্রাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্স।
মুক্তি—২৪ এপ্রিল, ১৯৪৮; চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে।

○ দৃষ্টিদান ছবিতেই সর্বপ্রথম উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন। অরুণকুমার ছদ্মনামে তিনি অভিনয় করেন।
○ অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী প্রযোজিত এস. বি. প্রোডাকসনের সর্ব প্রথম চলচ্চিত্র 'দৃষ্টিদান।'

শুনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপ-বশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দ বৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম ; কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না ; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিন্তু শরীরের দুর্বলতায়, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ-বশত চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুশি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি. এল. দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।"

আমার স্বামী কহিলেন, "ভালো ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কী করিবে। ওষুধপত্র তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, "তবে তো তোমার সঙ্গে তোমাদের কলেজের বড়ো সাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কী বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনো মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চলিবে।"



আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার সুখদুঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সেদিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল, সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরো বাড়িয়া উঠিল ; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিংবা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম, তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতার বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস।" ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার পূর্বেই আমি সে কৌটা শিশি তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরো দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশি জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম, জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে



দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।'

স্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।" এই বলিয়া সেইদিনই এক ইংরেজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন ; তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গর্দভ ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝিবে।"

স্বামী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।"

আমি একটু রাগের ভান করিয়া কহিলাম, "অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।"

স্বামীর লজ্জা দূর হইল ; তিনি বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে, পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "পুরুষেব বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।"

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লানগম্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, "দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধ চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন, চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরো আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতেছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয় স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়—মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল ; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ



দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দনচর্চিত তরুণমূর্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাপিযা কহিলাম, "বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তাবের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কী সান্ত্বনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম—আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম ; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না ; এ-সব কথা আমি অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম ; এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সেদিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছুতেই হইতে দিব না। তোমাকে আর একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কী জন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্বে আমার একটুখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যা পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুই চক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল ; তাহাকে সংবরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্‌বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না! দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।



অবশেষে অশ্রুর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতীনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পরিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম।"

স্বামী কহিলেন, 'কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।" বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন ; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভালো। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয় গৃহিণী রমণীর যত-কিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূব করিয়া দিলাম।

সেদিন সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল ; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না। দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারণ নাই। মানবী কহিল, সকলই বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন, ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রূকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইযা গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমনি করিয়া সর্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাঙক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের সে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকেব জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহার অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত



হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙক্ষা, এত নির্ভর তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। অমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না।

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি, আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।"

আমি কহিলাম, "তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।"

যাহাই বলুন, আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস পরিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতদিন চক্ষু ছিল কলিকাতা শহর আমার চারিদিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লীগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যাকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল: সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমনি-কি, ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে



বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্বগান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইযা কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারি দিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিবপূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটি বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্মল সবলতাটুকু থাকে না। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে যেদিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, "তোর রাগ হয় না, কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই, মুখ দেখা তো বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারকম ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিযা যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ, তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখেব বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতো বলিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তবু দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা; সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "হে দেব আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপর কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।



কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসঞ্চয়ের ভার নেয়, তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল, জিনিসপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না, কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিংবা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, ''ডাক্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।'' যে সব-ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি, এখন আর সেদিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন ; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কি চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়! যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুইচক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকাব ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয় ; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই ; আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি—আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনো শুকায় নাই ; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল সুখসম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর



হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম ; তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময় ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে কহিল, ''বাবা, আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।'' আমার স্বামী কহিলেন, ''আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কী করিবে সেটা আগে শুনি।'' শুনিবামাত্রই ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্লা' বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কি-দ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম কহিলাম, ''বাবা তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।''

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।'' পূর্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল—'না, কিছুই হয় নাই ; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, ''কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।'' স্বামী হাসিয়া কহিলেন, ''পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।'' আমি কহিলাম, 'টাকাকড়ি রূপযৌবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।'' তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ''দেখো, অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে— কাহারও স্বামী উপার্জন করে না, কাহারও স্বামী ভালোবাসে না ; তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন।'' আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে; আমি অন্য স্ত্রীলোকের মতো নহি; আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্শাশুড়ি দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, ''বলি বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-একটা বিয়েথাওয়া দিয়া দাও।'' স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন 'তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না' তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, ''আঃ পিসিমা, কী বলিতেছ।'' পিসিমা উত্তর করিলেন, ''কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা বউমা, তুমিই বলো তো বাছা।'' আমি হাসিয়া কহিলাম, ''পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ



সম্মতি নেয়।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।"

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউয়ের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিংবা ঘরকন্নার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, "অভাব কী। আমারই তো ভাসুরের এক মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে ; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।" স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে।" পিসিমা কহিলেন, "ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।" কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, "বউমা, যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইঁহাকে প্রণাম করো।"

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস, অবিনাশ।" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন, "এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনী।" ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারংবার অনেক অনাবশ্যক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম, 'যাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই বুঝিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল। লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা। অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।'

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম ; মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দপনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল ; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন এক মুহূর্তে



কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহুতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি।"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অন্ধ।" শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন-চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল ; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিয়াছেন।"

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতেছেন না। কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।

এমন সময় পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অমনি যাই-যাই! অমন চঞ্চল মেয়েও তো দেখি নাই।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আত্মীয়ঘর, তুমি যতদিন খুশি থাকো ; আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী বলো ভাই, তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই-সকল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন, এই কন্যাটিকে তাঁহার সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন ; সে তাহা যেন গা হইতে ঝড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, "হিমু চল্, তোর স্নানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, "আমরা দুইজনে ঘাটে যাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন ; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেপুলে নাই কেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কি করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাঙ্গিনী কহিল, "অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বরূপ কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপুণ্য সুখদুঃখ দণ্ডপুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না ; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে!"



দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি-ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট্‌ সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্বে যখন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, "হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো," আমি বুঝিতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দুইতিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কৌটো প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, "হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি"—বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত ; একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমাব দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীরূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া, চারি দিকে যেন একটা ধূলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরো বেশি ধরা পড়িবাব কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন ; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে, সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয না, পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষের মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম ; বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি ; বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না ; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই-বা বল।" এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না ; অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল, এমন সময় দেখিলাম, খাট একটু নড়িল, মানুষ-চলার উস্‌খুস্‌ শব্দ



হইল এবং মহূর্তপরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরম্ভে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না ; বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পরদিন হেমাঙ্গিনী কহিল, ''কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্তদাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।'' পিসিমা কহিলেন, ''তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি ; একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্ হিমু, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।'' বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, ''এই দেখো কাকি, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।'' বলিয়া জানালা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি-পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারংবার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, ''বউমা, এই ছেলেমানুষির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না ; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও বউমা!'' আমি কহিলাম, ''আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।''

পরদিন যাত্রার পূর্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ''দিদি, আমাকে মনে রাখিস।'' আমি দুই হাত বারংবার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম, ''অন্ধ কিছু ভোলে না বোন ; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।'' বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝরঝর্ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল—সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত, যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে, দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে। আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, ''ইহারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একটু কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।'' ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনো ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না। যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই।

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনো হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন



এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই-যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়ছিল তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটলভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকরুন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন।" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে ; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল ; সংহারকারী শংকর নীরব অঙ্গগুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, "কই, আমি তো এখনো কোনো খবর পাই নাই।" ঝি আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, "দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে. কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুই ভিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।"

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "মিথ্যা কী বলিলাম।"

আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ।"

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, "একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

আমি কহিলাম, "না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী ; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।"

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, "আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।"

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব, ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

"আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বৈ কিছু নই ; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে



বড়ো করিয়া তুলিয়ো না—আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।"

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম, সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পায়। কেবল মনে পড়ে, বলিয়াছিলাম, "যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম-শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এই বলিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনো রাত্রিশেষের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না যে, 'হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।' আমি কেবল একান্তমনে বলিতে লাগিলাম, "ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।" সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। অনিদ্রায় অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষাণমূর্তির সম্মুখে পাষাণমূর্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভঙ্গে শুনিলাম "দিদি!" দেখিলাম, হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্ করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

প্রথম একমুহূর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণে উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন! তোমার কী অপরাধ।"

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, 'জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।' হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি কহিলাম, "তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম, "ভালো আছিস কুমু?"



আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভগ্নীপতি।"

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হু হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন ; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপভাবে সংবরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সেদিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্যামী জানেন ; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল, সেইসঙ্গে ভাবিতেছিলাম, যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাহার পূর্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লজ্জায় এবং কী আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারীমাত্র।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।"

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে, নানাপ্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল, নির্যাতনের আর সীমা রহিল না; কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কী ঘটিয়াছিল কেহ তার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

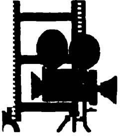
পৌষ ১৩০৫

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা......

১৩৫৫ সনের ১৬ বৈশাখ দীপালি পত্রিকায় 'দৃষ্টিদান' ছবির বিষয়ে লেখা হয়—'চিত্র রূপায়িত করিবার জন্য কাহিনীর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনর্থক কাহিনীকে বিকৃত করা উচিত নয়। এই গল্পটিকে চিত্ররূপায়িত করিবার জন্যে দুটি চরিত্র আমদানি করিতে হইয়াছে জমিদার এবং অন্ধ ভজন দাস। ভজন দাসের নাম রবীন্দ্রনাথের গল্পে শুধু এক স্থানে আছে।.....কিন্তু সেই ভজন দাস চিত্র কাহিনীতে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং এই চরিত্রটির জন্য কাহিনী মন্থর হইয়া পড়িয়াছে।...........

—গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ—'সোনার দাগ' গ্রন্থ সূত্রে প্রাপ্ত।

মালঞ্চ



❑ ১৯৫৩ সাল।

মালঞ্চ—রবীন্দ্র উপন্যাস। 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রে আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, ১৩৪০ ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'মালঞ্চ' ১৩৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে গন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
সাদা কালো। ১০ রিল। ৩৫ মি. মি.।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়।
প্রযোজনা—ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট পিকচার্স।
চিত্রগ্রাহক—জি কে মেহতা।
শিল্প নির্দেশনা—চারু রায়।
সঙ্গীত পরিচালনা— কমল দাশগুপ্ত।
অভিনয়ে—যমুনা বড়ুয়া, প্রণতি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ।
পরিবেশনা—ডিলাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড।
মুক্তি—২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩; চিত্রা, প্রাচী ও ইন্দিরা।

○ পরিচালক প্রফুল্ল রায় ১৯৫৩ সালেই 'ফুলওয়াড়ী' নামে 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিব হিন্দী চলচ্চিত্ররূপ নির্মাণ কবেছিলেন। এর সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কমল দাশগুপ্ত।

❑ ১৯৭৯ সাল।

মালঞ্চ— রবীন্দ্র উপন্যাস 'মালঞ্চ' অবলম্বনে নির্মিত দ্বিতীয় সবাক কাহিনীচিত্র। 'মালঞ্চ' প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক রঙীন চলচ্চিত্র।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পূর্ণেন্দু পত্রী।



প্রযোজনা—ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার কো অপারেটিভ।
চিত্রগ্রাহক—পান্তু নাগ।
শিল্প নির্দেশনা—অনু বর্ধন।
সম্পাদনা—অরবিন্দ ভট্টাচার্য।
সঙ্গীত —পূর্ণেন্দু পত্রী।
কণ্ঠদানে—কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা।
অভিনয়ে—নীরজা—মাধবী মুখার্জী, রমেন—সন্তু মুখার্জী, সরলা—সুমিত্রা মুখার্জী, আদিত্য—ধ্রুব মিত্র, এছাড়া রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, নিমু ভৌমিক প্রমুখ।
পরিবেশনা—ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কো অপারেটিড সোসাইটি প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তি—২২ জানুয়াবী, ১৯৮২, মিনার বিজলী।

○ *১৯৮২ সালে পূর্ণেন্দু পত্রী পবিচালিত 'মালঞ্চ' প্রথম রবীন্দ্রকাহিনী ভিত্তিক রঙীন চলচ্চিত্র।*

১

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাশে তার শাঁখের মতো রঙ, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মার্‌বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই; এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়।

পূব দিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে। বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, 'না না থাক্।' চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্রচ্ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায়, নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিম ধারে প্রাচীন



মহানিম গাছ। তারই জুড়ি আরো একটা নিমগাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত—"সত্যি বলছি ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।" কেউ-বা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, "ওগুলো কি সূর্যমুখী?" নীরজা ভারি খুশি হয়ে হেসে উত্তর করেছে, "না না, ও তো গাঁদা।" একজন বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ একদা বলেছিল—"এতবড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী? আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর!" সমজদারের পুরস্কার মিলল; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিক্রম—ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন—তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েৎবেল—ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। যথাঋতুতে সব-শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বলত, "কী মিষ্টি জল।" উত্তরে শুনত, "আমার বাগানের গাছের ডাব।" সবাই বলত, "ও, তাই তো বলি।"

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জিলিঙ চায়ের বাষ্পে-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায় হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙিন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন। ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট করে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী। কোন্ বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ। কোন্ বিরাট পাগল। এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পারলে কে।

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা; মনে করেছে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ।'

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকা প্রথম যে ব্যাপার নিয়ে ধস্ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের 'ডলি' কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্বে ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হল দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন লেজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হত স্বামিনীর তর্জনী সংকেতে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করুন প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটে নি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মবা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর



হল তখন ওর দুর্গের প্রাচীরের প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হল এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশদ্বার। মনে হল বিশ্বসংসারের কর্মকর্তা অব্যবস্থিত চিত্ত—তাঁর আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারেছ না, এমন সময় ঘটল সন্তানসম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তার পর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালেব দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কেমন আছ!"

সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনই সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাত-পাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারা রোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তার পরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তার পরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত। মালীদেব জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়ছে বুঝি, কোনদিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফুলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকল, "রোশনি!"

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা-পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপরে



ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার 'পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন-কি, নীরজার স্বামী পর্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "জল এনে দেব খোঁখী?"

"না, বোস্।" মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বাগত উক্তির বাহন।

নীরজা বললে, "আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।

আয়া কিছু বললে না; কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, "কবে না শোনা যায়।"

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, "সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন?"

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগল, "আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।"

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বললে, "ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে?"

নীরজা আপন মনে বলে চলল, "নিয়ু মার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেইরকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ি শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি।"

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আযাকে বললে, "আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।"

আয়া উঠল গুমরিয়ে, বললে, "সেদিন নেই, এখন লুঠ চলছে দু হাতে।"

"সত্যি নাকি।"

"আমি কি মিথ্যা বলছি। কলকাতার নতুনবাজারে ক'টা ফুলই বা পৌছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।

"এরা কেউ দেখে না?"

"দেখবার গরজ এত কার।"

"জামাইবাবুকে বলিস নে কেন।"

"আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো? তুমি বল না কেন। তোমারই তো সব।"

"হোক-না, হোক-না, বেশ তো। চলুক-না এমনই কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক্-না।"

"কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ঐ হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।"

হলার কাজে ঔদাসীন্যই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসংগতরূপে বেড়ে উঠছে, এই কারণটাই সব চেয়ে গুরুতর।



নীরজা বললে, "মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন। ওদের হল সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়। হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস নে কথা, চুপ করে থাক।"

"সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"

"কেন, কী জন্যে।"

"ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্ছে। জামাইবাবু বললে, গোরু তাড়াস নে কেন।' ও মুখের উপর জবাব করলে, 'আমি তাড়াব গোরু। গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই!"

শুনে হাসলে নীরজা, বললে, "ওর ঐরকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন হাতে তৈরি।"

"জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।"

"চুপ কর রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্‌ তো ওকে।"

আযাব ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ কিছু আছে?"

হলা বললে, "আছে বৈকি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।"

"কী রকম, শুনি।"

"ঐ-যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, ঐখান থেকে ইটপাটকেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হল ওঁর হুকুম। আমি বললুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।"

"বাবুকে বলিস নে কেন।"

"বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক। বউদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।"

"তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।"

"বউদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।"

"আচ্ছা, এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইটসুরকি বইতে বলবে আমার নাম করে বলিস আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"দেশ থেকে চিঠি এসেছে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।" ব'লে মাথা চুলকোতে লাগল। নীরজা বললে, "না, মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস নে।" এই ব'লে টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

"আবার কী।"

"বউয়ের জন্যে একখানা পুরোনো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।" এই বলে পানের ছোপে কালো-বর্ণ মুক প্রসারিত করে হাসলে।

নীরজা বললে, "রোশনি, দে তো ওকে আলনার ঐ কাপড়খানা।"



রোশনি সবলে মাথা নেড়ে বললে, "সে কী কথা, ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি!"

"হোক-না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।"

রোশনি দৃঢ়মুখ করে বললে, "না, সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্ হলা, খোঁখীকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বললে, "আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।"

"কেন রে, কী হয়েছে তোর।"

"আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন দেন বাগড়া। কারও দোষ নয়, আমারই কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় প'ড়ে!"

"ভয় নেই রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।"

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।" সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন?"

"নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া! টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।"

"আজ এই প্রথম হল। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।"

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অর্কিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রঙ, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না, সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বললে, "কে আনতে বলেছে।"

"অদিতদা।"

"নিজে এলেন না, যে?"

"নিয়ু মার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা খাওয়া সেরেই।"

"এত তাড়া কিসের।"

"কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা-চুরির খবর এসেছে।"

"টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও সময় দিতে পারতেন না।"

"কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্যন্ত



এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।"

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, "জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী?" বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়াবে বৈ কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, "জান এ ফুলের নাম?"

বললেই হত, জানি নে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল, বললে, "এমারিলিস।"

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, "ভারি তো জান তুমি; ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।"

সরলা মৃদুস্বরে বললে, "তা হবে।"

"তা হবে মানে কী। নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও, আমি জানি নে?"

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাকল, "শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে।"

"অর্কিডের ঘরে।"

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, "অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার।"

"পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্যে আদিতদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।"

নীরজা বলে উঠল ধমক দেওয়ার সুরে, "আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না।"

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন-কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ আমলে ঠিকমত কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাস না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত কিন্তু করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বললে, "দাও, বন্ধ করে দাও ঐ জানালা।" সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি?"

"না, কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।"

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, "মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।"

"না, দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি।"



"গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।"

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বললে, "তার সময় এই বুঝি। এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে শুনি।"

সরলা মৃদুস্বরে বললে, "মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।"

"বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।"

এল হলা মালী। নীরজা বললে, "বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে! দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি। বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।" মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে-শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরে বললে, "বউদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।"

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "এর দাম কত।"

জিভ কেটে হলা বললে, "এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-পরে যে মানুষ।"

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগনীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।"

নীরজা বললে, "আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।" হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, রোশনি, রোশনি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।"

আয়া বললে, "ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি!"

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, "আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন। আমি কি জানি নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।"

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠল, নীরজা বললে, 'থাক্ থাক্, আজ থাক্।"

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বললে, "বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আপিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।"

নীরজা হেসে বললে, "খবর দেবার ছুতো করে একদৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো। কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?"

"তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি। বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।"



"ওগো মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে। তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবুকুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।"

'কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।" এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীবজা খুশি হয়ে বললে, "অশ্রু-শিকল", এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বল তোমার কল্পনার দোসর, তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী। কী সোহাগ গো।"

রমেন হঠাৎ বললে, "আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।"

"কী কথা।"

"সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে।"

"কেন বলো তো।"

"দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন কোন্ দিকে।' ও বললে, 'যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।" আমি বললুম, 'ওটা হল হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।" সে বললে, 'সব কথারই ভাষা আছে?" আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল 'কাহার বচন দিয়েছে বেদন।"

' হয়তো তোমার দাদাব বচন।"

"হতেই পারে না। দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ' এও কি সম্ভব হয।"

"আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।"

"পুণ্যের লোভ রাখি নে, কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমাব কাছে হলফ করে।"

"তা হলে বাধাটা কোথায়। ওর কি মন নেই।"

"সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেইছি তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।"

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, 'কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।"

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, "বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।"

"আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি করো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।"

"আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।"



"এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?"

"না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।"

হরলিকস দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, "যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার। চিনতে পার?"

সরলা বললে, "ও তো আমার।"

"তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জেঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।"

"এ তুমি কোথা থেকে পেলে।"

"দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।"

রমেন বললে, "তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল। অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে।"

নীরজা বললে, "ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোনো একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে—যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি-ঝরি করছে—একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো?"

সরলা চলে যেতে উদ্যত হল, নীরজা তাকে বললে, "সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি।"

রমেন বললে, "সমস্তটাই একসঙ্গে।"

"নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।"

"তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বউদি। জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।"

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, "ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ?"

রমেন হেসে বললে, "আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।"

"অমন-দুটি হাতের 'পরে দাবি করবে না?"

"চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।"

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে, "একটা কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব।"

"কী, বলো।"

"আজ শুক্লাচতুর্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার



দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা—এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে-সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

সরলা সহজ সুরেই বললে, "আচ্ছা, এসো তুমি।"

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, "তবে আসি বউদি।"

"আর থাকবার দরকার কী। বউদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হল।"

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো-আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে, "আমার রঙমহলের সাকী।" দশ বছরে রঙ একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, "সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে-পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারই দু ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা।" কথায় কথায় সে বলত, "তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।" হায় রে, যৌবন তো আজও ফুরোয় নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভাবতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়। সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকালবেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর। আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন।

"রোশনি, শুনে যা।"

"কী খোঁখী।"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত 'রঙমহলের রঙ্গিনী'। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রঙ তো এখনো ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রঙমহল?"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।"

"রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।"

"একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।"

"আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে।"



"ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়।"

"মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে। তা হলে মালীদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?"

"তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি।"

"ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ?"

"হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।"

"হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানি থেকে। সেফটিপিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।"

"থাক্ পড়ে, খাব না।"

"দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।"

"তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।"

আয়া চলে গেল।

ঢং ঢং করে তিনটি বাজল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদদুরের রঙ, ছায়া হেলে পড়েছে পূব দিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রঙের দেশী ল্যাবার্নম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।" শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, "মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।"

"অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো। আমার কি আর সেদিন আছে।"

"দিনের কথা হিসেব করে কী হবে। তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।"

"আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।"

"অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।"

"আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয়?"

"ভুলতে ফুরসত দাও কই।"

"বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসত দিয়েছি যে।"

"উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।"

"সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?"

"কী কথা বল তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।"

"কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা-দুটো বিছানায় তোলো।"

"বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই!"

"হাঁ, বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

"মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।"



"না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে। তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্‌কার।"

"আমিই তা হলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।"

"তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।"

"যাই বল আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার 'পরে।"

"কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমার দিতে হবে না—নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।"

"দণ্ড কিসের জন্য। রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।"

"যদি কোনোদিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।"

"অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।"

আয়া ঘরে এল। বললে, "জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।" বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, "এবার তবে আমি রাগ করি?"

"হাঁ, করো. খুব রাগ করো, যত পার রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।"

আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল, "সরলা, সরলা।"

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন ঝন করে উঠল। বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, "নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?" নীরজা বলে উঠল, "ওকে বকছ কেন। ওর দোষ কী। আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি, আমাকে বকো না। সরলা তুমি যাও; মিছে কেন দাঁড়িয়ে বক্‌নি খাবে।"

"যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক। হরলিকস মিল্ক তৈরি করে আনুক।"

"আহা, সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার, তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন। একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো-না।"

"আয়া কি ঠিকমত পারবে এ-সব কাজ।"

"ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া।"

"অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।"

"আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি" বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য হল, ভাবলে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্ছে।

ওষুধপথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে, সরলাদিদিকে ডেকে দাও।

"কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।"

"কাজের কথা আছে।"



"থাক্-না এখন কাজের কথা।"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো-না।"

"তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ কর প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।"

"সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে, যে-বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে তাই তো পোড়োবাড়িতে ভূতের বাসা হল।"

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "অর্কিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?"

"হাঁ, হয়ে গেছে।"

"সবগুলো?"

"সবগুলোই।"

"আর গোলাপের কাটিং?"

"মালী তার জমি তৈরি করছে।"

"জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতন-কাঠিব চাষ হবে আর কী।"

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, "সরলা, যাও তো কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।"

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি ভোরে উঠেছিল, যেমন আমরা রোজ উঠতুম?"

"হাঁ, উঠেছিলুম।"

"ঘড়িতে তেমনি এলার্‌মের দম দেওয়া ছিল?"

"ছিল বৈকি।"

"সেই নিমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?"

"রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।"

"দুটো চৌকিই পাতা ছিল?"

"পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রঙের চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানি ট্রে।"

"অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন!"

'ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।"

"সরলাকে কেন ডাক না তোমার চায়ের টেবিলে।"

এর উত্তরে বললেই হত, তোমার আসনে আর কাউকে ডাকতে মন যায় না। সত্যবাদী



তা না বলে বললে, "সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।"

"চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?"

"হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও-না কেন।"

"ঘটকালি কি আমার ব্যাবসা।"

"না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়।"

"পাত্র আছে এক দিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে-খবর নেবার ফুরসত পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।"

একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে নীরজা, "কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।"

"বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে। তুমি চেষ্টা দেখো-না।"

"কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।"

"শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্‌স্‌রে আর কি।"

"মিছে বকছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।"

"এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ-লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল নাকি।"

উদবিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বললে, "কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।"

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠল, "আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না!"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, "সে কেমন কথা। নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়।"

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে, "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।"

"বল কী! সরলা জানে না? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জেঠামশায়। তুমি তো জান তাঁরই বাগানে আমার হাতেখড়ি। জেঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।"

"আর তুমি ছিলে সঙ্গী।"

"ছিলেম বৈকি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।"

"সেই বাগান নিয়ে তোমার মেশোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। এমনই ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো-না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন! মেয়েমানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।"

"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু। কী কথা বলছ। মেশোমশায় বাগান করতেই



জানতেন, ব্যাবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনই তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।"

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, "ঐখানে রেখে যাও।" রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলই না।

"সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।"

"শোনো একবার কথা! বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।"

"মনেও আসে নি? এই বুঝি তোমার কবিত্ব!"

"জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।"

"কেন, সভ্যতার অপরাধটা কী।"

"এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।"

"সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।"

"সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে-তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।"

"আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?"

"নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন-কি, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখ নি কি তুমি। ও যে ভালোবাসবার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।"

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বললে, "থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলেছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিসট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।"

"বারাসতের মেয়ে। ইস্কুল? কেন, আন্ডামানও তো আছে।"

"না, ঠাট্টা নয়, সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো, কিন্তু ঐ অর্কিড-ঘরের কাজ দিতে পারবে না।"

"কেন, হয়েছে কী!"

"আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।"

"আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ



ছিল অর্কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি, চীন থেকে অর্কিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।"

কথাটা নীরজা জানে, সেইজন্যে কথাটা তার অসহ্য।

"আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে, এমন-কি, তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও-না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপালদোষে না হয় আজ আছি বিছানায় প'ড়ে, তাই বলে—" কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার। বুঝতে পারল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে দিনে, আদিত্য জানতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। এমন নির্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি। বিশেষত ঋতুর হিসাব করে বাছাই-করা ফুলে কেয়ারি সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, একদিন যখন কোনো উপলক্ষে সরলার প্রশংসা করে ও বলেছিল, "কামিনীর বেড়া এমন মানানসই করে আমি তো লাগাতে পারতুম না", তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, "ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।" আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনোমতে সরলার একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চাহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল। ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; "ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলা মালীও বলতে পারত।"

আদিত্য, অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তার পরে হাতধরে বললে, "কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি।"

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "কিছু চাই নে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারই বাগান। তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো আমার তাতে কী।"

"নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান? তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে।"

"যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর-সমস্ত কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার সামনে। আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি?"

"নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবি লেবুর সঙ্গে কলম্বা লেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।"

"তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে, ও এত জানে, ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এ-সব কথা কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ



আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে। আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন। মাপে সমান হব কী নিয়ে।"

"নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা-সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর-কেউ।"

"না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এত দিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সব চেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন। তুমি তো জান আমার দিন-রাতের সাধনা। জান কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।"

"জানি বৈকি। আমার সব-কিছুকে নিয়েই যে তুমি।"

"ও-সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর-কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে। আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়। আমি হলে কি এমন করতে পারতুম।"

"কী করতে তুমি।"

"বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যাবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে, বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে—সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কববে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার? এমনটা কেন হতে পারল, বলব?"

"বলো।"

"তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখিছিলে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তার পরে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, "নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্নারির পাশে যে জাপানি ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।"

৫

দিঘির ও পারেব পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রূপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল, "আসতে পারি কি।"



সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, "এসো।" রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে, "কোথায় বসলে রমেনদাদা, উপরে এসো।"

রমেন বললে, "জান দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে? পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতি মতে।"সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বললে, "সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।"

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

"এ আবার কী।"

"জান না আজ দোলপূর্ণিমা? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রঙটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।"

"তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।"

"কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।"

পাশে এসে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে, "রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।"

"জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিকতে দিল না।"

"না, আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।"

"ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।"

"বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিতদার মুখখানা দেখতে পেতে।"

"আভাসে কিছু দেখেছি।"

"আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে, দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে; রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিতদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্ছে, তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সব দিকেই সগাজ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনই হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'ক্যাটালগ দেখছ বুঝি?' আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনই কী একটা বলাই চাই। আবার তখনই পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দেখেছ সরি, কতবড়ো ন্যাসটার্শিয়াম।' কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তার পর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, 'যাবে না বাগানে?' আদিতদা বললেন, 'না ভাই, বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে' বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।



"আদিতদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন; কী আন্দাজ কর তুমি।"

"বলতে এসেছিলেন, আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।"

"তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।"

সরলা ম্লান হেসে বললে, "তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি। সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলসা রাখবেন।"

"তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে। এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।"

"কী করবে তুমি।"

"তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন-কি, কালাপানির পার পর্যন্ত।"

"তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছুদিন থেকে। আর সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।"

"না বললে মনে করব।"

"ছেলেবেলা থেকে আদিতদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাই-এর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু-তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে। জেঠামশাইয়ের মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে-বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ ক'রে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিতদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।"

"তার পরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিতদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই—আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তার পর থেকে আদিতদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে-বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।"

"কথাটা শেষ করে ফেলো।"

"হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে *প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের* কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি।"



"তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।"

"আমি কী করব বলো। নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।" বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরল।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বললে, "যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।"

"অন্যায় কার উপরে।"

"বউদির উপরে।"

"দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের; তখন কোথায় ছিল বউদি।"

"কী বলছ রমেনদা! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা। আদিতদার কথাও তো ভাবতে হবে।"

"হবে বৈকি। তুমি কি ভাবছ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগে নি।"

"রমেন নাকি।" পিছন থেকে শোনা গেল।

"হাঁ দাদা।" রমেন উঠে পড়ল।

"তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।"

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনই উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে, "যেয়ো না সরি, একটু বোসো।" আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্মরত আপনা-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবলই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বললে, "আমার দুজনে এ সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি।"

"অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিতদা।"

"সে-ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জান কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের 'পরে।"

"জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।"

"সইতে পারবে সরি?"

"সইতেই হবে।"

"মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।"

"তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য, এ ছাড়া আর তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।"

"তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ *অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।"—ব'লে মুঠো শক্ত করে আকাশে কোন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই* করতে প্রস্তুত হল।



সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে, "ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব।"

"তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সে চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের 'পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনই জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে, 'মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে?" ব'লে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ কচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন, 'এ কী কাণ্ড।' তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, 'বড়ো গরম লাগে।' তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জাঠামশায়!"

সরলা হেসে বললে, "তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।"

"খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে—"

"থাক্ আর বলতে হবে না আদিতদা" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, "সে-সব দিন আর আসবে না" বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে, "না যেয়ো না, এখনই যেয়ো না, কখন এক সময়ে যাবার দিন আসবে তখন—"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা! আজ দশ বৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হল, তারই এই পরিণাম? কী নিয়ে ঈর্ষা। তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।"

"তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি। সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী। তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠল, "অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

"কথা বোলো না আদিতদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।"

"ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম



মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনো রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে। তোমার কথা বলতে পারি নে সরি, আমার তো সাধ্য নেই।"

"পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।"

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে, "উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।"

"চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।"

"সরি আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে। তুমি তো কর নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি।"

"জেঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয়তো—"

"না না—তোমার মনের গভীরে ছিল তোমাব সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা।"

"থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে। কী হবে মিথ্যে ছটফট করে।" কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।"

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করবার দরকার। হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, "আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটিপিন।"

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, "কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।"

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদির 'পরে। চাকর এসে খবর দিল "খাবার এসেছে।" আদিত্য বলল, "আজ আমি খাব না।"

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "বউদি, ডেকেছ কি।" নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, "এসো।"

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর, বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানলার বাইরে।



সেদিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসাছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে থালায় বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার! রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখির চলেছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মানতে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছনার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতিমুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জেঠামশায়ের প্রসাদে: আমার জীবন সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল-সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমাব একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জেঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অর্কিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এতবড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরানিগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা? এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার 'পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।"

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।



নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, "কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।"

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, "অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে।"

"কী করছ বউদি। শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।"

"এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের। তার 'পরে আমাব অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে। এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস! সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'মালিনী', কখনো বলতেন 'বনলক্ষ্মী'! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন। আমার কি একটাই নাম ছিল। কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তাব উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো-বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।"

"বউদি, আবার তুমি সেরে উঠবে, তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।" "মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।"

"দরকার কী বউদি। আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তাব চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি। যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়। যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে-গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন। এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।"

"বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম করেও জ্বলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।"

"সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না। তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি, তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষমুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টামাত্র



করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বললে,''আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।''

''হুকুম করো বউদি।''

বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন্ করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে,উদ্ধার করো।''

'' তুমি তো জান বউদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।''

''ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো,তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু কবছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।''

''বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার—'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি'—সব ভার যাবে একমুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনই বলো—'দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব-কিছুই দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে'।''

''আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা-কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার— আর দেরি নয়, এখনই। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।''

''আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।''

''না, না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে জাপানি ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না—এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।''

''সময় হয় নি বউদি, আজ থাক্।''

''সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষনি ডেকে আনো।'' পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে বললে, '' বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো, একটা কথা বলি, আপত্তি করো না।''

''কী বলো।''

''একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।''

''আচ্ছা, যাও, আপত্তি করব না।''

''আয়া!



"কী খোঁখী।"

"ঠাকুরঘরে নিয়ে চল্ আমাকে।"

"সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—"

"ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?"

"আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও, ভয় নেই, ভালোই হবে।"

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময়ে আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, " এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন।"

"এখনই আসবেন, তিনি ঠাকুরঘরে গেছেন।"

"ঠাকুঘরে। ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।"

"শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।"

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জানত না যে, অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে-লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথম ও সরলাকে বলতে এসেছিল— আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরল উলটো কথা। তার পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসে বসে বার বার করে বলেছে— জীবনের সত্যকে আবিস্কার কবেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির; ফলাফল যা হয় তা হোক। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

"রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান আমি জানি।"

"হাঁ, জানি। "

"আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পর্দা ফেলব উঠিয়ে।"

"তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ও দিকে ; সংসারের গ্রন্থি জটিল।"

" তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মান তো?"

"মানি বৈকি।"

"সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ।"

"কে বলে দোষ।"

"আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।"

"গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন। বউদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।"



নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বললে, "মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।" আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, "নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।" নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।"

"তুমি তো জান নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে।"

'এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন। এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে।"

"অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।"

"কী বল তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল।—ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন।"

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক্ করে ঘা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনোক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বললে, "রাত হয়েছে, এখন থাক্।"

এমন সময় নীরজা বলে উঠল, "ঐ শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজাব বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।"

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম করলে নীবজাব পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে, "এসো বোন, আমার কাছে এসো। "

সবলাব হাত ধরে বিছানায় বসাল। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে, "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় 'পরে থেক শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।"

"অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।"

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে, "ঐ মালাটা আমাকে দাও-না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারও কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।

নীরজা বললে, "আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনো মতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই

হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

'ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।"

"সে কী কথা।"

আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনেই বলছি। ভাগ্য যে-দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম, আমি চললেম, অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু বেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।"

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না , সেও গেল চলে।

"ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও।"

"এইজন্যেই বলেছিলুম আজ রাত্রে ডেকো না"

"কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না।'

"বুঝেছে বৈকি। বুঝেছে যে, মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।"

"কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন।। এত মার খেয়েও! কে বিশুদ্ধ করে দেবে। ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও-না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি।"

"আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।"

"ঘুমোব কেমন করে। এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।"

"চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।"

"যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

৭

আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বললে, "কেন এলে। ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।"

"তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে আমাদের হাত নেই।"

"সে-সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও, রোগীকে শান্ত করো গে।"

"আমাদের এই বাগানের আর-একটা শাখা বাড়াব সেই কথাটা—"

"আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।"

রমেন এসে বললে, "যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।"

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বললে, "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?"

"আছে।"



"তুমি যাবে না?"

"যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হল না।"

"কেন।"

"সে কথা তোমাকে বলে কী হবে।"

"তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।"

"যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বৈকি।"

"তা হলে শোনো আমর কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।"

"আর-একটু স্পষ্ট করে বলো। "

"আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।"

"বুঝেছি।"

"পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।"

"আচ্ছা বাধা দেব না।"

"এই রইল কথা?"

"রইল।"

"আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়। "

"হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।"

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, "ও কী, এখনই এলে যে বড়ো!"

"দুই-একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।"

রমেন বললে, "আমার কাজ আছে, চললুম।"

সরলা হেসে বললে, "বাসা ঠিক করে রেখো ভুলো না।"

"কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।" এই বলে সে চলে গেল।

৮

সবলা বসে ছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।"

"কিচ্ছু বলব না, ভয় নেই।"

"আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই তুমি শোনো। বলো, কথা রাখবে।"

"অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জান।"

"বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমরা ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।"

"আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।"

"না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার । কক্ষনো না আমি তোমাকে জানি।"

আদিত্যের হাত ধরে বললে, "আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের

শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা দাও ভাই।"

"দেব, কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো রাখবে।"

"তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।"

"না, হবে না।"

"আচ্ছা, বলো।"

"যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ কববে আমার সমস্ত শূণ্যতা। কেন চুপ করে রইলে।"

"জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।"

"বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি। সেই কথাটা বলো আগে।"

"কেন আমাকে দুঃখ দাও। তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।"

"আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।"

"আর ফিরে তাকাবে না এখন?"

"না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার সীলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।"

"যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায়।"

"সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।"

"রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে! সে-লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি।"

"ভয় নেই তোমার। পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।"

"আমি জানতে পারব তো?"

"নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।"

"তোমারও মন ব্যস্ত হবে না?"

"যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূণ্য রেখেই বিদায় দেবে?"

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

৯

"রোশনি!"

"কী খোঁখী।"

"কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন।"

"সে কী কথা, জানা না, সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে?"



"কেন, কী করেছিল।"

"দারোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।"

"কী করতে।"

"মহারানীর সীলমোহর থাকে যে-বাক্সয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা!"

"লাভ কী।"

"ঐ শোনো! সেটা পেলেই তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।

"আর ঠাকুরপো?"

"সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়িব ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিণবাড়িতে,পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সবলাদিদি তার জাফরানী রঙের দামি শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, "তোমার ছেলের বউকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল! কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো?"

"ভয় নেই তোর। কিন্তু শিগগির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাজ পড়ে আছে, নিয়ে আয়।"

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য হল, আদিত্য তাকে এতবড়ো খবরটাও দেয় নি। এ কি অশ্রদ্ধা ক'রে। জেলে গিয়ে জিতল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতে পারতুম।

"রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে—"

আয়া বললে, "মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোরডাকাতের বাড়া। ছি ছি!"

"ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।"

আয়ার মনে পড়ল জাফরানী রঙের শাড়ির কথা। বললে, "কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দবাজ।"

কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিল। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, "ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে কত যেন নিচু হয়ে গেছি। ছি ছি, নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমর চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।"

আয়া চলে গেলে ও পেনসিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, "চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?"

গণেশ গাঙ্গুলির কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে, "পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিসের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।"

নীরজা পড়ে শোনালে, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।"

গণেশ বললে, "ঐ যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।"



গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।"

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, "এ আবার কী।"

আদিত্য বললে, "ডাক্তার বলে গেছে ঘন্টায় ঘন্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

"ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না! নাহয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও-না, যদি মনে এতই উদ্‌বেগ থাকে।"

"সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন।"

"তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"হোক-না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তার পরে সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।"

"সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।"

"লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে,কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।"

"অমন করে আক্ষেপ করছ কেন। বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।"

"পাখাটা কি চালিয়ে দেব।"

"বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ-সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম ক'রে দিন কাটাতে চাও তোমাদের তো হর্টিকালচরিস্‌ট্ ক্লাব আছে।"

"তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজেছিলুম, একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।"

'কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ কবব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুকনো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে সরষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।"

"তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।"

"বলতে ওর রুচবে কেন। ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করছে। কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানিকে যেরকম গ্রাহ্য করে না সেইরকম আর কি।"

"হলা মালির সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

"আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দু দিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রিটা। আমি ম্যাপে পেনসিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।"

"আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?"

'না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমারই ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি রাস্তার ধারের



ঐ বট্‌ল-পামগুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্‌টা আমি রাখব না, ওখানে মারবেলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।''

''বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে। একটু যেন—যাকে বলে সস্তা নবাবি।''

''চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তার পরে সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।''

''আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব।''

''তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।''

''তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ?''

''হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই, এখন আমি কেবল আর-একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি, তাতে লাভ কী।''

''আচ্ছা বেশ । যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনই আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্যে গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।'' ব'লে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাত ধরে বললে, ''না। যেয়ো না, একটু বোসো।'' ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে বললে, ''জান এ ফুলের নাম?''

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুশি হবে, তাই মিথ্যে করে বললে, ''না, জানি নে।''

'আমি জানি। বলব?' পেট্যুনিয়া। তুমি মনে কর আমি কিছু জানি নে, মূর্খু আমি!''

আদিত্য হেসে বললে, 'সহধর্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।''

''সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ-যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটছে ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ঐ-যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।'' আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, ''একেবারেই থাকব না। কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।''

''যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর! যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোই নি।''

''বলো-না, তুমি কী মনে কর। একটুও থাকব না? এতটুকুও না?''

''এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়,তখন থাকব সেও সম্ভব।''

''নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি



আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?"

আদিত্যকে বলতে হল, "হাঁ, মনে করব।" কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

বিছানায় শুয়ে ছিল নীরজা; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল, বললে, "আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক'রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?" নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বললে, "নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।"

"যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত-কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না," বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হলে পর বললে, "সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।"

আদিত্য বললে, "শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।"

"শোনো বলি। কালি রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বার বার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিন শুনছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'। বালিশের নীচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বলল, "চিঠি", ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড় ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে কয়টি কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হাবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে



সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নারজা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কী খবর।"

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরল না কিছুক্ষণ। তার পরে খুব জোর করে বললে, "তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।"

'ও কী। কী হল। নীরু! নার্স, ডাক্তার আছেন?"

"আছেন বাইরের ঘরে।"

"এখনই নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

ডাক্তার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে, ডাক্তার আমাকে বাঁচতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না, ভালো হবে না তাতে । আশীর্বাদ করব তাকে—শেষ আশীর্বাদ।"

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হল, বলে উঠলো, "ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।"

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, "কখন আসবে সরলা।"

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, "রোশনি!"

আয়া বলে, "কী খোঁখী।"

"ঠাকরপোকে ডেকে দে এক্ষনি। একবার আপনি বলে উঠল, "কী হবে আমার ঠাকুরপো! দেব দেব দেব, সব দেব।"

রাত্রি তখন ন'টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্ছে আশঙ্কা ক'রে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখল ঠোঁট নড়ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে, "সরলা এসেছে।" চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, "তুমি যাও"—একবার ডেকে উঠল, "ঠাকরপো!" কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে।

ভাঙা গলায় বলে উঠল, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।"

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।"

হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই , নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

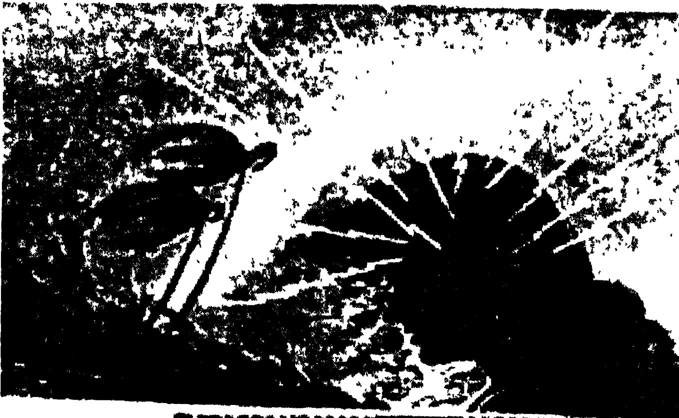
গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফ্‌রিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

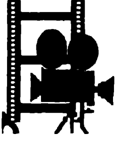
পূর্ণেন্দু পত্রী ১৯৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ চলচ্চিত্রায়িত করেন। এটি রঙিন ছবি। সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম রবীন্দ্রকাহিনী ভিত্তিক রঙিন চলচ্চিত্র ফলে পিরিয়ড ফিল্ম হিসেবে ছবিটি তৈরি করা একটা চ্যালেঞ্জের মতো হয়েছিল। পরিচালক কেন ছবিটি তুলতে গিয়েছিলেন তার একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। —'রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ছবি আর শেষ বয়সের সাহিত্য দুটোই সূর্যাস্তের মতো রক্তবর্ণ। সেখানে এমন এক সৌন্দর্য যা ভীতিপ্রদ বিভীষিকাময় আর রুদ্ধশ্বাস .. যে রবীন্দ্রনাথ এতকাল আমাদের লালন করে এসেছেন স্নিগ্ধ, সুস্থির, অমঙ্গলহীন লাবণ্যে সেই রবীন্দ্রনাথেরই শেষ বয়সের রচনাগুলো বিস্ময়করবূপে কর্কশ, কঠিন, নির্দয় আর নির্বিকার। লোমকূপ ভেদ করে আমাদের শিরা-উপশিরায়, রক্তপ্রবাহের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এক ভয়ঙ্কর বিদুৎ আঘাত যখন দেখি সরলার হাতে জীবনের সমস্ত কিছু উপহার তুলে দেবে বলে সরলাকে কাছে ডেকে এনে ঢিলে সেমিজ পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ নীরজা তার প্রাণের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করে এগিয়ে যায় সরলার দিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণে — 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না, পালা, এখনি। নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বিশ্বাস করতে বিলম্ব হয় যে, এই সংলাপ সেই রবীন্দ্রনাথের যাঁর গানের ঝরনাতলায় গিয়ে আমরা বুক ভরি সুগভীর শান্তিতে। শুনেছি বৃহৎ অজগর নাকি নিজে না নড়ে নিঃশ্বাসের টানে দূরবর্তী খাদ্যকে নিয়ে আসে নিজের গ্রাসের এলাকায়। বড়মাপের সাহিত্যও কি তাই? নইলে মালঞ্চ-র আগুন মাখানো নিশ্বাস থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারলাম না কেন?

-- রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র অরুণকুমার রায়।





বউ ঠাকুরাণীর হাট



❑ ১৯৫৩ সাল।

বউ ঠাকুরানীর হাট —-রবীন্দ্র উপন্যাস। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ১২৮৯ সালেব পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১৬ রিল। ৩৫ মি. মি।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—নরেশচন্দ্র মিত্র।

প্রযোজনা—এমার প্রোডাকসন্স।

চিত্রগ্রাহক—দেওজীভাই পাধিয়াব।

শিল্প নির্দেশনা—সত্যেন বায়চৌধুরী।

সম্পাদনা—রবীন দাস।

সঙ্গীত পরিচালনা— দ্বিজেন চৌধুরী।

কণ্ঠদানে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—পাহাড়ী সান্যাল, নীতিশ মুখার্জী, পদ্মা দেবী, মঞ্জু দে, শম্ভু মিত্র, ভানু ব্যানার্জী, নরেশ মিত্র. উত্তমকুমার, রবি বায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পবিবেশনা—শ্রী বিষ্ণু পিকচার্স লিমিটেড।

মুক্তি—৯ অক্টোবর, ১৯৫৩, উত্তরা, পূববী ও উজ্জ্বলা।

○ নরেশচন্দ্র মিত্র-ই রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ করেন ১৯২৩ সালে নির্বাক যুগে 'মানভঞ্জন' গল্পটির চলচ্চিত্ররূপের মধ্য দিয়ে।

১৯৩৮ সালে সবাক যুগে তিনি নির্মাণ করেন 'গোরা'।

১৯৫৩ সালে সবাকযুগে তাঁব তৃতীয় রবীন্দ্র কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র 'বউ ঠাকুরাণীর হাট।'



উপহার

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

শ্রীচরণেষু

দিদি,

তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত সুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।
কাছে থাকি দূরে থাকি দেখ আর নাহি দেখ
শুধু স্নেহ দাও,
স্নেহ করে ভালো থাক আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়,
সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।
এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
— স্নেহ-পারাবার—
প্রভাত-শিশির সম নীরবে পরানে মম
ঝরে স্নেহধার।
তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়,
নীরবে বিমল হাসি উষার কিরণরাশি
প্রাণেরে জাগায়।

———



সূচনা

অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে একসময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিলে বউঠাকুরানীর হাট গল্পে— একটা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চারিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজো হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেননি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন সুখের দিন আসিবে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তো আর-কোনো সুখ চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম! তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র—তাঁহার সিংহাসনের, তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম! কী তপস্যা করিলে এ-সমস্ত অতীত উলটাইয়া যাইতে পারে!"

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পুরাইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এই ইচ্ছা পুরাইতে পারিবেন না এই দুঃখ।

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতি মুহূর্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গি তিনি পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদ্‌গণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, আমার দ্বারা এ বিপদে রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোঁজও লইতেন না।"



সুরমার চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, "আহা! কেমন করিয়া পারিত!"

তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল, "তোমাকে যাহারা নির্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্বোধ।"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোষে আরক্তিম মুখখানি নাড়িয়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "না সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন ষোলো বৎসর বয়স তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালি পরগনার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন তখনই বুঝা যাইতেছে উঁহার দ্বারা রাজ্যশাসন কখনো ঘটিতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড়ো একটা তাকাইতেন না। বলিলেন—ও কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতাব বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে।"

সুরমা আবার কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। হাজার হউন, পিতা তো বটেন। আজকাল রাজ্য-উপার্জন রাজ্যবৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ বহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাঁই নাই। যতই তাহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে।"

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী; কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এক তো আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়ত পিতার রাজ্যের সীমা যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারাইবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে—রাজকার্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে ততই আমাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিবেন।"

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র ; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লঙঘন করে। সে একমনে আশা করিত, এইরূপই যেন হয়।

"চারি দিকে কোথাও বা কৃপাদৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মাঝে মাঝে পালাইয়া রায়গড়ে দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড়ো একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কী পরিবর্তন! সেখানে গাছপালা দেখিতে পাইতাম, গ্রামবাসীদের কুটিরে যাইতে পারিতাম, দিবানিশি রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান তো, যেখানে দাদামহাশয় থাকেন তাহার ত্রিসীমায় বিষাদ ভাবনা বা কঠোর গাম্ভীর্য তিষ্ঠিতে পারে না। গাহিয়া বাজাইয়া, আমোদ করিয়া চারি দিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারি দিকে উল্লাস, সদ্ভাব, শান্তি। সেইখানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কী আরামের ভুল! অবশেষে আমার বয়স যখন আঠারো বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারি দিকে সবুজ কুঞ্জবন, সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।"

সুরমা বলিয়া উঠিল, "ও কথা অনেকবার শুনিয়াছি।"

উদয়াদিত্য। আর-একবার শুন। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে কথাগুলো যদি বাহির করিয়া না দিই তবে আর বাঁচিব কী করিয়া? সেই কথাটা তোমার কাছে এখনো বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বার বার করিয়া বলি। যেদিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সেদিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সেদিন আর বলিব না।



সুরমা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম ? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক তো সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না ? অন্তর্যামী কি তোমার মন দেখিতে পান না ?

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, ‘‘রুক্মিণীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো। সে একাকিনী, বিধবা। দাদামহাশয়ের অনুগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কী কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল। এত প্রখর আলো যে, কিছুই ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারি দিকে জগৎ জ্যোতির্ময় বাষ্পে আবৃত। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল; কিছুই আশ্চর্য, কিছুই অসম্ভব মনে হইত না; পথ-বিপথ, দিক্-বিদিক্ সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও আমার এমন কখনো হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখনো হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাঁহার কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্য সমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্বচরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্তমাত্র—আর অধিক নয়—সমস্ত বহির্জগতের মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত, আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল, বিদ্যুদ্‌বেগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, ম্লান—সে ধূলি আর মুজিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম বিধাতা, যে, পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল।’’

বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিযা উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, ‘‘আমার মাথা খাও, ও কথা থাক্।’’

উদয়াদিত্য। ধীরে ধীরে যখন রক্ত শীতল হইয়া গেল সকলই তখন যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা! কোথা হইতে কোথায় পতন! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয় আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন। অভিমান নাই, কিছুই নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন; মুখখানি নিজের স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, ‘‘তার পর কী হইল, সুরমা বলো দেখি। এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহপ্রেমে কোমল, হাস্যে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল, মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল?



আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙিবে আশা কি ছিল? তুমি আমার উষা, আমার আলো, আমার আশা, কী মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে।"

যুবরাজ বার বার সুরমার মুখচুম্বন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহিল না, আনন্দে তাহার চোখ জলে পুরিয়া আসিল। যুবরাজ কহিলেন, "এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমারই কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উঁচুনিচু নহে, রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত। পূর্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোনো কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত ইহাই ঠিক, আত্মসংশয়ী সংস্কার বলিত উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা, তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মনে যাহা ভালো বলে তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। ঐ সুকুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ।"

কী অপরিসীম নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল। কী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ কহিল, "আমার আর কিছুই নাই, কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে!'

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে এক-একদিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার-কথিত পুরানো জীবনকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড়ো ভালো লাগে।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এ দিকে রাজসভায় সভাসদ্গণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়, ও দিকে অন্তঃপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে কেবল তোমাকে অপমান আর কষ্টই সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এই বিবাহ না হইলেই ভালো ছিল।"

সুরমা। সে কী কথা নাথ! এই সময়েই তো সুরমাকে আবশ্যক। সুখের সময় আমি তোমার কী করিতে পারিতাম! সুখের সময় তো সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিস। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি নিজের জন্য তেমন ভাবি না। সকলই সহিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন অপমান সহ্য করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মতো আমার দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিয়াছ, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মতো তোমাকে অপমান হইতে, লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে, আপনাকে যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া



স্বীকার না করাতে, পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কানেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধূ করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক-একবার মনে হয় আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এতদিনে হয়তো যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।"

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।

শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন, "কেন বিভা? কী হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"

পাঠকেরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল, "এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হইল!"

সুরমা ও উদয়াদিত্য একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কেন, কী হইয়াছে?" বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কী কহিল। বলিতে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল; কহিল, "দাদা, কী হইবে?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তবে চলিলাম।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না না, তুমি যাইয়ো না।"

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। পিতা যদি জানিতে পারেন? তোমার উপরে যদি রাগ করেন?

সুরমা কহিল, "ছিঃ বিভা, এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?"

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিয়া প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। বিভা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, তুমি যাইয়ো না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড়ো ভয় করিতেছে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা, এখন বাধা দিস নে; আর সময় নাই।" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী হইবে ভাই? বাবা যদি টের পান?"

সুরমা কহিল, "আর কী হইবে? স্নেহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড়ো একটা ক্ষতি হইবে না।"

বিভা কহিল, "না ভাই, আমার বড়ো ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোনো প্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন?"

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, কাজটা কি ভালো হইবে?"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কাজটা?"



মন্ত্রী কহিলেন, "কাল যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কাল কী আদেশ করিয়াছিলাম?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে।"

প্রতাপাদিত্য আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন, যখন বসন্ত রায় যশোহরে আসিবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় লইবেন তখন—"

প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তখন কী? কথাটা শেষ করিয়াই ফেলো।"

মন্ত্রী। তখন দুইজন পাঠান গিয়া—

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁহাকে নিহত করিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মন্ত্রী, হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ নাকি? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সংকোচ হইতেছে! এখন বোধ কবি তোমার রাজকার্যে মনোযোগ দিবার বয়স গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন?"

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটা ভালো বুঝিতে পারেন নাই।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে; আমি অবশ্য ধর্ম অধর্ম সমস্ত ভাবিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, আমি—

প্রতাপ। চুপ করো, আমার সমস্ত কথাটা শোনো আগে। আমি যখন এ কাজটা আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই—এই যে ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন কবিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়; যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কাটিয়া ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় রায়বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ঐ বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।

মন্ত্রী কহিলেন, "এ বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "হাঁ ছিল। ঠিক কথা বলো। এখনো আছে। দেখো মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ করিয়ো। সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে তো বলিয়ো। আমাকে বুঝাইবার অবসর দিয়ো। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ; 'না বলিয়ো না,



ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না?"

এ বিষয়ে—অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোনো মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদূর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদূর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সংকোচ দেখান তাহা হইলে রাজা আপাতত কিছু রুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ না করিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন।"

প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, রুষ্ট হইবেন! রুষ্ট হইবার অধিকার তো সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়ো না।"

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা, মহারাজ, ফাঁকা রোষকে আমিও বড়ো একটা ডরাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বৈকি। দিল্লীশ্বরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।"

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিয়া কহিলেন, "দেখো মন্ত্রী, দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।"

মন্ত্রী কহিলেন, "প্রজারা জানিতে পারিলে কী বলিবে?"

প্রতাপ। জানিতে পারিলে তো?

মন্ত্রী। এ কাজ অধিকদিন চাপা রহিবে না। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনার বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা বিশেষ ভাবিয়া করি। অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলো ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, আমি শিশু নহি। প্রতি পদে আমাকে বাধা দিবার জন্য, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খলস্বরূপে রাখি নাই।

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে; দ্বিতীয়ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোনো কাজ হইত নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। মন্ত্রী আজ পর্যন্ত এই দুই আদেশের ভালোরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, "মহারাজ, দিল্লীশ্বর—" প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশ্বরের নাম মুখে আনিয়ো না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কানের কাছে তুমি মনের সাধ মিটাইয়া দিল্লীশ্বরের নাম জপিয়ো। ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাকো।"



মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লীশ্বরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—"

রাজা কহিলেন, "দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, এখন অবশেষে সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মূলেই নাই।"

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন, "তবে কী বলিতেছিলে বলো।"

মন্ত্রী বলিলেন, "কাল রাত্রে যুবরাজ সহসা অশ্বারোহণ করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনো ফিরিয়া আসেন নাই।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কোন্ দিকে গেছেন?"

মন্ত্রী কহিলেন, "পূর্বাভিমুখে।"

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত লাগাইয়া কহিলেন, "কখন গিয়াছিল?"

মন্ত্রী: কাল প্রায় অর্ধরাত্রের সময়।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই তো ভালো হয়।

মন্ত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কোনোকালেই রাজার মতো ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত? সিংহ-শাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়? তবে কিনা—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহার মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন। সে কি তবে এখনো ফিরিয়া আসে নাই?"

মন্ত্রী। না মহারাজ।

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "একজন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যাই নাই?"

মন্ত্রী। একজন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ। অদৃশ্যভাবে দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই?

মন্ত্রী। তাহারা কোনো প্রকার অন্যায় সন্দেহ করে নাই।

প্রতাপ। সন্দেহ করে নাই! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহারা বড়ো ভালো কাজ করিয়াছিল? মন্ত্রী, তুমি আমাকে অনর্থক যাহা-তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়ো না। প্রহরীরা কর্তব্য-কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে-সময়ে দ্বারে কাহারা ছিল ডাকিয়া পাঠাও। ঘটনাটির জন্য যদি আমার কোনো একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ, এ কাজের জন্য কেহই দায়ী নহে! তবে এ দায় তোমার।



প্রতাপাদিত্য প্রহরীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ। দিল্লীশ্বরের কথা কী বলিতেছিলে?"

মন্ত্রী। শুনিলাম আপনার নামে দিল্লীশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিয়াছে।

প্রতাপ। কে? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য নাকি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।

প্রতাপ। যেই করুক, তাহার জন্য অধিক ভাবিয়ো না, আমিই দিল্লীশ্বরের বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্‌যোগ করিতেছি। সে পাঠানেরা এখনো ফিরিল না? উদয়াদিত্য এখনো আসিল না? শীঘ্র প্রহরীকে ডাকো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজন পথ দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তব্ধ রাত্রে অশ্বের খুরের শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়েব মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি; শব্দের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রাম শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন। অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিতে হইল। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিন বার পড়িয়া গেল। শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সর্বাঙ্গ ঘর্মে প্লাবিত। এ দিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশমাত্র নাই, এখনো অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন। একবার তাহার স্কন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন, "সুগ্রীব।" সে চকিতে একবার কান খাড়া করিয়া বড়ো বড়ো চোখে বঙ্কিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভালো দেখা যাইতেছে না, আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সবেগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই স্তব্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কানের কাছে সাঁ সাঁ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শৃগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ শিমুলতলির চটির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, "সুগ্রীব" বলিয়া কতবার ডাকিলেন, সে আর নড়িল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত কবিলেন। বার বার আঘাতের পর চটির অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানালার মধ্য দিয়া কহিল, "এত রাত্রে তুমি কে গো?" দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।



যুবরাজ কহিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, দ্বার খোলো।"

সে কহিল, "দ্বার খুলিবার আবশ্যক কী, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা করো-না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায় এখানে আছেন?"

সে কহিল, "আজ্ঞা, সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে কিন্তু এখনো আসেন নাই। আজ বোধ করি তাঁহার আসা হইল না।"

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন, "এই লও।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাহাকে কহিলেন, "বাপু, আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে?"

চটি-রক্ষক সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "না মহাশয়, তাহা হইবে না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি রাজবাটীর কর্মচারী। দুইজন অপরাধীর অনুসন্ধানে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোনো পাঠানকে দেখিতে পাইলেন। কেবল দুইজন সুপ্তোত্থিতা প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আ মরণ, মিনসে অমন করিয়া তাকাইতেছিস কেন?"

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন্‌ যে, ভালোই হইয়াছে, হয়তো আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন, যদি ইহার পূর্ববর্তী কোনো চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া থাকে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন, "কে ও, রতন নাকি?" সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ, আপনি এত রাত্রে এখানে যে?"

যুবরাজ কহিলেন, "তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বলো তো দাদামহাশয় কোথায় আছেন।"

"আজ্ঞা, তাঁহার তো চটিতেই থাকিবার কথা।"

"সে কী! সেখানে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।"

সে অবাক হইয়া কহিল, "ত্রিশজন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্যবশত পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।"

"পথে যেরূপ কাদা তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ঘোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজন পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূন্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্ত রায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলে না?"



পাঠান কহিল, "হুজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এতবড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

বসন্ত রায় মনে মনে কহিলেন, বাহবা, লোকটা তো বড়ো ভালো। কিছুক্ষণ বিতর্ক করিয়া পালকি হইতে তাঁহার টাকবিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।"

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্ত রায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে বড়োঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

পাঠান আবার সেলাম করিয়া কহিল, "কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক ঠাহরাইয়াছেন।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "এখন তোমার কী করা হয়?"

পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুজুর, দুরবস্থায় পড়িয়াছি, এখন চাষবাস করিয়া গুজরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।"

বসন্ত রায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, বাহবা, কবি কী কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েৎ আজ বলিলে, ঐ দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।"

পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড়ো সরেস; গরিবের বহুৎ কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্ত রায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়োলোক ছিল আজ তাহার এমন দুরবস্থা। চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার। মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন, "তোমার যেরকম সুন্দর শরীর আছে তাহাতে তো তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।"

পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "হুজুর, পারি বৈকি। সেই তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে। কবি বলেন—"

বসন্ত রায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-একজন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে।" এই বলিয়াই পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই-একটি ঝংকার দিয়া একবার জাগাইয়া দিলেন।

পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল, "আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।"



বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "কী বলিলে খাঁ সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার!" চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েৎটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তলোয়ার যে এতবড়ো ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না—কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ, কী তারিফ!" বৃদ্ধ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরো কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন, "তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?"

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

বসন্ত রায়। তুমি একবার রায়গড়ে যাইয়ো। আমি যশোর ফিরিয়া গিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব।

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন।" পাঠান ভাবিল একরকম বেশ গুছাইয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সেতার বাজানো আসে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ" ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলিতে মেজরাপ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "বাহবা! খাসী!" ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্যাদা গাম্ভীর্য আত্মপর সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন, "কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।"

গান থামিলে পাঠান কহিল, "বাঃ, কী চমৎকার আওয়াজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "তবে বোধ করি নিস্তব্ধ রাত্রে, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লাগে। কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজের তো বড়ো প্রশংসা করে না। তবে কি না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি-না-একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি-না-একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন দুটো অর্বাচীন আছে। নইলে এতদিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই দুটো আনাড়ি খরিদ্দার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরই কাছ হইতে বাহবা মিলে। অনেকদিন দুটাকে দেখি নাই, গীতগানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি। মনের সাধে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোঝা নামাইয়া বাড়ি ফিরিব।" বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোখদুটি স্নেহে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল, তোমার একটা সাধ মিটিয়াছে, গান শুনানো হইয়াছে, এখন প্রাণের বোঝাটা আমিই নামাইব কি? তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া



উঠিল—পাঠানের নিকটবর্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন, "কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।" বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন—আমার অনুচরেরা কখন ফিরিয়া আসিবে? আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

একজন অশ্বারোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল, "আঃ বাঁচিলাম। দাদামহাশয় পথের ধারে এত রাত্রে কাহাকে গান শুনাইতেছ?"

আনন্দে ও বিস্ময়ে বসন্ত রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেতার শিবিকা-উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী দাদা? দিদি ভালো আছে তো?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সমস্তই মঙ্গল।"

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন—

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো তো রয়েছে রাত, এখনো তো হয় নি প্রভাত,
এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস?"

উদয়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়কে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, এ কাবুলি কোথা হইতে জুটিল?"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "খাঁ সাহেব বড়ো ভালো লোক। সমঝদার ব্যক্তি। আজ রাত্রি বড়ো আনন্দে কাটানো গিয়াছে।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটিতে না গিয়া এখানে যে?"

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, "হুজুর, আশ্বাস পাই তো একটা কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে আপনি যখন যশোরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।"

বসন্ত রায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন, "রাম রাম রাম।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিয়া যাও।"

পাঠান। আমরা কখনো এমন কাজ করি নাই, সুতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখান। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোনোমতেই প্রবৃত্তি হইল না।



কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিয়ো না। এখন গরিব, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে ফিরিয়া গেলে আমার সর্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই। বলিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত রায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন, "তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে নাকি?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই।"

উদয়াদিত্য অবাক হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা!"

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমার তো আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক, সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন। আমার নিজের কোনো হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না। আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া। একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে বসন্ত রায়ের অনুচরগণ ফিরিয়া আসিল।

"মহারাজ কোথায়? মহারাজ কোথায়?"

"এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব?"

সকলে সমস্বরে বলিল, "সে নেড়ে বেটা কোথায়।"

বসন্ত রায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন, 'হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিয়ো না।"

প্রথম। আজ মহারাজ, বড়ো কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে—

দ্বিতীয়। তুই থাম্ না রে; আমি সমস্ত ভালো করিয়া গুছাইয়া বলি। সে পাঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁ-হাতি একটা আমবাগানের মধ্যে—

তৃতীয়। না রে সেটা বাবলা বন।

চতুর্থ। সেটা বাঁ-হাতি নয়, সেটা ডান-হাতি।

দ্বিতীয়। দূর খেপা, সেটা বাঁ-হাতি।

চতুর্থ। তোর কথাতেই সেটা বাঁ-হাতি?

দ্বিতীয়। বাঁ-হাতি যদি না হইবে তবে সে পুকুরটা—

উদয়াদিত্য। হাঁ-বাপু, সেটা বাঁ-হাতি বলিয়া বোধ হইতেছে, তার পরে বলিয়া যাও।

দ্বিতীয়। আজ্ঞা হাঁ। সেই বাঁ-হাতি আমবাগানের মধ্য দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চষা মাঠ জমি জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গাঁয়ের নামগন্ধও পাইলাম না। এমনি করিয়া তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গাঁয়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পালাইল খোঁজ পাইলাম না।

প্রথম। সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভালো ঠেকে নাই।

দ্বিতীয়। আমিও মনে করিয়াছিলাম এইরকম একটা কিছু হইবেই।



তৃতীয়। যখনই দেখিয়াছি নেড়ে, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

অবশেষে সকলেই ব্যক্ত করিল যে তাহারা পূর্ব হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটা এখনো আসিল না।"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সেটা তো আর আমার দোষ নয় মহারাজ।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দোষের কথা হইতেছে না। দেরি যে হইতেছে তাহার তো একটা কারণ আছে? তুমি কী অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মন্ত্রী। শিমুলতলি এখান হইতে বিস্তর দূর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতে ও ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনি যাহা অনুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অনুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সে দিক দিয়া গেলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, সে তো পূর্বেই জানাইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য। পূর্বেই জানাইয়াছি! কী উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ! যে সময়ে হউক জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল? উদয়াদিত্য তো পূর্বে এমনতরো ছিল না। শ্রীপুরের জমিদাবের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করিয়া বলিব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কী আন্দাজ কর, তাই বলো-না!"

মন্ত্রী। আপনি মহিষীর কাছে বধূমাতা ঠাকুরানীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ বিষয়ে আপনিই অনুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অনুমান করিব?

একজন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?"

পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কী করিয়া কাজ নিকাশ হইল?

পাঠান। আপনার পরামর্শমতে আমি তাঁহার লোকজনদের তফাত করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য। যদি না করিয়া থাকে?

পাঠান। মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ঐখানে হাজির থাকো। তোমার ভাই ফিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট প্রহরীদের জিম্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "এটা যাহাতে প্রজারা কোনোমতে না জানিতে পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"



কহিলেন, "মহারাজ, অসন্তুষ্ট না হন যদি .ো বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।"

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানিতে পারিলে?

মন্ত্রী। ইতিপূর্বে আপনি প্রকাশ্যভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্ত রায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী। এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুশি হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিনরাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি তো কোনো কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রাষ্ট্র না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, মার্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভালো বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি নাকি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ট হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।"

প্রতাপাদিত্য সিধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই-একটা শক্ত কথা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি বিবেচনা করিতেছি, ঐ পাঠান দুটাকে মারিয়া ফেলিলে এ বিষযে আব কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলানো অসম্ভব। প্রজারা জানিতে পারিবেই।" মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তবে তো আমি ভয়ে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পাবিবে! যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই। এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে। অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইয়ো না। যদি কোনো প্রজা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লৌহ দিয়া পুড়াইব।"

মন্ত্রী মনে মনে হসিলেন। মনে মনে কহিলেন—প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়! তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না।

প্রতাপাদিত্য। শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া লোকজন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

বৃদ্ধ বসন্ত রায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন —প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্ত রায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।"

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্যন্ত হইল না।



বসন্ত রায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিয়ো না। আমি কোনো কথা উত্থাপন করিব না। এসো বৎস, দুইজনে একবার কোলাকুলি করি। আজ অনেকদিনের পর দেখা হইয়াছে; আর তো অধিক দিন দেখা হইবে না।"

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেছেন। বসন্ত রায় ঈষৎ কোমল হাস্য হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "বসন্ত রায় অনেকদিন বাঁচিয়া আছে—না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনো যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।"

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর করিলেন না। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, "তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলিব। আমাকে বধ করিয়ো না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হইবে না। এতদিন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?"

বসন্ত রায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর দিলেন না। দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন, "প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্যেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা—'

এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন, পাঠানটা পালাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার উহাকে ছাড়িস না। পাকড়া করিয়া রাখ্।" বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।"

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন, "মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি? আমি বলিতেছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম, তুমি হারাইয়া ফেলিলে।"

দেড় মাসে পূর্বে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নাই।

"আর-একদিন উমেশ রায়ের নিকট তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে। চুপ করো। দোষ কাটাইবার জন্য মিছামিছি চেষ্টা করিয়ো না। যাহা হউক তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।"

রাজা প্রহরীদের ডাকাইলেন। পূর্বে রাত্রের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।



অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য পূর্বে তো এমন ছিল না। এখন সে যখন-তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। এ সকলের অর্থ কী?"

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ঐ বড়োবউ। বাছা আমার তো আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রঙ কেমন ছিল। যেন তপ্ত সোনার মতো। তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।" সুরমা ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন, "ওর ছোটো বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখনো তোকে ভালো পরামর্শ দেয় না, তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে। এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন।" মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়ত নেত্র অন্য দিকে ফিরাইলেন।

একজন পুরানো বৃদ্ধা দাসী বসিয়া ছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "শ্রীপুরের মেয়েরা জাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।" এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, ৩ তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ঐ যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড়ো সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ডাইনী! আহা, বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না।" এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রানীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল। উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখেব দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল ও চোখ মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন, "আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমাব তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভার ম্লান মুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না, তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা, তুই চুপ করিয়া থাকিস কেন? তোর মনে যখন যাহা হয় বলিস না কেন?"

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, "আমার আর কী বলিবার আছে?"

সুরমা কহিল, "অনেকদিন তাঁহাকে দেখিস নাই, তোর মন কেমন করিবেই তো! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্য একখানা চিঠি লেখ্‌-না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিব।"

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।



বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল, "এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভালো। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে তিনি কিসে ছোটো যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?" বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল, "আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হইতিস তো কী করিতিস? নিমন্ত্রণপত্র পাস নাই বলিয়া কি শ্বশুরবাড়ি যাইতিস না?"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না, তাহা পারিতাম না, আমি যদি পুরুষ হইতাম তো এখনই চলিয়া যাইতাম; মান অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া আনিলে তিনি কেন আসিবেন?"

বিভা এত কথা কখনো কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড়ো অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যেরকম করিয়া বলিয়াছি, বড়ো লজ্জা করিতেছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটি কথা নাই। বিভার চোখ দিয়া এক-এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ, "আজ কী ছেলেমানুষিই করিয়াছি।" ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল।

সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, "বিভা শুনিয়াছিস, দাদামহাশয় আসিয়াছেন?"

বিভা। দাদামহাশয় আসিয়াছেন?

সুরমা। হাঁ।

বিভা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কখন আসিয়াছেন?"

সুরমা। প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।

বিভা। এখনো যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না?

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদামহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন-কি, একদিন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, একেবারেই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এইজন্য বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে-বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্নমুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন,

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাকো,
অধিকক্ষণ থাকব নাকো,



আসিয়াছি দু-দণ্ডেরি তরে।
দেখব শুধু মুখখানি।
শুনব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।"

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড়ো আহ্লাদ হইয়াছে। অতটা আহ্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার জন্য তো আড়ালে যাইতে হইল না।"

বসন্ত রায়। না, বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বুড়া বিদায় না হয়, তবে না-হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মতলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে তাড়াইবার ফন্দি। কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না। আসিলাম যদি তো ভালো করিয়া জ্বালাইয়া যাইব, আবার যতদিন না দেখা হয় মনে থাকিবে।

সুরমা হাসিয়া কহিল, "দেখো দাদামহাশয়, বিভা আমার কানে কানে বলিল যে, মনে রাখানোই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা জ্বালাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নূতন করিয়া জ্বালাইতে হইবে না।"

কথাটা শুনিয়া বসন্ত রায়ের বড়োই আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, আমি কখনো ও-কথা বলি নাই। আমি কোনো কথাই কই নাই।"

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, তোমার মনস্কামনা তো পূর্ণ হইল! তুমি হাসি দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে এখন দেশান্তরে যাও।"

বসন্ত যায়। না ভাই, তাহা পারিলাম না। আমি গোটা-পনেরো গান ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল, "তোমার আধমাথা বৈ চুল নাই যে দাদামহাশয়।"

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেকদিনের পর প্রথম আলাপে বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদামহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়োজনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোনো অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্ত রায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সে একদিন গিয়াছে রে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা রূপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।"

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভালো দেখিতে ছিল?"

মনে মনে বিভার সে-বিষয়ে বিষম সন্দেহ ছিল। দাদামহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুম্ফসম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আম্রের ন্যায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোনোমতেই ভালো ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গোঁফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে



হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদামহাশয়ের আবার গোঁফ! দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই!

বসন্ত রায় কহিলেন, "সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনো একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।"

বিভা কহিল, "কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয়, যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভালো দেখাইবে না।"

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও।"

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, আমি তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।"

সুরমা। আমি বলি কি —

বিভা। শোনো-না দাদামহাশয়, তোমার—

সুরমা। বিভা, চুপ কর্। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার—

বিভা। দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকা চুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়বে।

বসন্ত রায়। আমাকে যদি কথা শুনতে না দিস দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল।

বিভা বলিল, "কী সর্বনাশ। তবে আমি পালাই।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, "বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্যে বহন করে তাহা জানিতে পারিলে বোধ করি মহারাজারও মনে দয়া হয়!"

"কেন। কেন। তাহার কী হয়েছে।" বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্ত রায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, "বৎসরের মধ্যে একটি দিন ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও কাহারও মনে পড়ে না।"

বসন্ত রায় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথাই তো।"

সুরমা কহিল, "স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বলো তো? বিভা ভালোমানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে?"

সুরমা। আজ বিকেলে আমার কাছে কত কাঁদিতেছিল।

বসন্ত রায়। বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল?

সুরমা। হাঁ।

বসন্ত রায়। আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আনো, আমি দেখি।

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্ত রায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস কেন



দিদি? যখন তোর যা কষ্ট হয় তোর দাদামহাশয়কে বলিস না কেন? তা হলে আমি আমার যথাসাধ্য করি। আমি এখনই যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গে।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিয়ো না। দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি, যাইয়ো না।"

বলিতে বলিতে, বসন্ত রায় বাহির হইয়া গেলেন; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, "তোমার জামাতাকে অনেকদিন নিমন্ত্রণ কর নাই, ইহাতে তাহার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহরপতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই।"

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণপত্র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা ও সুরমার কাছে আসিয়া বসন্ত রায়ের সেতার বাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দু-নয়ন।"

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ?"
বসন্ত রায় গান গাহিতে লাগিলেন,

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী. পরো আভরণ।"

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, "বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ?"

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ দিদি। দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ! আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

"এসো, এসো, ভাই এসো।" বলিয়া বসন্ত রায় তাহাকে পাকড়া করিলেন।

রাজপরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্ত রায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্ত রায় আসিলে সামাল সামাল পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাহেঁচড়া আরম্ভ করিল। বসন্ত রায় তাহাকে সেতার দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চশমা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাঁচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া অছেন। ঘরটি অষ্টকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত কারিকর বটকৃষ্ণ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। চারি দিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া। তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারি দিকে দেশী আয়না ঝুলানো, তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারি দিকে যে-সকল মনুষ্য-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়। রাজার বাম পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশংকর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফর্নাণ্ডিজ।



রাজা বলিলেন, "ওহে রমাই।"

রমাই বলিল, "আজ্ঞা, মহারাজ।"

রাজা হাসিয়া আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্নাণ্ডিজ হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্তোষে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্তব্য; ফর্নাণ্ডিজ ভাবে, অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা ছাড়া, যে দুর্ভাগ্য রমাই ঠোঁট খুলিলে দৈবাৎ না হাসে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নহিলে রমাইয়ের মান্ধাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকই আমোদে হাসে। তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী হে?"

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যক।

"পরম্পরায় শুনা গেল সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।"

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাঁহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তেমনি তাঁহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়োই আমোদ। রমাই আসিলেই ফর্নাণ্ডিজকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি প্রধান আমোদ আছে; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফর্নাণ্ডিজকে স্থাপন করা; রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাস্যের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে। পাঠকেরা মার্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না, সুরুচির অনুরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পরে?"

"নিবেদন করি মহারাজ। (ফর্নাণ্ডিজ তাঁহার কোর্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন-চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করিতেছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই।"

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ।

"দিনেব বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, 'দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরিব।' রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, "ওগো চোর আসিয়াছে।' কর্তা বলিলেন, 'ঐ যাঃ, ঘরে যে আলো জ্বলিতেছে। চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পলাইবে।' চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আজ তুই বড়ো বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পলাইতে পারিবি, কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।' "

রাজা। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি।

রাজা বলিলেন, "তার পর?"



রমাই দেখিল, এখনো রাজার তৃপ্তি হয় নাই। "জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না। তাহার পররাত্রেও ঘরে আসিল। গিন্নি কহিলেন, 'সর্বনাশ হইল ওঠো।' কর্তা কহিলেন, 'তুমি ওঠো-না।' গিন্নি কহিলেন, 'আমি উঠিয়া কি করিব।' কর্তা বলিলেন, 'কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও-না। কিছু যে দেখিতে পাই না।' গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'দেখো দেখি, তোমার জন্যই তো যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও বন্দুকটা আনো।' ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সারিয়া কহিল, 'মহাশয়, এক ছিলিম তামাকু খাওয়াইতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হইয়াছে।' কর্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন, 'রোস্ বেটা! আমি তামাক সাজিয়া দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়াইয়া দিব।' তামাক খাইয়া চোর কহিল, 'মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন তো উপকার হয়। সিঁধকাঠিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।' সেনাপতি কহিলেন, 'বেটার ভয় হইয়াছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস না।' বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্তা গিন্নিকে কহিলেন, 'বেটা বিষম ভয় পাইয়াছে।"

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। ফর্নাণ্ডিজ থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে "হিঃ হিঃ" করিয়া টুকরা টুকরা হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, শুনিয়াছ আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি?"

রমাই মুখভঙ্গি করিয়া কহিল, "অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং (হাস্য। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি।) কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার—আহারটা, সমাদরটা; দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়; সকলই সার পদার্থ; কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ঐ স্ত্রীটা।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—"

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, "মহারাজ, তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না!" (যথাক্রমে হাস্য।) কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, "আমি তো শুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা ও ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।"

রমাই। সে কথায় কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি।

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যন্ত কৃশাঙ্গী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরো ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রমাই ঘরে আসিলে তিনি কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না। রাজসভায় রমাই একপ্রকার ভঙ্গিতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর-একপ্রকার ভঙ্গিতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ-রস আসে, এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্থূলকায়া ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না।

হাসি থামিলে পর রাজা কহিলেন, "ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।"



সেনাপতি বুঝিলেন, এবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চশমাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, 'উৎসবস্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।"

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রমাই। সাহেবের চক্ষে দিনরাত্রি চশমা আঁটা। ঘুমাইবার সময়েও চশমা পরিয়া শোন, নহিলে ভালো করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই যা ভয়। কেমন মহাশয়?

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, "তাহা নয় তো কী।" তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজ আদেশ করেন তো বিদায় হই।"

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত উদ্‌যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।" মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনিয়াছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করিয়াছিল।"

রমাই। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাঙ্গুল বানাইয়া দিয়াছিল।

রাজা হাসিলেন, মুখে দন্তের বিদ্যুৎছটা বিকাশ হইল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোরতর মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পাবিয়াছে শুনিয়া তিনি বড়ো সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "আপনার এক শ্যালক আসিয়া আমাকে কহিলেন, 'বাসব-ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানিতাম না।' আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, 'পূর্বে জানিবেন কিরূপে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাই যস্মিন্ দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন।' "

রাজা জবাব শুনিয়া বড়োই সুখী। ভাবিলেন, রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চির-রাহুগ্রস্ত হইল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো একটা ধার ধারেন না। এই-সকল ছোটোখাটো ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় বিষম বড়ো করিয়া দেখেন। এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার ঘোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে। এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই।

রাজা রমাইকে কহিলেন, "রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ি ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।"

রাজা কহিলেন, "তাহার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব।"



রমাই কহিল, ''আপনার অসাধ্য কী আছে?''

রাজারও তাহাই বিশ্বাস। তিনি কী না করিতে পারেন? অনুগতবর্গের কেহ যদি বলে, ''মহারাজের জয় হউক, সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন।'' মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ বলেন, ''হাঁ, তাহাই হইবে।'' কেহ যেন মনে না করে এমন কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, রমাই ভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী-মাতার সঙ্গে বিদ্রূপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায়। এতবড়ো মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন তবে আর তিনি কিসের রাজা।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো ছিল। শরীর পায় সাড়ে চারিহাত লম্বা। সমস্ত শরীরে মাংসপেশী তরঙ্গিত। সে স্বর্গীয় রাজার আমলের লোক। রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে তো সে এই রামমোহন। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনা-আপনি সংকুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশজন অনুচর যাইবে। রামমোহন তাহাদিগের সর্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল, ''যে আজ্ঞা। রমাই ঠাকুর যাইবেন কি?'' বিড়ালচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানাপ্রকার উদ্‌যোগ করিতে হইতেছে। আহারাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহিষীর কোনো মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে; কিন্তু হইলে হয় কী, বিভার কিসে ভালো হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভালো বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুকুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না—কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া গর্বসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বিভা চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরমার কাছে মনের মতো চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন, কেবল চুল বাঁধার দোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা হিংসা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্য হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ,



তাহার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, দুরন্ত আহ্লাদকে কোনোমতেই সে কেবলই অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে কেবলই বিদ্যুতের মতো উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেওয়ালগুলা পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন। বিভার হর্ষ দেখিয়া তাঁহার এমনি আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সস্নেহে মৃদু হাস্যে সুরমাকে চুম্বন করিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কী?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কিছুই না।"

এমন সময়ে বসন্ত রায় জোর করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "দেখো দাদা, আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও। আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহ্লাদ হয় তো ভালো করেই হাস-না ভাই, দেখি।

হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,
হাসির সে প্রাণের সাধ ওই অধরে খেলা করে।

বয়স যদি না যাইত তো আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এইখানে পড়িতাম আর মরিতাম। হায়, হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে। যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরিতাম। বুড়াবয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না।"

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কে গিয়াছে?" তিনি কহিলেন, "আমি কী জানি।" "আজ পথে অবশ্য আলো দিতে হইবে?" নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজ কহিলেন, "অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।" তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, "নহবত বসিবে নাকি?" "সে-সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।" আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্বে দুই-এক বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাজবাটী হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত, এবারে চকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশজন বৈ লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর-পঞ্চাশজন লোক মিলিল না। রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ?" ভালোমানুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছেন, "না, ওটা হাতি।"

রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন, "তোমাদের মন্ত্রী যে হাতিটাতে চড়িয়া থাকে সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়ো।"

দেওয়ান কহিলেন, "বড়ো হাতিগুলি রাজকার্য উপলক্ষে দূরে পাঠানো হইয়াছে, শহরে একটিও নাই।"



রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই তাহাদের দূরে পাঠানো হইয়াছে। নহিলে আর কী কারণ থাকিতে পারে!

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রতাপাদিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোটো?"

রমাই ভাঁড় কহিল, "বয়সে আর সম্পর্কে, নইলে আর কিসে? তাঁহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন ইহাতেই—"

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখো ঠাকুর, তোমার বড়ো বাড় বাড়িয়াছে! আমার মা-ঠাকরুনের কথা অমন করিয়া বলিয়ো না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, "অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে-ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।"

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীরপদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, ঐ বামনা যে আপনার শ্বশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহা তো আমার সহ্য হয় না। বলেন তো উহার মুখ বন্ধ করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন, তুই থাম্।"

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সেদিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে তিনি নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড়ো লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুমাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন "এসো, ভালো আছ তো?"

রামচন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "ভাঙামাথি পরগনার তহসিলদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোনো তদন্ত করিয়াছ?"

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বৎসরের মতো এবার তো তোমাদের ওখানে বন্যা হয় নাই?"

রামচন্দ্র। আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জলবৃদ্ধি—

প্রতাপাদিত্য। মন্ত্রী, এ চিঠিখানার অবশ্য একটা নকল রাখা হইয়াছে?

বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, 'যাও বাপু, অন্তঃপুরে যাও।"

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়ো।



নবম পরিচ্ছেদ

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।" তখন বিভার মনে বড়ো আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড়ো ভালোবাসিত। কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত। কোনো আবশ্যক না থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক-একবার বিভাকে দেখিতে আসিত। রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দীর্ঘ রামমোহন যখন "মা" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল অলংকারশূন্য স্নেহের ভাব থাকিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাহাকে কহিল, "মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?"

রামমোহন কহিল, "তা মা, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়।' তুমি কেন্ আমাকে মনে করিলে। আমি মনে মনে কহিলাম, 'মা না ডাকিলে আমি যাব না, দেখি কতদিনে তাঁর মনে পড়ে।' তা কই, একবারও তো মনে পড়িল না!"

বিভা ভারি মুশকিলে পড়িল। সে কেন ডাকে নাই, তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুশকিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, "না মা, অবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।"

বিভা কহিল, "মোহন, তুই বোস্; তোদের দেশের গল্প আমায় বল্!"

রামমোহন বসিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয়টুকুর মধ্যে কত কী কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন সে আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই বাঁধিয়াছিল তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধা মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল ও দুইজনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল, "মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ঐ হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।"

বিভা তাহার চারগাছি সোনার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল, "মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।"

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ তো সাজিয়াছে, বেশ তো মানাইয়াছে।"

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। সে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনীর গানটি গা।" রামমোহন বিভার দিকে চাহিয়া গাহিল,

"সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমনধারা,
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।

এলি কি পাষাণী ওরে,
দেখব তোরে আঁখি ভরে—
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।"

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভার মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল মুছিলেন। আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্য ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্য অন্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ, লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত অনির্দেশ্য না-জানি-কী-হইবে ভাবে বিভার হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে!

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। হুলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারি দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারি দিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারি দিক হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস, মৃণাল-বাহুর কঠোর তাড়ন, চম্পক-অঙ্গুলির চন্দ্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুররমণীদের মুখ একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভুতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভুতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই প্রৌঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মাগো, মা, তোমার মুখ নয় তো, একগাছা ঝাঁটা।" ভুতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, "আর মাগি, তোর মুখটা আঁস্তাকুড়, এত ঝাঁটাইলাম তবুও সাফ হইল না।" বলিয়া গস গস করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘর খালি হইল, রামচন্দ্র রায় বিরাম পাইলেন।

তখন সেই প্রৌঢ়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিষী দাসদাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও এক পার্শ্বে বসিয়া খাইতেছিল। সেই প্রৌঢ়া মহিষীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "এই যে নিকষা জননী।" শুনিবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শার্দূলের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্ঠিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি যে ঠাকুর তোমায় চিনি।" বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর। রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল, "আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।" বলিয়া তাহাকে দুই-এক পাক আকাশে ঘুরাইল। মহিষী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "রামমোহন, তুই করিস কী?" রমাই কাতরস্বরে কহিল, "দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।" চারি দিক হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হতভাগা, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?"

রমাই কহিল, "মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" রামমোহন বলিয়া উঠিল, "কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের অমন কথা বলিবি তো এই শানের পাথরে তোর মুখ ঘষিয়া দিব।" বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।



রমাই আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্বকায় রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্তার মতন করিয়া ঝুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা অনেকটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার শ্যালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সহিত, এমন-কি, মহিষীর সহিত বিদ্রূপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্তি অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "লছমন সর্দারকে ডাকো।" লছমন সর্দারকে কহিলেন, "আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে চাই।" সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, "যো হুকুম মহাবাজ।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যালক তাহার পদতলে পড়িল, কহিল, "মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করিবেন না।" প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আজ রাত্রের মধ্যেই আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই।" তাঁহার শ্যালক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মহারাজ, আজ তাঁহারা অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জনা করুন, মহারাজ, মার্জনা করুন।" তখন প্রতাপাদিত্য কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "লছমন, শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।" শ্যালক দেখিলেন, তিনি যতদূর মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবত বাজিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই নহবতের শব্দ জ্যোৎস্নার সহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই-এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন তো আজ আসিয়াছে।

রামচন্দ্র রায় শয্যায় শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে—তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কী করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া। তিনি জানাইতে চান, 'তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?' এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্শ্ব পরিবর্তন করেন নাই। যত মান-অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক-একবার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছে—প্রাণের মধ্যে বড়ো ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সহসা দেখিলেন, বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোত্থিত অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের সুস্থ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে, তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখখানি দেখিয়া সহসা তাঁর মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, কাঁদিতেছ?" বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল।



তখন রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপর রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "কে ও?" বাহির হইতে উত্তর আসিল, "অবিলম্বে দ্বার খোলো।"

দশম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশ্যালক রমাপতি কহিলেন, "বাবা, এখনই পালাও, মুহূর্ত বিলম্ব করিয়ো না।"

সেই রাত্রে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন, কী হইয়াছে?"

"কী হইয়াছে তাহা বলিব না, এখনই পালাও।"

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কী হইয়াছে?"

রমাপতি কহিলেন, "সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, মা।"

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্ত রায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল, "মামা, কী হইয়াছে বলো।"

রমাপতি তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বাবা, অনর্থক কালবিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পলাইবার উপায় দেখো।"

হঠাৎ বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোদ্যত মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হইয়াছে বলিয়া যাও।"

বমাপতি সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গোল করিস নে বিভা, চুপ কর, আমি সমস্তই বলিতেছি।"

যখন রমাপতি একে একে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন—কহিলেন, "চুপ, চুপ, সর্বনাশ করিস নে।"

বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতরে কহিলেন, "এখন আমি কী উপায় করিব? পলাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।"

রমাপতি কহিলেন, "আজ রাত্রে প্রহরীরা চারি দিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারি দিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোনো উপায় থাকে।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিলেন, "মামা, তুমি কোথায় যাও। তুমি যাইয়ো না, তুমি আমাদের কাছে থাকো।"

রমাপতি কহিলেন, "বিভা, তুই পাগল হইয়াছিস। আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না। ততক্ষণ আমি একবার চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া আসি।"

বিভা তখন বলপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত-পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল, "মামা, তুমি আর-একটু এইখানে থাকো। আমি একবার দাদার কাছে যাই।" বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায়। চারি দিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজ-অন্তঃপুরে শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে



চারি দিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার এক পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সেটুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক পা এক পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল ঘেঁষিয়া অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন, এই চারি দিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ঐ যে ইতস্তত এক-একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে তো কেহ মুখ গুঁজিয়া সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কী জানি ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে। খাটের নীচে, অথবা দেওয়ালের এক পাশে। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু করেন, যদি তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকে? অস্তে আস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন, কে একজন বুঝি প্রদীপ নিবাইয়া দিল—কে একজন বুঝি ঘরে আছে। রমাপতির কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া ডাকিলেন, "মামা।" মামা কহিলেন, "কী বাবা?" রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভালো হইত, মামাকে ভালো বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইয়াছে বিভা?" বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। উদয়াদিত্য সস্নেহে বিভার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "কেন বিভা, কী হইয়াছে?" বিভা তাহার ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমার সঙ্গে এসো, সমস্ত শুনিবে।"

তিনজনে মিলিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া ও রমাপতি দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, হইয়াছে কী?" রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন, উদয়াদিত্য তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি এখনই পিতার কাজে যাই—তাঁহাকে কোনোমতেই আমি ও কাজ করিতে দিব না। কোনোমতেই না।"

সুরমা কহিল, "তাহাতে কি কোনো ফল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদামহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু উপকার দেখে।"

যুবরাজ কহিলেন, "আচ্ছা।"

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন,

"কবরীতে ফুল শুকাল, কাননের ফুল ফুটল বনে,
দিনের আলো প্রকাশিল, মনের সাধ রহিল মনে।"

উদয়াদিত্য বলিলেন, "দাদামহাশয়, বিপদ ঘটিয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ বসন্ত রায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ! সে কী দাদা। কী হইয়াছে। কিসের বিপদ।"

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না দাদা, না, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও।"



বসন্ত রায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা প্রতাপ, এ কি কখনো সম্ভব?" প্রতাপাদিত্য এখনো শয়নকক্ষে যান নাই—তিনি তাঁহার মন্ত্রগৃহে বসিয়া আছেন। একবার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল লছমন সর্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনো দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও তো বিভা বিধবা হইত। রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কী হাত আছে। কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনই সমস্ত ঘটনাটা উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনই তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন, রাত কখন পোহাইবে? ঠিক এমন সময় বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, ইহা কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন সম্ভব নয়?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?"

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই! ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া নির্বোধ মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধের কাছে দাঁত দেখাইয়া যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করিবার জন্য আনিয়াছে—এতটা বুদ্ধি যাহার জোগাইতে পারে, তাহার ফল কী হইতে পারে, সে বুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় জোগাইল না! দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাইবে, তখন তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না।" যতই বলিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বুঝে না।"

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোহরের রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ঐ পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পাব। বাদশাহের প্রসাদগর্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবন-চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ঐ যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায়-বংশের কতবড়ো অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়-বংশের অপমানকারীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ।"

বসন্ত রায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রতাপ, আমি বুঝিযাছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি একজনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর-একজন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভালো প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্ত রায় মাথা নিচু করিয়া দিলেন)। ইহা লইয়া যদি তোমার



তৃপ্তি হয় তবে লও। ছুরি আনো। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে যৌবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্ত রায়ের মুখে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল)। কিন্তু ভাবিয়া দেখো, প্রতাপ, বিভা আমাদের দুধের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িবে তখন—" বলিতে বলিতে বসন্ত রায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমাকে শেষ করিয়া ফেলো প্রতাপ। আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেলো।"

প্রতাপাদিত্য এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্ত রায়ের কথা শেষ হইল তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ হইয়াছে। নীচে গিয়া প্রহরীদের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন খাল এখনই যেন বড়ো বড়ো শালকাঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় যখন অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত রায় আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।" রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারি হস্তে লইলেন, কহিলেন, "এসো, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো।" সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা, তুই এখানে থাক্, তুই আসিস নে।" বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন, "না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।" সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সকলে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিভীষিকা চারি দিক হইতে তাহার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দাদা, নীচে যাইবার দরজা হয়তো বন্ধ করে নাই সেইখানে চলো।" সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না, বুঝি বাসুকি-সাপের গর্তটা এইখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই-তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ।

যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোনো পথই নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে। তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়।" উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" সুরমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন, "প্রতাপাদিত্য যেরকম লোক দেখিতেছি তিনি



কী না করিতে পারেন। বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু করিতে পারিবেন, এমন ভরসা হয় না। এ বাড়ি হইতে কোনোমতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।'

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোনো ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উলটা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পলাইবার উপায় করিয়া দাও।"

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তবে আমি যাই, বলপ্রয়োগ করিয়া দেখি গে।"

সুরমা দৃঢ়ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যাও।"

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন, চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদুর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নত করিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন ও মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমা তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জোড়হস্তে কহিল, "মাগো, যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা। তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল, "কেন মা, আমি কী করিয়াছি?" তাহাব উত্তর শুনিতে পাইল না। সে সেই চারি দিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়েব মূর্তি নাচিতেছে। সুরমা চারি দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে-ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্ত রায় কাতর স্বরে কহিলেন, "দাদা এখনো ফিরিল না, কী হইবে?"

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিধাতা যাহা করেন।"

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্বনাশ করিতেছিলেন। কেননা, তাহা হইতেই এই-সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যতপ্রকার শাস্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক-একবার চৈতন্য হইতেছে যে শাস্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারি হস্তে অন্তঃপুরে অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সবলে পদাঘাত করিলেন—কহিলেন, "কে আছিস?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞা, আমি সীতাবাম।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "শীঘ্র দ্বার খেলো।"

সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে জোড়হস্তে কহিল, "যুবরাজ মাপ করুন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কাহারও বাহির হইবার হুকুম নাই।"

যুবরাজ কহিল, "সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে? আচ্ছা, তবে এসো।" বলিয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সীতারাম জোড়হস্তে কহিল, "না যুবরাজ, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না,



আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।" বলিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, "তবে কী করিতে চাও শীঘ্র করো, আর সময় নাই।"

সীতারাম কহিল, "যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না। আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।"

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেইখানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া একটা অনতিউচ্চ প্রাচীরের মতো আছে। সে প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার, সে দ্বারও রুদ্ধ। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, একজন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে সেই নিদ্রিত প্রহরীর উপর দিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও সেই হতবুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপাদমস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল, "যুবরাজ, করেন কী?"

যুবরাজ কহিলেন, "অন্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।"

প্রহরী কহিল, "কাল মহারাজের কাছে কী জবাব দিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিস, যুবরাজ বলপূর্বক আমাদিগকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।"

উদয়াদিত্য অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যে-ঘরে জামাতার লোকজন থাকে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সে-ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকি সকলে আহারাদি করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ ধীরে ধীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কী? যুবরাজ?" যুবরাজ কহিলেন, "বাহিরে এসো।" রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে স্ফীত হইয়া কহিল, "দেখিব লছমন সর্দার কতবড়ো লোক। যুবরাজ আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া একশো জন লোক ভাগাইতে পারি!"

যুবরাজ কহিলেন, "সে কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজপ্রাসাদে এক শত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে। তুমি বলপূর্বক কিছু করিতে পারিবে না। অন্য কোনো উপায় দেখিতে হইবে।"

রামমোহন কহিল, "আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি।" তখন অন্তঃপুরে গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "তোকে আমি এখনই ছাড়াইয়া দিলাম, তুই দূর হইয়া যা। তুই পুরানো লোক, তোকে আর অধিক কী শাস্তি দিব। যদি এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাই তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভালোবাসিতেন, শিশুকাল হইতে রামমোহন তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।



রামমোহন জোড়হাত করিয়া কহিল, "তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে, মহারাজ? আমার এ চাকরি ভগবান দিয়াছেন। যেদিন যমের তলব পড়িবে, সেদিন ভগবান আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।" বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, 'রামমোহন, কী উপায় করিলে?' রামমোহন কহিল, "আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।"

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ও উপায় কোনো কাজের নয়। আচ্ছা রামমোহন, তোমাদের নৌকা কোন দিকে আছে?"

রামমোহন কহিল, "রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "চলো একবার ছাদে যাই।"

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইল—সে কহিল, "হ্যাঁ, ঠিক কথা, সেইখানে চলুন।"

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ হইতে প্রায় সত্তর হাত নীচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে। রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সে সেইখানে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না না, সে কি হয়? রামমোহন, তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়ো না।"

বিভা চমকিয়া সত্রাসে উঠিল, "না মোহন, তুই ও কী বলিতেছিস।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "না রামমোহন, তাহা হইবে না।"

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলো খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। বামমোহন সেগুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মতো প্রস্তুত করিল। যেদিকে নৌকা ছিল, সেইদিককার ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরিবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।" রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল, "জয় মা কালী।" রামচন্দ্রকে পিঠে তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুজিয়া প্রাণপণ তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল, "মা, তবে আমি চলিলাম। তোমার সন্তান থাকিতে কোনো ভয় করিয়ো না।"

রামমোহন রজ্জু আঁকড়াইয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া "দুর্গা" "দুর্গা" জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই হস্তে ঝুলাইয়া অতি সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল ও নিজেও লাফাইয়া পড়িল। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মূর্ছিত হইলেন। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, কী হইল?" উদয়াদিত্য মূর্ছিত বিভাকে সস্নেহে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "এখন তোমার কী হইবে?" উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার জন্য আমি ভাবি না।"

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড়ো বড়ো শাল কাঠে খাল বদ্ধ। এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল, নৌকা পলাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল,



একটাও গিয়া পৌঁছিল না। প্রহরীদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না, একজন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল তো চকমকি জুটিল না। "ওরে বারুদ কোথায়—গুলি কোথায়" করিতে করিতে রামমোহন ও অনুচরগণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরীগণ অনুসরণ করিবার জন্য একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল পথের মধ্যে সে হরি মুদির দোকানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল ও রামশংকরকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া গেল। যখন নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁকডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-আহ্বানকারীকে সুদীর্ঘ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, "আমি তো আর ঘোড়া নই।" একে একে সকলের যখন ভর্ৎসনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে নৌকা ধরিবার আর কোনো সম্ভাবনাই নাই। নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ভর্ৎসনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌঁছিল তখন ফর্নাণ্ডিজ এক তোপের আওয়াজ করিল। প্রত্যুষে প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, "প্রহরী।" কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরীগণ সেই রাত্রেই পলাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী"। যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, "মন্ত্রী।" একজন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

"মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল?"

মন্ত্রী কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পলাইয়া গেছে।" মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের কথার স্পষ্ট পরিষ্কার দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া হয়, ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য, কহিলেন, "অন্তঃপুরের প্রহরীরা?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আসিবার সময় দেখিলাম তাহারা হাত-পা বাঁধা পড়িয়া আছে।"

মন্ত্রী রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কী হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না। অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কী ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে; সে সময়ে মহারাজকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য কোথায়? বসন্ত রায় কোথায়?"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বোধ করি তাঁহারা অন্তঃপুরেই আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বোধ তো আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কী করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রমাপতির কাছে রাত্রের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন; যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল। মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।



মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল, "এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান।" বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই দন্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না। মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন, "ইহাকে লইয়া আয়।" মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই। প্রতাপাদিত্যের বজ্র একজন-না-একজনের উপরে পড়িবেই— তা এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকি বড়ো বড়ো গাছ রক্ষা পাক।

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষত সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গি করিয়া একটা হাস্যরসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দুই হাত নাড়িয়া দারুণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, "দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও। ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?" প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইত, তবে রমাই ভাঁড় এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না। কেননা ঘৃণ্য ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপাদিত্য অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র রায়—"

মন্ত্রী কহিলেন, "হ্যাঁ, তিনি কাল রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন? প্রহরীরা গেল কোথায়?"

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।"

প্রতাপাদিত্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে। অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনই ডাকিয়া লইয়া এসো।" মন্ত্রী বাহিব হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা সে-রাত্রে আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য একজন কে— অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল— বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দ-হৃদয় বসন্ত রায় চারি দিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারি দিক দেখিতেছেন, ও ভাবিতেছেন—এ কী হইল। তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারি দিককার ব্যাপার ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক-একবার বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, "দাদা।" উদয়াদিত্য কহিতেছেন, "কী দাদামহাশয়?" তাহার উত্তরে বসন্ত রায়ের আর কথা নাই। ঐ এক "দাদা" সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে। তাঁহার বিশেষ একটা কোনো প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থ এই—এ কী? চারি দিককার অন্ধকার এমনি গোলমাল করিয়া একটা কী ভাষায় তাঁহার কানের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতরে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার জন্যই কি এ-সমস্ত হইল?" তাঁহার



বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই-সমস্ত ঘটিয়াছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মতো ভাব নহে। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "না দাদামহাশয়।" অনেকক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস না কেন?" বলিয়া বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "সুরমা, ও সুরমা!" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই দেখিতেছিল। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারি দিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্ত রায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ভার দূর হইল। তখন স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাত-পা-বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, "দেখ্ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে বাঁধিয়াছে, তুই আমার নাম করিস। প্রতাপ জানে, এককালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তার কথা বিশ্বাস করিবে।"

সীতারাম প্রতাপাদিত্যের কাছে কী জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোনোমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা-পা তিন-চোখো তালবৃক্ষাকৃতি ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্ত রায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে খালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, "ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়ো বসন্ত রায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।" সহসা ভাগবতের ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, "এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।"

বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন; ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা কথা বলিতে যদি কোনো অধর্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অনুরোধ করিব?" বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোনো যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, "না মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কী করিয়া।"

বসন্ত রায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোনো পাপ নাই। দেখো বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুশি করিব, তুমি আমার কথা রাখো। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।"

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল ও সেই টাকাগুলো মুহূর্তের মধ্যে তাহার ট্যাঁকে আশ্রয় লাভ করিল। বসন্ত রায় কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রহরীদ্বয়ের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক



কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কী করিয়া?"

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।"

মহারাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ্ঞা না, বলি মহারাজ, যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।" যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ঐ নামটা কোনোমতে করিবে না বলিয়া সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ঐ নামটাই সর্বাগ্রে তাহার উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্ত রায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতারাম কহিতেছে, "যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম, তিনি শুনিলেন না।"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ সীতারাম, কী কহিলি? অধর্ম করিস নে, সীতারাম, ভগবান তোর 'পরে সন্তুষ্ট হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞা না, যুববাজের কোনো দোষ নাই।" প্রতাপাদিত্য দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে তোর দোষ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞে না?"

"তবে কার দোষ?"

"আজ্ঞা মহারাজ—"

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় চারি দিক ভাবিয়া কোনো উপায় দেখিলেন না। তিনি চোখ বুজিয়া মনে মনে 'দুর্গা' 'দুর্গা' কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের যদি বলপূর্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসিয়াছে কী বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কশাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নাই!" এমনি ভাবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের সে অপরাধ বসন্ত রায়েরই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে সম্মুখে রাখিয়াই ভর্ৎসনা করিতেছেন। বসন্ত রায়ের অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, 'বাবা প্রতাপ, উদয়ের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া কহিলেন, "দোষ নাই? তুমি দোষ নাই বলিতেছ বলিয়াই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া মীমাংসা করিতে আসিয়াছ কেন?"

বসন্ত রায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্ত রায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের



কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে, একটা অভিপ্রায় আছে, যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে, যদি না জানিতাম যে সে-নির্বোধটাকে যে খুশি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পরে, কটাক্ষের সংকেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে তাহা হইলে তাহার আজ আর রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ঐ পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নীচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে। এইজন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো পিতৃব্যঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।''

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, ''ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম।'' আর একটি কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে-কেহ উদয়াদিত্যকে ভালোবাসে, উদয়াদিত্য যাহাদের বশীভূত তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাত করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন, ''বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোনো সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।'' বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোনো আশঙ্কা হয় নাই; হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, ''দাদা, তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।'' বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, ''কেন দাদামহাশয় ?''

বসন্ত রায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, ''ভাই, তোকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা তুই যদি সুখে থাকিস তো এ-কটা দিন আমি একরকম কাটাইয়া দিব।''

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ''না, তাহা কখনোই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই। তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি গেলে দাদামহাশয়, আমি আর বাঁচিব না।''

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, ''প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল! দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে ফিরিয়া চাহিস নে, মনে করিস বসন্ত রায় মরিয়া গেল।''

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, ''বিভা, দিদি আমার, একবার ওঠ্। বুড়ার এই মাথাটায় একবার ঐ হাত বুলাইয়া দে।'' বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদামহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন, ''সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।'' সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন, ''সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায় ?''

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, ''সে যম পারে, আর কেহ পারে না।''

সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য



অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, "আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।'

সুরমা আবার কহিল, "আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।"

সুরমা ঐ কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে-বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাহু দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে যে, কোনো পার্থিব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ঐ কথা বলিয়া মনকে সে বজ্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সুরমা, দাদামহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।"

সুরমা নিশ্বাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি নিজের কষ্টের জন্য ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে। দেখি বিধাতা আরো কী করেন। তাঁর আরো কী ইচ্ছা আছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের কত গল্প করিলেন।

বসন্ত রায় কোথায় কী কহিয়াছিলেন, কোথায় কী করিয়াছিলেন সমুদায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বসন্ত রায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে ছোটো ছোটো রত্নের মতো জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, "আহা, দাদামহাশয়ের মতো কি আর লোক আছে।"

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাহিতেছেন,

"ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই,
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,
(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা,
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল্‌ রে সোজা,
(সেথা) নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "দেখো ভাই, বিভা আমাকে ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কিসের আবশ্যক। এক কালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া সে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা বিভা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কাঁদে! এমন আর কখনো শুনিয়াছ? আমি ভাই বিভার কান্না দেখিতে পারি না।" বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

"আমার যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস নে আর মায়াডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,



নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই,
যেতে হবে ত্বরা করে।

"ঐ দেখো, ঐ দেখো বিভার রকম দেখো। দেখ্ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদিবি তো—" বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দাদা, ঐ দেখো ভাই, সুরমা কাঁদিতেছে। এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করো; নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব, তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ঐ দুই হাতে পাকা চুল তোলাইব, ঐ কানের কাছে এই ভাঙা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে ফিসফিস করিব, আর কানের অত কাছে গিয়া আর যদি কোনোপ্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না।"

বসন্ত রায় দেখিলেন, কেহ কোনো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ঝন্ঝন্ করিয়া বিষম বেগে বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বাজাইবার বড়োই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু আর কথা জোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, "এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাকো; বিভা—" কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পালকিতে উঠিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলার কুটির যশোহরের এক প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসবজির চুবড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, "আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসি গে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।" বলিয়া চুবড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেইখানে বসিল। "তা দিদি, তুমি তো সব জানই, সেই মিনসে আমাকে বড়ো ভালোবাসিত, ভালো এখনো বাসে তবে আর-একজন কার 'পরে তার মন গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি—তা সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?"

মঙ্গলার নিকট গোরু হারানো হইতে স্বামী হারানো পর্যন্ত সকলপ্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড়ো বড়ো ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যায়। যে-মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে সে আর কেহ নহে স্বয়ং মঙ্গলা।

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, 'সে মাগীর মরিবার জন্য বড়ো তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে।' মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার মতন রূপসীকে ফেলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি? তা নাতনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি ফিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ আছে, একটু বেশি করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিয়ো, তাহাতেও যদি না হয় তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইয়ো।" বলিয়া এক শুকনো শিকড় আনিয়া দিল।



মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি রাজবাটীর খবর কী?"

মাতঙ্গিনী হাত উলটাইয়া কহিল, "সে-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই?"

মঙ্গলা কহিল, "ঠিক কথা। ঠিক কথা।"

মঙ্গলার যে এ-বিষয়ে সহসা মতের একটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, "তা তোমাকে বলিতে দোষ নাই, তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই, আর-একদিন সমস্ত বলিব।" বলিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলা কহিল, "তা বেশ, আর-একদিন শুনা যাইবে।"

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল, "তবে আমি যাই ভাই। দেরি করিলাম বলিয়া আবার কত বকুনি খাইতে হইবে। দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

মঙ্গলা কহিল, "সত্যি নাকি? বটে। কেন বলো দেখি? তাই বলি, মাতঙ্গ না হইলে আমাকে ভিতবকার খবর কেহ দিতে পারে না।"

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "আসল কথা কী জান? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষে কাহারও ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কি মন্তর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি—না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।"

মঙ্গলা আর কৌতূহল সামলাইতে পারিল না; যদিও সে জানিত, আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব সহিল না, কহিল, "এখানে কোনো লোক নাই নাতনী। আর আপনা-আপনির মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কী? তা তোমাদের বউ-ঠাকরুন কী করিলেন?"

"তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি-ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনাস্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউ-ঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান। ঐ দেখো ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি। ইহাতে হাসিবার কী পাইলে? তোমার যে আর হাসি ধরে না।"

রামচন্দ্র রায়ের পলায়নবার্তার যথার্থ কারণ রাজবাটীর প্রত্যেক দাসদাসী সঠিক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, "তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিয়ো যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলিয়া সে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ কথা।"

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ-ঠাকরুনকে কি যুবরাজ বড়ো ভালোবাসেন?"

"সে কথায কাজ কী। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে 'তু' বলিয়া ডাকিলেই আসেন।"

"আচ্ছা আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাঁহার কাছেই থাকেন?"

"হাঁ।"

মঙ্গলা কহিল, "ও মা কী হইবে। তা সে যুবরাজকে কী বলে, কী করে, দেখিয়াছিস?"

"না ভাই, তাহা দেখি নাই।"



"আমাকে একবার রাজবাটীতে লইয়া যাইতে পারিস, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি।"

মাতঙ্গ কহিল, "কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

মঙ্গলা কহিল, "বলি তা নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কী মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না।"

মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ, আজ তবে আসি।" বলিয়া চুবড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পালকি চলিয়া গেল। বসন্ত রায় পালকির মধ্য হইতে মাথাটি বাহির কবিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পবিবর্তনহীন অবিচলিত পাষাণহৃদয় রাজবাটীব দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলা ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পাইলেন। পালকি চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। তারাগুলি উঠিল, দীপগুলি জ্বলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরমা তাহাকে সারা দেশ খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া স্নেহের স্বরে কহিল, "কী দেখিতেছিস বিভা?" বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কে জানে ভাই।" বিভা সমস্তই শূন্যময় দেখিতেছে, তাহার প্রাণে সুখ নাই। সে কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন শুইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ কিছু খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন, রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘব নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা সুখদুঃখ হাসিকান্নায় মিলিয়া রাজবাটীর মধ্যে তাহার জন্য যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি একদিনে কে ভাঙিয়া দিল রে। এ ঘর তো আর তাহার ঘর নয়। সে এখন গৃহের মধ্যেই গৃহহীন। তাহার দাদামহাশয় ছিল, গেল; তাহার—চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে? হয়তো রামমোহন মাল রওনা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহারা না জানি কোথায়। বিভার সুখের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুবমা আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যেন একটা কী বিপদ ছায়ার মতো পশ্চাতে ফিরিতেছে। যে-বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্যভাবে ধূমায়িত হইতেছে সে বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয়?

উদয়াদিত্য শুনিলেন, কর্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পয়সার সম্বল নাই, তাহার উপর তাহার অনেকগুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা সহসা স্নেহের আধিক্যবশত কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কি না, সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। সীতারামের এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজকর্মে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোটো



কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়। এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্য কোনোমতে সে-কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে ঋণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিতা বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই। তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেয়টির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার থলি ব্যতীত আব কাহারও উদর কমিবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না। সীতারামের অন্যান্য গলগ্রহের সঙ্গে শখটিও বজায় আছে, সেটি ধারের উপর বর্ধিত হইতেছে, সুদও যে-পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র্যদশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময় সম্বোধন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। সে শতরঞ্জ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্গনরকের জমি বিলি করিয়া দেয়। সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বাঁকাইয়া নানা ভাবভঙ্গিতে জানাইল যে যুবরাজ তাহার যে সর্বনাশ করিয়াছেন এ টাকাতে তাহার কী প্রতিশোধ হইবে। টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্মচ্যুত প্রহরীদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, এ কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে, উদয়াদিত্য সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার কানে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অল্পে অল্পে তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়াছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এইবার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কানে গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন ও কহিলেন, "আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছ?"

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার-অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।"

ইতিপূর্বে কখনোই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে হয় নাই। উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থসাহায্য না করা হয়।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।" হাত জোড় করিয়া



কহিলেন, "কিন্তু এমন কী অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এতবড়ো শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে? আমি কী করিয়া দেখিব, আমার জন্য আট-নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট-নয়টি হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।"

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পর আস্তে আস্তে কহিলেন, "তোমার যা বক্তব্য তাহা শুনিলাম, এক্ষণে আমার যা বক্তব্য তাহা বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।" প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই 'আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন। দেখি, তিনি দয়া করিয়া কী করিতে পারেন। আমি যেখানে নিষ্ঠুর সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এতবড়ো আস্পর্ধা কাহার প্রাণে সয়!'

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। সুরমা কহিল, "সেদিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের মা সীতারামের ছোটো মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহারা সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকানো যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায়?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিশেষত রাজবাটী হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অন্য কেহ তাহাদের কর্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ-সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্য ভাবিয়ো না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভালো হয় না, যাহাতে এ-কাজটা গোপনে সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব। আমার উপরে ভার দাও।" সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে-কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সেগুলি এমন কাজ যে, সুরমার মতো স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে-কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতি পদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতি পদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়া সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশ্বস্তা বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে এ কথা গোপন রাখিবার সে কোনো আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠানোর কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল, তখন তিনি কথা না কহিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, সুরমার পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া কহিল, "তুমি যদি যাও, তবে এ শ্মশানপুরীতে আমি কী করিব?" সুরমা বিভার চিবুক ধরিয়া, বিভার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্বস্ব এখানে রহিয়াছে।" সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, "আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। সেখান হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।" শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোনো উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অন্তঃপুরে শারীরিক বল খাটে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড়ো বড়ো কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন কিন্তু তাঁহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচন করিতে পারেন না। এই মেয়েগুলো তাঁহার মনে নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও জানিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনই কোনো গোল বাধে, তিনি তাড়াতাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ। এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।" মহিষী কহিলেন, "তাহা হইলে বাবা উদয়ের কী হইবে।" প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "উদয় তো আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্যের অনুরোধে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।"

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।" উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করিয়াছে?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্যে যে কী সুযোগ হইবে, তা মহারাজই জানেন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্যের কী উন্নতি হইল? যতদূর কষ্ট সহিবার তাহা তো সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে? সুরমা যে বড়ো সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভর্ৎসনা সহিয়াছে, 'দূর ছাই' সে অঙ্গ-আভবণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার জন্য একটুকু স্থানও কুলাইল না। তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোনো সম্পর্ক নাই মা? সে কি ভিখারি অতিথি যে, যখন খুশি রাখিবে, যখন খুশি তাড়াইবে? তাহা হইলে মা, আমার জন্যও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দাও।"

মহিষী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, "কী জানি বাবা। মহারাজা কখন কী যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা! ও দিনকতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কিনা।"

উদয়াদিত্য এ কথার আর কোনো উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মহিষী কাঁদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, কহিলেন, "মহারাজ, রক্ষা করো! সুরমাকে



পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোনো দোষ নাই, ঐ সুরমা ঐ ডাইনীটা তাহাকে কী মন্ত্র করিয়াছে।'' বলিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, ''সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।''

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, ''পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে। আসিয়া অবধি তুই তাহার কী সর্বনাশ না করিলি? অবশেষে—সে রাজার ছেলে, তার হাতে বেড়ি না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?''

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ''আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ি পড়িবে? সে কী কথা মা। আমি এখনই চলিলাম।''

সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, ''বিভা এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।'' বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রান্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, ''আর হইবে না।'' আর আসিতে পাইব না, আর হইবে না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল—যে ভবিষ্যতে সে সুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখদুঃখের বিনিময় নাই, বুক ফাটিয়া গেলেও এক মুহূর্তের জন্যও একবিন্দু প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ। সুরমার বুক ফাটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদয়াদিত্য আসিবা মাত্র সুরমা তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া বুকে চাপিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখনো কাঁদে নাই, তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কী হইয়াছে সুরমা?'' সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে! বলিল, ''ঐ মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দিবে, তুমি ঐ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়?'' সুবমা যে বলিল ''কোথায়'', তাহাতে কতখানি নিরাশা, তাহাতে কত দূর—দূরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব! যখন কেবলমাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরো কতদূর! যখন বার্তা লইতে বিলম্ব হয় তখন আরো কতদূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও এক মুহূর্তের জন্যও দেখা হইবে না, তখন—তখন ঐ পা দুখানি এমনি করিয়া বুকে চাপিয়া এই মুহূর্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে রায়গড় পরিত্যাগ করিয়া নাম-পরিবর্তন-পূর্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিনীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ। হাসিকান্না তাহার হাত-ধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে তখন সে অতি প্রচণ্ডা, মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক



কথা কয় না; চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, থর্‌থর্ করিয়া কাঁপে। গলিত লৌহের মতো তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগ্‌বগ্ করিতে থাকে। তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে। এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্যরূপে বুঝিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর-রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্য সে কী না করিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটীর সমস্ত দাসদাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতে পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কানে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশে সে নানা অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনো তো কিছুই সফল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয়তো শুনিতে পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্রতন্ত্র চুলায় যাক, একবার হাতের কাছে পাই তো মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে, অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন, মঙ্গলা-নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে তখন তিনি ভাবিলেন, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভালো। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নির্জন নগরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির-মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার একমাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চোখে আর ঘুম রহিল না।

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচদিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচদিন লাগিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু সুরমা মরিবার সময় যাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশে মন্ত্র পড়িতে ও অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরো কিছুদিন রাজবাটীতে থাকিতে দিলেন। সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারি দিকে অকূল পাথার দেখিতেছে। এ কয়দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মতো সে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক-একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। বিভার চারি দিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম



নাই, সংসারের দিগ্‌বিদিক সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাহার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে, "বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম।" বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রত্যুষে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা-কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, "বিভা, বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্, আর বিলম্ব নাই!"

উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা বলিয়া উঠিল, "এসো, এসো, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল। উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে; তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে। উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, "সুরমা।" সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কী নাথ।" উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কী হইয়াছে সুরমা?" সুরমা কহিল, "বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।" বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত উঠাইতে চাহিল, হাত উঠিল না। কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, সুরমা তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল?" সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল। বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সে বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারি দিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া গেল। রাজবাটীতে পূজার শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছি না।"

ক্রমে রাজবাটীতে রাষ্ট্র হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সুরমা মা আমার, তুই এইখানেই থাক্, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে?" সুরমা শাশুড়ির পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "মা, তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে?" তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না! রাত্রি যখন চারিদণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন, "শেষ হইয়া গেছে।" "দাদা, কী হইল গো" বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ঐ দিকে কোথায় আছে! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি



হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ—ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল—সে-ই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারি দিকে দেখিতেন, দেখিতেন—কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন—আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে—মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে।

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মতো কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারি দিক দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন—কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন, আজকাল আর সে-সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন। শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব—সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস? আমাব কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে—সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে লইতে এ পর্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোনো আদর থাকিত, তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত। আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না।"

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবা অবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে একটা কী ছেলেমানুষী করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এতদূর পর্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগে নাই। তিনি মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও।" মহারাজ রাগ



করিলেন, কহিলেন, "ঐ এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিয়ো না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে।" মহিষী কহিলেন, "মেয়ে অধিক দিন শ্বশুরবাড়ি না গেলে দশজনে কী বলিবে?" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আর প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশজনে কী বলিবে?"

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজ এক-এক সময় কী যে করেন তাহার কোনো ঠিকানা থাকে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুইজন অনভিজ্ঞ তাঁতি তাহাদের কুটিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহা লইয়া হুলুস্থুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা কী কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারা এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শ্বশুরবাড়ির ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না। তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষত সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কী একটা কথা বলিতেছিলেন—অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কী হইতে পারে। একদিন কয়েকজন বালক মাটির ঢিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল। রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীরু দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোনো সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিতে পায় ও তাহা লইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের একজন সে কথাটা রাজার কানে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, "বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!"

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, "দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই।"

মন্ত্রী কহিতেছেন, "বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আমাদের মহারাজের তুলনা।"

দেওয়ান কহিতেছেন, "বেটা জানিস না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তাহাকে রাজটিকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া তাহাকে টিকা পরাইয়া দেন।"

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, "বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহারা তো দুই পুরুষে রাজা। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাত-সাপ চিনি না?" রাজা রামচন্দ্র রায় বিষম সন্তুষ্ট



হইয়া সহাস্যবদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বচনবাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের তূণ নিঃশর হইলে সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক, আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটি করাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন, ''আচ্ছা যা, এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।''

অন্যান্য সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, ''আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বি কত!''

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, ''বটে!''

মন্ত্রী কহিলেন, ''মহারাজ, শুনিতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হইতেছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।''

রাজা কলিলেন,, ''সত্য নাকি!'' বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়োই আনন্দ বোধ হইল।

মন্ত্রী কহিল, ''আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনো তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর!''

রমাই কহিল, ''তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়াছেন, সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না তো কী!''

এইরূপে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কী অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে-সকল কথা চুলায় গেল, আর তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি একজন লঘুহৃদয় সংকীর্ণপ্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা তো হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না তো কী! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিবারাত্রি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় এক দিকে জগৎকে ও আর-এক দিকে নিজেকে চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহারও উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় না হইবার আর-এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্যপরিহাসের ত্রুটি করিতেন না। কারণ



যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাশা করিতেছে, বিশেষত রমাই ভাঁড় যাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে।

এখনো বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মতো একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্পদিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন—কিন্তু যখন সেই রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুম্বন করিবার জন্য হৃদয়ে একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিশ্বাস বেগে বহিল, অর্ধনিমীলিত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন। এমন সময় দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাস , সেই যে নয়নের মোহদৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহারা তৃষাকাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল। ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা বিলাসদ্রব্যের প্রতি শৌখিন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, শৌখিন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে-কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের যৌবনস্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা অভিলাষ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পাঠান, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে। সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে। তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কী শাস্তি হইল? শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কই? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন-কি, বিভাকে লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে থাকে, তাহাতে বাধা দিতেও তাঁহার সাহস হয় না এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া জোড়হাতে কহিল, "মহারাজ।"

রাজা কহিলেন, "কী রামমোহন।"

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।

রাজা কহিলেন, "সে কী কথা!"

রামমোহন কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না। অন্তঃপুরে যাই, মহারাজের ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।"



রাজা কহিলেন, "রামমোহন, তুমি পাগল হইয়াছ? সে-মেয়েকে আমি ঘরে আনি?"

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কেন মহারাজ, আমার মা-ঠাকুরানী কী অপবাধ করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "বল কী রামমোহন! প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?"

রামমোহন কহিল, "কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার—আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন, আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?"

রাজা কহিলেন, "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কী করিয়া?"

রামমোহন কহিল, "মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোক যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?"

রাজা কহিলেন, "যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?"

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, "কী বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড়ো সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কাহার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যতবড়ো প্রতাপাদিত্য হউন-না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলাম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?" বলিয়া বামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু—দেখো, এ কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রীর কানে যেন এ কথা না উঠে।"

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ।" বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে। আপাতত উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সম্মুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে—কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা যোগায় না। দুইজনে স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, "দাদা, সে কোথায় গেল?" উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন



বিভা কী বলিল ভালো বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, "আয় বিভা, একটা গল্প বলি শোন্।"

বর্ষার দিন খুব মেঘ করিয়াছে, সমস্ত দিন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই—সে নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হুহু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, "সুরমা কোথায়!" বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে, "দাদা!" দাদা আব উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপর মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, "দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাও' সে।" উদয়াদিত্য কোনো উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, "দাদা, উঠ, রাত হইল।" উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন, বিভা কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভালো করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না। উদয়াদিত্যকে কী করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদামহাশয় থাকিতেন!

আজকাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্বেকার সাহস নাই। বিপদকে তৃণজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন ছাপরার জমিদারের কাছারিতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল পাঠাইয়া কাছারি লুট করিবার ও কাছারিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া একবার চারি দিক দেখিলেন। কী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া কহিল, "যুবরাজ, অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে?" যুবরাজ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, "কোথাও না। তুমি অশ্ব লইয়া যাও।"

একদিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন রাজকর্মচারী এক প্রজাকে গাছে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দোহাই যুবরাজ।" যুবরাজ তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে। তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনই তাহাদের কষ্টের কথা শুনেন, তখনই

মনে করেন, 'আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দিব।' তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠানো আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কী একটা মনে করেন। যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনো যদি প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনো তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। রূপ এবং রুপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম শৌখিন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সার সংস্থান নাই, এইজন্য রুক্মিণীর রূপ ও রুপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যেদিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সেদিন সীতারামকে দেখো, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাতলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলাব বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?" সীতারাম তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলে, "বেশ চলিতেছে। কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।" সীতারামের বড়ো বড়ো কথাগুলা কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থা বড়ো মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনরারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া কাছে ঘেঁষিয়া কহিল—

"ভিক্ষা যদি দিবে বাই,
আমার সোনা- রুপায় কাজ নাই,
আমি প্রাণের দায়ে এসেছি হে,
মানরতন ভিক্ষা চাই।

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মানরতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে, আপাতত কিঞ্চিৎ সোনা-রুপা পাইলে কাজে লাগে।"

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা, তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তো তোমাকে দিব না তো কাহাকে দিব?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "নাঃ—আবশ্যক এমনই কী। তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা জোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব।"

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কী? যখন



সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ তো আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না।'' জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনাটুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলার এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালোবাসা একেবারে উথলিয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবি করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে ও আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত আর সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রকিসতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিলের সহিত হাস্যরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সীতরামের অনুরাগ সহসা উথলিয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘেঁষিয়া প্রীতিভরে কহিল, ''তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ!''

রুক্মিণী কহিল, ''মর্ মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন!''

সীতারাম কহিল, ''তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।''

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, ''না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।''

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে ইহার উপরে আর কথা কহিবার জো নাই।

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, ''দূর মূর্খ।''

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, ''মূর্খই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ।'' সীতারাম মনে মনে ভাবিল খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা জোগাইয়াছে।

আবার কহিল, ''আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কী বলিয়া ডাকিলে তুমি খুশি হইবে, আমাকে বলো।''

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, ''বলো প্রাণ।''

সীতারাম কহিল, ''প্রাণ।''

রুক্মিণী কহিল, ''বলো প্রিয়ে।''

সীতারাম কহিল, ''প্রিয়ে।''

রুক্মিণী কহিল, ''বলো প্রিয়তমে।''

সীতারাম কহিল, ''প্রিয়তমে।''

রুক্মিণী কহিল, ''বলো প্রাণপ্রিয়ে।''



সীতারাম কহিল, "প্রাণপ্রিয়ে, আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার সুদ কত লইবে?"

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "যাও যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?"

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি প্রিয়তমে।"

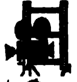
সীতারামের মায়ের কী রোগ হইল জানি না, আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাইবাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজকাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কী একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল,"আমার ভাই অত ফন্দি আসে না, এ বিষয়ে ভাগবতেব সাহায্য না লইলে চলিবে না।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুম্‌দাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোটো একটি মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়া ছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া "কাকা" "কাকা" বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধবিয়া তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে। ইহাকে যে সে বড়ো ভালোবাসিত। এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে। মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা, কাকীমা কোথায়?"

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "একবার তাঁহাকে ডাক্-না।" মেয়েটি "কাকীমা" "কাকীমা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ঐ যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ঐ যেন কে বলিয়া উঠিল, "এই যাই রে।" যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিযা অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ঐ-না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়্‌দুড়্ করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব। দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "সুরমা কি?" পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, "কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না।"

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিল। উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া



উঠিয়া "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কী করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলি, এখন তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?" উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, "আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে সে আজ ভিখারিনীর মতো পথে পথে বেড়াইতেছে। এ পোড়া কপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?"

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কী করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আবর্তের মতো তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল—সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন। রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণহৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন, "তোমার কী চাই?"

রুক্মিণী কহিল, "আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই। আমি ঐ বাতায়নে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে তো সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে তো কালো ছিল না।"

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বিছানায় বসিয়ো না, বসিয়ো না।"

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মতো মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন বসিব না?"

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন, "না, ও বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কী চাও আমি এখনই দিতেছি।"

রুক্মিণী কহিল, "আচ্ছা তোমার আঙুলের ঐ আংটিটি দাও।"

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মন্ত্রমোহ এখনো দূর হয় নাই, আরো কিছুদিন যাক, তাহার পর আমার মন্ত্র খাটিবে। রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "কোথায়, সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দগ্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগবতের অবস্থা বড়ো ভালো নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড়ো ধর্মনিষ্ঠ। সে কাহারও সঙ্গে মেশে না এই যা তাহার দোষ,



হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মতো পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখনো ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখনো ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়, সংসারে যাহাকে ভালো বলে ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে, দুরবস্থায় ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটিবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

একদিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ হে?"

ভাগবত কহিল, "ভালো না।"

সীতারাম কহিল, "কেন বলো দেখি?"

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুঁকা দিয়া কহিল, "বড়ো টানাটানি পড়িয়াছে।"

সীতারাম কহিল, "বটে? তা কেমন করিয়া হইল?"

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি। আমি তো জানিতাম আমারও যে দশা তোমারও সে দশা।"

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার কর না কেন?"

ভাগবত কহিল, "ধার করিলে তো শুধিতে হইবে। শুধিব কী দিয়া? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিস বড়ো অধিক নাই।"

সীতারাম সগর্বে কহিল, "তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।"

ভাগবত কহিল, "বটে? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তাহা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেলো। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই!"

সীতারাম কহিল, "সেজন্যে দাদা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্য প্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর-এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল, "দাদা, রাজার অন্যায় বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।"

ভাগবত কহিল, "কই, তোমার ভাবে তো তাহা বোধ হইল না।" সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড়ো সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, "না ভাই, কথার কথা বলিতেছি। আজ না যায় তো দশ দিন পরে তো যাইবে।"

ভাগবত কহিল, "তা, রাজা যদি অন্যায় বিচার করেন তো আমরা কী করিতে পারি।"

সীতারাম কহিল, "আহা, যুবরাজ যখন রাজা হইবে তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি!"

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, "ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই? তুমি বড়োমানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা-উজির মার, সে শোভা পায়। আমি গরিব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।"



সীতারাম কহিল, "রাগ কর কেন দাদা? কথাটা মন দিয়া শোনোই-না কেন?" বলিয়া চুপি চুপি কী বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখো সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"

সীতারাম সেদিন তো চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কী একটা ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল, "কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।"

সীতারাম গর্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "কেমন দাদা, বলি নাই!"

ভাগবত কহিল, "আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সীতারাম আরো গর্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের সীলমোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুক্মিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত সীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমত কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লির দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, "উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনো সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।" ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কী অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্বার রাজবাড়িতে চাকরি হইল!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতিমুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই। বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া, বিভা কাঁদিয়া, বিভা আকুল হইয়া কহিল, "আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি?" কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কী অপরাধ করিয়াছি?" দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার করিয়া কহিল, "আমি কী করিয়াছি? একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারও মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব? বুক ফাটিয়া ছট্ ফট্ করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।" এমন কত



দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়।

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া "মা গো জয় হোক" বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনই চমকিয়া উঠিল যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, "মোহন, তুই এলি!"

"হাঁ মা, দেখিলাম মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি।"

বিভা কত কী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না—বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না, অথচ শুনিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া রহিল।

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন মা, তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এসো মা, আমাদের ঘরে এসো। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই।"

বিভা ম্লান হাসি হাসিল, কিছু কহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না। বহুদিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, 'এতদিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল?'

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, "এ কী অলক্ষণ! মা লক্ষ্মী তুমি, হাসিমুখে আমাদের ঘরে এসো। আজ শুভদিনে চোখের জল মোছো।"

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাইবাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল। কাল যাত্রার দিন ভালো, কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এ বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কী একটা ভাবিতেছিলেন।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "বিভা, তবে তুই চলিলি! তা ভালোই হইল। তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্বাদ করি লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক।"

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন, "কেন কাঁদিতেছিস? এখানে তোর কী সুখ ছিল বিভা, চারি দিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি—তুই বাঁচিলি।"

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, "যাইতেছিস? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস নে। এক-একবার মনে করিস, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই।"

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল, "এখন আমি যাইতে পারিব না।"

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কী কথা মা!"

বিভা কহিল, "না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট, এত দুঃখ, আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে



ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব? যতদিন তাঁহার মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকিবে ততদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মতো তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?" বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন। বিভা কেবল কহিল, "না মা, আমি পারিব না।"

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন মেয়েও তো কোথাও দেখি নাই।" তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "তা বেশ তো, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় তো কেন যাইবে?"

মহিষী অবাক হইয়া, হাত উলটাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করো, আমি আর কোনো কথায় থাকিব না।"

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভালো বুঝিল না।

হতাশ্বাস রামমোহন আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কী বলিব।"

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, "তবে বিদায় হই মা।" বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল, "মোহন।"

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কী মা?"

বিভা কহিল, "মহারাজকে বলিয়ো, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট।"

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল, "যে আজ্ঞা।"

বামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একে তো বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না। তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। ম্লান শীর্ণ একখানি ছায়ার মতো সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া আদর করিয়া কোনো কথা কহিলে চোখ নিচু করিয়া একটুখানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে; যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়; যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে "বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস কেন" বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়। প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন, পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, যুবরাজ যে এ কাজ করিয়াছেন, ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না। যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, ও কথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ এ কাজ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমারও তো বড়ো একটা বিশ্বাস



হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কী? সেখানে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে, তাহার জন্য পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী জোড়হস্তে অপরাধীর মতো রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দু-চারিটা খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শ্বশুরের উপর শোধ তুলিবেন। কী কী কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গোঁয়ার নহেন, বিভাকে যে কোনপ্রকারে পীড়ন করিবেন ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন-কি, এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল রামমোহন?"

রামমোহন কহিল, "সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আনিতে পারিলি না?"

রামমোহন। আজ্ঞা, না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম।

বাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর আজ—"

বামমোহন কপালে হাত দিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

বামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম কবিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে আব কখনো হয নাই।"

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে কহিল, "ও কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে তাহা তো বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা তো সে নয়।"

রাজা কহিলেন, "তবে হইল না কেন?"

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, শীঘ্র বল্।"

রামমোহন জোড়হাতে কহিল, "মহারাজ—"

রাজা কহিলেন, "কী বল্।"

রামমোহন। মহারাজ, মা-ঠাকরুন আসিতে চাহিলেন না।

বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সন্তানের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ—'মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম, আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।' কী জানি কী মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।



রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে।" অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

"আসিতে চাহিলেন না! বটে! বেটা, তুই বেরো, বেরো, আমার সম্মুখ হইতে এখনই বেরো।"

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কী করিয়া যে ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না লইলে আর মুখ রক্ষা হয় না। এমন-কি, প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল, "আমাদের মহারাজার অপমান!" অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে। একে তো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কী মনে করিবে, ভৃত্যেরা কী মনে করিবে, রমাই ভাঁড় কী মনে করিবে? তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই কথা লইয়া রমাই আর—একজন ব্যক্তির কাছে হাসি-টিটকারি করিতেছে তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

একদিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, "মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।"

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ রমাই।" রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্নাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মতো লোকেরা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সম্ভ্রম কাহাকে বলে ও কী কবিয়া সম্ভ্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, "মন্ত্রী মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।" বলিয়া রমাই চোখ টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল। যাহারা দূরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, "বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়িঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন।"

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল। ফর্নাণ্ডিজ অলক্ষিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ— যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না।"

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন,



সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক হইয়া চাহিল, এমন-কি, একজন অমাত্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কী কথা দেওয়ানজি মহাশয়। রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে?" দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত কারাগার নহে; তাহা প্রাসাদসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটীর ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ ও তাহার পূর্ব দিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্য দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই-একজন পথিক চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ কবিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্ব দিক হইতে কারাগারের হৃৎস্পন্দন-ধ্বনির মতো প্রহবীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক-এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক-একটা হাঁক শোনা যাইতেছে। আকাশে একটিমাত্র তারা নাই। যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন তাহা জোনাকিতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন, না, জানালার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে বোধ করি অনেক লোক। চারি দিকে দাসদাসী, চারি দিকেই পিসি মাসি। কথায় কথায় কী হইয়াছে, কী বৃত্তান্ত, জিজ্ঞাসা করে; প্রতি অশ্রুবিন্দুর হিসাব দিতে হয়; প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই, ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন যে দিনের অবসান হইল ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা ঝাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীরু, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল যতই আঁধার বাড়িতেছে ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে, যেন সুখ হতে শান্তি হইতে জগৎ-সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারি দিকে কিছুই নাই। আশ্রয় উপকূল জগৎ-সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার



সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপারে কত কী পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে; সেখানকার সূর্যালোক, খেলাধুলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুরভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘনঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিস্পন্দ, নেত্র নির্নিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকার গাছপালাগুলা হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, "কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায়।" বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য দিগ্‌দিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারি দিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল—হু হু।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন-কি, স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সংবরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখিরা গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পান্থেরা গান গাহিয়া উঠিল, দুই-একটি রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ কী বিভা, এত সকালে যে?" ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ কী, আমি কোথায়?" মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আঃ! বিভা, তুই আসিয়াছিস? কাল তোকে সমস্তদিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।"

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারও তুমি খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?" বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই না বিভা।



জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ঐ পাখিদের মতো ঐ অনন্ত আকাশে প্রাণের সাথে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারি দিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে—মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে একদিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে আমি স্বভাবতই স্বাধীন; কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ঐখানে ঐ ঘরের মধ্যে ঐ কোমল শয্যা, ঐখানেই আমার কারাগার।''

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদয় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল! সেদিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে কারাপ্রবেশের পূর্বে বোধ করি এত কথা কখনো বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানি না, এক প্রাণ হইতে আর-এক প্রাণে কী করিয়া বার্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর-এক প্রাণে কী নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পুরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল। বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এতদিন সে চারি দিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিত, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণকিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া দিয়া তখনই বিভার বিমল মূর্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একটি টিয়াপাখি আনিয়া ঘরে টাঙাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একখানি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতরে একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। তিনি তো ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ অতৃপ্ত-আশা সুকুমার বিভাকে আশ্রয়স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে পর্যন্ত ডুবাইতেছেন? প্রতিদিন মনে করেন বিভাকে বলিবেন, ''তুই যা বিভা।'' কিন্তু বিভা যখন উষার বাতাস লইয়া উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখেব দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোনোমতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, ''বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস না, তোকে আর দেখিব না।'' প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, ''বিভা, তুই আর এখানে থাকিস নে। তুই না



গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারি দিক হইতে দেশে বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই শ্বশুরবাড়ি যা। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব।''

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, 'আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কী করিয়া মুক্ত হইতে পারিব।'

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্মগৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখনো বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন? আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠানো না হয়। এরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া পাঁচজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ঐ মর্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড়ো সাধারণ সাহসের কর্ম নহে। রামচন্দ্র রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্বতে বেগে নামিতে নামিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, ''এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।'' রামমোহন জোড়হস্তে কহিল, ''আজ্ঞা না মহারাজ. আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরানীকে আনিতে যাইতে বলেন তো আর-একবার যাইতে পারি, নতুবা এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।'' রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে. কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড়ো ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কী করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। এক দিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর-এক দিকে উদয়াদিত্যের জন্য তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলেমালে তিনি যেন একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্নায় মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন—কী যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না, তাহা হইলে সুকুমার বিভা আর বাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কী যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও নিকট কোনো পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না, চারি দিক অকূল পাথার দেখিয়া কাঁদিতে



কাঁদিতে প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন, "মহারাজ, বিভার তো যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "কেন বলো দেখি?"

মহিষী কহিলেন, "নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে, তবে বিভাকে তো এক সময়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।"

প্রতাপাদিত্য। সে তো বুঝিলাম, তবে এতদিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন, "ঐ তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়—"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হইবে আর কী?"

মহিষী। এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।

বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্তি দেখিয়া মহিষী চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ কবিলাম, তাহাকে আ'র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়ো না, তাহা নহে—তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "মহারাজ, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখো, একবার ভাবিয়া দেখো বিভার কি হইবে। আমার পাষাণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যত দূর যন্ত্রণা দিবার তা দিয়াছ। উদয়কে—আমার বাছাকে—রাজার ছেলেকে সামান্য অপরাধীর মতো রুদ্ধ করিয়াছ। সে আমার কাহাবও কোনো অপকার করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে-সোঝে না, রাজকার্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন তাহার দোষ কী।"

বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ও কথা তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে কথা হইতেছিল তাহাই বলো-না।"

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আমারই পোড়া কপাল। বলিব আব কী! বলিলে কি তুমি কিছু শোন! একবার বিভার মুখপানে চাও মহারাজ। সে যে কাহাকেও কিছু বলে না— সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মতো হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না। তাহার একটা উপায় করো।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত-পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই তো সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল। তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর-কি। কহিল, "সর্বনাশী,



তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম। আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ঐ কালামুখ লইয়া এই শানের উপরে ঘষিব, তোর চুনকালি মাখাইয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব।"

রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া গেল। ক্রমে তাহার স্থূল অধরৌষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন ভ্রূ তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্বাঙ্গস্ফীত কম্পমান হিংসা সীতাবামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরৌষ্ঠ পৃথক হইল, কুঞ্চিত ভ্রূ প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বটে! যুবরাজ তোমারই বটে! যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড়ো লাগিয়াছে—যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়। পোড়ারমুখো, এটা জানিস না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্ত রায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্ত রায়ের হাতে তাঁহার চিরসহচর সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন—

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।
আমার ব'লে ছিল যারা
আর তো তারা দেয় না সাড়া—
কোথায় তারা? কোথায় তারা? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখলি নে রে?
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কী ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতেছিল। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, 'গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনই আনন্দ জন্মিত তখনই যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত তাহারা কোথায়? যেদিন প্রভাতে রায়গড়ে ঐ তালগাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরো যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক-একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে, কিন্তু হায়—'



এই-সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিতেছে—আমিই শুধু রইনু, বাকি।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, এসো এসো।" অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভালো আছে তো?"

খাঁ সাহেব। মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে সুখ নাই। একটি বয়েত আছে—রাত্রি বলে আমি কেহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে ম্লান হইয়া যাই! মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।

বসন্ত রায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা সাহেব? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব?"

খাঁ সাহেব। মহারাজা এখন আপনার আর তেমন গান বাদ্য শুনা যায় না।

বসন্ত রায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার গান শুনিবে সাহেব?—

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে,
রইল যা তা কেবল ফাঁকি।"

খাঁ সাহেব। আপনি আর সে সেতার বাজান কই? আপনার সে সেতার কোথায়?

বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে সেতার যে নাই, তাহা নয়, সেতার আছে, শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।"

বলিয়া আম্রবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, একটা গান গাও-না—একটা গান গাও; গাও, তাজবে তাজ নওবে নও।

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন—

তাজবে তাজ নওবে নও।

দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন—তাজবে তাজ নওবে নও। ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন এবং বার বার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্ত রায় একেবারে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাব কাছে আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "আরে সীতরাম যে! ভালো আছিস তো? দাদা কেমন আছে? দিদি কোথায়? খবর ভালো তো?"

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল, "একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।" বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটিয়াছিল, সে কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্ত রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি সীতরামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন।



তাঁহার ভ্রূ উর্ধ্বে উঠিল, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাঁহার অধরৌষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল—নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্ত রায় কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। মহারাজ!

বসন্ত রায়। তাহা হইলে দাদা এখন কোথায়?

সীতারাম। আজ্ঞা, তিনি কারাগারে।

বসন্ত রায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভালো করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, "সীতারাম।"

সীতারাম। আজ্ঞা মহারাজ!

বসন্ত রায়। তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে?

সীতারাম। কী আর করিবেন। তিনি কারাগারেই আছেন।

বসন্ত রায়। তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

বসন্ত রায়। তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

বসন্ত রায়। সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে?

বসন্ত রায় এ কথাগুলি বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই—আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই—সে উত্তর করিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "দাদা, তুই আমার কাছে আয় রে, তোকে কেহ চিনিল না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় তাহার পরদিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটীর অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদামহাশয়কে দেখিয়া যেন কী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কী যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ—খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধুলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্ত রায় একবার নিতান্ত একাগ্রদৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" আর কিছু বলিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" যেন তাঁহার মনে একটি অতি ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে, পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয় ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" তাই তিনি অতি একাগ্রদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না; তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদামহাশয় আসিতেন, সেই-সব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে। সে এক কী উৎসবের দিনই গিয়াছে। তিনি আসিলে কী একটা আনন্দই পড়িত। সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাশা করিতে



পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দমূর্তিতে দাদামহাশয়ের গান শুনিতেন। আজ দাদামহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা—সুখের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মতো একলা দাদামহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদামহাশয় আসিলে যে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিত— সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন? সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়—দাদমহাশয়কে দেখিলেই সে ঘরটা যেন এখনই কাঁদিয়া উঠিবে। বসন্ত রায় একবার কী যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারি দিক দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুক-ফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দিদি, ঘরে কি কেহই নাই।''

বিভা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, ''না দাদামহাশয়, কেহই নাই!''

স্তব্ধ ঘরটা যেন হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই।'

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন—

আমিই শুধু রইনু বাকি।

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন, ''বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও—সে তোমাদের কী করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভালো না বাস, পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাহাকে এই বুড়ার কাছে দাও-না। আমি তাহাকে লইয়া যাই—আমি তাহাকে রাখিয়া দিই। তাহাকে আর তোমাদের দেখিতে হইবে না— সে আমার কাছে থাকিবে!''

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারিয়া চুপ করিয়া বসন্ত রায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন, ''খুড়ামহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি, এ বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প জানেন—অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ-সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।''

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, ''বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই! তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যেদিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিযাছেন, সেদিন হইতে আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি একদিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল্ দেখি, আমি তোর কী অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী— তোদের মানুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্নেহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এতএব প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি—তাও দিবি না?''

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বসন্ত রায় আবার কহিলেন, ''তবে আমার কথা শুনিবি না, আমার ভিক্ষা রাখিবি না? কথার উত্তর দিবি না প্রতাপ?'' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ''ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই। আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে—এই অনুমতি দাও।''



প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরো বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বসন্ত রায় নিতান্ত ম্লানমুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন, তাহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদামহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, আমার ঘরে এসো।" বসন্ত রায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, এসো, তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।" বসন্ত রায় কহিলেন, "দিদি, সে পাকা চুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে-সব ছিল, তখন তোদের পাকা চুল তুলিতে বলিতাম। আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি, আজ আর আমার পাকা চুল নাই।"

বসন্ত রায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আয় বিভা আয়, গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকা চুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর তো আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল। এখন আর-একটা মাথার অনুসন্ধান কর্‌, আমি জবাব দিলাম।" বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্ত রায়কে কহিল, "রানীমা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।"

বসন্ত রায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্ত রায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্ত রায় আশীর্বাদ করিলেন, "মা, আয়ুষ্মতী হও।"

মহিষী কহিলেন, "কাকামহাশয়, ও আশীর্বাদ আর করিবেন না। এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।"

বসন্ত রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "রাম রাম! ও কথা মুখে আনিতে নাই।"

মহিষী কহিলেন, "আর কী বলিব কাকামহাশয়, আমার ঘরকন্নায় যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

বসন্ত রায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, "বিভার মুখখানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্নজল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না, কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কী করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।"

বসন্ত রায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

"এই দেখুন কাকামহাশয়, এক সর্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।" বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হাতে দিলেন।

বসন্ত রায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার আর কিসের সুখ আছে? উদয়—বাছা আমার কিছু জানে না। তাহাকে তো মহারাজ—সে যেন রাজার মতোই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে তো আমার আপনার সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কী করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না।" মহিষী আজকাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে এক স্থলে আসিয়া পড়ে। ঐ কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে।



চিঠি পড়িয়া বসন্ত রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিঠি তো কাহাকেও দেখাও নি মা।"

মহিষী কহিলেন, "মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ভালো করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইয়ো না, বউমা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান-অপমানের কথা ভাবিয়ো না!"

মহিষী কহিলেন, "আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন! বিভা যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথায় আছে। রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।" বসন্ত রায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্ত রায় কহিলেন. "বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দাও যে, বিভাকে চন্দ্রদ্বীপ পাঠাইতে অনুরোধ কবিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে বিভা নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বসন্ত রায় একাকী বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্ত রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী সীতারাম, কী খবর?"

সীতারাম কহিল, "সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন, কোথায় সীতারাম?"

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া কী বলিল! বসন্ত রায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "সত্য নাকি?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় মনে মনে অনেক ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এখনই যাইতে হইবে নাকি।"

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না।

সীতারাম। আজ্ঞা না, আর সময় নাই।

বসন্ত রায়। কোথায় যাইতে হইবে?

সীতারাম। আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি-না কেন?"

সীতারাম। আজ্ঞা না মহারাজ, দেরি হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে কাজ নাই—কাজ নাই।" উভয়ে চলিলেন।



আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন, "একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না?"
সীতারাম। না মহারাজ, তাহা হইলে বিপদ হইবে।
"দুর্গা বলো" বলিয়া বসন্ত রায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্ত রায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেননা যখন উভয়ের দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পর বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভালো দেখা যাইতেছে না। কীটপতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক-একবার দীপ নিভো-নিভো হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল—দীপ নিভিয়া গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত কী ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরি করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ ম্লান দেখিয়াছিলেন; তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই। সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না। বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার ম্লান মুখখানি ভাবিতেছিলেন। সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল, 'বিভার কি ক্রমেই বিরক্তি ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কারাগারের মধ্যে এক বিষণ্ণ অন্ধকার মূর্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভালো লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা, তাহার সংসারপথের কণ্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরি করিয়া আসিয়াছে, কাল হয়তো আরো দেরি করিয়া আসিবে, তাহার পরে একদিন হয়তো সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন বিভা আসিবে—বিকাল হইল, সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না।—তাহার পর হইতে আর হয়তো বিভা আসিবে না।' উদয়াদিত্যের মনে যতই এ কথা উদয় হইতে লাগিল ততই তাঁহার মনটা হা হা করিতে লাগিল—তাঁহার কল্পনারাজ্যের চরি দিক কী ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। একদিন আসিবে যেদিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাহার সুখের কণ্টক বলিয়া দেখিবে—সেই অতিদূর কল্পনার আভাসমাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন, 'আমি কী ভয়ানক স্বার্থপর। আমি বিভাকে ভালোবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি কোনো শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।' বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না। কিন্তু যখনই কল্পনা করিতেছেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন তখনই তাঁহার মনের সে বল চলিয়া যাইতেছে, তখনই তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন—মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মতো বিভার কাল্পনিক মূর্তিকে আকুলভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

এমন সময় বহির্দেশে সহসা "আগুন আগুন" বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সহসা নানা কণ্ঠের নানাবিধ চীৎকার আকাশে উঠিল—বাহিরে শত শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন প্রাসাদের কাছাকাছি



আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল—তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

সে উত্তর করিল, "আমি সীতারাম, আপনি বাহির হইয়া আসুন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন?"

সীতারাম কহিল, "যুবরাজ, কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন।" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেক দিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন—মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাঁহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারি দিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশে অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব, কোথায় যাইব?" অনেক দিন সংকীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই—আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায়ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব? কোথায় যাইব?"

সীতারাম কহিল, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

এ দিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্মচারীদের নিকট কী একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল, তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটিরশ্রেণী ছিল, সেইখানেই তাহাদের চারপাই বাসন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না তাহারা হাত-পা আছড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই-একজন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কড়াক্কড় পাহারা দিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ, উদয়াদিত্য এমন শান্তভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে, বোধ হইত না যে তিনি কখনো পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এইজন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আগুন নেবে না—কেহ বা জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল। কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল—আগুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল—সে কী একটা বলিতে চায়। কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল, "যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কী মাগী, তোরই বা কী? সে দয়াল সিং জানে। আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।" বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বার বার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ডা হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল, "পোড়ারমুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া তোমাদের পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবারাজ যে পলাইয়া গেল।"

"ভালোই হইয়াছে, তোর তাহাতে কী?" বলিয়া সে তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল।



যাহারা ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো তাহার চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুলগুলা ফুলিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহ্নিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মতো দেখিতে হইল। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল—হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না—সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, আসিয়াছিস?" উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—সেই চিরপরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত, পৃথিবীতে যতটুকু সুখ আছে, যতটুকু আনন্দ আছে, যে স্বর তাহারই সহিত অবিচ্ছিন্ন। এক-একদিন কারাগারে গভীর রাত্রে বিনিদ্রনয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশীধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন—সেই স্বর। বিস্ময় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্ত রায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পুরিয়া গেল। উভয়ে সেইখানে তৃণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়।" বসন্ত রায় কহিলেন, "কী দাদা!" আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণ পর উদয়াদিত্য চারি দিকে চাহিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "দাদামহাশয়, আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর সুখের কী অবশিষ্ট আছে? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?" কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম জোড়হাত করিয়া কহিল, "যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।"

যুবরাজ চমক ভাঙিয়া কহিলেন, "কেন, নৌকায় কেন?"

সীতারাম কহিল, "নহিলে এখনই আবার প্রহরীরা আসিবে।"

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। এ যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ—এরা যে তোকে ভালোবাসে না। তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস, আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি যাই—একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই যে, তিনি হয়তো রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।"

বসন্ত রায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার কথা শোন্—সেখানে যাস নে, সে-চেষ্টা করা নিষ্ফল।"



উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে যাই। আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই।"

বসন্ত রায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়, এ-হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ। আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সে কি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?" বসন্ত রায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে চলো চলো দাদামহাশয়।" সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাইতে চাই।"

সীতারাম কহিল, "নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন, অধিক সময় নাই।"

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন, "মা, আমাকে গর্ভে ধরিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা—আমি দাদামহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোনো ভাবনার কারণ থাকিবে না।" বিভাকে লিখিলেন, "চিরায়ুষ্মতীষু—তোমাকে আর কী লিখিব—তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাকো—স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাও।" লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে পুরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিনখানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন—এমন সময়ে দেখিলেন, কে একজন ছুটিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ রে—সেই ডাকিনী আসিতেছে।" দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো, তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ দুটা অগ্নি উদ্‌গার করিতেছে—তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যেন যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আগুন নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতো প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে—একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মতো সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল—সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্বক রুক্মিণীকে ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে থাকে, তেমনি সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছুই হইল না, কিছুই হইল না—এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোদের হইবে।" সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে রুক্মিণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল—কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে



ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন—বসন্ত রায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া কহিল, "যাত্রার সময় কী অমঙ্গল!"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া শহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারও হাতে দিতে তাহাকে গোপনে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকি পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাতে নির্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বৈ সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েকজন প্রজা ও প্রাসাদের ভৃত্যের সাহায্যে সে-ই এই কীর্তি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ-ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখনো দৈবের কর্ম নহে, এতক্ষণে এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিয়াও যে নিবিতেছে না, তাহারও কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই-একজন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে জল আনিতে গিয়া আনে না, কৌশলে কলসী ভাঙিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এ দিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা কড়ি-বরগা চৌকাঠ কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে কোনো সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং সে দিকে আর কাহারও মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমত ধরিয়াছে। কতকগুলো হাড়, মড়ার মাথা ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোনোপ্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এ দিকে যাহারা প্রহরীশালার আগুন নিবাইতেছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "ও কী রে।" একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওরে, যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে।" প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিসপত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর-একজন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন শুনা গেল।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওরে তোরা শীঘ্র আয়। যুবরাজের ঘরের ছাদ ভাঙিয়া



পড়িয়াছে, আর তো তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।" যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চারি দিকে আগুন—ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। এমন-কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আগুন লাগিয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দমনে তাহার কুটিরাভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারি দিক স্তব্ধ। বাঁশ গাছের পাতা ঝর ঝর করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, সীতারামের শৌখিন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রসগর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে তো সপরিবারে পলাইতে হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক-না। মঙ্গলা পোড়ামুখী তো মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে, একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক। বেটির টাকা আছে ঢের, তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই, সে-টাকা আমি না লই তো আর-একজন লইবে—তায় কাজ কী, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল, প্রফুল্লমনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ-সকল কিছুতেই এড়াইতে পায় না। দুইটা রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হইল—কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন হন করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটিরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হৃষ্টচিত্তে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারি দিকে নিরীক্ষণ করিল। ঘোরতর অন্ধকার—কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারি দিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিন্দুকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই-একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে। কাহার যেন নিশ্বাসপ্রশ্বাস শুনা যাইতেছে—আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়নগৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিদ্রনয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কে ও রমণী থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অর্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশুবর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে, পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে—ঘরে আর কিছুই নাই—কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোকে, এলোচুলে, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে। সহসা দেখিয়া তাহাকে প্রেতিনী বলিয়া বোধ হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না—ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পাইল না।



সীতারাম নিতান্ত ভীরু ছিল না, অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল, ''তুই কোথা হইতে মাগী। তোর মরণ নাই নাকি।'' রুক্মিণী কট্‌মট্ করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, ''বটে। তোদের এখনো সর্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!'' উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, ''যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম, আগে তোকে আর যুবরাজকে চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দু-মুঠা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব—তার পরে যমের সাধ মিটাইব। তাহার আগে যমালয়ে আমর ঠাঁই নাই।''

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেঁষিয়া গেল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল, ''মাইরি ভাই, ঐজন্যই তো রাগ ধরে। তোমার কখন যে কী মতি হয় ভালো বুঝতে পারি না। বল্ তো মঙ্গলা, আমি তোর কী করেছি। অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?''

সীতারাম যতই অনুরাগের ভান করিতে লাগিল, রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল—সীতারাম যদি তাহার নিজের মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পট্‌পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত। সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কিছুই হাতের কাছে পাইল না। দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, ''একটু রোসো, তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি।'' বলিয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বঁটির অন্বেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল—সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলংকারে মরিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল এবং চৈতন্য হইল যে সত্যকার বঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বঁটিহস্তে শূন্যগৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সাতীরামের উদ্দেশ্যে বার বার আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন মরিয়া হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে—তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণশানিত হাস্য নাই, বিদ্যুদ্‌বর্ষী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই—রাজবাটীর যে-সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেদিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল, মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে। সর্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন। যাহা হউক, আমার আর যশোহরে একমুহূর্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড় পলাইল।



শেষরাত্রে মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আগুনও ক্রমে নিবিয়া গেল। যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই-একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে দেখিয়াছে। আর-কয়েকজন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর-একজন যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দগ্ধ তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়া কোথায়?" রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল, "যখন আগুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন।" কেহ কহিল, "না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্য এইরূপে যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী চাও?" সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি আর-কিছু চাই না—তোমার ঐ প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে না তোমাকে ভয় করে!" এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারি দিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল, "চুপ কর মিন্‌সেরা। কাল যখন তোদের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ারমুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমরা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ। পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত বলো।"

রুক্মিণী কহিল, "বলিব আর কী। তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে!"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে কে আগুন দিয়াছে জান?"

রুক্মিণী কহিল, "আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড়ো পিরিত, আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতরামই যেন তাঁর সব। এ-সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে, এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ-সব কী করিয়া জানিতে পারিলে?" রুক্মিণী কহিল, "সে কথায় কাজ কী গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমরা রাজবাড়ির সব ভেড়া, উহারা এ কাজ করিবে না।"

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু



প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কী বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ।" মহারাজ তাহার কোনো উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল তাহার এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?" তাহারা কহিল, "সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেইখানেই রহিল।"

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কী একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের পূর্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কী করিবেন। প্রতিদিন মহারাজ যখন এক-একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাসমাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তিভাবে কহিলেন, "আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমি তো কিছুই করি নাই।"

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান এই নিমিত্ত মহিষী ও-কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল, মহারাজের কোনোপ্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশ্বস্ত হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছুদিনের জন্য মহিষী একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে অনুবোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহ্লাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্তের জন্য শান্তি ছিল না। যখনই সে অবসর পাইত তখনই ভাবিত 'তিনি কী মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়তো তিনি রাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?' উলটিয়া পালটিয়া বিভা ক্রমাগত এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের



মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জা-শরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার কথা ঠিক বুঝিয়াছেন—তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল! তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল। সে মনে করিল, তাহার স্বামীর ভালোবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মতো বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো প্রসারিত, নির্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো কত কী খেলা করে। ছোটো স্নেহের মেয়েটির মতো তাহার মায়ের কাছে কত কী আবদাব করে, তাহার মায়ের গৃহকার্যে সাহায্য কবে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন নিস্তব্ধ বিষণ্ণ ছায়ার মতো ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে—এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয়খানি পরিস্ফুট প্রভাতের ন্যায় তাহাব সর্বাঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো সে সংকোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই; সে এখন আনন্দভরে বিশ্বস্তভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে, কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখনো প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু এক তিল মলিন করিবেন। এইজন্য মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্যমুখে অপরিতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্তমান ছিল, তারই জন্য আজ কাল করিয়া এ-পর্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই-এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেবল বিভার সম্বন্ধে যে কী করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছুদিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা। একবার তিনি মার্জনা করিয়াছেন, আবার—। কয়েক দিন বিভা আর-কিছু বলিল না, অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, "মা।" ঐ কথাতেই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কী বাছা।" বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, "মা, তুই আমাকে কবে পাঠাইবি মা।" বলিতে বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা, ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় পাঠাইব বিভু।" বিভা মিনতিস্বরে কহিল, "বলো-না মা।" মহিষী কহিলেন, "আর কিছুদিন সবুর করো বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।



ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পর উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মতো তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদামহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার যে কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন তো বোধ হয় না। আমার কী কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল। তিনি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই।" প্রথম প্রথম বসন্ত রায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন,

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলাম
জোর করে রাখিব ধরে।
শূন্য করে হৃদয়-পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরি
তুমিই তবে থাকো সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বার বার কহিলে পর বসন্ত রায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্নমুখে কহিলেন, "কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?" উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্ত রায় তাঁহাক সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, গান গাহিতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য বন্ধ হইল। বসন্ত রায়ের ভয় পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিনরাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, "দাদা, তোকে আর সে পাষাণহৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।"

দিনকতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। অনেকদিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সংকীর্ণপ্রসর পাষাণময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্ত রায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারি দিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে-সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর-দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর আসিল, হবিচাচা ও করিমউল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরান ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, "মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে।" বলিয়া সে



তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, "প্রণাম করো।" তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরান আসিয়া কহিল, "এখান হইতে যশোর যাইবার সময় হুজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।" শীতল সর্দার আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বকশিশ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এসো তো বাপধন, তোমরা এগোও তো।" বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়তো রাগ করেন নাই, তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এতদিন আর কি কিছু করিতেন না।

কিন্তু এরূপ চোখ-বাঁধা বিশ্বাসে বেশিদিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্য মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন—একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা আর কোথায় সেই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন। কারাগারের সেই প্রতিমুহূর্তকে এক-এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জন, বায়ুহীন, বদ্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই পলাইব—এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না। একদিন পলাইব—মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড়ো খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলা রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভালো মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন—যেন জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইতেছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দাদামহাশয়। ছাড়াছাড়ি যদি বা হয় তো জন্মের মতো কেন হইবে?"

বসন্ত রায় অন্য দিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, "তা নয় তো আর কী। কতদিন আর বাঁচিব বল্, বুড়া হইয়াছি।"

গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্ত রায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো কী হইবে।"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া কহিলেন, "কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস নে ভাই।"

উদয়াদিত্যের চোখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনের অভিসন্ধি যেন



বসন্ত রায় কী করিয়া টের পাইয়াছেন। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদামহাশয়।"

বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "কিসের বিপদ ভাই? এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি। মরণের বাড়া তো আর বিপদ নাই। তা মরণ যে আমার প্রতিবেশী। সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা!"

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্ত রায়ের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, কোথায় যাস?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "একটু বেড়াইয়া আসি।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আজ নাই-বা গেলি।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন দাদামহাশয়?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হোস নে, আজ তুই আমার কাছে থাক্ ভাই!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি অধিক দূর যাইব না দাদামহাশয়, এখনই ফিরিয়া আসিব।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাইব?"

যুবরাজ কহিলেন, "না, আবশ্যক নাই।"

প্রহরী কহিল, "মহারাজের হাতে অস্ত্র নাই!"

যুবরাজ কহিলেন, "অস্ত্রের প্রয়োজন কী?"

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কী ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছু স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই—পরের মুহূর্তেই কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে। কোথাও ঘরবাড়ি না বাঁধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া কিরূপে কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল—বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এতকাল আমিই তাহার সুখের সূর্য আড়াল করিয়া বসিয়া ছিলাম, এখন কি সে সুখী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন।

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ বট খেজুর সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে—যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল—সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্ত রায় যখন শুনিবেন উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখে কেমন করিয়া বলিবেন, 'অ্যাঁ, দাদা আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল!' সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে একজন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওই যে গা, এইখানে তোমাদের যুবরাজ—এইখানে।"



দুইজন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, ''আমাকে চিনিতে পার কি গা। একবার এই দিকে তাকাও! একবার এই দিকে তাকাও!'' যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, ''দূর হ মাগী।'' সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল, ''এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি—।'' যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক ধরিয়া তফাত করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ''মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর?''

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, ''জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।''

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলে, ''কী আদেশ।''

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, ''ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেই তো আমি যাইতাম। আমি তো আপনিই যাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোহরে ফিরিয়া যাই।'' মুক্তিয়ার খাঁ হাত জোড় করিয়া কহিল, ''এখনই ফিরিতে পারিব না।'' যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন, ''কেন?''

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, ''আর-একটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিব না।''

যুবরাজ ভীতস্বরে কহিলেন, ''কী আদেশ!''

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, ''রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।''

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, ''না, করেন নাই, মিথ্যা কথা।''

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, ''আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।''

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, ''মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের—আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি তখন আর কী! আমাকে এখনই লইয়া চলো, এখনই লইয়া চলো—আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিয়ো না।''

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, ''যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন, ''তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ। তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা চলো, যশোহরে চলো। আমি মহারাজের সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিয়ো।''

মুক্তিয়ার জোড়হস্তে কহিল, ''যুবরাজ, মার্জনা করুন, তাহা পারিব না।''

যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন, ''মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।''

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।



যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।"

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্রে তাহা বলে, সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারি দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে যাও, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিয়ো।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘেঁষিয়া আসিয়া যুররাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোনো উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদামহাশয়, সাবধান।" বন কাঁপিয়া উঠিল, মাঠের প্রান্তে গিয়া সে সুর মিলাইয়া গেল। সৈন্যেরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ধরিল। উদয়াদিত্য আর-একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদামহাশয়, সাবধান।" একজন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল— শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "কে গা!" উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "যাও যাও, গড়ে ছুটিয়া যাও, মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও।" দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্যেরা গ্রেপ্তার করিল। যে কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল, সৈন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েকজন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিযা অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বাব ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ কবিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁখ-ঘণ্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাটীতে কোনো কোলাহল নাই, চারি দিক নিস্তব্ধ। বসন্ত রায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আহ্নিক করিতে করিতে বসন্ত রায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিয়ো না। আমি এখনই আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি।"

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, ভালো আছো তো?"

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আহারাদি হইয়াছে?"

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

মুক্তিয়ার কহিল "আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।"

বসন্ত রায়। না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।



মুক্তিয়ার। না মহারাজ, শীঘ্রই যাইতে হইবে।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?"

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ, শীঘ্র বলো। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্‌বেগ হইতেছে। প্রতাপের তো কোনা বিপদ ঘটে নাই?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে না, তাঁহার কোনো বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী আদেশ? এখনই বলো।"

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্ত রায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি প্রতাপের লেখা?"

মুক্তিযার কহিল, "হাঁ।"

বসন্ত রায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

তখন বসন্ত রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অবশেষে আবার কহিলেন, "প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম—সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?"

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "তিনি বন্দী হইয়াছেন। মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "উদয় বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?"

মুক্তিয়ার খাঁ জোড়হাত করিয়া কহিল, "না জনাব, হুকুম নাই।"

বসন্ত রায় সাশ্রুনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন, "একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব!"

মুক্তিয়ার কহিল, "আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।"

বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এসো সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।"

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।"



বসন্ত রায় কহিলেন, "না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?" বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন; কহিলেন, "প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ—দেখিয়ো অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।"

বলিয়া বসন্ত রায় চোখ বুজিয়া ইষ্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "সাহেব, এইবার।"

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, "আবদুল।" আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুইদিন উদয়াদিত্য খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, কাহারও সহিত একটি কথাও কহিলেন না, কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণমূর্তির ন্যায় স্থির তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই—কেবলই ভাবিতেছেন। নৌকায় উঠিলেন, নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল। তবুও কিছু শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা, নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল। কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোটো ছোটো তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে—যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল, নৌকা খুলিয়া দিল, উষার বাতাস বহিল, পূর্ব দিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া হু হু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল—তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মতো চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিযা বসিল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ, কী ভাবিতেছেন।" যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন, অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কী করিলাম। আমার জন্য কী সর্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না, যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কী উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজে বাধা দেয়—নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর-সকলকেও ভারাক্রান্ত করে। আমি একজন দুর্বল ভীরু, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল, সংসারের ভরসা ছিল—আমার জন্য তাহাদেরই বিনাশ করিলেন। আর না, এ সংসার হইতে আমি বিদায় লইলাম।"



উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব শরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল—তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কী করিয়া জানিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দুর্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব —আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না। সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি তবে কী চাও?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর-একটি ভিক্ষা—আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেইদিনই উদযাদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন, "মা কালী, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি—যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না। যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারানী যখন শুনিলেন উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কী কথা মা। তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোহরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষাণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।" মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভালোবাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "মা, তুমি তো জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।"



উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, কাশী যাইবার আগে তোকে আমি সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে।"

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামহাশয় কেমন আছেন?"

"দাদামহাশয় ভালো আছেন।" বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, "বাবা, বিভাকে তো লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে।"

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি, তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখনো রাগ করিতে পারে?"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহারা অনাদর করে তবে আর বিভা বাঁচিবে না।"

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনো শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে তা কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, 'বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।' রাজবাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোর হৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচরিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা ঊর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন

জাগিয়া উঠিয়াছে। মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত—মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, 'জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।'

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখ চোখে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে—বিভা ছোটো পাখিটির মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারি দিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদু স্বরে তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

বামচন্দ্র রায়ের বাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারি দিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, 'আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।' সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন, কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারি দিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটি উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে। তাহার 'পরে চারি দিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রখিয়াছে। উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কী হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাদের নৌকা গা?" নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল, "কে ও? রামমোহন যে? আরে, এসো



এসো।" রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে, রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "মোহন!"

রামমোহন। মা।

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ হাসিহাসি মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা তুমি আসিলে?"

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ, মোহন। মহারাজ কী ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস।"

রামমোহন কহিল, "না মা, অত ব্যস্ত হইয়ো না। আজ থাক্, আর-একদিন লইয়া যাইব।"

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল, " কেন মোহন, আজ কেন যাইব না।"

রামমোহন কহিল, "আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—আজ থাক্ মা।"

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল্ মোহন, কী হইয়াছে?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, "মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।"

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত-পা হিম হইয়া গেল। রামমোহন কহিতে লাগিল, "মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না। বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না।"

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, মাথা ঘুরিয়া সেখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে-চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্ত-হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা, মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।

বিভা আকুলভাবে কহিল, "মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—আমার আসিতে কি বড়ো বিলম্ব হইয়াছে।"

মোহন কহিল, "বিলম্ব হইয়াছে বৈকি।"

বিভা অধীর হইয়া কহিল, "আর কি মার্জনা করিবেন না?"

মোহন কহিল, "মার্জনা আর করিলেন কই।"

বিভা কহিল, "মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" বলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল, "আজ থাক্-না, মা।"

বিভা কহিল, "না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।"

রামমোহন কহিল, "যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।"

বিভা কহিল, "না মোহন, আমি এখনই একবার যাই।"

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল, "তবে একখানি শিবিকা আনাই।"



বিভা কহিল, "শিবিকা কেন? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজন সামান্য প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায় কাজ কী?"

রামমোহন কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।"

বিভা কাতর স্বরে কহিল, "মোহন, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে আর বাধা দিস্ নে, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।"

রামমোহন ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, "আচ্ছা মা, তাহাই হউক।"

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যেরা আসিয়া কহিল, "এ কী মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথায় যাও!"

রামমোহন কহিল, "এ তো মায়েরই রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারেন।"

ভৃত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চারি দিকে লোকজন, চারি দিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সংকোচে মরিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহাব চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্ত যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারি দিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁষাঘেঁষি—কিছুই যেন কিছু নয়। চারি দিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্যন্ত, চারি দিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্যন্ত, তাহার যেন একটা কোনো অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধবিয়া বিভাকে নিবারণ করিল, তখন সহসা বিভা একমুহূর্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল, চারি দিক দেখিতে পাইল, লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার ঘোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল। বামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। অদূরে ফর্নান্ডিজ ছিল, সে আসিয়া দ্বারীকে ধবিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দাসদাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না।

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? ভিখারিনী? ভিক্ষা চাইতে আসিয়াছিস?"

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনার মহিষী-- যশোহরের রাজকুমারী।"

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন, এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?"

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।



বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল, সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল, মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও। কাতর হইয়া চারি দিকে চাহিল, রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস!"

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম। তোমার মহিষীকে—আমার মা-ঠাকরুনকে বেটা অপমান করিল—উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।"

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন, "কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।"

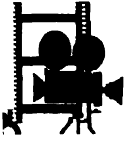
বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন জোড়হস্তে রাজাকে কহিল, "মহারাজ, আজ চারপুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমাব চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।" বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল, "আয় মা, আয়। এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়।" বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে লাগিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে—

"বউ-ঠাকুরানীর হাট।"

শেষের কবিতা



❑ ১৯৫৩ সাল।

শেষের কবিতা —রবীন্দ্র উপন্যাস। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভাদ্র থেকে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দেব ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সাদা-কালো। ১৪ বিল। ৩৫ মি মি।

চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মধু বসু।

পবিচালনা—মধু বসু।

প্রযোজনা—প্রদীপ প্রোডাকসন্স।

চিত্রগ্রাহক—জি কে মেহতা।

শিল্প নির্দেশনা—কার্তিক বোস।

সম্পদনা—শ্যামদাস, শিবসাধন ভট্টাচার্য।

'ববীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধানে—অনাদি দস্তিদাব।

সঙ্গীত পবিচালনা—কালীপদ সেন।

অভিনয়ে—অমিত—নির্মলকুমার. লাবণ্য—দীপ্তি বায়, কেটি—সাধনা বসু, যোগমায়া—চন্দ্রাবতী, অবনীশ—ছবি বিশ্বাস, সিসি—বনানী চৌধুরী, লিসি—বমলা চৌধুবী, যতিশংকব—অনিল, শোভনলাল—সমব বায়, কুমার মুখোপাধ্যায়—উৎপল দত্ত। এছাড়া—শোভা সেন, বেনুকা বায়, নীলিমা দাস প্রমুখ।

পবিবেশনা—প্রভা পিকচার্স।

মুক্তি—৪ ডিসেম্বব, ১৯৫৩, চিত্রা, ইন্দিরা ও লাইট হাউস।

○ শেষের কবিতা উপন্যাসে কুমার মুখোপাধ্যায় নামে কোন চরিত্র ছিল না। সম্ভবত পরিচালক মধু বসু চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে এমন একটি চবিত্র তৈরি করেছিলেন।



❑ *২০০৮ সাল।*

'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি অবলম্বনে নির্মিত হয় 'Mon Amour' Sesher Kabita Revisited' (রঙীন চলচ্চিত্র)

পরিচালনা—শুভ্রজিৎ মিত্র।

অভিনয়ে—ঋতুপর্ণা, সাহেব।

মুক্তি—নন্দন প্রেক্ষাগৃহ, ২০০৮।



১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী ''রয়'' ও ''রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এ কারণে,নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিষ্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিকে গেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ 'র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের , দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশন তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা ''বিষবৃক্ষে'', বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা ''মনোমোহনের



মোহনবাগানে'', নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস্তুর বলে জানত। অক্সফোর্ডের বি এ 'র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা ''ন পুনরাবর্তন্তে''।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না—বলত, ''রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডেব পাস।'' সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম. এ.; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, ''অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।'' দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি!

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক্ পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে কবতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়



একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্‌। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারও প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্‌ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে, ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে, দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ও পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, "গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।"

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল; কিন্তু সে জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা ঠেলা দিয়ে লিলি



হেসে উঠল, বললে, "অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।"

অমিত হেসে উঠে বললে, "তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে ; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙুটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।"

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পবে কী হবে ভেবে দেখো।"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, "তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যায় না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছে বলে তার হিসেব নেই।"

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনা নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।"

অমিত বলে, "আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তার কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম. এ.-তে বটানিতে ফারস্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।"



অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, 'ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত বললে, "পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমাব বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়সজন অমিতের বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উল্‌টো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে বাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে—ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্‌-একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল; ও বলে উঠল, "বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে; খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল—কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারও গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।"

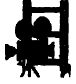
একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস করে বললে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, "মানে কী হল।"

অমিত বললে, "যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।"

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলেগোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, "কবিমাত্রের উচিত পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে



ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, "আনো ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।...রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্সওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমারবতী বাঁধা থাকবে মর্তে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্য দিন—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভ লগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চুতষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পুজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।...ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেণ্টিমেণ্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, "সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।...এখন থেকে ফেলে দাও মনভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ; ডিকেন্স্কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্বুদ্ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক



মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।''

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, ''ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো।''

অমিত বললে, ''ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।...যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসীভর্স্ অফ স্টোলন্ প্রপার্টি। সে স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদেব বাঁচতে না দেওয়া—শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।''

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, ''জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্টি করতে চান? তার নাম করুন।''

অমিত ফস্ করে বললে, ''নিবারণ চক্রবর্তী।''

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল—''নিবাবণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে।''

''আজকের দিনে এই-যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরে বনস্পতি জেগে উঠবে।''

'ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।''

''তবে শুনুন।'' বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল—

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খেলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে



দিবি তার দুরূহ উত্তর।
শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্থ ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে,
তরঙ্গের নিস্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট-'পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।
পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ লালাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ।
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।
ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি,
"ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারি,
তোর কণ্ঠধ্বনি
ঘুরি ঘুরি
নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।"

অস্ত্র আনো।
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় ও প্রাণ
করি যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে,
মুহূর্তে চকিতে,



মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।
শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
উর্ধ্বস্বরে চাহিব খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ—
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্ধ ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,



হানি বজ্রমুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণসঞ্চয়
ছিন্ন ক'রে মুক্ত করে সর্বজগন্ময়।

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে। সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে বললে, "একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।"

অমিত বললে, "অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্তে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।"

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, "আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?"

অমিত বললে, "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোট-বইয়ে লেখা আছে।"

"কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।"

"আমার মনটা অয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।"

সিসি বললে, "অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।"

২
সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্রাক্‌টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে"।

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চার দিকে চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে—দুদিন না যেতেই বুঝলে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে



বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সেই বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো— ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই, অর্থাৎ, ওর মধ্যে বিস্তর আছে কিন্তু এক নেই— তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন, শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে 'ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। ঝরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে, পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খাবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বি‹দ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়— নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলাণ্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মুজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না—মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিসট্রিক্ট্ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত— তার মধ্যে "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর, চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে "দেহলীদত্তপুষ্পা" যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মালবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো-একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে—পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারি দিকের সমস্ত



হতে স্বতন্ত্র। মন্দরপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললটা অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্‌জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, "অপরাধ করেছি।"

মেয়েটি হেসে বললে, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।"

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প-বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট-বইখানা খুলে লিখলে, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, "একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।"

অমিত বললে, "উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে—একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীর্তি।"

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, "লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।"

অমিত বললে, "আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস"।

"দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।"

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, "আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়— এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।"

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায়



না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশে উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, "কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।"

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, 'আমার সময়ের অভাব নেই, এখনই আসতে পারি।' সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল, "পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামী করলে। দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে— লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়ানার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে; এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে -পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমর 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও।' বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায়ে আবীর গুলাল,

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য;
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ



উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

৩

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউবিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক-দৌড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনাসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পরে যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুরে জল খাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূবাহ্ন যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট্ ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায়, শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় -হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক-কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপকাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই



সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন. এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যতে অনুস্বার -বিসর্গরে ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা-নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহাড়ায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজী বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত, প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপোজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন—এঁদের সভপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, "মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি। দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে **উলটপালট** করতে দুঃখ বোধ করি না। তার মানে , মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তেমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।"

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন; এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না । বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল। তিনি যোগমায়াকে বলতেন, "মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছে।" এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনো মতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের-কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে "বাধ্যতামূলক"। স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যদিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোন-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।



৪

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি, এখনো তার পাঠানুযোগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল ছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে—খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর-একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারও দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে. হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা , তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচেব অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যের ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেন্‌সিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাঁটরার ভিতর থেকে, গোপালফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাঘণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার-দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে। টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়?

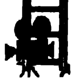
এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফ্লেটে



ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুন মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথ হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি. এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান , লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন-একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পবীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম. এ পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত— তার বদলে আপন পরীক্ষা -পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ। সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেবির গ্রন্থব্যূহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না। একমাত্র বাধা লাবণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্ন রিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্বধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে—অনুদ্ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে; কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসাতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল— নিজের উপরে, ননীগোপালের 'পরে।



এমন সময় শোভনের কাছ থেকে চিঠি এল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনই তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন, বললেন, "পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।"

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরীতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা-কোনো কথা বলে; জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ; যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্‌ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ওৎসুক্য । কিন্তু এ -পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে-পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলেরৈ উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্‌-এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না। বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ এক সময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না । লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, "আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন ?"

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

"আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন ? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই ?"

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।"

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যাথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো-একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুন ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপর।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটালো। অবনশী



তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, "আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ।"

লাবণ্য বললে, "আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা! যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।"

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল, উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ'র আমল পর্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট্ মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল, আর সমস্ত কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে "জাগো"। লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে— জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারি দিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওরা মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে, ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা -ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ -চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিল দেখতে পেলে ইংরেজ কবি 'ডন' -এর কাব্যসংগ্রহ। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্স্‌ট্ বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন যে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর



ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতি মুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, 'আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব।'

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন করে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম-পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, "তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।"

অমিত বললে, "আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিযেছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছেন?"

অমিত বললে, "ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।"

"মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা।"

"ভেবে দেখুন-না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না; বলতেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন ছেলেমানুষি।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।"

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি—গাড়ি-ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো জীবনে অবতীর্ণ হলেন—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "কর্মফল কার বাবা। তোমার না আমার, না যারা মোটর-মেরামতের ব্যাবসা করে তাদের?"

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, "শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের; নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?"

যোগমায়া লাবণ্যর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে-না-হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ করেই বললেন, "বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।"



দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, "মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।"

লাবণ্য বললে, "আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।"

"ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।"

লাবণ্য হেসে বললে, "ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।"

আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of Names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।"

"আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়?"

"একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।"

"দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।"

"বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।"

লাবণ্য বললে, "সহজ নয়, সময় লাগবে।"

"সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই; ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইন্‌স্টাইনের এই মত।"

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

"ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।"

"সময় আর নেই, কাজ আছে" বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমরাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে শিখেছে, কিন্তু শান্তি পায় নি— লাবণ্যর মুখে ও এমন-একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস। গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাসা চলে না, তাদের সঙ্গে



কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়; তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলং পাহাড়টা চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে—আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠেছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্যাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধ ঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক, এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। গুরু করলে সাহায্য—এত বাহুল্যপরিমাণে যে প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে—তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময় চুরির অপরাধ ধরা



পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে, বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়তে দৌড়তে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, "জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়।"

"কিসের অসুবিধা।"

অমিত বললে, "যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে। দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।"

"না ডাকলেই চুকে যায়।"

"বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।"

"কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।"

"মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন-না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্তের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে। মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না। কল্পনা করুন-না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট।"

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, 'নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।"

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, "চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উল্‌টো। এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।"

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন?"

অমিত বললে, "জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন-কি তারা গানও গায়।"

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, "আশ্চর্য!"



অমিত বললে, "হাসছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।"

লাবণ্য বললে, "আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।"

অমিত বললে, "দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে।"

"এর জবাবে খুব-একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো, ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস নতুন করে আবিষ্কার।"

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, "আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেছি, আপনি যে কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার, আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না। এক-এক-সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন-না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটি লাইন বের করি যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।"

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, "বের করতে পেরেছেন?"

"হাঁ, পেরেছি?"

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেলল, "লাইনটা কী বলুন-না।"

"For God's sake, hold your tongue
and let me love!"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।"

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, হাঁ।

অমিত বললে, "সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডনের বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আসত না।"

"আবিষ্কার করলেন?"

"আবিষ্কার নয় তো কী। বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে; আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডনের কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে



পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়, বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডনের কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি।"

"ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব-বা। নতুন অমিত রায় কী-যে কাণ্ড করে বসবে, পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো-বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।"

"লড়াই? কার সঙ্গে।"

"সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্‌খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।"

"সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে, ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব 'যুদ্ধং দেহি'—ঐ যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।"

লাবণ্য হেসে বললে, "লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়?"

"তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব, এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল. কিন্তু ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে ভাবনা নেই।"

অমিত বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"কী বলুন।"

"আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।"

"আচ্ছা, বেশ, তার পরে?"

"ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাতলা পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝির্-ঝির্ করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।"

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু সময় যে অল্প।"

"জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্যদেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল। যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্‌চুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতবয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে 'ভবে এসে করলে কী' তখন কোন্ লজ্জায় বলব, 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ



করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।" তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।"

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারও যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, "চলুন।"

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্রপথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না, স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, "দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা—একটা সাধু, আর-একাট চলতি। কিন্তু এ ছাড়া অরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল— সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এইরকম জায়গার জন্য। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাবণ্যদেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?"

লাবণ্য মাথা হেঁটে করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, "চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ কবি।"

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, "রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।"

"হাঁ, লাগে।"

"আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে; তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।"

"আপনি এত ভয় করছেন কেন।"

"এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।"

"আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।"



"এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেখেছেন? না-চেনার বন্ধন। সব চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।—

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে।

নিজেকেই ভুলে থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না—
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়!
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী—
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিন্ন হবে ডোর—
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।"—লাবণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—

"হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।"

আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।



এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, 'মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।''

''পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম ধাম বিবরণটা বলো।''

অমিত বললে, ''নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।''

''তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।''

''অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রী ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে যেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।''

''আচ্ছা, নামটা নাহয় খাটো হল, রূপটা?''

''বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।''

''অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?''

''পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ করা চাই—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।''

''আচ্ছা নামরূপ থাক্, বাকিটা?''

''বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।''

''বুদ্ধি?''

''লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান ব'লে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।''

''বিদ্যে?''

''স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।''

''পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।''

''অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।''

''তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।''

''জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা। ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা?''

''সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।''

''এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।''

''বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।''

''মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে কথা বুঝেছিলেন।''

''আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে।''



"কিরকম পরীক্ষা চান, বলুন।"

"একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।"

"কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।"

"যে রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।"

'মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলেছেন। মনে হচ্ছে, যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা—জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থার সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনই ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।"

"ভয় নেই বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও, হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব, লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।"

"আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।"

"আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে।"

"দেখছি, বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।"

"তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসীমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।"

"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ণ। নইলে আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন।"

"বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।"

"মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।"

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল, আজ তাকে অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, "অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়োতে যাব।"

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, "পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন।"

"কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব—"

"ইস্কুলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।"

হঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান



করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, "কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।"

"সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম।"

"বলেছিলে, 'অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।' বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ করি নি।"

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, "কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এ উপদেশের বাজারদর বেশি, আক্‌ব্বরি মোহরের মতো; কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।"

"তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।"

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, "জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।"

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, এক ধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলার রোদ্‌দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে, "সুখবব আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।"

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, "যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।"

"তা দাও।"

"তোমাকে ডাকব বন্য বলে।"

"বন্য!"

"না না, এ নামটাতে হয়তো-বা তোমার বদনাম হল। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব—বন্যা। কী বল।"

"তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।"

"কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারও কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।"



"আচ্ছা বেশ।"

"আমারও ঐ রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি 'ব্রহ্মপুত্র' কেমন হয়। বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।"

"নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারী।"

"ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।"

"আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।"

"চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে—বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে নাহয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী।"

"ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।"

"সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা।'"

"কী মিতা।"

"তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?—অনন্যা।"

"তাতে কী বোঝাবে।"

"বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।"

"সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।"

"বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো, পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

"তুমি কবিতা লিখবে নাকি।"

"নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

"এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।"

"কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয় তেমনি করেই, কেবলই অক্স্‌ফোর্ড্ বুক অফ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসাব কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।"

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, "হাত জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব চেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।"

"কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা।"

"কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন যে যাচাই করবে কী দিয়ে। তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই



টিকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake, hold your tongue
and let me love !"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, "ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপ্‌টস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি-চাটগাঁ পর্যন্ত চীৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্‌সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে, হয়তো এইটেই ভালো।"

"কোন্‌টা ভালো।"

"ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়িতে নাড়িতে।—আচ্ছা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।"

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, "তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।"

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।"

"ভয় কিসের।"

"তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই-বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।"

"কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।"

"তুমি যখন বললে কর্তা-মা সম্মতি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।"

"ধরাই তো পড়তে হবে।"

"মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না—না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।"

"বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ।"



"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরো; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভাল্‌গার। ওটা বড়ো রেস্‌পেক্‌টেবল্‌; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।"

"বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।"

"মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না, তাতেই আমি খুশি থাকব।"

"বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্য করেছ। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার এরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।"

"আজ তুমি তার কোন্‌টা।"

"যেটা আমাব বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে রুচিত ঢাকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ।"

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠ্‌বার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।"

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে



শাজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।''

অমিত বললে, ''তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।''

''আমি চাই নে কবি হতে।''

''কেন চাও না।''

''জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।''

''বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি; ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা— কী করে খবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে—

''ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা—
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।

''আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই— তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

''আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি—
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী।

''তুমি ঝরনা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

''আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,



তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।"

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, "যতই আমার আলো থাক আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।"

অমিত বললে, "কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর কিছু যদি না থাকে, আমার বাণীরূপ রয়েছে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "কোথায়। নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?"

"আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।"

"তা হলে কোনো-একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।"

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে—খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, 'লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি না। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়—কেই-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়—জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব। এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ। পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল। এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব ক'রে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।'

এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?"

"ঠিক বুঝেছি মা।"



"অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।"

লাবণ্য একটু হেসে বললে, "ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।"

"সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।"

"সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে।"

"দেখছ-না লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"তা বাসেন।"

"তবে আর ভাবনা কিসের।"

"কর্তা-মা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।"

"আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।"

"কর্তা-মা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।"

"তা মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ, যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।"

"সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটোন আপনি ঘটতে থাকে। কিন্তু, যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানাহেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর-কি।"

"তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য।"

"বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তা-মা, খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো-একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।"

"লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু, উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি



দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

"তোমার মনে হয় অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?"

"স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন। আমি তো তা চাই না।"

"তুমি কী চাও।"

"যতদিন পারি, নাহয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন। সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাহয় সে গুটি-থেকে-বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—নাহয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী। কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।"

"সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে নাহয় ক্ষণকালের মায়া-রূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না। তোমার কাছে অমিতও কি মায়া।" লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, "তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি, তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে; তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে—দেখলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম সান্ত্বনা দিয়ে আসি; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।"

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, "তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।"

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে



বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে—এও তো সূক্ষ্ম। যোগমায়ার মা-ঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, "কর্তা-মা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।"

যোগমায়া বললেন, "আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।"

"না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো—কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয়, এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে বোলো না, কর্তা-মা।"

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

৯

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, "বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে।"

অমিত উত্তর করলে, "উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্‌বাবের তপস্যা—খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় সে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা—এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।"

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো—থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প-কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে



তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বার বার বললেন, "মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।"

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে একচোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো-একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, "এ কী কাণ্ড অমিত।"

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।"

"অসম্বদ্ধ প্রলাপ?"

"অর্থাৎ, বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারিদিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, তার বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে তবে সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রোটেস্ট্ স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি—ঘরের মিস্‌গভর্নমেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্‌সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।"

"মূলনীতিটা কী শুনি।"

"সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।"

আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। 'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি! আর, যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন। পোড়ারমুখিকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।'

একবার যোগমায়া ভাবলেন অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, "একটু বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি।"

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল, লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির 'মা' বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল।

বললেন, "চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।"



সে বললে, "কর্তা-মা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল, কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে, এল বুঝি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছট্‌ফট্ করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতের দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হুহু করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা—অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল! এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ-রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপার-গামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে। সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমাব ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল—সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টনটন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে—নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল, ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্ করে জ্ব'লে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে-একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, "সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, "এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা।"

"যদি না ভালোবাস, ওকে স্পষ্ট করেই বল-না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

"এই মাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে। ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না।"

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, "আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভলোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব। আর কেউ কি এমন করে জেনেছে।"

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল। তাকে আস্তে আস্তে বললেন, "মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে— সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও, একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।"

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো— সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে; তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে। অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ কী অন্যায় মাসিমা।"

"কেন বাবা, কী করেছি।"

"আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন।"



"শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন।"

"শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।"

"এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা।"

"নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্য-দেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।"

"দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।"

"এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড্‌ কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই, লাইফ্‌স্‌ কমেন্টারি ইন্‌ ভার্স্‌। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছি, সে লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস নে তারে;
সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভলোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধুলায় পথের ধারে।

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্যধনে
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের—নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটিরের নাম দেব মাসতুতো বাংলো।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটিরেও তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে মনে নিশ্চয় জান পেয়েছ।"

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের



উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, "তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।"

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, "তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।"

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। এক সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন।"

অমিত উত্তর দিলে, "কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে, আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ। সে অকূল কোনোকালে কি পার হব।

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন—
ডুবুক সবই, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?"

"হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।"

"বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে-না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল—তারই উপরে আলো ঝল্‌মল্‌ করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর। এই-যে-আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গ ধ্বনি; একে থামায় কে।"

"মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে।"

'মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম—কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও!

O, what is this ?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.

একি রহস্য, একি আনন্দরাশি!
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,



তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি, পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা দিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন—হয়তো-বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।"

"বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মন্‌সুন নেমেছে। ওয়েদার -রির্পোট যদি রাখ তো দেখবে, এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, "মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।"

এটা আব কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শবীব দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, "বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।"

লাবণ্য বললে, "কী দরকার মিতা।"

"তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা! ভালোবাসার যত-কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথাব মতো। সে কথাটি শুধু এই, 'পেয়েছি'। আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক-না।"

লাবণ্য বললে, "আচ্ছা, তাই থাক্।"

"কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।"

"আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।"

"আচ্ছা, সেই ভালো! আমিও মুক্তো ভালোবাসি।"



১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল, আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, "তোমার কলকাতায় ফেরবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল এখন ছুটি। নিঃসংশয় চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"এমন কড়া শাসন কেন।"

"সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।"

"এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ, এই ভরা দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চমকে থেমে-যাওয়া লাইনটা—

চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে!

শিলঙ থেকে আমিই নাহয় চললুম, কিন্তু পাঁজি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস্ করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী কবব জান।"

"কী করবে।"

"মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায়, দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অজ -মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন।"

লাবণ্য বললে, "প্রিয়াশিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অমিত বললে, "সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে, তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।"

"মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।"

"আচ্ছা, তবে শোন। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা, শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।"

"দামের হিসাবটা শুনি।"

"রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ডহার্বারের ঐ দিকটাতে। ছোটো একটা স্টীম লঞ্চ করে ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।"

"আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল।"

"এখন কোনো দরকার নেই, সে কথা জান। যাই বটে, বার -লাইব্রেরিতে, ব্যাবসা করি

নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে,কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।"

"বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে হবে—দশটা-পাঁচটা।"

"দোষ কী। কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।"

"কিসের কাজ, বলো। বিনা মাইনেয়?"

"না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয়, ছুটিও নয়, বারো-আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।"

"আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর?"

"স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—গঙ্গার ধার; পাড়ির নীচে-তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি-পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকা বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ-ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু বসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে-সাদায় রঙকরা আমাদের ছিপ্‌ছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম, বলে দাও তুমি।"

"বলব? মিতালি?"

"ঠিক নামটি হয়েছে—মিতালি। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল। বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।"

"রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব।"

"দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী; আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।"

"দীপক।"

"ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব। মিলনের সন্ধ্যোবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের বাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছে থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই—সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধ্যে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বারট্রাণ্ড রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।"

"আর তোমার বাড়িতে আমি?"

"ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।"

'নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুর্‌কা পরে যাব।"



"তা হোক্, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।"

"আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?"

"তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে— চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

"এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।"

"আচ্ছা বেশ।" পকেট থেকে একটা নোট-বই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে—

"Blow gently over my garden
Wind of the southern sea.
In the hour my love cometh
and calleth me.
চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন-সাগরের সমীরণ,
যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।"

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, "এবারে তোমার চিঠির নুমনা দাও, দেখি, তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।"

লাবণ্য একটা টুকবো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, "না, আমার এই নোট-বইয়ে লেখো।"

লাবণ্য, লিখে দিল—

"মিতা ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।"

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, "আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমূলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।"

লাবণ্য বললে, "নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?"

অমিত বললে, "সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝিরঝির করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গার ও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির-দাঁতে-কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পুজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দুজনে দুজায়গায়।



তুমি যদি যাও পর্বতে, আমি যাব সমুদ্রে।— এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত।"

"মেনে নিতে রাজি আছি।"

"মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে বন্যা।"

"তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।"

"প্রয়োজন নেই তোমার?"

"না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে। কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে; সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমরা পক্ষে নিরাপদ।"

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে দূরে ভেদ নেই। সাড়ে-তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পুব-দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সারক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ বাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আল্‌নার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে দু হাত তফাতে, নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ-হাওয়া
প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা।"

"কিছু না মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে।"

"আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্‌সে এম. এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না-সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিনে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করেতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।"

"তোমারও ছাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে।"

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, "থাকবে, থাকবে, থাকবে।"

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী থাকবে অমিত। আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।"

"জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায়, সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।"

"একদিন সময় আসবে, দেখাব।"

"বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।"

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, "কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।

"আত্মীয়স্বজনেরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব।"

"খুব জানে। নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের। তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল। এ যে যুগ-বদল! তার মাঝখানে একট কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।"

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্তজগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "চলো এবার।" কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, "কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে। তার আগে আর দেখা করতে আসব না।"

"কেন আসবে না।"

"আজ ঠিক জায়গায় আমর শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে-বয়ে স্বর্গ।"



লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গেএকটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরম ক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘরে আছে। রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে; বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, "বন্যা , আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা-কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।"

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

"তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব-হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

"বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল। তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।"

"ভয় কিসের মিতা । এই আগুনে -পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে।"

"কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়।"

"রবি ঠাকুরের।"

"তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।"

"বইয়ে বেরোয় নি।"

"তবে পেলে কি করে।"

"একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত। বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।"

"আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।"

"সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।"

"তাকে দয়া করেছ?"

"করবার অবকাশ হল না। মনে মনে প্রর্থনা করি, ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।"

"যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি, এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।"

"হাঁ, তারই কথা বৈকি।"

"তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল।"



"কেমন করে বলব। ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ-বন্ধ টুটে।
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।"

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল। ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়। কিন্তু কেমন একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।"

"একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তারপরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতাদুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যই বিদায়ের কবিতা মনে এল।"

"সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই।"

"কেমন করে বলব। কিন্তু এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।"

"বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো-লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।"

"দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচাজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মনে নেই।

"তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।"

"আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখ তোমার পথশেষের কবিতাটা শুনে নিই।"

"রাগ কোরো না বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।"

"রাগ করব কেন।"

"আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—"

"তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি, তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্য।"

"সর্বনাশ! তার বই! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয়



না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—''

''ভয় কোরো না মিতা, তুমি তাকে যেভাবে বোঝ আমিও তাকে সেইভাবেই বুঝে নেব, এমন ভরসা আমার আছে, আমারই জিত থাকবে।''

''কেন।''

''আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেল্‌ফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।''

''আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড়্‌ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।''

''কিচ্ছু খারাপ হয় নি, হাওয়া ঠিক আছে।''

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গলে—

''সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত-পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া! গ্র্যাণ্ড!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচাব বোঝাটা যে বড়্‌ডো বেশি; যে নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে অল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ। ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ও-পারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল—



সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে—

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আর্বিভাব সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে। তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।"

"রাগ কর কেন মিতা। রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বার বার বলে লাভ কী।"

"তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—"

"ও কথা বোলো না মিতা। আমর ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারও সঙ্গে আমার মিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ। নাহয় কথা রইল, তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।"

"কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো বিবাহ।

"রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।"

"ভালো করলুম না তর্ক তুলে আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলার সুর বিগড়ে গেল।"

"একটুও না । যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদরে সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।"

"আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুল্‌ডগের মতো—ধুতির



কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।"

"তা মানতেই হবে। পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না, অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক্‌ গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জমায়।"

"না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্‌, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারও নয়।"

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, "জয় নিবারণ চক্রবর্তীর! এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারও দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।"

"তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে।"

"না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।"

"আচ্ছা, কান-মলার কথা পরে স্থির করব; এখন শুনিয়ে দাও।"

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

"কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছে মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে কবিয়া যাব দান
তব জয়গান।
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।
এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।



লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণপরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে,
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।"

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না, সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বোরোবার আগেই লাব্যণ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা; কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে. তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায়, গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন ন'টা, অমিত দুম্‌দাম্‌-শব্দে ঘরে ঢুকেই "মাসিমা" "মাসিমা" করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন নি; বুঝেছিলেন, আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, "কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি।"

"ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা। সেখানে এক টেলিগ্রাম।"



অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''খবর সব ভালো তো?''

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, ''আজই সন্ধ্যেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।''

''তা ভাবনা কিসের বাছা। শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না।''

''সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।''

''আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খেপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরই।''

''না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।''

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই-যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝলে, যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলেছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, ''আমি হোটেলেই যাই আর জাহান্নমেই যাই, কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।''

অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মমে মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্‌বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল। লাবণ্যও ভাবলে, অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মাজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, ''তোমার কি সময় আছে। বেড়াতে যাবে?''

লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, ''না, সময় নেই।''

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, ''যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।''

লাবণ্য বললে, ''কর্তা-মা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোর বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম, আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।'' বলে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলে না। অমিত ও নীরস কণ্ঠ বললে, ''আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।''



এই বলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে,"বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক। নিশ্চয় ভেবেছে,ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকব। দাম বেশ-একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকানো থাকবে।"

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, "আর- কারও কথা অত করে তুমি ভাব কেন। নাহয় আর-সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ আমর্যাদা করতে সাহস করে না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, "বন্যা ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ, সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে, ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দরারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি; সেটা হচ্ছে ত্যাগের।"

"বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি তৈরি-জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি-ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ঐ ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই। ওরা কি একজন মাত্র। সেইজন্যেই তো তাজমহল কোনো দিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে —সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্ট কার্ডে লেখা—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,



নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেব, দরজা খুলবে না।"

"মিনতি রাখো মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী। কিন্তু তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু কোরো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা কোরো।"

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্-একটা উদ্‌বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের-দ্বন্দ্ব কাল সন্ধ্যেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, "তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল-পরিদর্শন। ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।"

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, "দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।" এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়। দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধরলে। জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখলে, ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের 'বলাকা'। তার নীচের পাতাটা ভিজে গেছে। একবার ভাবলে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো -ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছাপালার সীমান্তগুলি যেন ঘননীল আকাশে খুদে-দেওয়া ,জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে , আর থাকতে পারলে না , বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছল্‌ছলিয়ে। কাছে এসে বললে, "মিতা, তুমি কী ভাবছ।"

"এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।"

"মাঝে মঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না । তা তোমার উলটো ভাবনাটা কিরকম শুনি।"



"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার-ফলা-ওয়ালা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধ ঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।"

"ডায়মণ্ড্‌হার্বারের বাগনাটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর -বেচারাও গেল, তা যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কিরকম করবে। দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে আর আমি আর-একটাতে?"

"তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরানো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।"

"হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা।"

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছে থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়—বাযচাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, "শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছে করে।"

"এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়াচিঠি জুটল না। তার পরে থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ -খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী, বলো।"

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্‌ কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত-দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল। নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা



ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম, ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।''

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয় -মেলানো একটা বুনো ফল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, ''জান বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।''

''কেমন করে।''

''আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল, তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধূ, ঘরে এসো।

তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।''

বনফুলেব বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, ''মি.ং. আব নয়, সময় নেই।''

১৪

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, ''লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙ-সুদ্ধ, বাঙালি জানে। গভর্মেন্ট, আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট্ ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো! পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্জে —অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো! সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে , কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায়-ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা মোটা চুরুট থাকে, এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু, বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা



একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত, চুরি- বিদ্যের মতোই। তার সার্থকতার প্রমাণ হয়, যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে, 'অমিত বায়ের অমিতাচার'। মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতিশোধনের জন্যে কমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতিবিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চু রুটধূমাকৃত অত্যুক্তি -উদ্‌গারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহনা-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠে ছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকাব ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতি -সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পাববে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংবেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন-কি, তারযোগে অত্যন্ত বে-তার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি—কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউয়ের মতো কেথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, অবস্থাটা সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কোটির উৎসাহ অনেক বেশী। ভাবতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ, কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটাব দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জিমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও ; বিদ্যার্জনেব ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ কবেছিল,অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দাযমুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়, এইজন্যে আর্ট-সবস্বতীব অনুসবণে য়ুরোপেব অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল. এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পবিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেছে, এ দিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আবো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্রে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো—এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালায় রেজেস্ট্রি-বহিতে ওর গায়ে মাপ ও নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা, কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত



বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ -সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ্ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য সম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই -করা —বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স্। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশ গৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ; এখন মনে হয়, সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি -বা লক্ষ করে তাতে যেন আধ খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলের, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ-খুর-ওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগল-জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায় নি, কিন্তু ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে ,অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগ্‌বগ্ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও তার ভাবখানা পাকা,কোথাও কাঁচা—এরও তাই, খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ;পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্টমাসের প্লাম্ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে, এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালির কাছে সে নাচ শিখছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরষের জাত মারবার জন্যেই তার "স্পেশাল ক্রিয়েশন"। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে



আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদের সম্মাজর্নপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজেন্য মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জনতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়,সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়। এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, ‘‘দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইন গাছের মতো, হয়তো আগেকাব চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিং নয়।’

অমিত ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক্ নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন “mute insensate things”।

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওবা আশা করেছিল, লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝ গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়ো হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরে পাতায় লাবণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, ‘‘খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি।’’ খিদের জোগানটা কোথায় আর খিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই



সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, "চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।"কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর , আর তার গতিটা কোন্-অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেছে। মেয়ে-দুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল । সিসি গেল না।এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্য কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়ল, বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টক্ টক্ করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, "দুঃখিত।"

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, "কাকে চান আপনারা।"

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তক দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, "মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।"

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিট্রায়ে কোন জাতের জীব। বললে, 'তাঁকে তো আমরা চিনি নে।"

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়-হাসির রেখা। কেটি ঝাঁজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him।"

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "কর্তা-মাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।"

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে,"তোমার টীচার?"

"হাঁ।"

;"নাম বুঝি লাবণ্য?"

"হাঁ।"

"গট ম্যাচেস?"

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সরিমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, 'দেশালাই।'

সুরমা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইংরেজী পড়?"



সুরমা স্বী-ৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, "গবর্নেসের কাছে মেে ়া আর যাই শিখুক, ম্যানার্স শেখে নি।"

তা-র পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। "ফেমাস লাবণ্য। ডিল্লীশস। শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্ক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, ঐ ধার থেকে ও ধার। সিলি! মেন আর ফানি।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত-ধরনে-কাপড় পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া। কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে।

"সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্-এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।"

এই বলে টেবিলে অ্যালজেব্রার বইয়েরগায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রূপোর-শিকল-ওয়াল৷ প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে,অঞ্জনের পেন্সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের 'পরে । দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গেএসেছিল ঝাঁকড়া-চুলে-দুই-চোখ-আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি -নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, "নটি ডগ্।"

কোটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড় ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা,লাবণ্যর ইতিহসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, আমি সিসি, অমির বোন।"

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, "অমি আমাকে মাসি বলে. সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা।"

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, "এসো মা, ঘরে বসবে এসো।"

সিসি বললে, "সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।"



যোগমায়া বললেন, "এখনো আসে নি।"

"কখন আসবেন জানেন?"

"ঠিক বলতে পারি নে—আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।"

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, "যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়চ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালে জানেই না।"

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন, কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন, এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, "শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।"

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, 'লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।"

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্ক আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতার কেটির একটা গর্ব আছে। যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের। সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায়, সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখ-চোরা আপত্তি লুকিয়েছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রু এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত—"that much for it!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল, মাথায় ছিল ফেল্ট্ হ্যাট্, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ্, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে বিকেলে সাড়ে-চারটে বেলায় চা-পান-সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টো কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।



আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে— 'একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে রেখেছ—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।'

অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, 'ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি; কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নশ্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে।'

অমিত বাইবের দিকে তাকিযে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা পাঁচটা-ছটাব মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ কবে, যেমন বহুদিনেব জ্বোবো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটর মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুবাশা নির্লজ্জ।

বারান্দায় যে কোণটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল, নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্তেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল; সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্‌ভাবপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করে "মাসি" বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "মাসিমা, লাবণ্য কোথায়।"

"কী জানি বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।"

"এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।"

"বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।"

"চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।" যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলে।



সিসি একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল, "অপমান! চলো কেটি, ঘরে যাই।"

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, "কোনো ফল হবে না।"

"কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বললে, "হতেই হবে ফল।"

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, "চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, "এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।"

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন্ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, "মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।"

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁস্‌ফোঁসানিতে যুদ্ধের আশু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্রগর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব বিকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চিৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমাব কাছ থেকে এর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে আর দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি কবলে না। বললে, "আই কন্‌গ্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে। রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।"

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে, কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, "আজ বোরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ। আমি বলেছিলুম, বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ; আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।"

কেটি শান্ত স্বরেই বললে, "কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।"

"কী করতে হবে বলো।"



"নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যান্‌রা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমাকে দেখা পেলুম। বলো-না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose।"

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, "মনে পড়ছে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোনো পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসে ছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়। মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না, আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, "অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস্ করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সান্‌ডে স্কুলের বিধানমত ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন—এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো সিসি, কী অন্যায়।"

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি-কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

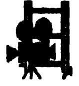
কেটি বললে, "অমিট, তুমি জান, এই হীরের অংটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।"

সিসি বললে, "বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই।"

"মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল—এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে, অমিটকে আর বাজি করতে পারব না। তা, এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে, সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিল কেন। সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না। এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।"

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে গেল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবীর সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে। তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি,



তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

কেটির তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল "মন্ আমী", ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে 'বঁধু'!

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না কী বলবে।

কেটি বললে, "বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট্। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।"

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেলকরা মুখের উপর দিয়ে দর্ দর্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা:

শিলঙে কার রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনাবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা ঠিক কঠিন হয়ে উঠল। সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল। আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে :

তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজও, তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, "বন্যা চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।"



অমিত ভয়ে ভয়েই বলেছিল; ভেবেছিল, লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, "চলো।"

দুজনে বেরোল। অমিত কিন্তু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না! চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, "একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন।"

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, "তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে বন্য। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ।"

লাবণ্য বললে, "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।"

অমিত বললে, "কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি, তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।"

"কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন। যে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি, ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক্ গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।"

"বলো, নিশ্চয় রাখব।"

"অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার, ওকে আমোদ দিতে পারবে।"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "আচ্ছা।"

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, "একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন; বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি উদ্‌ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।



সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই য়ুক্যালিপ্‌টাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞসা করলে, "ঘর খুলে দেব কি। ভিতরে বসবেন?" অমিত একটু দ্বিধা করে বললে," হাঁ।"

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্‌ফ্‌ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেন্‌সিল টেবিলের উপরে। পেন্‌সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্যমর বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন-কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন শুনতে পেলে শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান—বাছা। সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৭

শেষের কবিতা

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে, অমিতের এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড়োো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে "কেয়া" বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে



শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের ''নিরুদ্দেশ যাত্রা''। কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না। যতি বুঝতে পারে, আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর ''নিরুদ্দেশ যাত্রা''র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে,''অমিতদা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?''

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, ''লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে।''

''না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।''

''খবরটা সত্যি. কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।''

যতি হেসে বললে, ''এর মধ্যে ভুল বোঝার জায়গা কোথায়। বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।''

''দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায়, সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।''

যতি বললে, ''অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।''

''আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়; মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।''

'' তোমার বিশেষ মানেটাই বলো-না।''

''সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না,জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা তা হলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব। ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।''

''তা হলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব, আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ চলে না।''

''ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি। উপায় কী। তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক, চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।''

''তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে।''

''এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খতম করতে দোষ নেই।''

''ধরে নাও-না প্রাণের গরজেই।''

''শাবাশ, তবে শোনো।''



এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্নে সাহিত্যালোচনা সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বলে, "অক্সিজেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর এক ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?"

"সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।"

"যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।"

" তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।"

অমিত বললে, "একদিন আমরা সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্রো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমর আকাশও রইল।"

"কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না।"

"জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে মানুস অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁদিক থেকে মেলে রাজক্যনা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স্ সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোমান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি। কিছুতেই না। আমার রোমান্স্ আমিই সৃষ্টি করব। আমরা স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স্, আমার মর্তেও ঘটাব রোম্যান্স্। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোমান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও নদীর চর রইল আমার পাকা দখল। আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব, সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমরা লাবণ্যর জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।"

যতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তা ঠিক লাগল না । অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, "দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না-হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়—কথগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমর সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার

করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না।"

"যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—"

"তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

"তা হোক. শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খরব জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌছিয়ে দেবে?"

"দেব।"

অমিতর এই চিঠি:

সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা প'ড়েছে সেইদিন মরেছে—অতি সৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমাবই কবির উপব ভার দিলুম আমার শেয কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

মিতা

তা'ব পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে উইলিয়ম জেম্‌সের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতি শংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির একপাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছমাস পরে জৈষ্ঠমাসে রামগড়পর্বতের শিখরে, অপর পাতে .

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই-উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,



সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয়, অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়—
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো—কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগ-বেগে



ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই—
শূন্যেরে করিব পূর্ণ,এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান—
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

ব্যালাব্রুয়ি, বাঙ্গালোর
২৫ জুন ১৯২৮



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা......

১৯৫৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'শেষের কবিতা'র চলচ্চিত্ররূপের সমালোচনায় লেখা হয়—

একদিন যা সবাইয়ের মনে অভাবনীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তাকেই সবাইয়েরই কাছে মনোজ্ঞ করে তুলে ধরার একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব 'শেষের কবিতা'-র চিত্ররূপ। .....বাক্যের ছন্দাভরণকে যথাসম্ভব অলঙ্কৃত রেখে সোজা ভাবে একটি সহজ প্রেমের গল্পকে সামনে তুলে ধরায় চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা উভয় দিক থেকেই অসাধারণ শিল্পকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়।......আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক থেকে ছবিখানি বর্তমান বাংলা চিত্রশিল্পে গৌরব করার মতো প্রকাশ করেছে।

—ছায়াচিত্রে রবীন্দ্রকথা—নির্বাক থেকে সবাক যুগে—
সেরিনা জাহান-এর প্রবন্ধ থেকে গৃহীত তথ্য
(চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা; মে, ২০০৬ সংখ্যা)

১৯৫৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর যুগান্তর পত্রিকায় লেখা হয়—'কলা কৌশলের দিক থেকে 'শেষের কবিতা' চলতি বছরের একটি স্মরণীয় ছবি।

—অনুপম হায়াৎ—এর রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য



১

অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা : তুমি পঞ্চশর?

মদন : আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারী হিয়া
বেদনাবন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা : কী বেদনা কী বন্ধন
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব?

বসন্ত : আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা : প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ
দাসী দেব দরশনে।

মদন : কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবনকুসুম
অনঙ্গ- পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভদ্রে।

চিত্রাঙ্গদা : দয়া কর যদি,



উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরমকল্যাণীয়েষু

বৎস,

তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমাব কাবা এবং স্নেহ আশীর্বাদ দিলাম ১৫ শ্রাবণ ১২৯৯

মঙ্গলাকাঙক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব



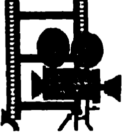
সূচনা

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগলভ্‌ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনেব জযযাত্রাব সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পবিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনেব ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতিব আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ ইচ্ছে তখনই মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভাবতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্ত নিযে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবাব আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

বৈশাখ ১৩৪৭ — *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব*

চিত্রাঙ্গদা



১৯৫৫ সাল

চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্র গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে একে নৃত্যনাট্যে রূপ দেন।

চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কাহিনীটি পরে কবি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'চিত্রাঙ্গদা' চলচ্চিত্র নির্মাণে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য উভয় 'চিত্রাঙ্গদা' র যোগ ঘটেছে। তাই এই গ্রন্থে পরপর দুটি চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল।

সাদা কালো। ৩৫ মি মি।

চিত্রনাট্য - বিনয় চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়।

পরিচালনা হেমচন্দ্র চন্দ্র ও সৌরেন সেন।

প্রযোজনা অশোক ফিল্মস্ লিমিটেড।

চিত্রগ্রাহক প্রবোধ দাস।

শিল্প নির্দেশনা- -সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা- -সুবোধ রায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—পঙ্কজ কুমার মল্লিক।

কণ্ঠদানে-পঙ্কজ কুমার মল্লিক, সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—নমিতা সেনগুপ্ত, সমীরকুমার, মালা সিন্হা, মিতা চ্যাটার্জী, জহর রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিবেশনা—ডিলাক্স ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্স লিমিটেড।

মুক্তি—১ লা এপ্রিল, ১৯৫৫, মেট্রো, উত্তরা, উজ্জ্বলা ও পূরবী।

○ 'চিত্রাঙ্গদা'-র চলচ্চিত্ররূপের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের কোন নৃত্যনাট্য অবলম্বনে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হল।



শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন : শুনিবারে রহিনু উৎসুক।

চিত্রাঙ্গদা : আমি চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না- -
দিয়াছিলা যেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈব তেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন : শুনিয়াছি
বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিদ্যা
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রঙ্গদা। তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাসচাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বসন্ত · সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী,
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা · এক দিন
গিয়েছিনু মৃগ অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য—অন্ধকার
লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা,
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে--নড়িল না, চাহিল না ফিরে।



উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না -সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে রোষদৃষ্টি
মিলাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালক মূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে আপনি-অটল মূর্তি হেরি',
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন : সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে। আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পূণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কী ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা : সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু, "কে তুমি?" শুনিনু উত্তর, "আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।"
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ! আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনিছিনু বটে, সত্যপালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্যদুরাশায় কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই



স্পর্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে।
কী ভাবিতেছিনু মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া ধীরে চলি গেলা
বীর, বন অন্তরালে। উঠিনু চমকি;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা, বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে--হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম
যদি।
পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অন্যভস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।
গোপনে গেলাম সেই বনে
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে

মদন . বলে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না
কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা : মনে নাই ভালো
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে--
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর।
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল
"ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"

পুরুষের ব্রহ্মচর্য!



ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে।
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বির্সজন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু—ছিল যা গর্বের ধন
এত কাল মোর—লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিস্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমলমৃণালবাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার এস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।

হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন : আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা-ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা : সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,



ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে, "এ কোন্ বালক,
পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো।"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্বাক ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিস্ফল।
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি,
নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি,
সেদিন কী দেখেছিল! শরমে কুঞ্চিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল
প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই? যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে,
চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি? কিন্তু হায়,
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে
বহু দিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ।
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও—জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী। দাও মোরে
সেই একদিন· তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।—যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে



অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

মদন : তথাস্তু।

বসন্ত : তথাস্তু। শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।

২

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়

অর্জুন

অর্জুন : কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান করে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত-অঞ্চলে।
সেথা তরু অন্তরালে
অপরাহ্ণবেলাশেষে ভাবিতেছিলাম
আশৈশবজীবনের কথা; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখসুখ উলটি পালটি:
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত মানবের।
হেনকালে ঘনতরু-অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল
সরোবরে সোপানের শ্বেত শিলাপটে।
কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে
ধরাতলে কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে



সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতুহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন।
চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি   যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হল দুটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদপদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর



ভুবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।
আর এক বার যদি—কে দুয়ার ঠেলে।

দ্বার খুলিয়া

এ কী! সেই মূর্তি! শান্ত হও হৃদয়!
কোনো ভয় নাই মোরে বরাননে! আমি
ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত দুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা : আর্য, তুমি অতিথি আমার।
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি।

অর্জুন : অতিথি-সৎকাব
তব দরশনে, হে সুন্দরী! শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্রাঙ্গদা : শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জুন : শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্তজনে করিয়া বঞ্চিত।

চিত্রাঙ্গদা : গুপ্ত এক
কামনা-সাধনা-তরে একমনে করি
শিবপূজা!

অর্জুন : হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন। সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপমাঝে
যেখানে যা-কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রঙ্গদা : ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যারে চাহি।

অর্জুন : হেন
নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে



করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।
কহো নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা : জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জুন : মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়, ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যার কোরো না উপাসনা, এ দুলর্ভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহো শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।

চিত্রাঙ্গদা : পরকীর্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী!
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবনমাঝে
রাজবংশচূড়া।

অর্জুন : কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা : সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ?

অর্জুন : বলো, শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা : অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারীহৃদয় পূর্ণ করি। ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য তব?
তবে মিথ্যা এ কি?
মিথ্যা সে অর্জুন নাম? কহো এই বেলা
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জুন : অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য



হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।

চিত্রাঙ্গদা : তুমি পার্থ?

অর্জুন : আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা : শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ।

অর্জুন : তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা : ধিক্ পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত। মুহূর্তেকে সত্যভঙ্গ
করি অর্জুনের কবিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জুন : খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া, বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টিশতদল



দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে। আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ। কৈলাসশিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত, তৃষিত, তাপিত,
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুরসরসীর সলিলের পানে,
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত-অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণমৃণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে, কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মতো। মনে হল ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া
দিলেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্তজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক-আলোক-মাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ।

চিত্রাঙ্গদা : আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ হায়,
কোন্ দেবের ছলনা। যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যার কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

৩

তরুতলে চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা : হায় হায়, সে কি ফিরাইতে পারি। সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের



দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমার; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গে টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপহুতাশনে
ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে
মারি।

মদন : বলো, তম্বী, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কী সাধিল
কাজ শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা : কাল সন্ধ্যাবেলা
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তেব ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে শুয়েছিনু আনমনে,
রাখিয়া অলস শির বামবাহু 'পরে
ভাবিতেছিলাম গতদিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জুনের মুখে
আনিতেছিলাম তাহা মনে ; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু লয়ে
করিতেছিলাম পান ; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব ইতিহাস, গতজন্মকথাসম।
যেন আমি রাজকন্যা নহি ; যেন মোর
নাই পূর্বপর; যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

বসন্ত : একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরী।

মদন : সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের



তানে, গুঞ্জরি, কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বলো।

চিত্রাঙ্গদা : ভাবিতে ভাবিতে
সর্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণশাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য আবেশে
মোর গৌরতনু 'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কত ক্ষণ। হেনকালে
ঘুমঘোরে কখন করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গলির মতো পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি উঠিনু জাগি।
দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থিরপ্রতিমূর্তিসম। পূর্বাচলহতে
ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী, সমস্ত হিমাংশুবাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লাননূতন শুভ্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া; সুপ্ত বায়ু;
শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকারে পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেইমতো চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া, দীর্ঘকায় বনস্পতিসম,
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর।

প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারি দিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্ এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে,
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণীতীরে।



দাঁড়ান উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শতজন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহো লহো, যাহা কিছু আছে
সব লহো জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে। চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।
প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সংগীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর;
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। নিপতিত
উন্নত ললাটপটে অরুণের আভা;
মর্তলোকে যেন নব উদয়পর্বতে
নবকীর্তি-সুর্যোদয় পাইবে প্রকাশ।
উঠিনু শয়ন ছাড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে। দেখিলাম চতুর্দিকে
সেই পূর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নবপ্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াএস্তা হরিণীর মতো।
বিজনবিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্দন।

মদন : হায়, মানবনন্দিনী,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধরসম্মুখে—
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,



নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

চিত্রাঙ্গদা : কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার-সম, সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি।
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে ঝরে পড়ে যাবে অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর ;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন
কী অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। সে প্রেমদৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা—সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম, চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারী-হৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

মদন : কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কূলের সম্মুখে
এসে আশার তরণী, গেছে ফিরে ফিরে
তরঙ্গ-আঘাতে?

চিত্রাঙ্গদা : কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করি নি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,



আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙক্ষা-তীর্থ
বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

মদন : যদি ফিরে লই,
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভবে
চমকিয়া, কী আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রাঙ্গদা : সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি আমি রব।
সেও ভালো, ইন্দ্রসখা।

বসন্ত . শোনো মোর কথা।
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

৪

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা : কী দেখিছ বীর।

অর্জুন : দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত



ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

চিত্রাঙ্গদা : কী ভাবিছ।

অর্জুন : ভাবিতেছি অমনি সুন্দর ক'রে ধ'রে,
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে,
প্রবাস দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে
অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া
অক্ষয় আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা : এ প্রেমের গৃহ আছে?

অর্জুন : গৃহ নাই?

চিত্রাঙ্গদা : নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে।

অর্জুন : এই শুধু?

চিত্রাঙ্গদা : শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন।
আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই হও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।
দিন গেল।



এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু 'পরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক অধরের সুখসম্মিলনে
ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এসো বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জুন : ওই শোনো
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

৫

মদন ও বসন্ত

মদন : আমি পঞ্চশর, সখা; এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয়, এক শরে বিরহ মিলন
আশা ভয় দুঃখ সুখ এক নিমেষেই।

বসন্ত : শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা। হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ করো রণরঙ্গ তব; রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন। মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিবাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও সখা।

মদন : জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি বহুকাল ধরে
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে হুহু করি কোথা
যেতেছে উড়িয়া চ্যুত পল্লবের মতো
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।



৬

অরণ্যে অর্জুন

অর্জুন : আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা : কী ভাবিছ।

অর্জুন : ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে পঞ্চ ভ্রাতা মিলে
চিত্রক-অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝরকলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্ক পরে, দিয়ে যেত
আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সঙ্গী পণ করি মোরা সন্তরণে
হইতাম পার বর্ষার সৌভাগ্যগর্বে
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেইমতো বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা : হে শিকারী,
যে-মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই



হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণ মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা? নহে, তাহা নহে। এ বন্য হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধবি।
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন
স্বপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে-- শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ-'পরে,
তুব সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়---তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেইমতো খেলা, আজি বরষাব দিনে;
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি; যত শর, যত অস্ত্র আছে তুণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিতে আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টিবরিষন, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

৭

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা : হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে
সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতো
রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে।
আপনার গতিগর্বে মত্ত মৃগী আমি
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহতপ্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়---এক দণ্ড
স্থির হলে পাছে ক্রন্দনে হৃদয় ভ'রে
ফেটে পড়ে যায়।



মদন :
থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছুটুক ফুটুক বাণ,
টুটুক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও, করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জর করে দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

৮

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন :
কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা :
প্রশ্ন কেন। তবে কি আনন্দ মিটে গেছে।
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়।
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জুন :
কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা :
তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জুন :
তাই সদা হারাই-হারাই
করে প্রাণ; তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।



নামধামগোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

চিত্রাঙ্গদা : নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবার চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জুন : তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা : এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্ত এরি
মাঝে? হায় হায়, এখন বুঝিনু পুষ্প
স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে,
পার্থ। যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে
বার বার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে তৃষিত ভৃঙ্গের মতো।

৯

বনচরগণ ও অর্জুন

বনচর : হায় হায়, কে রক্ষা করিবে।

অর্জুন : কী হয়েছে।

উত্তর-পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জুন : এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর : রাজকন্যা



চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জুন : এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর : এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

। *প্রস্থান*

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা : কী ভাবিছ নাথ।

অর্জুন : রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা : কুৎসিত, কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার- এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু যেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জুন : কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা · ছি ছি, সেই
তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা -শুধু সুমধুর ছলে
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে, বেঁকে, বেঁধে, হেসে কেঁদে,
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা-
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীর্তি, বীর্যবল, শিক্ষাদীক্ষা তার।
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে;
ওই দেবালয়মাঝে হেসে চলে যেতে।
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ!



এসো নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্নশয়ন
কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এসো, নাথ, বিরল বিরামে।

অর্জুন : আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা : কেন নাথ।

অর্জুন : শুনিয়াছি দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা : কোনো ভয় নাই প্রভু।
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

অর্জুন : তবু আজ্ঞা করো প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধ্যমে, ক্ষীণকীর্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রাঙ্গদা : যদি আমি
নাই যেতে দিই? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন
করে যাবে? তাই যাও। কিন্তু মনে রেখো
ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি
হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা;
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারো তরে
বসে নাহি থাকে; সে কাহারো সেবাদাসী



নহে; তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভুঁয়ে;
সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চিরদিন
রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এসো নাথ, বসো। কেন আজি
এত অন্যমন। কার কথা ভাবিতেছ।
চিত্রাঙ্গদা? আজ তার এত ভাগ্য কেন।

অর্জুন ·	ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত। কী অভাব তার।

চিত্রাঙ্গদা .	কী অভাব তার? কী ছিল সে অভাগীর?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুদ্যমান রমণীহৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী; সংগোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি। কী অভাব তার!
অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত
উষার মতন, যে-রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্যশৈলশৃঙ্গ-'পরে নিত্য-একাকিনী
কী অভাব তার! থাক্ থাক্ তার কথা;
পুরুষের শ্রুতিসুমধুর নহে তার
ইতিহাস।

অর্জুন ·	বলো বলো। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;



প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।

চিত্রাঙ্গদা : কী আর শুনিবে।

অর্জুন : দেখিতে পেতেছি তারে-
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মতো চারি দিকে আপনার
বৎসগনে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ-'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া
রমণীর কমনীয় দুই বাহু-'পরে
স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণকিঙ্কিণী।
অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।
এসো এসো, দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিযা
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রাঙ্গদা হে কৌন্তেয়,
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন করে ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ডসম--
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে। কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে



আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত—সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষ চোখে। থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি
দুদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পুরিয়া
করাইব পান; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে যাবে কর্মের সন্ধানে; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে।

অর্জুন : বুঝিতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম, প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্পযবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি। নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে ওঠে, মুহূর্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি; তার পরে



সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।—অশ্রু কেন
প্রিয়ে! বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?
তবে থাক্, তবে থাক্। ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর। এই-যে সংগীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্তসমীরে
এ যৌবনযমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে,
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে।

১০

মদন, বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদা

মদন : শেষ রাত্রি আজি।
বসন্ত : আজ রাত্রি-অবসানে
তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে গিয়ে তব ওষ্ঠরাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মতো নব জাগরণে।
চিত্রাঙ্গদা : হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে,
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের,
আচম্বিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে।
মদন : তবে তাই হোক। সখা, দক্ষিণ পবন
দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক উচ্ছ্বসি পুনর্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মত্ত স্রোত।
আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর



তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

১১

শেষ রাত্রি

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা : প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান। আর কিছু বাকি আছে?
আর কিছু চাও? আমার যা কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু!
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

প্রিয়তম ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্যপুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।
যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসারপথের
পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস বিক্ষতচরণ;
কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দু দণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়।
দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার



কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

সূর্যোদয়

অবগুণ্ঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা, প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নাহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমার ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি



পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুন : প্রিয়ে আজ ধন্য আমি।

কটক

২৮ ভাদ্র ১২৯৮

চিত্রাঙ্গদা

(নৃত্যনাট্য)



দৃশ্য

মণিপুর অরণ্য

মণিপুর প্রাসাদ

পাত্র

অর্জুন

চিত্রাঙ্গদা

সখীগণ

মদন

অর্জুনের বন্যপরিচর

গ্রামবাসীগণ

ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ করে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে
বর্ণবৈচিত্র্যে
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করি অভিভূত
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন
তখনই প্রবুদ্ধ মনের—কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।
এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা

এই নাট্যকাহিনীতে আছে—

প্রথম প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।

মণিপুর-রাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য-পরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারি ধারে।
এসো সুন্দর নিরলঙ্কার,
এসো সত্য নিরহঙ্কার—
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো আনো মুক্তি আনো—
ছলনার বন্ধন ছেদি
এসো পৌরুষ-উদ্ধারে।।



১

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার-আয়োজন

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরন্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝর-কলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী।
রেখে গেছে ঐ পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান।

বনপথে অর্জুন নিদ্রিত। শিকারের বাধা মনে ক'রে
চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন। অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা,
অর্জুনের যে করে অশ্রদ্ধা।
সে কোন্‌খানে পাবে তার আশ্রয়!
চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
বালকবেশী দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জুন। হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়
অহো কী অদ্ভুত কৌতুক!

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
ফিরে এসো, ফিরে এসো,
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান!
বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব—
অর্জুন! তুমি অর্জুন!।

হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা মহতের,
এল দেবতা তোর জগতের,
গেল চলি,



গেল তোরে গেল ছলি—
অর্জুন! তুমি অর্জুন!।

সখীগণ। বেলা যায় বহিয়া, দাও কহিয়া
কোন্ বনে যাব শিকারে।
কাজল মেঘে সজল বায়ে
হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে।।

চিত্রাঙ্গদা। থাক্ থাক্, মিছে কেন এই খেলা আর
জীবনে হল বিতৃষ্ণা,
আপনার' পরে ধিক্কার।।

আত্ম-উদ্দীপনাব গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় আয় রে আমার
শুক্‌নো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা.
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক সারা।
যাবার যাহা যাক সে চ'লে
রুদ্র নাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের' পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে—
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুটল নিরুদ্দেশে —
পরান আমার জাগল বুঝি
মরণ-অন্তরালে।।

সখী। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে
কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে।।

চিত্রাঙ্গদা। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!



বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যালোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে—
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সঙ্গীতশূন্য বিষণ্ন মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে
বরমাল্যখানি তব আনো বহে, তুমি আনো বহে।
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।।

প্রস্থান

বন্য অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান

যাও যাও যদি যাও তবে,
তোমায় ফিরিতে হবে
হবে হবে।
ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে, লুটাবে না।
বাতি নিবায়ে যাব না, যাব না, যাব না
জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে
শক্তি আমার হবে মুক্ত
দ্বার যদি রুদ্ধ রহে।
বিমুখ মুহূর্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গৌরবে।।

চিত্রাঙ্গদার সখীসহ স্নানে আগমন

চিত্রাঙ্গদা। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি
অতল জলের আহ্বান।



মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
মন রয় না—
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল, ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে,
এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়
করে রোমাঞ্চ দান—
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান।।

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে
নূতন আভরণে।
হেমন্তের অভিসম্পাতে
রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি—
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন
নব লাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক
পল্লব-আবরণে।
সখীগণ। বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক
হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে।।

সকলের প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন
তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

চিত্রাঙ্গদা। আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন।।



অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়—আমায়,
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে—
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।।

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর!
ধিক্ বাহুবল!
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তের করিল ব্যাকুল।।

—

রোদন-ভরা এ বসন্ত
সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো
কিংশুকরক্তিমরাগে।

সখীগণ। তোমার বৈশাখ ছিল
প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন বাদল
আনে আষাঢ়ের পালা
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা,
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।
সখীগণ। কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা
নামিল অশ্রুঢালা
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। দক্ষিণসমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত



আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

সখীগণ। মৃগয়া করিতে
বাহির হল যে বনে।
মৃগী হয়ে শেষে
এল কি অবলা বালা।
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে।।

সখীগণ। যে ছিল আপন
শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে
হার মানিবার ডালা।
হায় হায় হায়।।

একজন সখী। ব্রহ্মচর্য!—
পুরুষের স্পর্ধা এ যে!
নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে,
দাও তারে অবলার বল।।

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজা-নিবেদন

চিত্রাঙ্গদা। আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে, পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু, তারি ফুলে
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে।
তোমার রণজয়ের অভিযানে



তুমি আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো দিয়ো—
রণজয়ের অভিযানে।
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি—জয়ধ্বনি—
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে
দক্ষিণবায়ে।।

মদনের প্রবেশ

মদন। মণিপুরনৃপদুহিতা
তোমারে চিনি,
তাপসিনী।
মোর পূজায় তব ছিল না মন,
তবে কেন অকারণ
তুমি মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুনি,
তাপসিনী।।

চিত্রাঙ্গদা। পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা
কুসুমধনু—
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু
অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী—
ফিরাইল, গেল ফিরে।
দয়া করো অভাগীরে—
শুধু এক বরযের জন্যে
পুষ্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
মর্তে অতুল্য।।

মদন। তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—
দিবে মন মোহি,



নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে,
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রূপহাসে।
মণিপুররাজকন্যা
কান্তহৃদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা।।

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাস-হারা!
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন,
বিশ্বের অপরিচিত আমি।
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তার পরে ধূলিশয্যা,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা।।

সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
পুষ্পবিকাশের সুরে
দেহমন উঠে পূরে,
কী মাধুরী সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি।।

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি।



এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!
ক্ষণিক যৌবনবন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া
উন্মাদ করেছে মোরে।।

নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগার দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে
এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে
দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—
নাহি নাহি কথা।।

এরে ক্ষমা কোরো সখা—
এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,
শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে,
আঁখি ভুলাতে।
মায়াপুরী হতে এল নাবি,
নিযে এল স্বপ্নের চাবি,
তব কঠিন হৃদয়-দুয়ার খুলাতে,
আঁখি ভুলাতে।।

প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও,



অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙক্ষার পূর্ণতা।।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
বলো কোন্ নামে করি সৎকার।।

অর্জুন। পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা,
নৃপতিকন্যা।
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্তি,
লহো পৌরুষগর্ব।
লহো আমার সর্ব।।

চিত্রাঙ্গদা। কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,
এর কাছে মানিবে কি হার—
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে মায়াময়ী—
পিঞ্জর রচিবে কি
এ মরীচিকার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
লজ্জা, লজ্জা, হায় এ কী লজ্জা—
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।।

অর্জুন। হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।
পৌরুষের সে অধৈর্য
তাহারে গৌরব মানি আমি।
আমি তো আচারভীরু নারী নহি
শাস্ত্রবাক্যে-বাঁধা।
এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম
বহন করুক আমাদের
অজানার পথে।।

চিত্রাঙ্গদা। তবে তাই হোক।
কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই-যে দুলিছে
একটু শিশির—তুমি যারে করিছ কামনা



সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিনী।।

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে
ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি
স্বর্গে কৌতুক-খেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে,
নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে,
মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।

যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি
রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া
মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে
মিলাবে ধুলার তলে
কার অবহেলায়।।

অর্জুন। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
শুধু একা পূর্ণ তুমি,
সর্ব তুমি,
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,

অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,
এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান,
সব সাধনার তুমি
শেষ পরিণাম।।

চিত্রাঙ্গদা। সে আমি যে আমি নই, আমি নহ—
হায় পার্থ, হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।



যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও।।

প্রস্থান

অর্জুন। এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা, পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে
সর্বাঙ্গ টুটিয়া।।

অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে
বেদন-ঢালা।
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,

মবণ—সুতোয় গাঁথল কে মোর
বরণমালা।
চেনা ভুবন হারিয়ে গেল
স্বপন-ছায়াতে
ফাগুন-দিনের পলাশরঙের
রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা,
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার
যাবার পালা।।

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন—
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্‌,
আর কতখন।



শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ।
সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ।
জীর্ণ কোরো না, কোরো না,
যা ছিল নূতন।।

মদন। না না না সখী, ভয় নেই, ভয় নেই—
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ
রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ
নবতর ছন্দস্পন্দন।।

প্রস্থান

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসুম-চয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে,
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহারা নয়নে।।

প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা।



এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ। হো, এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,
মল্ল পল্লী হতে চল্,
'জয় চিত্রাঙ্গদা' বল্,
বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি।
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী। তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা,
বাহুবলে তিনি রাজা।
তাঁর নামে ভেরী বাজা,
'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।।

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের' পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়।।

প্রস্থান



চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ।।

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শুনি স্নেহে সে নারী,
বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে
সিংহবাহিনী।
জান যদি বলো প্রিয়ে,
বলো তার কথা।।

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি কুৎসিত কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
কীণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ
কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা,
নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গির সঙ্গীতলীলা
ইঙ্গিতছন্দমধুর।।

অর্জুন। আগ্রহ মোর অধীরে অতি—
কোথা সে রমণী বীর্যবতী।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে—
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা।।

সখীগণ। নারীর ললিত লোভন লীলায়
এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি,
সে কি স্বপ্নে দান,
সে কি সত্যের অপমান।



দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ
পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান।
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন সমান ছিন্ন
করি ফেলে ধূলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি সখা, ক্ষুব্ধ করিবে
লুব্ধ পুরুষপ্রাণ,
হানিবে নিঠুর বাণ।।

অর্জুন। যদি মিলে দেখা
তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি
আর্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে।
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝনন্নন ঝনন্নন ঝঞ্ঝনা বাজে।
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী।।

চিত্রাঙ্গদা। ভাগ্যবতী সে যে,
এতদিনে তার আহ্বান
এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাতি
হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে
দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী
ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন।।

অর্জুনের প্রতি

সখী। রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা



দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,
সরল উন্নত বীর্যবন্ত অন্তরের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ-তরু-সম—
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।
রজনীর নর্মসহচরী
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
যেন বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয়, বীরোত্তম।।

৫

চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা। লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর,
হে অনঙ্গদেব।
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
এই মিথ্যার জাল,
হে অনঙ্গদেব।
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা—
অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
অশোকবনে, হে অনঙ্গদেব।
যাক যাক যাক এ ছলনা,
যাক এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব।।
মদন। তাই হোক, তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,
দেখা দিক শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ—
দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক
মোহনির্মোক।।

প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে,



আভরণে আজি আবরণ কেন রবে।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে।
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আভবণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহার দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে।
বাহির-বাঁধনে বাঁধিয়ে কি বন্ধুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে।।

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম,
এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে
আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার
শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান
আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান।
আজি পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।।

সখী। হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি
সৌন্দর্যের ডালি
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে
বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা



তবে আজ্ঞা করো প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি
থাক্ পড়ে মন্দির-বাহিরে।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও
সেবিকার পানে।।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সঙ্কটে সম্পদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।।
অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি।।

সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপ-ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে,
এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন।
উদ্‌বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন।
আনো নব পল্লবে
নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি' বল্লরীবন্ধন।।

———



এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে—
আনো মুহু মুহু নব তান,
আনো নব প্রাণ,
নব গান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তরে
নিবিড় চেতনা।
আনো নব উল্লাসহিল্লোল,
আনো আনো আনন্দছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল,
আনো আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।
এসো থরথর-কম্পিত
মর্মরমুখরিত
মধুসৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।

এসো বিকশিত উন্মুখ,
এসো চিরউৎসুক,
নন্দনপথচিরযাত্রী।
আনো বাঁশরিমন্দ্রিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র
নিয়ে এসো।

এসো অরুণচরণ কমলবরন
তরুণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে,
সুখসুপ্ত সরসীনীরে।
এসো তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে,
সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এসো জাগরমুখর প্রভাতে,
এসো নগরে প্রান্তরে বনে,
এসো কর্মে বচনে মনে।
এসো মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে,
এসো গীতমুখর কলকণ্ঠে।



এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এসো কোমল কিশলয়বসনে।
এসো সুন্দর, যৌবনবেগে।
এসো দৃপ্ত বীর, নব তেজে।
ওহে দুর্মদ, করো জয়যাত্রা
চলো জরা-পরাভব সমরে—
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে।।

অর্জুন। মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব।
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নি হন্মি তে মনঃ।

চিত্রাঙ্গদা। যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

উভয়ে। অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি।।

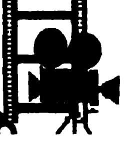
৮ ফাল্গুন ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা 





কাবুলিওয়ালা



❑ ১৯৫৭ সাল।

কাবুলিওয়ালা—রবীন্দ্র ছোট গল্প। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১১রিল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—তপন সিংহ।

প্রযোজনা—চারুচিত্র।

চিত্রগ্রাহক—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা—সুবোধ রায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—রবিশংকর।

কণ্ঠদানে—দেবযানী সেন, বনশ্রী মুখোপাধ্যায়, মালবিকা চৌধুরী, শুক্লা সেন।

অভিনয়ে— কাবুলিওয়ালা—ছবি বিশ্বাস, মিনি—টিঙ্কু ঠাকুর, মিনির বাবা—রাধামোহন ভট্টাচার্য, মিনির মা—মঞ্জু দে। এছাড়া জীবেন বোস, জহর রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিবেশনা—ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

মুক্তি—৪ জানুয়ারী, ১৯৫৭, রূপবাণী, অরুণ ও ভারতী।

- তপন সিংহ পরিচালিত প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'কাবুলিওয়ালা'।
- রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ঠাকুর পরিবারেরই মেয়ে টিঙ্কু ঠাকুর মিনি চরিত্রে অভিনয় করেন।

পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র—রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ১৯৫৬।

আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (বাংলা)—রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ১৯৫৬।

সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বার্লিন, ১৯৫৭ তে রৌপ্যভল্লুক— শ্রেষ্ঠ আবহ সঙ্গীতের জন্য।

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে ! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা : মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া



আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়কী কোথায় গেল।"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম- -সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্‌ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।



দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত,

"হাঁতি।"

অর্থাৎ, তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না। অথচ কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উল্‌টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে ; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ বা পদব্রজে ; কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চক্‌মকি ঠোকা বন্দুক কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক ; রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলে তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই



পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়োপোকা আরশোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশিদিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাস ব্যবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে। অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামা-পায়জামা পরা সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন দেখি মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে ; বেলা বোধ করি আটটা হইবে, মাথায় গলাবন্ধ জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত-- মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।



রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব, হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকাব করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষাব পরে এই শরতের নূতন ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায় গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমন-কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে ; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে ; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি?"



সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক বাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে কবিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল, "আপনার বহুত দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফেটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী



ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা-চেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস্?"

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না, রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে- তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমাব মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও ; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক কাহিনী নিয়ে ছবি কবার খুব ইচ্ছে হল। যোগাযোগটাও ঘটে গেল হঠাৎ। পরিবেশক-প্রযোজক অসিত চৌধুরি আমাকে অফার দিলেন ববীন্দ্রনাথের 'কাবলিওযালা' কববার। আমি তো ওঁর প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠলাম। মনে মনে ভাবলাম, ববীন্দ্রনাথেব গল্প নিয়ে ছবি করার জন্য একজন প্রযোজক নিজে থেকে আমার কাছে এসেছেন অফার নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর কথায় রাজি হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ যে আমার আদর্শ। ছেলেবেলা থেকেই আমার অমোঘ আকর্ষণ ছিল ওঁর প্রতি। ভেবেছিলাম, পরিচালনার কাজ শুবু করব রবীন্দ্রনাথের কোনো কাহিনি নিয়ে। প্রথমে না হলেও চতুর্থ প্রয়াস হিসেবে সুযোগ পেলাম রবীন্দ্র-কাহিনির চিত্ররূপ দেবার। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আমার জীবন আবর্তিত হচ্ছে তখন। আমি তাঁর একলব্য শিষ্য। আমার জীবনের ধ্রুবতারা তিনি। আমি তাঁকে পেয়ে ধন্য।......

চ্যালেঞ্জ নিয়ে লিখতে শুবু কবলাম 'কাবলিওয়ালা'র চিত্রনাট্য। আমাকে অনেকেই বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প ছবিতে ট্রান্সফার করা খুব শক্ত। কিন্তু তা নয়, রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে বুঝে তাঁর



বক্তব্য আত্মস্থ করতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে তার আগে রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে জানতে হবে। তাঁকে বোঝার অনুভূতি যাঁদের নেই, তাঁদের কাছে রবীন্দ্র-কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণের কাজটা স্বভাবতই খুব কঠিন মনে হবে। 'কাবুলিওয়ালা' ছবির অতিরিক্ত সংলাপের জন্য সাহায্য নিলাম সাহিত্যিক, কবি, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের। তার আগে আমি নিজেই সংলাপের কাজটা সেরে রেখেছিলাম চিত্রনাট্যে। সংলাপ ছাড়া তো চিত্রনাট্য হয় না। লিরিক্যাল ছবি বলেই বিশেষ কিছু দৃশ্যের সংলাপের কথা ভেবে প্রেমেনদার কাছে যাওয়া। তাছাড়া, চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রে নতুন কিছু করার কোন দরকার ছিল না। কাহিনির মূল ব্যাপারটা তো করে রেখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাঁকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে তাঁর স্পিরিটটা বজায় রেখে কাজ করতে পেরেছি, সেটাই তো বড় কথা। আর তাতেই সাফল্য। আসলে, কাহিনিটা রবীন্দ্রনাথের, আমি শুধু তার চিত্ররূপ দিয়েছি সিনেমায়। এটা তো ঠিক অনুবাদের ব্যাপার না, এ হল এক মাধ্যম থেকে আর এক মাধ্যমে রূপান্তরিত করা। রবীন্দ্রনাথ যদি এ কাহিনিটা না লিখতেন, তা হলে তো 'কাবুলিওয়ালা' ছবি হত না।

এ ছবির শিল্পী নির্বাচনের সময় নাম ভূমিকায় অর্থাৎ কাবুলিওয়ালা রহমতের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের কথাই মনে হল আগে। ওঁকে ছাড়া ভাবাই যায় না আর কোনো অভিনেতাকে। তাই প্রথম যখন ছবিদাকে এই রোলটা করতে বলি, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান তিনি। খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর চরিত্রটা। প্রাণ দিয়ে কাজ করেছিলেন বলেই এত প্রাণবন্ত হয়েছিল। এই চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর খ্যাতিও হয় গোটা পৃথিবী জুড়ে। ছবিদা অত্যন্ত বড় মাপের অভিনেতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কোনও আন্তর্জাতিক মানের অভিনেতার সমকক্ষ ছিলেন তিনি। সে আমলের লায়নেল ব্যারি মুর বা জন ব্যারি মুরের মতো বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন ছবিদা। যে কোনো চরিত্রে অসামান্য হয়ে উঠতেন তিনি। অভিনয় প্রতিভা ছাড়াও ছবি বিশ্বাস ছিলেন সুপুরুষ। চেহারা যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর তাঁর কণ্ঠস্বর। চেহারার মধ্যে ছিল একটা দারুণ আভিজাত্য, ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। কয়েক পাতার সংলাপ একবার দেখে নিলেই মুখস্থ হয়ে যেত। তখনকার দিনে ডায়লগ-ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ সংলাপধর্মী ছবি হত বেশি। অসম্ভব স্মৃতিশক্তি থাকায় দু-চার পাতার ডায়লগ মুখস্থ না করেই মনে রাখতে পারতেন।

ছবি বিশ্বাসের মতো অত বড় মাপের শিল্পীকে নিয়ে কাজ করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। তাঁর আচরণে কখনই মনে হয়নি যে তিনি সিনিয়ার আর্টিস্ট আর আমি জুনিয়ার ডিরেক্টর। যখন যেমন বলেছি, ঠিক তেমন অভিনয় করেছেন তিনি। আমার তো মনে হয়, 'কাবুলিওয়ালা' আমার ছবি নয়, ছবি বিশ্বাসের ছবি। ছবিদাই সব। আগাগোড়া তিনিই টেনে নিয়ে গেছেন ছবিটা।.. ....

এই ছবির অসাধারণ মিউজিক দিয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। ওঁর সঙ্গে কাজ করা এক বিরল অভিজ্ঞতা। সুরসৃষ্টি করার আগে ছবিতে আমি কী ধরনের মিউজিক চাইছি, তা অনেক আগেই জেনে নিতেন রবিশংকর। আমি ওঁকে বলি, আফগানিস্তান থেকে আসছে কাবুলিওয়ালা। একটা জিপসি টিউনিং করলে হয় না? রবিবাবু আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, ওই ধরনের টিউন করলে ক্যারেক্টরের সঙ্গে খুব ভাল ম্যাচ করবে। ভালই হল, আমি কাবুলে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে আপনার ছবির জন্য অনেক ফোক টিউন টেপ করে নিয়ে আসব।'

কথা রেখেছিলেন রবিশংকর। কাবুল থেকে ফিরে আমাকে স্পুলে ধরা আফগানিস্তানের অনেক ফোক টিউন শোনালেন। আমরা দুজনে বসে ছবির সিচুয়েশন অনুযায়ী টিউন নির্বাচন করলাম। তারপর ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক টেক করার সময়ে রবিবাবু সেসব টিউন ব্যবহার করলেন। আবহে তিনি রচনা করলেন কাহিনির যথার্থ পরিবেশ। সেইসঙ্গে সুরের মাধ্যমে তুলে ধরলেন ছবির মূল বক্তব্য ভালবাসা। আর ওই ভালবাসা দিয়েই একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলা যায় পৃথিবীর যে কোনো মানুষের সঙ্গে। যেমন কাবুলিওয়ালার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল মিনির।



অসিত চৌধুরীর চারু চিত্রমেব প্রযোজনায় ও ছায়াবাণীর পরিবেশনায় 'কাবুলিওয়ালা' ১৯৫৭ সালের ৪ জানুযারি মুক্তি পেল রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ও শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে। ছবিট মুক্তি পাওয়ার পর চারদিক থেকে প্রশংসা আসতে শুরু করল। হৈ চৈ পড়ে গেল সারা ভারতে। কলকাতার বাইরের যেসব জায়গায় বাংলা ছবি দেখানো হত না, সেখানে 'কাবুলিওয়ালা'র জয়জয়কার। বিশেষ করে মুম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, পুনে ইত্যাদি অঞ্চলে খুব সাড়া পড়ে গেল।

সত্যজিৎ রায় একদিন টেলিফোন করে বললেন, 'নিজে একজন টেকনিশিয়ান হয়ে ছবিটা টেকনিক্যালি এত খারাপ হল কী করে? এত ভালমানুষ হলে চলে না। কাজের সময়ে কোন কম্প্রোমাইজ করবেন না।'

কী করে বোঝাই আমার অসুবিধার কথা। কাউকে কোনো দোষারোপ না করে কলাকৌশলের কাজ খারাপ হওযার সব অপরাধ স্বীকার করে নিলাম নিজে।

বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'কাবুলিওয়ালা'র জন্য বেস্ট মিউজিক অ্যাওযার্ড পেলেন রবিশংকর। ভাল ছবির পরিচালক হিসেবে আমাকেও দেওযা হল সার্টিফিকেট অব মেরিট। বিদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশেও 'কাবলিওয়ালা' পেল বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল। তখন ক্যাশ-প্রাইজ ছিল না। বেস্ট ফিল্ম আর বেস্ট ডিরেক্টরের জন্য বরাদ্দ ছিল দুটো ফুলের তোড়া। তবে সেটাই তখন খুব সম্মানের ব্যাপার।

'কাবুলিওয়ালা'র দৌলতে যা সাফল্য পেলাম তা আগে তিনটি ছবিতে পাইনি। একেবারে অভাবিত। আমিও অভিভূত।



[illegible]

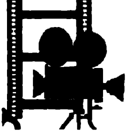
[illegible]

ছায়াবাণী রিলিজ





যোগাযোগ



❑ ১৯৫৮ সাল।

যোগাযোগ—রবীন্দ্র উপন্যাস। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি 'বিচিত্রা' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুই সংখ্যায় উপন্যাসটির নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। তৃতীয় সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের নাম দেন 'যোগাযোগ।' ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১৫ রিল। ৩৫ মি মি।

চিত্রনাট্য—বিনয় চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালনা—নীতিন বসু।

প্রযোজনা—রিদম প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চিত্রগ্রাহক—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা—সুবোধ রায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—হরিপ্রসন্ন দাস।

কণ্ঠদানে—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—বিকাশ রায়, ভারতী দেবী, মঞ্জু দে, অনিতা গুহ, উৎপল দত্ত, অসিতবরণ, সন্ধ্যা দেবী, বসন্ত চৌধুরী, জহর গাংগুলী প্রমুখ।

মুক্তি—২৫ এপ্রিল, ১৯৫৮, নিউ এম্পায়ার, রাধা ও পূর্ণ।

○ এর আগে নীতিন বসু ১৯৪৭ সালে রবীন্দ্র উপন্যাস 'নৌকাডুবি'-র চলচ্চিত্রায়ণ করেছিলেন। 'যোগাযোগ' নীতির বসু পরিচালিত দ্বিতীয় রবীন্দ্র উপন্যাস।

১

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হল বত্রিশ। ভোর থেকে আসছে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালাব আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান করলে দেখা যায়, ঘোষালবা এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের দিকে, তার পরে হুগলি জেলায় নুরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টুগীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায়, ঠিক জানা নেই। মরিয়া হয়ে যারা পুরানো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই দেখি, প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দিঘি পানা অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ সে দিঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্যে জমিদারের। কী করে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, খিটিমিটি বেধেছে চাটুজ্যে জমিদারের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পুজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্ধা করে চাটুজ্যেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল। চাটুজ্যেরা তার জবাব দিলে। রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে করে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু প্রতিমার দল তোরণ ভাঙতে বেরোয়, নিচু-প্রতিমার দল তাদের মাথা ভাঙতে ছোটে। ফলে, দেবী সেবার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিল। খুন জখম থেকে মামলা উঠল। সে মামলা থামল ঘোষালদের সর্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিবল, কাঠও বাকি রইল না, সবই হল ছাই। চাটুজ্যেদেরও বাস্তুলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দায়ে পড়ে সন্ধি হতে পারে, কিন্তু তাতে শান্তি হয় না। যে ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে ব্যক্তি কাত হয়ে পড়েছে, দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনো গরগর্ করছে। চাটুজ্যেরা ঘোষালদের উপর শেষ কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে



ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েছে, কেঁচো সেজেছে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল। কলঙ্কভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়ল ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্যভাবে বাসা বাঁধলে।

যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খসে পড়ে বলেই লাঠি তারা মনে মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চলে আসছে। মাঝে মাঝে চাটুজ্যেদের কেমন করে ওরা জব্দ করেছিল সত্যমিথ্যা মিশিয়ে সে-সব গল্প ওদের ঘরে এখনো অনেক জমা হয়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ করে শোনে। চাটুজ্যেদের বিখ্যাত দাশু সর্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বিশ-পঁচিশ জন লাঠিয়াল তাকে ধরে এনে ঘোষালদের কাছারিতে কেমন করে বেমালুম বিলুপ্ত করে দিলে সে গল্প আজ একশো বছর ধরে ঘোষালদের ঘরে চলে আসছে। পুলিস যখন খানাতল্লাসি করতে এল নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে বললে, হাঁ, সে কাছারিতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেছি, শুনলেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগি হয়ে চলে গেছে। হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বললে, হুজুর, এই বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের করে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাশুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার করলে একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে কবলে ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হল এক মাসেব জেল। যে তারিখে ছাড়া পেয়েছে ভুবন সেইদিন ম্যাজেস্টেরিতে খবর দিলে দাশু সর্দার ঢাকা জেলখানায়। তদন্তে বেরোল, দাশু জেলখানায় ছিল বটে, তার গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চলে গেছে। প্রমাণ হল সে দোলাই সর্দারেরই। তার পর সে কোথায় গেল সে খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়!

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেছে; তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা বলে এত বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও পোহায়। ঘোষাল-পরিবারে সূর্যোদয় দেখা দিল অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা-খাড়, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পইতে। ব্রাহ্মণ-মর্যাদায় প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পইতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।

মফস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চড়ে বসে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি--- যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন,সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল-দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।



বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুলমাস্টারি থেকে মোক্তারি ওকালতি পর্যন্ত ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ তার কোনো-না কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্যন্তই পিলপে-গাড়ি হয়ে রইল। তারা কেউ-বা আড়তদারের, কেউ-বা তালুকদারের দফতরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে বসে গেল। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্বস্বের উপর ভর করে মধুসূদন বাসা নিলে কলকাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা করেছিল পরীক্ষায় এ ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেল মারা। পড়বার বই, মায় নোটবই সমেত, বিক্রি করে মধু পণ করে বসল এবার সে রোজগার করবে। ছাত্রমহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি করে ব্যবসা হল শুরু। মা কেঁদে মরে- বড়ো তার আশা ছিল, পরীক্ষাপাসের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুকবে 'ভদ্দোর' শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে। তার পরে ঘোষাল-বশংদণ্ডের আগায় উড়বে কেরানিবৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই করতে পাকা, তেমনি তার বন্ধু বাছাই করবারও ক্ষমতা। কখনো ঠকে নি। তার প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিল কানাই গুপ্ত। এর পূর্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুচ্ছুদ্দিগিরি করে এসেছে। বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এরই মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাল বাঁধা, ফুলপাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া করে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙিয়ে পরিবেশন, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু ভারি খুশি। তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝলেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সিতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু-আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেলতে ফেলতে ব্যবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্‌যোগপর্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই বললে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ পূর্বজন্মের ইস্টিমেতেই এ জন্মের গাড়ি চলছে। মধুসূদন নিজে জানত যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করে নি বলেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়ে নি। যারা হিসেবের দোষে ফেল করতে মজবুত, পরীক্ষকের পক্ষপাতের 'পরে তারাই কটাক্ষপাত করে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারী। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেছে। গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিতকালবর্তী সম্পত্তিভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত করবার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না, মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভরলে তার পরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায়, মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক, পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর নেপাল থেকে এল বড়ো বড়ো শালকাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি-



বোম্বাই করোগেটেড লোহা। বাজারের লোক অবাক! ভাবলে, 'এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকল বলে!"

এবারও মধুসূদনের হিসেবে ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে-আকাশে কালিমা বিস্তার করলে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না করেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি-চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচিল-ঘেরা দোতলা ইমারত, গেটে শিলাফলকে লেখা 'মধুচক্র'। এ-নাম তার কলেজের পূর্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে ভয়ে এসে বললে, "বাবা, কবে মরে যাব, বউ দেখে যেতে পারব না কি?"

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর করলে, "বিবাহ করতেও সময় নষ্ট, বিবাহ করেও তাই। আমার ফুরসত কোথায়?"

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে মধুসূদনের এক কথা।

আরো কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফস্বল থেকে কলকাতায় উঠল। নাতিনাতনীর দর্শনসুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ করলে। ঘোষাল কোম্পানীর নাম আজ দেশবিদেশে, ওদের ব্যবসা বনেদি বিলিতি কোম্পানির গা ঘেঁষে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং বললে, বিবাহের ফুরসত হল। কন্যার বাজারে ক্রেডিট তার সর্বোচ্চে। অতিবড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন করবার মতো তার শক্তি। চার দিক থেকে অনেক কুলবতী রূপবতী গুণবতী ধনবতী বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌঁছোয়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ঐ চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নুরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্যের বাঁধ ভাঙছে। ছয়-আনি শরিকরা বিষয় ভাগ করে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তি অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে, ততই তার শস্য অংশ স্থূলভাবে উকিল-মোক্তারের আঙিনায় নয় ছয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হল না। নুরনগরের সে প্রতাপ নেই—আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। শতকরা ন টাকা হারে সুদের ন-পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারির চার দিকে জাল জড়িয়ে চলেছে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য-অপরাধের জরিমানা এখনো শোধ হয় নি। কর্তা থাকতেই চার বোনের বিয়ে হয়ে গেল কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হল কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন পার্সেন্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্সেন্টের গ্রন্থি পড়ল।



ছোটো ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসি, রোজগার না করলে চলবে না। সে গেল বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে পড়ল সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্যেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর-একবার বেধে গেল। ইতিহাসটা বলি।

বড়োবাজারের তনসুকদাস হালওয়াইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আসছে, কোনো কথা ওঠে নি। এমন সময়ে পুজোর ছুটি পেয়ে বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এল আত্মীয়তা দেখাতে। সে হল বড়ো অ্যাটর্নি-আপিসের আর্টিকেল্ড হেডক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি নুরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও কলকাতায় ফিরল আর তনসুকদাসও টাকা ফেরত চেয়ে বসল; বললে, নতুন চিনির কারবার খুলেছে, টাকার জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

সেই সংকটকালেই চাটুজ্যে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘটল দ্বন্দ্ব-সমাস। তার পূর্বেই সরকারবাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব পেয়েছে।

পূর্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বললে, নতুন রাজা খোশমেজাজে আছে, এই সময় ওর কাছ থেকে সুবিধেমত ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেল— চাটুজ্যেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাঁই করে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেন্ট সুদে। বিপ্রদাস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন বটে, তেমনি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটানোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করতে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড়ো না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হল না। যখন থেকে ওর বোঝবার বয়স হয়েছে তখন থেকে চার দিকে দেখছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো-দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ, তত বড়ো অপমান। কিছু করবাব নেই, কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা-কিছু ঘটে না কি? কোনো দেবতার বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্বজন্মের কোনো-একটা বাকিপড়া পাওনার এক মুহূর্তে পরিশোধ? এক-একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে, কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।'

বংশের দুগর্তির জন্য নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালোবাসা দেয় কঠিন দুঃখে নেংড়ানো ওর ভালোবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না বলে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে উপরওয়ালা যে স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা উৎসুক। ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর করে রেখেছে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন বলে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস



হেসে বলে, "কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য— তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাকত কোথায়?"

কুমুদিনী ঘরে পড়াশোনা করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আবছায়া- - সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখতে নেই; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়, অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে; মন্ত্র প'ড়ে পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগাতাবিজ প'রে, সে-জগতের শুভ-অশুভের সঙ্গে কারবার; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য-সংশোধনের আশা—সে আশা হাজারবার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অনেক সময়েই শুভলগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসংগতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব ভালো-মন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে, বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হল সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের বলেই গ্রহণ করেছিল- - সে তার পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরানো ধনী ঘরে পুরাতন কাল যে দুর্গে বাস করে তাব পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছোতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধবতে পাবেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বেব দৃষ্টি। ভারী গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পবিচরদের বুক থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয় তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট করা ফুর্‌ফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল-আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্‌বর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানা রকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক বল্লম বর্শা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুকাবরদারের জানা আছে, এদের কার সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়- বাঁধানো, আবাঁধানো, না গুড়গুড়ি। কর্তামহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধি।

বাড়ির আর এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালোদাগ ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিলটি-করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়া-পিঠওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠন, সমস্তই



হল্যাণ্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সব চেয়ে প্রাচীন ভূতে পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কবঞ্চিত বোবা।

মুকুন্দলালের যে শৌখিনতা সেটা তখনকার আদবকায়দাব অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তার মধ্যে যে নির্ভীক ব্যয়বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়ে নি, পাদপীঠ হয়ে আছে পায়ের তলায়। এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস দুই খুব টানা মাপের। এক দিকে আশ্রিতবাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর-এক দিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্তার বাগানের মালীর ছেলের কান মলে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান-বাবদ যত খরচ হয়েছে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাবকিয়ে তাকে শয্যাগত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি হয়েছিল বলে ছেলেটার উন্নতি হল। সরকারি খরচে পড়াশুনো করে সে আজ মোক্তারি করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথামত মুকুন্দলালের জীবন দুই-মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর-এক মহলে ইয়াবকি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম, আর এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা অর্চনা, অতিথিসেবা, পালপার্বণ, ব্রত উপবাস, কাঙালিবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, পাড়াপড়শি, গুরুপুরোহিত। ইয়ারমহল গৃহসীমাব বাইরেই, সেখানে নবাবি আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবত শিক্ষার উপায় বলে গণ্য করত। দুই বিরুদ্ধ হাওয়ার দুইকক্ষবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য করতে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরানী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হল না। তার কারণ ছিল। তিনি নিশ্চিত জানেন, বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক, তিনিই হচ্ছেন ধুয়ো, ভিতরে শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেইজন্যই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার 'পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবার তাই ঘটল।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক কলকাতা, কতক ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এল। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণযাত্রা, কোনোদিন বা কীর্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হত বৈঠকখানা ঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধছে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু-কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেল বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কী হচ্ছে দেখবার জো নেই বলে নন্দরানীর মন রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে আছড়ে আছড়ে কাঁদতে লাগল। ঘরে কাজকর্ম, লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো, দেখাশুনো হাসিমুখেই করতে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা নড়তে চড়তে কেবলই বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জানতে পারে না। ও দিকে থেকে থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক রানীমার।

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুরোল, বাড়ি হয়ে গেল খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা



খুরি-ভাঁড়ের ভগ্নাবশেষের উপর কাক-কুকুরের কলরবমুখর উত্তরকাণ্ড চলছে। ফরাসেরা সিঁড়ি খাঁটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিল, চাঁদোয়া নামাল, ঝাড়ের টুকরো বাতি ও শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিল। সেই ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী; সেখানে সর্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হয়ে উঠল যখন মুকুন্দলাল আজও ফিরলেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই বলেই নন্দরানীর ধৈর্য্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান্ খান্ হয়ে গেল।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পর্দার আড়াল থেকে বললেন, "কর্তাকে বলবেন, বৃন্দাবনে মা'র কাছে আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে। তাঁর শরীর ভালো নেই।"

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "কর্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত মাঠাকরুন। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন খবর পেয়েছি।"

"না, দেরি করতে পারব না।"

নন্দরানীও খবর পেয়েছেন আজকালের মধ্যেই ফেরবার কথা। সেইজন্যেই যাবার এত তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি-সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হয়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চলবে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েই দণ্ডদাতাকে পালাতে হচ্ছে। বিদায়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পা সরতে চায় না- -শোবার খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হল না।

তখন কার্তিক মাসের বেলা দুটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের সিসুতরুশ্রেণীর মর্মরের সঙ্গে মিশে কচিৎ গলাভাঙা কোকিলের ডাক আসছে। যে রাস্তা দিয়ে পালকি চলেছে সেখান থেকে কাঁচা ধানের খেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরানী থাকতে পারলেন না, পালকির দরজা ফাঁক করে সে দিকে চেয়ে দেখলেন। ও পারের চরে বজরা বাঁধা আছে, চোখে পড়ল। মাস্তুলের উপর নিশেন উড়ছে। দূর থেকে মনে হল, বজরার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা বসে; তার পাগড়ির তকমার উপর সূর্যের আলো ঝক্‌মক্ করছে। সবলে পালকির দরজা বন্ধ করে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে গেল।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ, সসংকোচে বন্দরে এসে ভিড়লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারী। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতিভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছে। যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহদাতা উদ্‌যোগকর্তা, তারা যদি সামনে থাকত তা হলে তাদের ধরে চাবুক কষিয়ে দিতে পারতেন। মনে মনে পণ করছেন আর কখনো এমন হতে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ এবং মুখের অতিশুষ্ক ভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস করে কর্ত্রীঠাকরুনের খবরটা দিতে পারলে না, মুকুন্দলাল ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। 'বড়োবউ মাপ করো অপরাধ করেছি, আর কখনো এমন হবে না' এই কথা মনে মনে বলতে বলতে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। মনে মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেন যে, অভিমানিনী বিছানায় পড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়বেন এই ভেবে ঘরে ঢুকেই দেখলেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দমে গেল। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরানীকে যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে, অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে মানিনী অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন।



কিন্তু বড়োবউ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝলেন, তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয়তো আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কিংবা হবে আরো দেরি। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনই মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় করবেন, নইলে জলগ্রহণ করবেন না। বেলা হয়েছে, এখনো স্নানাহার হয় নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাকতে পারবেন? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর বড়োবউমা কোথায়?"

সে বললে, "তিনি তাঁর মাকে দেখতে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেছেন।"

ভালো যেন বুঝতে পারলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবলেন, "কোথায় গেছেন?"

"বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।"

মুকুন্দলাল একবার বারান্দার রেলিং চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তার পরে দ্রুতপদে বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে একা বসে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আসতে কারও সাহস হয় না।

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে বললেন, "মাঠাকরুনকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিই?"

কোনো কথা না বলে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ করলেন। দেওয়ানজি চলে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে বললেন, "ব্রান্ডি লে আও।"

বাড়িসুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তার ভাঙাচোরা সহ্য করতেই হয়---এও তেমনি।

দিনবাত চলছে নির্জল ব্র্যান্ডি। খাওয়াদাওয়া প্রায় নেই। একে শবীর পূর্ব থেকেই ছিল অবসন্ন, তার পরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিল।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এল   দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখলে।

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন খেপে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকেব চক্রান্ত। ভিতরে ভিতবে একটা নালিশ গুমরে উঠছিল- এরা যেতে দিলে কেন?

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আসতে পারত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে; ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন---যেন মা'র সঙ্গে ওর চোখে কিংবা কোথাও একটা মিল দেখতে পান। কখনো কখনো বুকের উপরে তার মুখ টেনে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে থাকেন, চোখেব কোণ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কিন্তু কখনো ভুলে একবার তার মা'র কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এ দিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেছে। কর্ত্রীঠাকরুনের কালই ফেরবার কথা। কিন্তু শোনা গেল, কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেছে ভেঙে।

৭

সেদিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল। বাগানে মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠছে ক্রুদ্ধ অধৈর্য্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে চালাঘর তোলা হয়েছিল তার করোগেটেড লোহার চাল উড়ে দিঘিতে গিয়ে পড়ল। বাতাস বাণসিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ করে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে লেজ ঝাপটা দিয়ে পাক খেয়ে বেড়ায়। হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলাদরজাগুলো খড় খড় করে কেঁপে উঠল। কুমুদিনীর হাত চেপে ধরে মুকুন্দলাল বললেন, "মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিস নি। ঐ শোন্ দাঁতকড়মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আসছে।"



বাবার মাথায় বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, "মারবে কেন বাবা? ঝড় হচ্ছে; এখনই থেমে যাবে।"

"বৃন্দাবন? বৃন্দাবন.....চন্দ্র চক্রবর্তী! বাবার আমলের পুরুত—সে তো মরে গেছে—ভূত হয়ে গেছে বৃন্দাবনে। কে বললে সে আসবে?"

"কথা কোয়ো না বাবা, একটু ঘুমোও।"

"ঐ যে, কাকে বলছে, খবরদার, খবরদার!"

"কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্ছে।"

"কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কী দোষ করেছি, তুই বল্ মা।"

"কোনো দোষ কর নি বাবা। একটু ঘুমোও।"

"বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজত।

মিছে কর কেন নিন্দে,
ওগো বিন্দে **শ্রীগোবিন্দে**—"

চোখ বুজে গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগলেন।

"কার বাঁশি ওই বাজে বৃন্দাবনে।
সই লো সই,
ঘরে আমি রইব কেমনে!

রাধু, ব্রান্ডি লে আও।"

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, "বাবা, ও কী বলছ?" মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনো এ কথা ভোলেন নি যে, কুমুদিনীর সামনে মদ চলতে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধরলেন,

"শ্যামের বাঁশি কাড়তে হবে,
নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়তে হবে।"

এই এলোমেলো গানের টুকরোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়—মায়ের উপর রাগ করে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রাখে যেন মায়ের হয়ে মাপ-চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠলেন, "দেওয়ানজি?"

দেওয়ানজি আসতে তাকে বললেন, "ঐ যেন ঠক্ ঠক্ শুনতে পাচ্ছি।"

দেওয়ানজি বললেন, "বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্ছে।"

"বুড়ো এসেছে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র—টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এসো তো। কেবলই ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ করছে। লাঠি, না খড়ম?"

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিল। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হল। মুকুন্দলাল বিছানার চারি দিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বললেন, "বড়োবউ, ঘর যে অন্ধকার! এখনো আলো জ্বালবে না?"

বজরা থেকে ফিরে আসবার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ করলেন—আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরানী বাড়ির দরজার কাছে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়াল। সংসারে কিছুই তাঁর আর রুচল না। চোখের জল একেবারে



শুকিয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না- —বললেন, "আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োত ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হতে পারে?"

দূরসম্পর্কের ক্ষেমা ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "যা হবার তা তো হয়েছে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন বড়োবউ, ঘরে কি আলো জ্বালবে না?"

নন্দরানী বিছানা থেকে উঠে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাব, আলো জ্বালতে যাব। এবার আর দেরি হবে না।" বলে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনই যাত্রা করে চলেছেন।

সূর্য গেছেন উত্তরায়ণে; মাঘ মাস এল, শুক্ল চতুর্দশী। নন্দরানী কপালে মোটা করে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসি শাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চলে গেলেন।

৮

বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে দিয়েছে পোকায়। বিষয়সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে অল্প করে ডুবছে। ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপ ও চালচলন খাটো না করলে উপায় নেই। কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলই প্রশ্ন আসে, তার উত্তর দিতে মুখে বাধে। শেষকালে নুরনগর থেকে বাসা তুলতে হল। কলকাতায় বাগবাজারের দিকে একটা বাড়িতে এসে উঠল।

পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিল। চারি দিকে ফুলফল, গোয়ালঘর, পুজোবাড়ি, শস্যখেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেছে, সাজি ভরেছে, নুন লঙ্কা ধনেপাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য করেছে; চালতা পেড়েছে, বোশেখ-জষ্টির ঝড়ে আমবাগানে আম কুড়িয়েছে। বাগানের পূর্বপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে লাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহল তারও অল্প কিছু অংশ ছিল। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুর ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল-ঘুঘু-দোয়েল শ্যামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেছে সাঁতার, নালফুল তুলেছে, ঘাটে বসে দেখেছে খেয়াল, আনমনে একা বসে করেছে পশম সেলাই। ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে প্রকৃতির উৎসবের সঙ্গে মানুষের এক-একটি পরব বাঁধা। অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দোলযাত্রা বাসন্তীপুজো পর্যন্ত কত কী। মানুষে প্রকৃতিতে হাত মিলিয়ে সমস্ত বছরটিকে যেন নানা কারুশিল্পে বুনে তুলছে। সবই। যে সুন্দর, সবই যে সুখের তা নয়। মাছের ভাগ, পুজোর পার্বণী, কর্ত্রীর পক্ষপাত, ছেলেদের কলহে স্ব-স্ব ছেলের পক্ষসমর্থন প্রভৃতি নিয়ে নীরবে ঈর্ষা বা তারস্বরে অভিযোগ, কানে কানে পরচর্চা বা মুক্তকণ্ঠে অপবাদঘোষণা, এ-সমস্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে—সব চেয়ে আছে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা উদ্‌বেগ—কর্তা কখন কী করে বসেন, তাঁর বৈঠকে কখন কী দুর্যোগ আরম্ভ হয়। যদি আরম্ভ হল তবে দিনের পর দিন শান্তি নেই। কুমুদিনীর বুক দুর্‌ দুর্‌ করে, ঘরে লুকিয়ে মা কাঁদেন, ছেলেদের মুখ শুকনো। এই-সমস্ত শুভে অশুভে সুখে দুঃখে সর্বদা আন্দোলিত প্রকাণ্ড সংসারযাত্রা।

এরই মধ্যে থেকে কুমুদিনী এল কলকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় একফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা চেনা চেহারা ছিল। গ্রামের দিগন্তে কোথাও-



বা ঘন বন, কোথাও-বা বালির চর, নদীর জলরেখা, মন্দিরের চূড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ঝাউয়ের ঝোপ, গুণটানা পথ—এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ করে তুলেছিল—কুমুদিনীর আপন আকাশ। সূর্যের আলোও ছিল তেমনি বিশেষ আলো। দিঘিতে, শস্যখেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে নৌকোর খয়েরি রঙের পালে, বাঁশঝাড়ের কচি ডালের চিকন পাতায়, কাঁঠালগাছের মসৃণ ঘন সবুজে, ও পারের বালুতটের ফ্যাকাশে হলদে-সমস্তর সঙ্গে নানা ভাবে মিশিয়ে সেই আলো একটি চিরপরিচিত রূপ পেয়েছিল। কলকাতার এই-সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হয়ে সেই চিরদিনের আকাশ আলো তাকে বেগানা লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে করেছে।

বিপ্রদাস তাকে কেদারার কাছে টেনে নিয়ে বলে, "কি কুমু, মন কেমন করছে?"

কুমুদিনী হেসে বলে, "না দাদা, একটুও না।"

"যাবি বোন, ম্যুজিয়ম দেখতে?"

"হ্যাঁ, যাব।"

এত বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে যে, বিপ্রদাস যদি পুরুষমানুষ না হত তবে বুঝতে পারত যে এটা স্বাভাবিক নয়। ম্যুজিয়মে না যেতে হলেই সে বাঁচে। বাইরের লোকের ভিড়ের মধ্যে বেরোনো অভ্যেস নেই বলে জনসমাগমে যেতে তার সংকোচের অন্ত নেই। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চোখ চেয়ে ভালো করে দেখতেই পারে না।

বিপ্রদাস তাকে দাবাখেলা শেখালে। নিজে অসামান্য খেলোয়াড়, কুমুর কাঁচা খেলা নিয়ে তার আমোদ লাগে। শেষকালে নিয়মিত খেলতে খেলতে কুমুর একটা হাত পাকল যে বিপ্রদাসকে সাবধানে খেলতে হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়সী মেয়েসঙ্গিনী না থাকতে এই দুই ভাইবোন যেমন দুই ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড়ো অনুরাগ; কুমু একমনে তার কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেছে। যখন কুমারসম্ভব পড়লে তখন থেকে শিবপূজায় সে শিবকে দেখতে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দেবজ্যোতিতে উদভাসিত হয়ে দেখা দিলে।

বিপ্রদাসের ফোটোগ্রাফ তোলার শখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ-বা নেয় ছবি, কেউ বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। বন্দুকে বিপ্রদাসের হাত পাকা। পার্বণ উপলক্ষে দেশে যখন যায়, খিড়কির পুকুরে ডাব, বেলের খোলা, আখরোট প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে পিস্তল অভ্যাস করে; কুমুকে ডাকে, "আয় না কুমু, দেখ-না চেষ্টা করে।"

যে-কোনো বিষয়েই তার দাদার রুচি সে-সমস্তকেই বহু যত্নে কুমু আপনার করে নিয়েছে। দাদার কাছে এসরাজ শিখে শেষে ওর হাত এমন হল যে দাদা বলে, আমি হার মানলুম।

এমনি করে শিশুকাল থেকে যে দাদাকে ও সব চেয়ে বেশি ভক্তি করে, কলকাতায় এসে তাকেই সে সব কাছে পেলে। কলকাতায় আসা সার্থক হল। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস-সরোবরের কূলে। একইরকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা, এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূরবর্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয় বলে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তারা এটাকে হয় অহংকার, নয় হৃদয়হীনতা বলে মনে করে। তাই দেশে থাকতেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে নি।



পিতা-বর্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে হলুদের দুদিন আগেই কনেটি জ্বরবিকারে মারা গেল। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠিগণনায় বেরোল, বিবাহস্থানীয় দুর্গ্রহের ভোগক্ষয় হতে দেরি আছে। বিবাহ চাপা পড়ল। ইতিমধ্যে ঘটল পিতার মৃত্যু। তার পর থেকে ঘটকালি প্রশ্রয় পাবার মতো অনুকূল সময় বিপ্রদাসের ঘরে এল না। ঘটক একদা মস্ত একটা মোটা পণের আশা দেখালে। তাতে হল উলটো ফল। কম্পিত হস্তে হুঁকোটি দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সেদিন অত্যন্ত দ্রুতপদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল।

৯

সুবোধের চিঠি বিলেত থেকে আসত নিয়মমত। এখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। কুমু ডাকের জন্যে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে থাকে। বেহারা এবার চিঠি তারই হাতে দিল। বিপ্রদাস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, কুমু ছুটে গিয়ে বললে, "দাদা, ছোড়দাদার চিঠি।"

দাড়ি কামানো সেরে কেদারায় বসে বিপ্রদাস একটু যেন ভয়ে ভয়েই চিঠি খুললে। পড়া হয়ে গেলে চিঠিখানা এমন করে হাতে চাপলে যেন সে একটা তীব্র ব্যথা।

কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছোড়দাদার অসুখ করে নি তো?"

"না, সে ভালোই আছে।"

"চিঠিতে কী লিখেছেন বলো-না দাদা।"

"পড়াশুনোর কথা।"

কিছুদিন থেকে বিপ্রদাস কুমুকে সুবোধের চিঠি পড়তে দেয় না। একটু-আধটু পড়ে শোনায়। এবার তাও নয়। চিঠিখানা চেয়ে নিতে কুমুর সাহস হল না, মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

সুবোধ প্রথম-প্রথম হিসেব করেই খরচ চালাত। বাড়ির দুঃখের কথা তখনো মনে তাজা ছিল। এখন সেটা যতই ছায়ার মতো হয়ে এসেছে, খরচও ততই চলেছে বেড়ে। বলছে, বড়োরকম চালে চলতে না পারলে এখানকার সামাজিক উচ্চশিখরের আবহাওয়ায় পৌঁছনো যায় না। আর তা না গেলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়।

দায়ে পড়ে দুই একবার বিপ্রদাসকে তার-যোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হয়েছে। এবার দাবি এসেছে হাজার পাউণ্ডের— জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে বললে, পাব কোথায়? গায়ের রক্ত জল করে কুমুর বিবাহের জন্য টাকা জমাচ্ছি শেষে কি সেই টাকায় টান পড়বে? কী হবে সুবোধের ব্যারিস্টার হয়ে, কুমুর ভবিষ্যৎ ফতুর করে যদি তার দাম দিতে হয়?

সে রাত্রে বিপ্রদাস বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। জানে না, কুমুদিনীর চোখেও ঘুম নেই। এক সময়ে যখন বড়ো অসহ্য হল কুমু ছুটে এসে বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, "সত্যি করে বলো দাদা, ছোড়দাদার কী হয়েছে? পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়ো না।"

বিপ্রদাস বুঝলে গোপন করতে গেলে কুমুদিনীর আশঙ্কা আরো বেড়ে উঠবে। একটু চুপ করে থেকে বললে, "সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।"

কুমু বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, "দাদা, একটা কথা বলি রাগ করবে না বলো।"

"রাগ করবার মতো কথা হলে রাগ না করে বাঁচব কী করে?"

"না দাদা, ঠাট্টা নয়, শোনো আমার কথা— মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে, তাই নিয়ে—"



"চুপ, চুপ, তোর গয়নায় কি আমরা হাত দিতে পারি!"

"আমি তো পারি।"

"না, তুইও পারিস নে। থাক্ সে-সব কথা, এখন ঘুমোতে যা।"

কলকাতা শহরের সকাল, কাকের ডাক ও স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়্খড়ানিতে রাত পোয়ালো। দূরে কখনো স্টীমারের, কখনো তেলের কলের বাঁশি বাজে। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক মই কাঁধে জ্বরারি-বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেছে; খালি-গাড়ির দুটো গোরু গাড়োয়ানের দুই হাতের প্রবল তাড়ার উত্তেজনায় গাড়ি নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান; কল থেকে জল নেবার প্রতিযোগিতায় এক হিন্দুস্থানি মেয়ের সঙ্গে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ঠেলাঠেলি বকাবকি জমেছে। বিপ্রদাস বারান্দায় বসে; গুড়্গুড়ির নলটা হাতে; মেজেতে পড়ে আছে না পড়া খবরের কাগজ।

কুমু এসে বললে, "দাদা, 'না' বোলো না।"

"আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে রাতকে দিন, 'না'-কে হাঁ করতে হবে।"

"না, শোনো বলি—আমার গয়না নিয়ে তোমার ভাবনা ঘুচুক।"

"সাধে তোকে বলি বুড়ি? তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘুচবে এমন কথা ভাবতে পারলি কোন্ বুদ্ধিতে?"

"সে জানি নে, কিন্তু তোমার এই ভাবনা আমার সয় না।"

"ভেবেই ভাবনা শেষ করতে হয় রে, তাকে ফাঁকি দিয়ে থামাতে গেলে বিপরীত ঘটে। একটু ধৈর্য ধর্, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বিপ্রদাস সে মেলে চিঠিতে লিখলে, টাকা পাঠাতে হলে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়; সে অসম্ভব।

যথাসময়ে উত্তর এল। সুবোধ লিখেছে কুমুর পণের টাকা সে চায় না। সম্পত্তিতে তার নিজের অর্ধ অংশ বিক্রি করে যেন টাকা পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাঠিয়েছে।

এ চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মতো বিঁধল। এতবড়ো নিষ্ঠুর চিঠি সুবোধ লিখলে কী করে!

তখনই বুড়ো দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞাসা করলে, "ভূষণ রায়রা করিমহাটি তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল না? কত পণ দেবে?"

দেওয়ান বললে, "বিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।"

"ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্তা কইতে চাই।"

বিপ্রদাস বংশের বড়ো ছেলে। তার জন্মকালে তার পিতামহ এই তালুক স্বতন্ত্র ভাবে তাকেই দান করেছেন। ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতি। জন্মস্থান করিমহাটিতে। এইজন্যে অনেকদিন থেকে নিজের গ্রাম পত্তনি নেবার চেষ্টা। অর্থসংকটে মাঝে মাঝে বিপ্রদাস রাজি হয় আর-কি, কিন্তু প্রজারা কেঁদে পড়ে। বলে, ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার বলে মানতে পারব না। তাই প্রস্তাবটা বারে বারে যায় ফেঁসে। এবার বিপ্রদাস মন কঠিন করে বসল। ও নিশ্চয় জানে, সুবোধের টাকার দাবি এইখানেই শেষ হবে না। মনে মনে বললে, আমার তালুকের এই সেলামির টাকা রইল সুবোধের জন্যে, তার পর দেখা যাবে।

দেওয়ান বিপ্রদাসের মুখের উপর জবাব দিতে সাহস করলে না। গোপনে কুমুকে গিয়ে বললে, "দিদি, তোমার কথা বড়োবাবু শোনেন। বারণ করো তাঁকে, এটা অন্যায় হচ্ছে।"

বিপ্রদাসকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। কারও জন্যে বড়োবাবু যে নিজের স্বত্ব নষ্ট করবে, এ ওদের গায়ে সয় না।



বেলা হয়ে যায়। বিপ্রদাস ঐ তালুকের কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটছে। এখনো স্নানাহার হয় নি। কুমু বারে বারে তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। শুকনো মুখ করে এক সময়ে অন্দরে এল। যেন বাজে ছোঁওয়া পাতা-ঝলসানো গাছের মতো। কুমুক বুকে শেল বিঁধল।

স্নানাহার হয়ে গেলে পর বিপ্রদাস আলবোলার নল হাতে খাটের বিছানায় পা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসল যখন, কুমু তার শিয়রের কাছে বসে ধীরে ধীরে তার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তোমার তালুক তুমি পওনি দিতে পারবে না।"

"তোকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূতে পেয়েছে নাকি? সব কথাতেই জুলুম?"

"না দাদা, কথা চাপা দিয়ো না।"

তখন বিপ্রদাস আব থাকতে পারলে না, সোজা হয়ে উঠে বসে কুমুকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে সামনে বসালে। রুদ্ধ স্বরটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে একটুখানি কেশে নিয়ে বললে, "সুবোধ কী লিখেছে জানিস? এই দেখ।"

এই বলে জামার পকেট থেকে তার চিঠি বের করে কুমুর হাতে দিলে। কুমু সমস্তটা পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে বললে, "মাগো, ছোড়দাদা এমন চিঠিও লিখতে পরলে?"

বিপ্রদাস বললে, "ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ করে দেখতে পেরেছে তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা রাখতে পারি? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেব না তো কে দেবে?"

এর উপর কুমু আর কথা কইতে পারলে না, নীরবে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বিপ্রদাস তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইল।

অনেকক্ষণ দাদার পায়ে হাত বুলিয়ে অবশেষে কুমু বললে, দাদা, মায়ের ধন তো এখন মায়েরই তাঁর সেই গয়না থাকতে তুমি কেন - -"

বিপ্রদাস আবার চমকে উঠে বসে বললে, "কুমু, এটা তুই কিছুতে বুঝলি নে, তোর গয়না নিয়ে সুবোধ আজ যদি বিলেতে থিয়েটার কন্‌সার্ট দেখে বেড়াতে পারে তা হলে আমি কি তাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব— না, সে কোনোদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে? তাকে এত শাস্তি কেন দিবি?"

কুমু চুপ করে রইল, কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। তখন, অনেকবার যেমন ভেবেছে তেমনি করেই ভাবতে লাগল অসম্ভব কিছু ঘটে না কি? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র এক মুহূর্তে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে পারে না? কিন্তু শুভলক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, কিছুদিন থেকে বার বার তার বাঁ চোখ নাচছে। এর পূর্বে জীবনে আরো অনেকবার বাঁ চোখ নেচেছে, তা নিয়ে কিছু ভাববার দরকার হয় নি। এবারে লক্ষণটাকে মনে মনে ধরে পড়ল। যেন তার প্রতিশ্রুতি তাকে রাখতেই হবে—-সুভলক্ষণের সত্যভঙ্গ যেন না হয়।

১০

বাদলা করেছে। বিপ্রদাসের শরীরটা ভালো নেই। বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছে। কুমুর আদরের বিড়ালটা বালাপোশের একটা ফালতো অংশ দখল করে গোলাকার হয়ে নিদ্রামগ্ন। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুরটা অগত্যা ওর স্পর্ধা সহ্য করে মনিবের পায়ের কাছে শুয়ে স্বপ্নে এক-একবার গোঁ গোঁ করে উঠছে।

এমন সময়ে এল আর-এক ঘটক।

"নমস্কার।"



"কে তুমি?"

"আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন, (মিথ্যে কথা) আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।"

"কী প্রয়োজন?"

"ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।"

বিপ্রদাস একটু উঠে বসল। ঘটক রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের নাম করলে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলে আছে নাকি?"

ঘটক জিভ কেটে বললে, "না, তিনি বিবাহ করেন নি। প্রচুর ঐশ্বর্য। নিজে কাজ দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এখন সংসাব করতে মন দিয়েছেন।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ বসে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে একটু যেন জোর করে বলে উঠল, "বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।"

ঘটক ছাড়তে চায় না, বরের ঐশ্বর্যের যে পরিমাণ কত, আর গবর্নরের দরবারে তাঁর আনাগোনার পথ যে কত প্রশস্ত, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারই ব্যাখ্যা করতে লাগল।

বিপ্রদাস আবার স্তম্ভিত হয়ে রইল। আবার অনাবশ্যক বেগের সঙ্গে বলে উঠল, "বয়সে মিলবে না।"

ঘটক বললে, "ভেবে দেখবেন, দু-চারদিন বাদে আর-একবার আসব।"

বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ল।

দাদার জন্যে গরম চা নিয়ে কুমু ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে গামছাসুদ্ধ একটা ভিজে জীর্ণ ছাতি ও কাদামাখা তালতলার চটি দেখে থেমে গেল। ওদের কথাবার্তা অনেকখানি কানে পৌঁছল। ঘটক তখন বলছে, "রাজাবাহাদুর এবার বছর না যেতে মহারাজ হবেন এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধরেছে, মহারানীর পদ এখন আর খালি রাখা চলবে না। আপনাদের গ্রহাচার্য কিনু ভট্‌চাজ দূরসম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল —লক্ষণ ঠিকটি মিলেছে। এই নিয়ে শহরের মেয়ের কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখি নি—এমন কুষ্ঠি আর একটিও হাতে পড়ল না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।"

ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচল। শুভলক্ষণের কী অপূর্ব রহস্য! কিনু আচার্যি কতবার তার হাত দেখে বলেছে, রাজরানী হবে সে। করকোষ্ঠির সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে উপস্থিত। ওদের গ্রহাচার্য এই কদিন হল বার্ষিক আদায় করতে কলকাতায় এসেছিল; সে বলে গেছে, এবার আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির রাজসম্মান, স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ; মন্দের মধ্যে পত্নীপীড়া, এমন-কি, হয়তো পত্নীবিয়োগ। বিপ্রদাসের বৃষরাশি। মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ার কথা আছে। তারও প্রমাণ হাতে হাতে, কাল রাত থেকে স্পষ্টই সর্দির লক্ষণ। আষাঢ় মাসও পড়ল—পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুর কথাটা ভাববার আশু প্রয়োজন নেই, অতএব এবার সময় ভালো।

কুমু দাদার পাশে বসে বললে, "দাদা, মাথা ধরেছে কি?"

দাদা বললে, "না।"

"চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি? তোমার ঘরে লোক দেখে ঢুকতে পারলুম না।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সব চেয়ে অসহ্য, যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল। দাদার মুখভাবে এই দ্বিধার বেদনা কুমুকে ব্যথা



দিলে। দৈবের দানকে কেন দাদা এমন করে সন্দেহ করছেন? বিবাহ ব্যাপারে নিজের পছন্দ বলে যে একটা উপসর্গ আছে এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। শিশুকাল থেকে পরে পরে সে তার চার দিদির বিয়ে দেখেছে। কুলীনের ঘরে বিয়ে কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পছন্দর বিষয় ছিল তাও নয়। ছেলেপুলে নিয়ে তবু তারা সংসার করছে, দিন কেটে যাচ্ছে। যখন দুঃখ পায় বিদ্রোহ করে না; মনে ভাবতেও পারে না যে কিছুতেই এটা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত। মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয় সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার?

এতদিন পরে কুমুর মন্দভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এল রাজপুত্র ছদ্মবেশে। রথচক্রের শব্দ কুমু তার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ঐ যে শুনতে পাচ্ছে। বাইরের ছদ্মবেশটা সে যাচাই করে দেখতেই চায় না।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখলে, আজ মনোরথ-দ্বিতীয়া। বাড়িতে কর্মচারীদের মধ্যে যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছে সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে তাদের ফলার করালে, দক্ষিণাও যথাসাধ্য কিছু দিলে। সবাই আশীর্বাদ করলে, রাজরানী হয়ে থাকো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

দ্বিতীয়বার বিপ্রদাসের বৈঠকখানায় ঘটকের আগমন। তুড়ি দিয়ে 'শিব শিব' বলে বৃদ্ধ উচ্চস্বরে হাই তুললে। এবারে অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ করে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হল না। ভাবলে এতবড়ো দায়িত্ব নিই কী করে? কেমন করে নিশ্চয় জানব কুমুর পক্ষে এ সম্বন্ধ সব চেয়ে ভালো নয়? পরশুদিন শেষ কথা দেবে বলে ঘটককে বিদায় করে দিলে।

১১

সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির জলে নিবিড়। কুমুর আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। এক পাশে ছোটো খাট, আলনায় গুটি-দুয়েক পাকানো শাড়ি আর চাঁপা-রঙের গামছা। কোণে কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুক, তার মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নীচে সবুজ রঙ-করা টিনের বাক্সে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর একটা বাক্সে চুল বাঁধবার সামগ্রী। দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে কিছু বই, দোয়াতকলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে বোনা বাবার সর্বদা ব্যবহারের চটিজুতোজোড়া; শোবার খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের কোণে ঠেসানো একটা এসরাজ।

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর বসে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। সামনে ইঁটের কলেবরওয়ালা কলকাতা আদিম কালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গায়ে আলোকশিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে। সেখানকার ঘরবাড়ি লোকজন সবই তার আপন আদর্শে গড়া। তারই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী রূপের প্রতিষ্ঠা কত ভক্তি, কত পূজা, কত সেবা। তার নিজের মায়ের পুণ্যচরিতে এক জায়গায় একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে। তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যেও ধৈর্য হারিয়েছিলেন। কুমু কখনো সে ভুল করবে না।

বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে কুমু চমকে উঠল। দাদাকে দেখে বললে, "আলো জ্বেলে দেব কি?"

"না কুমু, দরকার নেই" বলে বিপ্রদাস সিন্দুকে তার পাশে এসে বসল। কুমু তাড়াতাড়ি মেজের উপর নেমে বসে আস্তে আস্তে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।



বিপ্রদাস স্নিগ্ধস্বরে বললে, "বৈঠকখানায় লোক এসেছিল, তাই তোকে ডেকে পাঠাই নি। এতক্ষণ একলা বসে ছিলি?"

কুমু লজ্জিত হয়ে বললে, "না, ক্ষেমাপিসি অনেকক্ষণ ছিলেন।" কথাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে বললে, "বৈঠকখানায় কে এসেছিল, দাদা?"

"সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি। এ বছর জষ্ঠি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লি, তাই না?"

"হাঁ দাদা, তাতে দোষ হয়েছে কী?"

"দোষের কথা না। আজ নীলমণি ঘটক এসেছিল। লক্ষ্মী বোন, লজ্জা করিস নে। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা কেউ করত না। আজ তো আমি তা পারি নে। রাজা মধুসূদন ঘোষালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। বংশমর্যাদায় ওঁরা খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাত। আমি রাজি হতে পারি নি। এখন, তোর মুখে একটা কথা শুনলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস নে কুমু।"

"না, লজ্জা করব না।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। "যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে।" এটা সেই ঘটকের কথার প্রতিধ্বনি- কখন কথাটা এর মনের গভীরতায় আটকা পড়ে গেছে।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হয়ে বললে, "কেমন করে ঠিক হল?"

কুমু চুপ করে রইল।

বিপ্রদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "ছেলেমানুষি করিস নে, কুমু।"

কুমুদিনী বললে, "তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষি করছি নে।"

দাদার উপর তার অসীম ভক্তি। কিন্তু দাদা তো দৈববাণী মানে না, কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা।

বিপ্রদাস বললে, "তুই তো তাঁকে দেখিস নি।"

"তা হোক, আমি যে ঠিক জেনেছি।"

বিপ্রদাস ভালো করেই জানে, এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এ অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই। তুব বিপ্রদাস আর একবার বললে, "দেখ, কুমু, চিরজীবনের কথা, ফস্ করে একটা খেয়ালের মাথায় পণ করে বসিস নে।"

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, "খেয়াল নয় দাদা, খেয়াল নয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি, আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।"

বিপ্রদাস চমকে উঠল। যেখানে কার্যকারণের যোগাযোগ নেই সেখানে তর্ক করবে কী নিয়ে? অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না। বিপ্রদাস বুঝেছে, কী একটা দৈব-সংকেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁরই ইচ্ছা। সব-শেষের ফুলটি হল নীল অপরাজিতা।

অদূরে মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল। কুমু জোড়হাত করে প্রণাম করলে। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ রইল বসে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; বৃষ্টিধারার বিরাম নেই।



১২

বিপ্রদাস আরো কয়েকবার কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে। কুমু কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে আঁচল খুঁটিতে লাগল।

বিয়ের প্রস্তাব পাকা, কেবল একটা বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে কিছু কথা-চালাচালি হল। বিয়েটা হবে কোথায়? বিপ্রদাসের ইচ্ছে কলকাতার বাড়িতে। মধুসূদনের একান্ত জেদ নুরনগরে। বরপক্ষের ইচ্ছেই বাহাল রইল।

আয়োজনের জন্যে কিছু আগে থাকতেই নুরনগরে আসতে হল। বৈশেখ-জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামলে মাটি যেমন দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে বাহিরে তেমনি একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল। আপন মনগড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত করে রাখে। শরৎকালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে চোখে কথা কইছে, কোন্-এক অনাদিকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখিরা এসে খায়; রুটির টুকরো রাখে, কাঠবিড়ালি চঞ্চল চোখে চারি দিকে দ্রুত ছুটে এসে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধরে কুটুর-কুটুর করে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হয়ে বসে দেখে। বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা। বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ করে বসে থাকে, জল যেন ওর সর্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম-ধারের বাতাবি-লেবু গাছের শাখার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে সোনার রেখার মতো ঝিকিমিকি করতে থাকে; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্বচনীয় পুলকের কাঁপন বয়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একলা গিয়ে বসে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের রূপটি তার, কৃষ্ণরাধিকার যুগলরূপের মাধুর্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপরে এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালী সুরের গানটি ঃ

আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।

রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়---একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মনগড়া প্রতিমার মন্দিরদ্বার চিরদিন তো রুদ্ধ থাকতে পারে না। কানাকানির নিশ্বাসের তাপে ও বেগে সে মূর্তির সুষমা যখন ঘা খেতে আরম্ভ করে তখন দেবতার রূপ টিকবে কী করে? তখন ভক্তের বড়ো দুঃখের দিন।

একদিন তেলেনিপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই বলে বসল, "হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল? ঐ যে বেদেনীদের গান আছে -

এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন,
কেটে করলে সিংহাসন।

এ'ও সেই শেয়ালকাঁটা-বনের রাজা। ঐ তো রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো। দেশে যেবার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা। তবু বুড়ি মাকে শেষদিন পর্যন্ত রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে হাড় কালি করিয়েছে।"

মেয়েরা উৎসুক হয়ে তিনকড়িকে ধরে বসে; বলে, "বরকে জানতে নাকি?"



"জানতুম না? ওর মা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্তীদের ঘরের। (গলা নিচু করে) সত্যি কথা বলি বাছা, ভালো বামুনের ঘরে ওদের বিয়ে চলে না। তা হোক গে, লক্ষ্মী তো জাতবিচার করেন না।"

পূর্বেই বলেছি কুমুদিনীর মন একালের ছাঁচে নয়। জাতকুলের পবিত্রতা তার কাছে খুব একটা বাস্তব জিনিস। মনটা তাই যতই সংকুচিত হয়ে ওঠে ততই যারা নিন্দে করে তাদের উপর রাগ করে; ঘর থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠে ছুটে বাইরে চলে যায়। সবাই গা-টেপাটেপি করে বলে, 'ইস, এখনই এত দরদ! এ যে দেখি দক্ষযক্ষের সতীকেও ছাড়িয়ে গেল।"

বিপ্রদাসের মনের গতি হাল আমলের, তবু জাতকুলের হীনতায় তাকে কাবু করে। তাই, গুজবটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু ছেঁড়া বালিশে চাপ দিলে তার তুলো যেমন আরো বেশি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি হল।

এ দিকে বুড়ো প্রজা দামোদর বিশ্বাসের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বহুপূর্বে ঘোষালেরা নুরনগরের পাশের গ্রাম শেয়াকুলির মালেক ছিল। এখন সেটা চাটুজ্যেদের দখলে। ঠাকুর-বিসর্জনের মামলায় কী করে সবসুদ্ধ ঘোশালদেরও বিসর্জন ঘটেছিল, কী কৌশলে কর্তাবাবুরা, শুধু দেশছাড়া নয়, তাদের সমাজছাড়া করেছিলেন, তার বিবরণ বলতে বলতে দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘোষালেবা এককালে ধনে মানে কুলে চাটুজ্যেদের সমকক্ষ ছিলেন এটা সুখবর, কিন্তু বিপ্রদাসের মনে ভয় লাগল যে, এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের নাকি?

১৩

অঘ্রান মাসে বিয়ে। পঁচিশে আশ্বিন লক্ষ্মীপূজো হয়ে গেল। হঠাৎ সাতাশে আশ্বিনে তাঁবু ও নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঘোষাল-কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওভারসিয়র এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল পশ্চিমি মজুর। ব্যাপারখানা কী? শেয়াকুলিতে ঘোষালদিঘির ধারে তাঁবু গেড়ে বর ও বরযাত্রীরা কিছুদিন আগে থাকতেই সেখানে এসে উঠবেন।

এ কী রকম কথা? বিপ্রদাস বললে, "তাঁরা যতজন খুশি আসুন, যতদিন খুশি থাকুন, আমরাই বন্দোবস্ত করে দেব। তাঁবুর দরকার কী? আমাদের স্বতন্ত্র বাড়ি আছে, সেটা খালি করে দিচ্ছি।"

ওভারসিয়র বললে, "রাজাবাহাদুরের হুকুম। দিঘির চারি ধারের বনজঙ্গলও সাফ করে দিতে বলেছেন আপনি জমিদার, অনুমতি চাই।"

বিপ্রদাস মুখ লাল করে বললে, "এটা কি উচিত হচ্ছে? জঙ্গল তো আমরাই সাফ করে দিতে পারি।"

ওভারসিয়র বিনীতভাবে উত্তর করলে, "ঐখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি, তাই শখ হয়েছে নিজেই ওটা পরিষ্কার করে নেবেন।"

কথাটা নিতান্ত অসংগত নয়, কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রজারা বলে, এটা আমাদের কর্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। হঠাৎ তবিল ফেঁপে উঠেছে, সেটা ঢাকা দিতে পারছে না; সেটাকে জয়ঢাক করে তোলবার জন্যেই না এই কাণ্ড; সাবেক আমল হলে বরসুদ্ধ বরসজ্জা বৈতরণী পার করতে দেরি হত না। ছোটোবাবু থাকলে তিনিও সইতেন না, দেখা যেত ঐ বাবুগুলো আর তাঁবুগুলো থাকত কোথায়।

প্রজারা এসে বিপ্রদাসকে বললে, "হুজুর, ওদের কাছে হঠতে পারব না। যা খরচ লাগে আমরাই দেব।"



ছয়-আনার কর্তা নবগোপাল এসে বললে, "বংশের অমর্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্তারা ঐ ঘোষালদের হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েছেন, আজ তারা আমাদেরই এলাকার উপর চড়াও হয়ে টাকার ঝলক মারতে এসেছে! ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক, বংশের মান তো ভাগ হয়ে যায় নি।"

এই বলে নবগোপালই ঠেলেঠুলে কর্মকর্তা হয়ে বসল।

বিপ্রদাস কয়দিন কুমুর কাছে যেতে পারে নি। তার মুখের দিকে তাকাবে কী করে? কুমুর কাছে বরপক্ষের স্পর্ধার কথা কেউ যে গলা খাটো করে বলবে সমাজে সে দয়া বা ভদ্রতা নেই। তারই কাছে সবাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। মেয়েদের রাগ তারই 'পরে। ওরই জন্যে পূর্বপুরুষের মাথা যে হেঁট হল। রাজরানী হতে চলেছেন! কী যে রাজার ছিরি!

জাতকুলের কথাটাকে কুমু তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু ধনের বড়াই করে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভরে উঠল। কেবলই লোকের কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যে ওরই লজ্জা। দাদার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু দাদার দেখা নেই, অন্দরমহলে খেতেও আসে না।

একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জাগা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ খিড়কির পুকুরের ঘাটে দেখে, কুমু নীচের পৈঠের উপর বসে মাথা হেঁট করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। এসেই রুদ্ধস্বরে বললে, "দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি নে।" বলেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল।

দাদা ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, "লোকের কথায় কান দিস নে বোন।"

"কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?"

"ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র করে দেখিস।"

কুমু চুপ করে রইল। বিপ্রদাস থাকতে পারলে না, মরিয়া হয়ে বললে, "তোর মনে যদি একটুও খটকা থাকে বিয়ে এখনো ভেঙে দিতে পারি।"

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "ছি ছি, সে কি হয়?"

অন্তর্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ পড়ে গেছে। বাকি যেটুকু সে তো বাইরের।

বিপ্রদাসের একেলে মন এতটা নিষ্ঠায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বললে, "দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহবন্ধন সত্য। সুরে-বাঁধা এসরাজের কোনো মানেই থাকে না যদি বাজাবার হাতটা হয় বেসুরো। পুরাণে দেখ্‌ না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠও তেমনি। হাল আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য, তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না, সলতেকে বলেন জ্বলতে—শুকনো প্রাণে জ্বলতে জ্বলতেই ওরা গেল ছাই হয়ে।"

কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ···

শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম সুখদুঃখের অতীত—তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের? অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে



ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

১৪

ঘোষালদিঘির ধারে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল চেনা যায় না। জমি নিখুঁতভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দিঘির পানা সব তোলা হয়েছে। ঘাটের কাছে তকতকে নতুন বিলিতি পাল-খেলাবার দুটি নৌকো, তাদের একটির গায়ে লেখা 'মধুমতী', আর-একটির গায়ে 'মধুকরী'। যে তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাকবেন তার সামনে ফ্রেমে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা 'মধুচক্র'। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা, 'মধুসাগর'। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চানকায় সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, গাঁদা, দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে নানা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারই মধ্যে লোহার ঢালাই করা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধরেছে, তার থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'মধুকুঞ্জ'। প্রবেশপথে কারুকাজ করা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়ছে—নিশানে লেখা 'মধুপুরী'। চারি দিকেই 'মধু' নামের ছাপ। নানা রঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙিন ফুলে চীনালণ্ঠনে হঠাৎ তৈরি এই মায়াপুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। এ দিকে ঝক্‌ঝকে চাপরাস-ঝোলানো, হলদের উপর লাল পাড় দেওয়া পাগড়ি বাঁধা, জরির ফিতে দেওয়া লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারও কারও চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্যেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজপরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না। কাণ্ড দেখে চাটুজ্যে-পরিবারের গায়ে জ্বালা ধরল। নুরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।

শুভপরিণয়ের এই সূচনা।

১৫

বিপ্রদাস নবগোপালকে ডেকে বললে, "নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা ওটা ইতরের কাজ।"

নবগোপাল বললে, "চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশি মানুষ গড়েছেন; চারটে মুখ কেবল বড়ো বড়ো কথা বলবার জন্যেই। সাড়ে পনেরো আনা লোক যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তাতেও তুমি পেরে উঠবে না। তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন করব। ওরা রাজা হয়েছে করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম আমাদের।"

নবগোপাল বললে, "দাদা, পাঁজি ভুলেছ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও



পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে---তিনু সরকার আছে তোমার তালুকদার ভাদু পরামানিক, কমরদ্দি বিশেষ, পাঁচু মণ্ডল---এরা কি তোমার ঐ কাঁচকলাভাতে হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে? এরা কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রপৌত্র? এদের যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ করে থাকো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

নবগোপাল প্রজাদের সঙ্গে মিলে উঠে পড়ে লাগল। সবাই বুক ঠুকে বললে, টাকার জন্যে ভাবনা কী? আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চড়ল নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙিন ধুতি। সালুতে মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল, সাত ক্রোশ তফাত থেকে তার চুড়ো দেখা যায়। দুই শরিকে মিলে তাদের চার চার হাতি বের করলে, সাজ চড়ল তাদের পিঠে, যখন তখন বিনা কারণে ঘোষালদিঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর যাই হোক, পাটের বস্তা থেকে হাতি বের হয় না, এই বলে সকলেই দুই পা চাপড়ে হো হো করে হেসে নিলে।

অঘ্রানের সাতাশে পড়েছে বিয়ের দিন; এখনো দিনদশেক বাকি। এমন সময় লোকমুখে জানা গেল, রাজা আসছে দলবল নিয়ে। ভাবনা পড়ে গেল, কর্তব্য কী। মধুসূদন এদের কাছে কোনো খবর দেয় নি। বুঝি মনে করেছে ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতাই রাজোচিত। এমন অবস্থায় নিজেরা গায়ে পড়ে স্টেশন থেকে ওদের এগিয়ে আনতে যাওয়া কি সংগত হবে? খবর না দেওয়ার উচিত জবাব হচ্ছে খবর না-নেওয়া।

সবই সত্য, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সংসারে দুঃখ ঠেকানো যায় না। কুমুর প্রতি বিপ্রদাসের গভীর স্নেহ; পাছে তাকে কিছুতে আঘাত করে এ কথাটা সকল তর্ক ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের পীড়ন করা এতই সহজ; তাদের মর্মস্থান চার দিকেই অনাবৃত। জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েছে, আর যারা বর্মহীন তাদের স্পর্শকাতর পিঠের দিকে কোনো বিধিবিধান নজর করে না। এমন অবস্থায় স্নেহের ধনকে রোষ বিদ্বেষ ঈর্ষার তুফানে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের অভিমান বাঁচাবার চেষ্টা করা কাপুরুষতা, বিপ্রদাসের মনের এই ভাব।

বিপ্রদাস কাউকে না জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেল স্টেশনে। গাড়ি এসে পৌঁছল, তখন বেলা পাঁচটা। সেলুন-গাড়ি থেকে রাজা নামল দলবল নিয়ে। বিপ্রদাসকে দেখে শুষ্ক সংক্ষিপ্ত নমস্কার করে বললে, "এ কী, আপনি কেন কষ্ট করে?"

বিপ্রদাস। বিলক্ষণ! এই প্রথম আসা আমার দেশে, অভ্যর্থনা করে নেব না?

রাজা। ভুল করছেন। আপনার দেশে এখনো আসি নি। সে হবে বিয়ের দিনে।

বিপ্রদাস কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে তর্ক করবার জায়গা নয়--তাই কেবল বললে, "ঘাটে বজরা তৈরি।"

রাজা বললে, "দরকার হবে না, আমাদের স্টীমলঞ্চ এসেছে।"

বিপ্রদাস বুঝলে সুবিধে নয়। তবু আর একবার বললে, "খাওয়া দাওয়ার জিনিসপত্র, রসুইয়ের নৌকো সমস্তই প্রস্তুত।"

"কেন এত উৎপাত করলেন! কিছুই দরকার হবে না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষদের জন্মভূমিতে--- আপনাদের দেশে না। বিয়েব দিনে সেখানে যাবার কথা।"

বিপ্রদাস বুঝলে কিছুতেই নরম হবার আশা নেই। বুকের ভিতরটা দমে গেল। স্টেশনের বসবার ঘরে কেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হয়ে এসেছে। উত্তর থেকে



গাড়ি আসবার জন্যে ঘণ্টা পড়ল, স্টেশনে আলো জ্বলল— লাগাম ছেড়ে ঘোড়াকে নিজের মরজিমত চলতে দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরলে তখন যথেষ্ট রাত। কোথায় গিয়েছিল, কী ঘটেছিল, কাউকে কিছুই বললে না।

সেইদিন রাত্রে ওর ঠাণ্ডা লেগে কাশি আরম্ভ হল। ক্রমেই চলল বেড়ে। উপেক্ষা করতে গিয়ে ব্যামোটাকে আরো উস্‌কে তুললে। শেষকালে কুমু ওকে অনেক ধরে কয়ে এনে বিছানায় শোওয়ায়। অনুষ্ঠানের সমস্ত ভারই পড়ল নবগোপালের উপর।

১৬

দুদিন পরেই নবগোপাল এসে বললে, "কী করি একটা পরামর্শ দাও।"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? কী হয়েছে?"

"সঙ্গে গোটাকতক সাহেব— দালাল হবে, কিংবা মদের দোকানের বিলিতি শুঁড়ি— কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দুশো কাদাখোঁচা পাখি মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেছে চন্দনদহের বিলে। এই শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম— রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা হবে— অহিরাবণ মহীরাবণ হিড়িম্বা ঘটোৎকচ ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত, প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধরে যাবার মতো।"

বিপ্রদাস স্তম্ভিত হয়ে রইল, কিছু বললে না।

নবগোপাল বললে, "তোমারই হুকুম ঐ বিলে কেউ শিকার করতে পাবে না। সেবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলে- আমরা তো ভয় করেছিলুম তোমাকেও পাছে সে রাজহাঁস ভুল করে গুলি করে বসে। লোকটা ছিল ভদ্র, চলে গেল। কিন্তু এরা গো মৃদ দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বল তো একবার না হয়

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বলে, "না না, কিচ্ছু বোলো না।"

বিপ্রদাস বাঘ শিকারে জেলার মধ্যে সব সেরা। কোনো একবার পাখি মেরে তার এমন ধিক্কার হয়েছিল যে, সেই অবধি নিজের এলাকায় পাখি মারা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

শিয়রের কাছে কুমু বসে বিপ্রদাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নবগোপাল চলে গেলে সে মুখ শক্ত করে বললে, 'দাদা, বারণ করে পাঠাও।"

"কী বারণ করব?"

"পাখি মারতে।"

"ওরা ভুল বুঝবে কুমু, সইবে না।"

"তা বুঝুক ভুল। মান অপমান শুধু ওদের এলাকার নয়?"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসলে। সে জানে কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে কুমু মনে মনে সতীধর্ম অনুশীলন করছে। ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা। সামান্য পাখির প্রাণ নিয়ে কায়ার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি?

বিপ্রদাস স্নেহের স্বরে বললে, "রাগ করিস নে কুমু, আমিও একদিন পাখি মেরেছি। তখন অন্যায় বলে বুঝতেই পারি নি। এদেরও সেই দশা।"

অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে চলল শিকার, পিকনিক, এবং সন্ধেবেলায় ব্যাণ্ডের সংগীত সহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ। বিকালে টেনিস, তা ছাড়া দিঘির নৌকোর 'পরে তিন চার পর্দা তুলে দিয়ে বাজি রেখে পালের খেলা; তাই দেখতে গ্রামের লোকেরা দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাত্রে ডিনারের পরে চীৎকার চলে, ফর হী ইজ এ জলি গুড ফেলো।' এই-সব



বিলাসের প্রধান নায়কনায়িকা সাহেব-মেম, তাকেই গায়ের লোকের চমক লাগে। এরা যে সোলার টুপি মাথায় ছিপ ফেলে মাছ ধরে, সেও বড়ো অপরূপ দৃশ্য। অন্য পক্ষে লাঠিখেলা কুস্তি নৌকোবাচ যাত্রা শখের থিয়েটার এবং চারটে হাতির সমাবেশ এর কাছে লাগে কোথায়?

বিবাহের দুদিন আগে গায়ে হলুদ। দামি গয়না থেকে আরম্ভ করে খেলার পুতুল পর্যন্ত সওগত যা বরের বাসা থেকে এল তার ঘটা দেখে সকলে অবাক। তার বাহনই বা কত! চাটুজ্যেরা খুব দরাজ হাতেই তাদের বিদায় করলে।

অবশেষে জনসাধারণকে খাওয়ানো নিয়ে বৈবাহিক কুরুক্ষেত্রের দ্রোণপর্ব শুরু হল।

সেদিন ঢোল পিটিয়ে সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে। রবাহূত অনুহূত কারও বাদ নেই। নবগোপাল রেগে আগুন। এ কী আস্পর্ধা! আমরা হলুম জমিদার, এর মধ্যে উনি ওঁর মধুপুরী খাড়া করেন কোথা থেকে?

এ দিকে ভোজের আয়োজনটা খুব ব্যাপকরূপেই সকলের কাছে প্রকাশমান হয়ে উঠল। সামান্য ফলার নয়। মাছ দই ক্ষীর সন্দেশ ঘি ময়দা চিনি খুব শোরগোল করে আমদানি। গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি হাঁড়া মালসা কলসী জালা; সারবন্দি গোরুর গাড়িতে এল আলু বেগুন কাঁচকলা শাকসব্‌জি। আহারটা হবে সন্ধের সময় বাঁধা রোশনাইয়ের আলোয়।

এ দিকে চাটুজ্যেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেছে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি· রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েছে। আহারের উপকরণ যত না হোক, ঘন ঘন চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনি উঠছে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপালবাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায বসে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তাব পবে হল কাঙালিবিদায়। মাতব্বব প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।

মধুপুরীতে সমস্তদিন রান্না বসেছে। গন্ধে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত। খুরি ভাঁড় কলাপাতা হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। তরকারি ও মাছ কোটার আবর্জনা নিয়ে কাকেদের কলরবের বিরাম নেই—বাজ্যের কুকুরগুলোও পরস্পর কামড়াকামড়ি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে। সময় হয়ে এল, রোশনাই জ্বলছে, মেটিয়াবুরুজের রোশনচৌকি ইমনকল্যাণ থেকে কেদারা পর্যন্ত বাজিয়ে চলল। অনুচরপরিচরেরা থেকে থেকে উদ্‌বিগ্নমুখে রাজাবাহাদুরের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে জানাচ্ছে এখনো খাবার লোক যথেষ্ট এল না। আজ হাটের দিন, ভিন্ন এলেকা থেকে যারা হাট করতে এসেচে তাদের কেউ কেউ পাতা-পাড়া দেখে বসে গেছে। কাঙাল-ভিক্ষুকও সামান্য কয়েকজন আছে।

মধুসূদন নির্জন তাঁবুর ভিতর ঢুকে মুখ অন্ধকার করে একটা চাপা হুংকার দিলে "হুঁ।"

ছোটো ভাই রাধু এসে বললে, "দাদা, আর কেন? চলো।"

"কোথায়?"

"ফিরে যাই কলকাতায়। এরা সব বদমাইশি করছে। এদের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার কড়ে আঙুল নাড়ার অপেক্ষায় বসে। একবার তু করলেই হয়।"

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, "যা চলে।"



একশো বছর পূর্বে যেমন ঘটেছিল আজও তাই। এবারেও এক পক্ষের আড়ম্বরের চুড়োটা অন্য পক্ষের চেয়ে অনেক উঁচু করেই গড়া হয়েছিল, অন্য পক্ষ তা রাস্তা পার হতে দিলে না। কিন্তু আসল হারজিত বাইরে দেখা যায় না। তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে।

চাটুজ্যেদের প্রজারা খুব হেসে নিলে। বিপ্রদাস রোগশয্যায়; তার কানে কিছুই পৌঁছল না।

১৭

বিয়ের দিন রাজার হুকুম, কনেব বাড়ি যাবার পথে ধুমধাম একেবাবেই বন্ধ। আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না, সঙ্গে কেবল নিজেদের পুরোহিত, আর দুইজন ভাট। পালকিতে করে নিঃশব্দে বিয়েবাড়িতে বর এল, লোকে হঠাৎ বুঝতেই পারলে না। ও দিকে মধুপুরীর তাঁবুতে আলো জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিপরীত হৈ হৈ শব্দে বরযাত্রীর দল আহারে আমোদে প্রবৃত্ত। নবগোপাল বুঝলে এটা হল পালটা জবাব। এমন স্থলে কন্যাপক্ষ হাতে পায়ে ধরে বরপক্ষের সাধ্যসাধনা করে; নবগোপাল তার কিছুটা করলে না। একবার জিজ্ঞাসাও করলে না, বরাযাত্রীদের হল কী।

কুমুদিনী সাজসজ্জা করে বিবাহ-আসরে যাবার আগে দাদাকে প্রণাম কবতে এল; তার সর্বশরীর কাঁপছে। বিপ্রদাসের তখন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর, বুকে পিঠে রাইসরষের পলস্তারা; কুমুদিনী তার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ক্ষেমাপিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, ‘‘ছি ছি, অমন করে কাঁদতে নেই।’’

বিপ্রদাস একটু উঠে বসে ওকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল —দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্ষেমাপিসি বললে, ‘‘সময় হল যে।’’

বিপ্রদাস কুমুর মাথায় হ’ত দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, ‘‘সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।’’ বলেই ধপ্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দু চোখ দিয়ে কেবল জল পড়েছে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে হাত ঠাণ্ডা হিম, আর থরথর কবে কাঁপছে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেছে? হয়তো দেখে নি এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর ওর ভয় ধরে গেছে। পাখির মনে হচ্ছে তার জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সংকীর্ণ তির্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী। কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষে ছাঁট। খুব আঁটসাঁট শরীর; যত বয়েস তার চেয়ে কম বোধ হয়. কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায়, বাজে কথা বাজে বিষয় বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।

বিবাহটা এমন ভাবে হল যে, সকলেরই মনে খারাপ লাগল। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শমাত্রই এমন একটা বেসুর ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল যে, তার মধ্যে উৎসবের সংগীত কোথায়



গেল তলিয়ে। থেকে থেকে কুমুর মনের একটা প্রশ্ন অভিমানে বুক ঠেলে ঠেলে উঠছে, 'ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?'' সংশয়কে প্রাণপণে চাপা দেয়, রুদ্ধঘরের মধ্যে একলা বসে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে; বলে, মন যেন দুর্বল না হয়। সব চেয়ে কঠিন হয়েছে দাদার কাছে সংশয় লুকোনো।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কুমুদিনীর সেবার 'পরেই বিপ্রদাসের একান্ত নির্ভর। কাপড়চোপড়, দিনখরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের সম্মার্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সংগীতযন্ত্রের পর্যবেক্ষণ, শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন সমস্ত কুমুর হাতে। এত বেশি অভ্যাস হয়ে এসেছে যে, প্রাত্যহিক ব্যবহারে কুমুর হাত কোথাও না থাকলে তার রোচে না। সেই দাদার রোগশয্যায় বিদায়ের আগে শেষ কয়দিন যে সেবা করতে হয়েছে তার মধ্যে নিজের ভাবনার কোনো ছায়া না পড়ে এই তার দুঃসাধ্য চেষ্টা। কুমুর এসরাজের হাত নিয়ে বিপ্রদাসের ভারী গর্ব। লাজুক কুমু সহজে বাজাতে চায় না। এই দুদিন সে আপনি যেচে দাদাকে কানাড়া মালকোষের আলাপ শুনিয়েছে। সেই আলাপের মধ্যেই ছিল তার দেবতার স্তব, তার প্রার্থনা, তার আশঙ্কা, তার আত্মনিবেদন। বিপ্রদাস চোখ বুজে চুপ করে শোনে আর মাঝে মাঝে ফরমাশ করে---সিন্ধু, বেহাগ, ভৈরবী- যে সব সুরে বিচ্ছেদ-বেদনার কান্না বাজে। সেই সুরেব মধ্যে ভাইবোন দুজনেই ব্যথা এক হয়ে মিশে যায়। মুখের কথায় দুজনে কিছুই বললে না; না দিলে পরস্পরকে সান্ত্বনা, না জানালে দুঃখ।

বিপ্রদাসের জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা সারল না---বরং বেড়ে উঠছে। ডাক্তার বলছে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, খুব সাবধান হওয়া চাই। কুমুর মনে উদ্‌বেগের সীমা নেই। কথা ছিল বাসি-বিয়ের কালরাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু শোনা গেল মধুসূদন হঠাৎ পণ করেছে, বিবাহের পবদিনে ওকে নিয়ে চলে যাবে। বুঝলে, এটা প্রথার জন্যে নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে। এমন অবস্থায় অনুগ্রহ দাবি কবতে অভিমানিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু কুমু মাথা হেঁট করে লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে এইমাত্র প্রার্থনা কবেছিল যে, আর দুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়, দাদাকে একটু ভালো দেখে যেন সে যেতে পারে। মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, ''সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'' এমন বজ্রে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই। তার পর মধুসূদন ওকে রাত্রে কথা কওয়াতে চেষ্টা করেছে, ও একটিও জবাব দিল না- বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

তখনো অন্ধকার, প্রথম পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চলে গেল।

বিপ্রদাস সমস্ত রাত ছট্‌ফট্ করেছে। সন্ধ্যার সময় জ্বর গায়েই বিবাহসভায় যাবার জন্যে ওর ঝোঁক হল। ডাক্তার অনেক চেষ্টায় চেপে রেখে দিলে। ঘন ঘন লোক পাঠিয়ে সে খবর নিয়েছে। খবরগুলো যুদ্ধের সময়কার খবরের মতো, অধিকাংশই বানানো। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, ''কখন বর এল? বাজনাবাদ্যির আওয়াজ তো পাওয়া গেল না।''

সংবাদদাতা শিবু বললে, ''আমাদের জামাই বড়ো বিবেচক- বাড়িতে অসুখ শুনেই সব থামিয়ে দিয়েছে---বরযাত্রদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না, এমনি ঠাণ্ডা।''

''ওরে শিবু, খাবার জিনিস তো কুলিয়েছিল? আমার ঐ এক ভাবনা ছিল এ তো কলকাতা নয়!''



"কুলোয় নি? বলেন কী হুজুর! কত ফেলা গেল! আরো অতগুলো লোককে খাওয়াবার মতো জিনিস বাকি আছে।"

"ওরা খুশি হয়েছে তো?"

"একটি নালিশ কারও মুখে শোনা যায় নি। একেবারে টু শব্দটি না। আরো তো এত এত বিয়ে দেখেছি, বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে। এরা এমনি চুপ, আছে কি না-আছে বোঝাই যায় না।"

বিপ্রদাস বললে, "ওরা কলকাতার লোক কিনা, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। ওরা বোঝে যে, যে বাড়ি থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমানে নিজেদেরই অপমান।"

"আহা, হুজুর যা বললেন, এই কথাটি ওদের লোকজনদের আমি শুনিয়ে দেব। শুনলে ওরা খুশি হবে।"

কুমু কাল সন্ধ্যের সময়েই বুঝেছিল অসুখ বাড়বার মুখে। অথচ সে যে দাদার সেবা করতে পারবে না এই দুঃখ সর্বক্ষণ তার বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তার হাতের সেবা যে তার দাদার কাছে ওষুধের চেয়ে বেশি।

স্নান করে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে কুমু যখন দাদার ঘরে এল তখনো সূর্য ওঠে নি। কঠিন রোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করে ক্ষণকাল ছুটি পাবার সময় যে অবসাদের বৈরাগ্য আসে সেই বৈরাগ্যে বিপ্রদাসের মন তখন শিথিল। জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তার কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ। সমস্ত রাত দরজা বন্ধ ছিল, ডাক্তার ভোরের বেলায় পূব দিকের জানালাটা খুলে দিয়েছে। অশথগাছের শিশির-ভেজা পাতার আড়ালে অরুণবর্ণ আকাশের আভা ধীরে ধীরে শুভ্র হয়ে আসছে—অদূরবর্তী নদীতে মহাজনি নৌকোর বৃহৎ তালি-দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হয়ে উঠল। নহবতে করুণ সুরে রামকেলি বাজছে।

পাশে বসে কুমু নিজের দুই ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে দাদার শুকনো গরম হাত তুলে নিলে। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুর খাটের নিচের বিমর্ষ মনে চুপ করে শুয়ে ছিল। কুমু খাটে এসে বসতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে দু পা তার কোলের উপর রেখে লেজ নাড়তে নাড়তে করুণ চোখে ক্ষীণ আর্তস্বরে কী যেন প্রশ্ন করলে।

বিপ্রদাসের মনে ভিতরে ভিতরে কী একটা চিন্তার ধারা চলছিল, তাই হঠাৎ এক সময়ে অসংলগ্নভাবে বলে উঠল, "দিদি, আসলে কিছুই নয়--কে বড়ো কে ছোটো, কে উপরে কে নীচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌গুলোর কোন্‌টার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়। আপনার ভিতরে আপনি সহজ হয়ে থাকিস, কিছুতেই তোকে মারবে না।"

"আমাকে আশীর্বাদ করো দাদা, আমাকে আশীর্বাদ করো," বলে কুমু দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপা দিলে।

বিপ্রদাস বালিশে ঠেস দিয়ে একটু উঠে বসে কুমুর মুখ নামিয়ে ধরে তার মাথার চুমো খেলে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে বললে, "আর নয় কুমুদিদি, এখন ওঁর একটু শান্ত থাকা দরকার।"

কুমু রোগীর বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক করে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে, পাশের টিপাইটার উপরকার বিশৃঙ্খলতা একটু সেরে নিয়ে দাদার কানের কাছে মৃদুস্বরে বললে, "সেরে গেলেই কলাকাতায় যেয়ো দাদা, সেখানে তোমাকে দেখতে পাব।"

বিপ্রদাস বড়ো বড়ো দুই স্নিগ্ধ চোখ কুমুর মুখের উপর স্থির রেখে বললে, "কুমু, পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এ-সব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইছে।



মেঘের মতোই অমনি সহজে এটাকে মেনে নিস দিদি। এখন থেকে আমাদের কথা বেশি ভাবিস নে। যেখানে যাচ্ছিস সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস— এই আমার সকল মনের আশীর্বাদ। তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাই নে।"

দাদার পায়ের কাছে কুমু মাথা রেখে পড়ে রইল। 'আজ থেকে আমার কাছে আর কিছুই চাবার নেই। এখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমার কোনো হাতই থাকবে না' —এক মুহূর্তে এতবড়ো বিচ্ছেদের কথা মেনে নেওয়া যায় না। ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙর যেমন করে মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়, দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেমনি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন। ডাক্তার আবার এসে ধীরে ধীরে বললে, "আর নয় দিদি।" বলে নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ মুছে ফেললে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে যে চৌকিটা ছিল তার উপর বসে পড়ে মুখে আঁচল দিয়ে কুমু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ে গেল দাদার 'বেসি' ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে বলে কাল রাত্রে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরি করে রেখেছিল। সইস আজ ভোরবেলায় তাকে খিড়কির বাগানে রেখে এসেছে। কুমু সেখানে গিয়ে দেখলে ঘোড়া আমড়াগাছতলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া করলে এবং তাকে দেখেই চিহিঁ হিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। বাঁ হাত তার কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তার মুখের কাছে রুটি ধরে তাকে খাওয়াতে লাগল। সে খেতে খেতে তার বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চলে গেল।

১৮

বিপ্রদাস নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন এই কয়দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা করে যাবে। তা যখন করলে না তখন ওর বুঝতে বাকি রইল না যে, দুই পরিবারের এই বিবাহের সম্বন্ধটাই এল পরস্পরের বিচ্ছেদের খড়্গ হয়ে। রোগের নিরতিশয় ক্লান্তিতে এ কথাটাকেও সহজভাবে সে মেনে নিলে। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "একটু এসরাজ বাজাতে পারি কি?"

ডাক্তার বললে, "না, আজ থাক্।"

"তা হলে কুমুকে ডাকো, সে একটু বাজাক। আবার কবে তার বাজনা শুনতে পাব, কে জানে।"

ডাক্তার বললে, "আজ সকালে ন-টার গাড়িতে ওঁদের ছাড়তে হবে, নইলে সূর্যাস্তের আগে কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন না। কুমুর তো আর সময় নেই।"

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলে বললে, "না, এখানে ওর সময় ফুরোল। উনিশ বছর কাটতে পেরেছে, এখন এক ঘণ্টাও আর কাটবে না।"

বিদায়ের সময় স্বামীস্ত্রী জোড়ে প্রণাম করতে এল। মধুসূদন ভদ্রতা করে বললে, "তাই তো, আপনার শরীর তো ভালো দেখছি না।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না করে বললে, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

"দাদা নিজের শরীরের একটু যত্ন কোরো" বলে আর-একবার বিপ্রদাসের পায়ের কাছে পড়ে কুমু কাঁদতে লাগল।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঢাক-কাঁসর-নহবতে একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল। ওরা গেল চলে।



পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালস্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ-যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন-মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন নরকে গিয়ে ঠেকবে! কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে!

পূজার্চনায় বিপ্রদাসের কোনোদিন উৎসাহ ছিল না। তবু আজ হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

এক সময়ে চমকে উঠে বললে, "ডাক্তার, ডাকো তো দেওয়ানজিকে।"

বিপ্রদাসের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিয়ে দিতে আসবার কিছুদিন আগে যখন সুবোধকে টাকা পাঠানো নিয়ে মন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন, হিসাবের খাতাপত্র ঘেঁটে ক্লান্ত, বেলা এগারোটা - এমন সময়ে অত্যন্ত বে-মেরামত গোছের একটা মানুষ, কিছুকালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, ময়লা একখানা চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চটি-পরা, এসে উপস্থিত। নমস্কার করে বললে, "বড়োবাবু, মনে পড়ে কি?"

বিপ্রদাস একটু লক্ষ্য করে বললে, "কী, বৈকুণ্ঠ নাকি?"

বিপ্রদাস বাল্যকালে যে ইস্কুলে পড়ত সেই ইস্কুলেরই সংলগ্ন একটা ঘরে বৈকুণ্ঠ ইস্কুলের বই খাতা কলম ছুরি ব্যাটবল লাটিম আর তারই সঙ্গে মোড়কে-করা চীনাবাদাম বিক্রি করত। তার ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিল—যতরকম অদ্ভুত অসম্ভব খোসগল্প কবতে এর জুড়ি কেউ ছিল না।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার এমন দশা কেন?"

কয়েক বৎসর হল সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তাদের পণের বিশেষ কোনো আবশ্যক ছিল না বলেই বরের পণও ছিল বেশি। বারোশো টাকায় রফা হয়, তা ছাড়া আশি ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে বলেই মরিয়া হয়ে সে রাজি হয়েছিল। একসঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেছে। সম্বল সবই ফুরোল তবু এখনো আড়াইশো টাকা বাকি। এবাবে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তাতে করে জেলের কয়েদির জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হল, অপরাধ বেড়েই গেল। এখন ঐ আড়াইশো টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচতে পারলে বাপ মরবার কথাটা ভাববার সময় পায়।

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসলে। যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবার কথা সেদিন ভাববারও জো ছিল না। ক্ষণকালের জন্যে ইতস্তত করলে, তার পরে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে থলি ঝেড়ে দশটি টাকার নোট এনে তার হাতে দিল। বললে, "আরো দু-চার জাগয়া থেকে চেষ্টা দেখো, আমার আর সাধ্য নেই।"

বৈকুণ্ঠ সে কথা একটুও বিশ্বাস করলে না। পা টেনে টেনে চলে গেল, চটিজুতোয় অত্যন্ত অপ্রসন্ন শব্দ।

সেদিনকার এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল, আজ হঠাৎ বিপ্রদাসের মনে পড়ল। দেওয়ানজিকে ডেকে হুকুম হল—বৈকুণ্ঠকে আজই আড়াইশো টাকা পাঠানো চাই। দেওয়ানজি চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়। জেদাজেদির মুখে খরচ করে বিবাহ তো চুকেছে, কিন্তু অনেকদিন ধরে তার হিসাব শোধ করতে হবে—এখন দিনের গতিকে আড়াইশো টাকা যে মস্তবড়ো অঙ্ক।

দেওয়ানজির মুখের ভাব দেখে বিপ্রদাস আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে বললে, "ছোটোবাবুর



নামে যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, তার থেকে ঐ আড়াইশো টাকা নাও, তার বদলে আমার আংটি বন্ধক রইল। বৈকুণ্ঠকে টাকাটা যেন কুমুর নামে পাঠানো হয়।"

১৯

বিবাহের লঙ্কাকাণ্ডের সব-শেষ অধ্যায়টা এখনো বাকি।

সকালবেলায় কুশণ্ডিকা সেরে তবে বরকনে যাত্রা করবে এই ছিল কথা। নবগোপাল তারই সমস্ত উদ্‌যোগ ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিপ্রদাসের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাবাহাদুর বলে বসল- -কুশণ্ডিকা হবে বরের ওখানে, মধুপুরীতে।

প্রস্তাবের ঔদ্ধত্যটা নবগোপালের কাছে অসহ্য লাগল। আর কেউ হলে আজ একটা ফৌজদারি বাধত। তবু ভাষায় প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।

অন্তঃপুরে অপমানটা খুব বাজল। বহুদূর থেকে আত্মীয় কুটুম্ব সব এসেছে, তাদের মধ্যে ঘরশত্রুর অভাব নেই। সবার সামনে এই অত্যাচার। ক্ষেমাপিসি মুখ গোঁ করে বসে রইলেন। ববকনে যখন বিদায় নিতে এল তাঁর মুখ দিয়ে যেন আশীর্বাদ বেরোতে চাইল না। সবাই বললে, এ কাজটা কলকাতায় সেরে নিলে তো কারও কিছু বলবার কথা থাকত না। বাপের বাড়ির অপমানে কুমু একান্তই সংকুচিত হয়ে গেল মনে হতে লাগল সে ই যেন অপরাধিনী তার সমস্ত পূর্বপুরুষদের কাছে। মনে মনে তার ঠাকুরের প্রতি অভিমান করে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি যেজন্যে আমার এত শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস করে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছি।'

বরকনে গাড়িতে উঠল। কলকাতা থেকে মধুসূদন যে ব্যান্ড এনেছিল তাই উচ্চৈঃস্বরে নাচের সুর লাগিয়ে দিলে। মস্ত একটা শামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। ইংরেজ মেয়েপুরুষ অভ্যাগত কেউ-বা গদিওয়ালা চৌকিতে বসে, কেউ-বা কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। এরই মধ্যে তাদের জন্যে চা-বিস্কুটও এল। একটা টিপায়ের উপর মস্তবড়ো একটা ওয়েডিং কেকও সাজানো আছে। অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেলে এরা এসে যখন কনগ্যাচুলেট করতে লাগল, কুমু মুখ লাল করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মোটাগোছের প্রৌঢ়া ইংরেজ মেয়ে ওব বেনারসি শাড়ির আঁচল তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে; এর হাতে খুব মোটা সোনাব বাজুবন্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেও তার বিশেষ কৌতূহল বোধ হল। ইংরেজি ভাষায় প্রশংসাও করলে। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধুসূদনকে একদল বললে, "how interesting"; আর একদল বললে, "isn't it?"

এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে— আজ তাকেই দেখলে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকশিত। চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর-এক পিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুদৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য।

সেলুন-গাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে মধুসূদন; অন্য রিজার্ভ-করা গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। তারা কেউ-বা ওর হাত তুলে টিপে দেখে, কেউ-বা চিবুক তুলে মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে, কেউ-বা বলে ঢ্যাঙা, কেউ-বা বলে রোগা। কেউ-বা অতি ভালোমানুষের মতো



জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ গা, গায়ে কী রঙ মাখ, বিলেত থেকে তোমার ভাই বুঝি কিছু পাঠিয়েছে?" সকলেই মীমাংসা করলে, চোখ বড়ো নয়, পায়ের মাপটা মেয়েমানুষের পক্ষে অধিক বড়ো। গায়ের প্রত্যেক গয়নাটি নেড়েচেড়ে বিচার করতে বসল-- -সেকেলে গয়না, ওজনে ভারী, সোনা খাঁটি—কিন্তু কী ফ্যাশান, মরে যাই!

ওদের গাড়িতে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকের জানলা খোলা ছিল, সেই দিকে কুমু চেয়ে রইল, চেষ্টা করতে লাগল এদের কথা যাতে কানে না যায়। দেখতে পেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুকে বেড়াচ্ছে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাকত! কিছুই ছিল না। কুমু মনে মনে ভাবতে লাগল, যে-একটি পা গিয়েছে তারই অভাবে ওর যা-কিছু সহজ ছিল তার সমস্তই হয়ে গেল কঠিন। এমন সময় কুমুর কানে গেল সেলুন-গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক বলছে, "দেখুন, এই চাষির মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসেছে; গোয়ালন্দ পর্যন্ত টিকিটের টাকা আছে, ওর বাড়ি দুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়।" সেলুন-গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার আওয়াজ কুমু শুনতে পেলে। সে আর থাকতে পারলে না, তখনই ডান দিকের জানলা খুলে তার পুঁতিগাঁথা থকে উজাড় করে দশ টাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানলা বন্ধ করে দিল। দেখে একজন মেয়ে বলে উঠল, "আমাদের বউয়ের দবাজ হাত দেখি।" আর একজন বললে, "দরাজ নয় তো দরজা, লক্ষ্মীকে বিদায় করবার।" আর একজন বললে, "টাকা ওড়াতে শিখেছে, রাখতে শিখলে কাজে লাগত।" এটাকে ওরা দেমাক বলে ঠিক করলে বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অমনি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দেন, এত কিসের গুমোর! ওদের মনে হল এও বুঝি সেই চাটুজ্যে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ।

এমন সময়ে ওদের মধ্যে একটি মোটাসোটা কালোকোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে বসল। চুপি চুপি বললে, "মন কেমন করছে ভাই? এদের কথায় কান দিয়ো না, দুদিন এইরকম টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।" এই মেয়েটি কুমুর মেজো জা, নবীনের স্ত্রী। ওর নাম নিস্তারিণী, ওকে সবাই মোতির মা বলে ডাকে।

মোতির মা কথা তুললে, "যেদিন নুরনগরে এলুম, ইস্টিশনে তোমার দাদাকে দেখলুম যে।"

কুমু চমকে উঠল। ওর দাদা যে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল সে খবর এই প্রথম শুনলে।

"আহা, কী সুপুরুষ! এমন কখনো চক্ষে দেখি নি। ঐ-যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে --

গোরার রূপে লাগল রসের বান
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ

আমার তাই মনে পড়ল।"

মুহূর্তে কুমুর মন গলে গেল। মুখ আড় করে জানালা দিকে রইল চেয়ে -বাইরের মাঠ বন আকাশ অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে গেল।

মোতির মা'র বুঝতে বাকি ছিল না কোন্ জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম করে ওর দাদার কথাই আলোচনা করলে। জিজ্ঞাসা করলে বিয়ে হয়েছে কি না।

কুমু বললে, "না।"

মোতির মা বলে উঠল, "মরে যাই! অমন দেবতার মতো রূপ, এখনো ঘর খালি! কোন্ ভাগ্যবতীর কপালে আছে ঐ বর!"

কুমু তখন ভাবছে—দাদা গিয়েছিলেন সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, কেবল আমারই জন্যে!



তার পরে এঁরা একবার দেখতেও এলেন না! কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকেও অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! তাঁর শরীর এইজন্যই বুঝি-বা ভেঙে পড়ল।

বৃথা আক্ষেপের সঙ্গে বার বার মনে মনে বলতে লাগল — দাদা কেন গেলে ইস্টেশনে? কেন নিজেকে খাটো করলে? আমার জন্যে? আমার মরণ হল না কেন?

যে কাজটা হয়ে গেছে, আর ফেরানো যাবে না, তারই উপর ওর মনটা মাথা ঠুকতে লাগল। কেবলই মনে পড়তে লাগল, সেই রোগে ক্লান্ত শান্ত মুখ, সেই আশীর্বাদে ভরা স্নিগ্ধগম্ভীর দুটি চোখ।

২০

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছল, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায় চাদরে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে বরকনে গিয়ে বসল ব্রুহাম গাড়িতে। কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সংকুচিত হয়ে রইল। যে-একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারীজীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে? এমন মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খসে যায়। কিন্তু সে মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনো বেজে ওঠে নি। পাশে যে মানুষটি বসে আছে, মনে ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেছে। তার ভাবে ব্যবহারে যে একটা রূঢ়তা সে যে কুমুকে এখনো পর্যন্ত কেবলই ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখল।

এ দিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য নারীর ছোঁওযাও ওকে কখনো লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে — ইমারত জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের এই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায় নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।

এমন সময় বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখলে। এক রকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ও পারে। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে — অন্তত একটা ভাবনা উঠল এর সঙ্গে কী রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন করে বললে সংগত হবে।

কী বলে আলাপ আরম্ভ করবে ভাবতে ভাবতে মধুসূদন হঠাৎ এক সময়ে কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "এ দিক থেকে রোদদুর আসছে, না?"



কুমু কিছুই জবাব করলে না। মধুসূদন ডান দিকের পর্দাটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ কাটল। আবার খামকা বলে উঠল, "শীত করছে না তো?" বলেই উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সামনের আসন থেকে বিলিতি কম্বলটা টেনে নিয়ে কুমুর ও নিজের পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপন করলে। শরীর মন পুলকিত হয়ে উঠল। চমকে উঠে কুমুদিনী কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, শেষে নিজেকে সংবরণ করে আসনের প্রান্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে যায় এমন সময় হঠাৎ হাতের দিকে মধুসূদনের চোখ পড়ল।

"দেখি দেখি" বলে হঠাৎ তার বাঁ হাতটা চোখের কাছে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার আঙুলে এ কিসের আংটি? এ যে নীলা দেখছি।"

কুমু চুপ করে রইল।

"দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।"

কোনো এক সময়ে মধুসূদন নীলা কিনেছিল, সেই বছর ওর গাধাবোট বোঝাই পাট হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়। সেই অবধি নীলা পাথরকে ও ক্ষমা করে না।

কুমুদিনী আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলে। মধুসূদন ছাড়লে না; বললে, "এটা আমি খুলে নিই।"

কুমু চমকে উঠল; বললে, "না, থাক্।"

একবার দাবাখেলায় ওর জিত হয়; সেইবার দাদা ওকে তার নিজের হাতের আংটি পারিতোষিক দিয়েছিল।

মধুসূদন মনে মনে হাসলে। আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখছি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল। বুঝলে, সময়ে অসময়ে সিঁথি কণ্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে— এই পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, বয়স না-হয় কিছু বেশিই হল।

নিজের হাত থেকে মস্তবড়ো কমলহীরের একটা আংটি খুলে নিয়ে মধুসূদন হেসে বললে, "ভয় নেই, এর বদলে আর-একটা আংটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি।"

কুমু আর থাকতে পারলে না, একটু চেষ্টা করেই হাত ছাড়িয়ে নিলে। এইবার মধুসূদনের মনটা ঝেঁকে উঠল। কর্তৃত্বের খর্বতা তাকে সইবে না, শুষ্ক গলায় জোর করেই বলল, "দেখো, এ আংটি তোমাকে খুলতেই হবে।"

কুমুদিনী মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন আবার বললে, "শুনছ? আমি বলছি ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।" বলে হাতটা টেনে নিতে উদ্যত হল।

কুমু হাত ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি খুলছি।"

খুলে ফেললে।

"দাও, ওটা আমাকে দাও।"

কুমুদিনী বললে, "ওটা আমিই রেখে দেব।"

মধুসূদন বিরক্ত হয়ে হেঁকে উঠল, "রেখে লাভ কী? মনে ভাবছ, এটা ভারি একটা দামি জিনিস! এ কিছুতেই তোমার পরা চলবে না, বলে দিচ্ছি।"

কুমুদিনী বললে, "আমি পরব না।" বলে সেই পুঁতির কাজ করা থলেটির মধ্যে আংটি রেখে দিলে।



"কেন, এই সামান্য জিনিসটার উপরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়!"

মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী করে উঠল।

"এ আংটি তোমাকে দিলে কে?"

কুমুদিনী চুপ করে রইল।

"তোমার মা নাকি?"

নিতান্তই জবাব দিতে হবে বলেই অর্ধস্ফুটস্বরে বললে, "দাদা।"

দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দাদার দশা যে কী, মধুসূদন তা ভালোই জানে। সেই দাদার আংটি শনির সিধকাঠি—এ ঘরে আনা চলবে না। কিন্তু তার চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্ছে যে, এখনো কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সব চেয়ে বেশি। সেটা স্বাভাবিক বলেই যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরোনো জমিদারের জমিদারি নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে, এও তেমনি। আজ থেকে আমিই যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যত শীঘ্র হোক ওকে জানান দেওয়া চাই। তা ছাড়া গায়ে-হলুদের খাওয়ানো নিয়ে ববের যা অপমান হয়েছে তাতে বিপ্রদাস নেই এ কথা মধুসূদন বিশ্বাস করতেই পারে না। যদিও নবগোপাল বিবাহের পরদিনে ওকে বলেছিল, "ভায়া, বিয়েবাড়ির তোমাদের হাটখোলার আড়ত থেকে যে-চালচলনের আমদানি করেছিল, সে কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো না; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।"

আংটির কথাটা আপাতত স্থগিত রাখলে, কিন্তু মনে রইল।

এ দিকে রূপ ছাড়া আরো একটা হঠাৎ হঠাৎ কুমুদিনীর দর বেড়ে গিয়েছে। নুরনগরে থাকতেই ঠিকবিবাহের দিনে মধুসূদন টেলিগ্রাফ পেয়েছে যে, এবার তিসি চালানের কাজে লাভ হয়েছে প্রায় বিশ লাখ টাকা। সন্দেহ রইল না, এটা নতুন বধূর পয়ে। স্ত্রীভাগ্যে ধন, তার প্রমাণ হাতে হাতে। তাই কুমুকে পাশে নিয়ে গাড়িতে বসে ভিতরে ভিতরে এই পরম পরিতৃপ্তি তার ছিল যে, ভাবী মুনফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল নিয়ে বাড়ি চলেছে। এ নইলে আজকের এই ব্রুহাম-রথযাত্রার পালাটায় অপঘাত ঘটতে পারত।

২১

রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে কলকাতায় ঘোষালবাড়ির দ্বারে নাম খোদা হয়েছে 'মধুপ্রাসাদ'। সেই প্রাসাদের লোহার গেটের এক পাশে আজ নহবত বসেছে, আর বাগানে একটা তাঁবুতে বাজছে ব্যাণ্ড। গেটের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার গ্যাসের টাইপে লেখা "প্রজাপতয়ে নমঃ।" সন্ধ্যাবেলায় আলোকশিখায় এই লিখনটি সমুজ্জ্বল হবে। গেট থেকে কাঁকর-দেওয়া যে পথ বাড়ি পর্যন্ত গেছে তার দুই ধারে দেবদারুপাতা ও গাঁদার মালায় শোভাসজ্জা; বাড়ির প্রথম তলায় উঁচু মেজেতে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে লাল সালু পাতা। আত্মীয়বন্ধুর জনতার ভিতর দিয়ে বরকনের গাড়ি গাড়িবারান্দায় এসে থামল। শাঁখ উলুধ্বনি ঢাক ঢোল কাঁসর নহবত ব্যাণ্ড সব একসঙ্গে উঠল বেজে—যেন দশ-পনেরোটা আওয়াজের মালগাড়ির এক জায়গাতে পুরো বেগে ঠোকাঠুকি ঘটল। মধুসূদনের কোন্-এক সম্পর্কের দিদিমা, পরিপক্ক বুড়ি, সিঁথিতে যত মোটা ফাঁক তত মোটা সিঁদুর, চওড়া-



লাল-পেড়ে শাড়ি, মোটা হাতে মোটা মোটা সোনার বালা এবং শাঁখার চুড়ি, একটা রুপোর ঘটিতে জল নিয়ে বউয়ের পায়ে ছিটিয়ে দিয়ে আঁচল মুছে নিলেন, হাতে নোয়া পরিয়ে দিলেন, বউয়ের মুখে একটু মধু দিয়ে বললেন, "আহা, এতদিন পরে আমাদের নীল গগনে উঠল পূর্ণচাঁদ, নীল সরোবরে ফুটল সোনাল পদ্ম।" বরকনে গাড়ি থেকে নামল। যুবক অভ্যাগতদের দৃষ্টি ঈর্ষান্বিত। একজন বললে, "দৈত্য স্বর্গ লুট করে এনেছে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা।" আর একজন বললে, "সাবেক কালে এমন মেয়ের জন্যে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেত, আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি। কলিযুগে দেবতাগুলো বেরসিক। ভাগ্যচক্রের সব গ্রহণক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।"

তার পরে বরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পালা শেষ হতে হতে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন কালরাত্রির মুখে ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ হল।

একটিমাত্র বড়ো বোনের বিবাহ কুমুর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নিজেদের বাড়িতে কোনো নতুন বউ আসতে সে দেখে নি। যৌবনারম্ভের পূর্বে থেকেই সে আছে কলকাতায়, দাদার নির্মল স্নেহের আবেষ্টনে। বালিকার মনের কল্পজগৎ সাধারণ সংসারের মোটা ছাঁচে গড়া হতে পায় নি। বাল্যকালে পতিকামনায় যখন সে শিবের পূজা করেছে তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজত-গিরিনিভ শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা। অপর পক্ষে তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন ছিল; তৎসত্ত্বেও সে চরিত্র ঔদার্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিল না, যে একটা মর্যাদাবোধ ছিল সে যেন দূরকালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হয়েছে যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য। তিনি ও তাঁর সমপর্যায়ের লোকেরা বড়ো বহরের মানুষ। তাঁদের ছিল নিজেদের ক্ষতি করেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহংকার প্রচার নয়

কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচল সেদিন সে তার সব ভক্তি নিয়ে, আত্মোৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোথাও কোনো বাধা বা খর্বতা ঘটতে পারে এ কথা তার কল্পনাতেই আসে নি। দময়ন্তী কী করে আগে থাকতে জেনেছিলেন যে, বিদর্ভবাজ নলকেই বরণ করে নিতে হবে! তাঁর মনেব ভিতরে নিশ্চিত বার্তা এসে পৌচেছিল তেমনি নিশ্চিত বার্তা কি কুমু পায় নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, বাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বাইরে তাকে দেখতে কই? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যিকার বাজা কোথায়?

তার পরে আজ, যে অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়ে কুমুকে তাব নতুন সংসারে আহ্বান করলে তাতে এমন কোনো বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজল না কেন যার ভিতব দিয়ে এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্বাদমন্ত্র শুনতে পেত! সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ করে এমন বন্দনাগান উদাত্ত স্বরে কেন জাগল না

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ

সেই 'জগতঃ পিতরৌ' যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র মিলিত হয়ে আছে?



২২

মধুসূদন যখন কলকাতায় বাস করতে এল, তখন প্রথমে সে একটি পুরোনো বাড়ি কিনেছিল, সেই চকমেলানো বাড়িটাই আজ তার অন্তঃপুর মহল। তার পরে তারই সামনে এখনকার ফ্যাশানে একটা মস্ত নতুন মহল এবই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সেইটে ওর বৈঠকখানা বাড়ি। এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত। বাইরের মহলে সর্বত্রই মার্বলের মেজে, তার উপরে বিলিতি কার্পেট, দেয়ালে চিত্রিত কাগজ মারা এবং তাতে ঝুলছে নানারকমের ছবি কোনোটা এনগ্রেভিং, কোনোটা ওলিয়োগ্রাফ, কোনোটা অয়েলপেন্টিং -- তার বিষয় হচ্ছে, হরিণকে তাড়া করেছে শিকারী কুকুর, কিংবা ডার্বির ঘোড়দৌড় জিতেছে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, বিদেশী ল্যান্ডস্কেপ, কিংবা স্নানরত নগ্নদেহ নারী। তা ছাড়া দেয়াল কোথাও বা চীনে বাসন, মোরাদাবাদি পিতলের থালা, জাপানি পাখা, তিব্বতি চামর ইত্যাদি যতপ্রকার অসংগত পদার্থের অস্থানে অযথা সমাবেশ। এই সমস্ত গৃহসজ্জা পছন্দকরা, কেনা এবং সাজানোর ভার মধুসূদনের ইংরেজ অ্যাসিস্টান্টের উপর। এ ছাড়া মকমলে বা রেশমে মোড়া চৌকি-সোফার অরণ্য। কাঁচের আলমারিতে জমকালো বাঁধানো ইংরেজি বই, ঝাড়ন-হস্ত বেহারা ছাড়া কোনো মানুষ তার উপর হস্তক্ষেপ করে না-- টিপাইয়ে আছে অ্যালবাম, তার কোনোটাতে ঘরের লোকের ছবি, কোনোটাতে বিদেশিনী অ্যাকট্রেসদের।

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জনা সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই, যখন ব্যবহার নেই তখনো কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরে বারান্দা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুলছে, আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনে। বারান্দার দেয়ালের যেখানে সেখানে পানের পিকের দাগ ও নানাপ্রকার মলিনতার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন। উঠোনের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্বত্রই লাভ করে। রান্নাঘরের বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে, তারই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশীকৃত; অপর প্রান্তে গুটিদুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জমছে, এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। এক ধারে একটিমাত্র নিমগাছ, তার গুঁড়িতে গোরু বেঁধে বেঁধে বাকল গেছে উঠে, আর ক্রমাগত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তার পাতা কেড়ে নিয়ে গাছটাকে জেরবার করে দিয়েছে। অন্তঃপুরে এই একটুমাত্র জমি, বাকি সমস্ত জমি বাইরের দিকে। সেটা লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুরকি দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

অন্দরমহলে তেতলায় কুমুদিনীর শোবার ঘর। মস্ত বড়ো খাট মেহগনি কাঠের ফ্রেমে নেটের মশারি, তাতে সিল্কের ঝালর। বিছানার পায়ের দিকে পুরো বহরের একটা নিরাবরণ মেয়ের ছবি, বুকের উপর দুই হাত চেপে লজ্জার ভান করছে। শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েলপেন্টিং, তাতে তার কাশ্মীরি শালের কারুকার্যটাই সব চেয়ে প্রকাশমান। এক দিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না; আয়নার দু দিকে দুটো চীনেমাটির শামাদান, সামনে চীনেমাটির থালির উপর পাউডারের কৌটো, রুপো বাঁধানো চিরুনি, তিন চার রকমের এসেন্স, এসেন্স ছিটোবার পিচকারি এবং আরো নানা রকমের প্রসাধনের সামগ্রী, বিলিতি অ্যাসিস্টান্টের কেনা। নানাশাখাযুক্ত গোলাপি কাঁচের ফুলদানিতে ফুলে তোড়া। আর-এক দিকে লেখবার টেবিল, তাতে দামি পাথরের দোয়াতদান, কলম ও কাগজকাটা। ইতস্তত মোটা গদিওয়ালা সোফা ও কেদারা--- কোথাও-বা



টিপাই, তাতে চা খাওয়া যায়, তাসখেলা যেতেও পরে। নতুন মহারানীর উপযুক্ত শয়নঘর কী রকম হওয়া বিধিসংগত এ কথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। এমন হয়ে উঠল, যেন অন্দরমহলের সর্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরিজহরাত-দেওয়া পাগড়ি।

অবশেষে এক সময়ে গোলমাল ধুমধামের বানডাকা দিন পার হয়ে রাত্রিবেলা কুমু এই ঘরে এসে পৌঁছল। তাকে নিয়ে এল মোতির মা। সে ওর সঙ্গে রাত্রে শোবে ঠিক হয়েছে। আরো একদল মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। তাদের কৌতূহল ও আমোদের নেশা মিটতে চায় না মোতির মা তাদের বিদায় করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে এসেই এক হাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি কিছুক্ষণের জন্যে যাই ঐ পাশের ঘরে তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই, চোখের জল যে বুক ভরে জমে উঠেছে।" বলে সে চলে গেল।

কুমু চৌকির উপর বসে পড়ল। কান্না পরে হবে, এখন ওর বড়ো দরকার হয়েছে নিজেকে ঠিক করা। ভিতরে ভিতরে সকলের চেয়ে যে ব্যথাটা ওকে বাজছিল সে হচ্ছে নিজের কাছে নিজের অপমান। এতকাল ধরে ও যা-কিছু সংকল্প করে এসেছে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উলটো দিকে চলে গেছে। সেই মনটাকে শাসন করবার একটুও সময় পাচ্ছিল না। ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি করে দিয়ো না। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারই।

পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই বললে, "মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বেড়ে রাখবে তোমাকে যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্ছি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ত জমাখরচের খাতাই হবে ওব বউ। তা ঐ খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ঐখানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

কুমু অবাক হয়ে রইল, কী জবাব দেবে ভেবেই পেলে না। শ্যামা বলে উঠল, "বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কী, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উলটো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।"

কুমু বললে, "এ কী কথা বলছ দিদি!"

শ্যামা জবাব দিলে, "খোলসা করে কথা বললেই কি দোষ হয় বোন? মুখ দেখে কি বুঝতে পারি নে? তা দোষ দেব না তোমাকে। ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি? বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝে সুঝে চোলো।"

এমন সময় মোতির মাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, "ভয় নেই, ভয় নেই, বকুলফুল যাচ্ছি আমি। ভাবলুম তুমি নেই এই ফাঁকে আমাদের নতুন বউকে একবার দেখে আসি গে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখতে হবে। সইকে বলছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন হল আধ-কপালে মাথাধরা; বউকে ধরেছে ওর বাঁ দিকের পাওয়ার-কপালে এখন ডান দিকের রাখার-কপাল যদি ধরতে পারে তবেই পুরোপুরি হবে।"

এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত পরে ঢুকে কুমুর সামনে পানের ডিবে খুলে ধরে বললে, "একটা পান নেও। দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে?"



কুমু বললে, "না।" তখন এক টিপ দোক্তা নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিয়ে শ্যামা মন্দগমনে বিদায় নিলে।

"এখনই বদ্দিমাসিকে খাইয়ে বিদায় করে আসছি, দেরি হবে না" বলে মোতির মা চলে গেল।

শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সব চেয়ে দরকার ছিল মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গড়তে বসেছিল, আর যে সৃষ্টিকর্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রঙ নিয়ে রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন বোনা জালে ঘা মারলে। কুমু চোখ বুজে খুব জোর করে নিজেকে বলতে লাগল, 'স্বামীর বয়স বেশি বলে তাঁকে ভালোবাসি নে এ কথা কখনোই সত্য নয় লজ্জা লজ্জা! এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা।' শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই? শিবনিন্দুকরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা সতী কানে নেন নি।

স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে এ পর্যন্ত কুমু কোনো চিন্তাই করে নি। সাধারণত যে ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে পয়োজন আছে এ কথা কুমু ভাবেও নি। পছন্দ করে নেওয়ার কথাটাকেই রঙ মাখিয়ে চাপা দিতে চায়।

এমন সময় ফুলকাটা জামা ও জরির পাড়ওয়ালা ধুতি-পরা ছেলে, বয়স হবে বছর সাতেক, ঘরে ঢুকেই গা ঘেঁষে কুমুর কাছে এসে দাঁড়াল। বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ ওর মুখের দিকে তুলে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি সুরে বললে, "জ্যাঠাইমা।" কুমু তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে, "কী বাবা, তোমার নাম?" ছেলেটি খুব ঘটা করে বললে, শ্রীটুকুও বাদ দিলে না, "শ্রীমোতিলাল ঘোষাল।" সকলের কাছে পরিচয় ওর হাবলু বলে। সেইজন্যেই উপযুক্ত দেশকালপাত্রে নিজের সম্মান রাখবার জন্যে পিতৃদত্ত নামটাকে এত সুসম্পূর্ণ করে বলতে হয়। তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টনটন করছিল এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হল কতদিন ঠাকুরঘরে যে গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সেই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, "এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।" মোতির গোল গোল গাল টিপে ধরে কুমু বললে, "গোপাল, ফুল নেবে?"

কুমুর মুখ দিয়ে গোপাল ছাড়া আর কোনো নাম বেরোল না। হঠাৎ নিজের নামান্তরে হাবলুর কিছু বিস্ময় বোধ হল--কিন্তু এমন সুর ওর কানে পৌঁচেছে যে, কিছু আপত্তি ওর মনে আসতে পারে না।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে মোতির মা ছেলের গলা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে বললে, "ঐ রে, বাঁদর-ছেলেটা এসেছে বুঝি।" শ্রীমোতিলাল ঘোষাল-এর সম্মান আর থাকে না। নালিশে-ভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল, ডান হাতে জ্যাঠাইমার আঁচল চেপে। কুমু হাবলুকে তার বাঁ হাত দিয়ে বেড়ে নিয়ে বললে, "আহা, থাক্ না।"

"না ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন শুতে যাক এ বাড়িতে ওকে খুব সহজেই মিলবে, ওর মতো সস্তা ছেলে আর কেউ নেই।" বলে মোতির মা অনিচ্ছুক ছেলেকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে গেল। এই এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেল হালকা হয়ে। ওর মনে হল প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হয়ে দেখা দেবে এই ছোটো ছেলেটির মতোই।



২৩

অনেক রাত্তিরে মোতির মা এক সময়ে জেগে উঠে দেখলে কুমু বিছানায় উঠে বসে আছে, তার কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানবিষ্ট চোখ দুটি যেন সামনে কাকে দেখতে পাচ্ছে। মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁব চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।

মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি' দাদার কাছে শেখা মীরাবাই এর এই গানটা বার বার মনে মনে আওড়াতে লাগল।

মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে পরিচয় সে পেয়েছে তাকে কিছুই নয় বলে জলের উপরকার বুদ্‌বুদ্‌ বলে উড়িয়ে দিতে চায়- চিরকালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত কবে তিনিই আছেন, 'ঔর নাহি কোহি, ঔর নাহি কোহি।' এ ছাড়া আর একটা পীড়ন আছে তাকেও মায়া বলতে চায় সে হচ্ছে জীবনের শূন্যতা। আজ পর্যন্ত যাদের নিয়ে ওর সমস্ত কিছু গড়ে উঠেছে, যাদের বাদ দিয়ে দিতে গেলে জীবনের অর্থ থাকে না, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ—সে নিজেকে বলছে এই শূন্যও পূর্ণ–

''বাপে ছাড়ে, মায়ে ছাড়ে, ছাড়ে সগা সহী,
মীরা প্রভু লগন লগী যো ন হোয়ে হোয়ী।'

ছেড়েছেন তো বাপ, ছেড়েছেন, তো মা, কিন্তু তাঁদের ভিতরেই যিনি চিরকালকার তিনি তো ছাড়েন নি। ঠাকুর আবো য কিছু ছাড়ান না কেন, শূন্য ভরাবেন বলেই ছাড়িয়েছেন। আমি লেগে রইলুম, যা হয় তা হোক। মনের গান কখন তার গলায় ফুটে উঠল তা টেরই পেলে না দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

মোতির মা কথাটি বললে না, চুপ করে দেখলে, আর শুনলে। তার পরে কুমু যখন অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম কবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল তখন মোতির মা'র মনে একটা চিন্তা দেখা দিল যা পূর্বে আর কখনো ভাবে নি।

ও ভাবতে লাগল, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমবা তো কচি খুকি ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়. স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি। সাধন করে আমাদের নিতে হয় নি, আমাদের জন্যে দিন-গোনা ছিল অনাবশ্যক। যেদিন বললে ফুলশয্যে সেইদিনই হল ফুলশয্যে, কেননা ফুলশয্যের কোনো মানে ছিল না, সে ছিল একটা খেলা। এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতবড়ো বিড়ম্বনা! বড়োঠাকুর এখনো পর; আপন হতে অনেক সময় লাগে। একে ছোবে কী করে? এ মেয়ের সেই অপমান সইবে কেন? ধন পেতে বড়োঠাকুরের কত কাল লাগল আর মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাততে হবে না?

এত কথা মোতির মা'র মনে আসত না। এসেছে তার কারণ, কুমুকে দেখবা মাত্রই ও তাকে



সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। এই ভালোবাসার পূর্বভূমিকা হয়েছিল স্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মা'র মনে হয়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজও সে ভুলতে পারে নি। তার পরে যখন কুমুকে দেখলে, মনে মনে বললে, দাদারই বোন বটে।

একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের---সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝাবার সময় পায় নি-কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তার গা কেমন করে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে---যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে। মোতির মা রেগে উঠে মনে মনে বললে, 'দেবতার মুখে ছাই! যে দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েছে সেই নাকি ওকে উদ্ধার করবে! হায় রে।'

২৪

পরের দিন সকালেই কুমু দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, "ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।" সেই টেলিগ্রামের কাগজখানি জামার মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে। এই টেলিগ্রামে যেন দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ। কিন্তু দাদা নিজের শরীরের কথা কেন কিছুই লিখলে না? তবে কি অসুখ বেড়েছে? দাদার সব খবরই মুহূর্তে মুহূর্তে যার প্রত্যক্ষগোচর ছিল, আজ তার কাছে সবই অবরুদ্ধ।

আজ ফুলশয্যে, বাড়িতে লোকারণ্য। আত্মীয়-মেয়েরা সমস্তদিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিছুতে তাকে একলা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিল।

শোবার ঘরের পাশেই ওর নাবার ঘর; সেখানে জলে কল পাতা এবং ধারাস্নানের ঝাঁঝরি বসানো। কোনো অবকাশে বাক্স থেকে যুগল-রূপের ফ্রেমে-বাঁধানো পটখানি বের করে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সাদা পাথরের জলচৌকির উপর পট রেখে সামনে মাটিতে বসে নিজের মনে বার বার করে বললে, "আমি তোমারই, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারই যুগল রূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।'

ডাক্তাররা বলছে বিপ্রদাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা ন্যুমোনিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। নবগোপাল একলা কলকাতায় এল ফুলশয্যার সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। খুব ঘটা করেই সওগাত পাঠানো হল। বিপ্রদাস নিজে থাকলে এত আড়ম্বর করত না।

কুমুর বিবাহ উপলক্ষে ওর বড়ো বোন চারজনকেই আনতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খবর রটে গেছে---ঘোষালরা সদ্‌ব্রাহ্মণ নয়। বাড়ির লোক এ-বিয়েতে কিছুতে তাদের পাঠাতে রাজি হল না। কুমুর তৃতীয় বোন যদি বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বিয়ের পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোল, নবগোপাল বললে, "ও বাড়িতে তুমি গেলে আমাদের মান থাকবে না।" বিবাহরাত্রির কথা আজও সে ভুলতে পারে নি। তাই প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে এক বুড়ি দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নিমন্ত্রণ রাখতে। কুমু বুঝলে, সন্ধি এখনো হল না, হয়তো কোনো কালে হবে না।



কুমুর সাজসজ্জা হল। ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের ঠাট্টার পালা শেষ হয়েছে—নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হবে। মধুসূদন আগে থাকতেই বলে রেখেছিল, বেশি রাত করলে চলবে না, কাল ওর কাজ আছে। ন-টা বাজবা মাত্রই হুকুমমত নীচের উঠোন থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আর এক মুহূর্ত না। সময় অতিক্রম করবার সাধ্য কারও নেই। সভা ভঙ্গ হল। আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। তার ঠাণ্ডা হাত ঘামছে, তার মুখ বিবর্ণ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মোতির মা'র হাত ধরে বললে, "আমাকে একটুখানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।" মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, "এমন কপালও করেছিলি।"

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এল বর শোবার ঘরে গেছে, বউ কোথায়? মোতির মা বললে, "অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? বউ মায়ের জামা গয়নাগুলো খুলবে না?" মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝলে আর চলবে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্ছিত হয়ে মেজের উপর পড়ে আছে।

গোলমাল পড়ে গেল। ধরাধারি করে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হল, কুমু বুঝতে পারলে না কোথায় সে আছে-ডেকে উঠল, "দাদা।" মোতির মা তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "ভয় নেই দিদি, এই যে আমি আছি।" বলে ওব মুখটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। সবাইকে বললে, "তোমরা ভিড় কোরো না, আমি এখনই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।" কানে কানে বলতে লাগল, "ভয় করিস নে ভাই, ভয় করিস নে।" কুমু ধীরে ধীরে উঠল। মনে মনে ঠাকুরের নাম করে প্রণাম করলে। ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তাপোশের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন—তার পাশে গিয়ে তার কপালে চুমো খেলে। মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখনো ভয় করছে দিদি?"

কুমু হাতের মুঠো শক্ত করে একটু হেসে বললে, "না, আমার কিচ্ছু ভয় করছে না।" মনে মনে বলছে, 'এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।'

মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।

২৫

ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, 'বউ মূর্ছো গেছে।' মধুসূদনের মনটা দপ করে জ্বলে উঠল; বললে, "কেন, তাঁর হয়েছে কী?"

"তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেলে। তা একবার কি দেখতে যাবে?"

"কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।"

"মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।"

"রোজ রোজ উনি মূর্ছো যাবেন আর আমি ওঁর মাথার কবিরাজি তেল মালিশ করব এইজন্যেই কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম?"

"ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েছে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন না হয় মূর্ছো ভাঙাতে হবে।"



মধুসূদন গোঁ হয়ে বসে রইল। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধরে বললে, "ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে।"

মধুসূদনের এত কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্বে এমন সাহস শ্যামার ছিল না। প্রগল্‌ভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ করে থাকত; জানত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেছে মধুসূদন আজ সে-মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্বল নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝল এটা ওর খারাপ লাগে নি। নববধূ ওর অভিমানে যে ঘা দিয়েছে, কোনো-একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হয়েছে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না, এটা তো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না হয় ওর রঙ একটু কালো---কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট!"

শ্যামা বলে উঠল, "ঐ আসছে বউ, আমি যাই ভাই। কিন্তু দেখো ওর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না, আহা ও ছেলেমানুষ!"

কুমু ঘরে ঢুকতেই মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, বলে উঠল, "বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদেব ঐ নুরনগবি চাল ছাড়তে হবে।"

কুমু নির্নিমেষ চোখ মেলে চুপ কবে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথাও বললে না।

মধুসূদন ওর মৌন দেখে আরো রেগে গেল। মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির মন পাবাব জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই ওব এই তীব্র নিষ্ফল রাগ। বলে উঠল, "আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্‌টিরিয়া ওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদগারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

কুমু ধীরে ধীবে বললে, "তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।"

কুমু কাকে এ সব কথা বলছে? ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? মধুসূদন অবাক হয়ে গেল, ভাবলে ঐ মেয়ে ঝগড়া করে না কেন! এর ভাবখানা কী?

মধুসূদন বক্রোক্তি করে বললে, "তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি।"

ও যে কুমুর দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্যে মূঢ় আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না।

কুমু বললে, "দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ে না।" বলে সোফার উপর বসে পড়ল।

কর্কশস্বরে মধুসূদন বলে উঠল, "কী! আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?"

কুমু বললে, "তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেছি।"

মধুসূদন ব্যঙ্গ করে বললে, "বড়ো জেনে এসেছ, না, টাকার লোভে?"

তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেজের উপর গিয়ে বসল।

কলকাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।



কুমু যে এমন করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে মধুসূদন এ একেবারে ভাবতেই পারে নি। নিজের এই পরাভবের জন্যে সকলের চেয়ে রাগ হচ্ছে কুমুর দাদার উপর। শোবার ঘরে চৌকির উপরে বসে পড়ে শূন্য আকাশের দিকে সে একটা ঘুষি নিক্ষেপ করলে। খানিকক্ষণ বসে থেকে ধৈর্য আর রাখতে পারলে না। ধড়ফড় করে উঠে ছাদে বেরিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ডাকলো, "বড়োবউ!"

কুমু চমকে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ালে।

"ঠাণ্ডায় হিমে বাইরে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? চলো ঘরে।"

কুমু অসংকোচে মধুসূদনেব মুখের দিকে চেয়ে রইল। মধুসূদনের মধ্যে যেটুকু প্রভুত্বের জোর ছিল তা গেল উড়ে। কুমুর বাঁ হাত ধরে আস্তে আস্তে বললে, "এসো ঘরে।"

কুমুর ডান হাতে তার দাদার আশীর্বাদেব সেই টেলিগ্রাম ছিল, সেটা সে বুকে চেপে ধরল। স্বামীর হাত থেকে টেনে নিল না, নীরবে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ফিরে গেল।

২৬

পরদিন ভোরে যখন কুমু বিছানায় উঠে বসেছে তখন ওর স্বামী ঘুমোচ্ছে। কুমু তার মুখের দিকে চাইলে না, পাছে মন বিগড়ে যায়। অতি সাবধানে উঠে পায়ের কাছে প্রণাম করলে, তার পরে স্নান করবার ঘরে গেল। স্নান সারা হলে পর পিছন দিকের দরজা খুলে গিয়ে বসল ছাদে, তখন কুয়াশার ভিতর দিয়ে পূর্ব-আকাশে একটা মলিন সোনার রেখা দেখা দিয়েছে।

বেলা হল, রোদ্দুর উঠল যখন, কুমু আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে তার স্বামী তখন চলে গেছে। আয়নার দেরাজের উপর তাব পুঁতির কাজ-করা থলিটি ছিল। তার মধ্যে দাদার টেলিগ্রামের কাগজটি রাখবার জন্যে সেটা খুলেই দেখতে পেলে সেই নীলার আংটি নেই।

সকালবেলাকাব মানসপূজার পর তাব মুখে যে একটি শান্তির ভাব এসেছিল সেটা মিলিয়ে গিয়ে চোখে আগুন জ্বলে উঠল! কিছু মিষ্টি ও দুধ খাওযাবে বলে ডাকতে এল মোতিব মা। কুমুব মুখে জবাব নেই, যেন কঠিন পাথবেব মূর্তি।

মোতির মা ভয় পেয়ে পাশে এসে বসল জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে, ভাই?" কুমুর মুখে কথা বোরোল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

"বলো দিদি, আমাকে বলো, কোথায় তোমার বেজেছে?"

কুমু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, "নিয়ে গেছে চুরি করে!"

"কী নিয়ে গেছে দিদি?"

"আমাব আংটি— আমার দাদার আশীর্বাদী আংটি।"

"কে নিয়ে গেছে?"

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে কারও নাম না করে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে।

"শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।"

"নেব না ফিরিয়ে— দেখব কত অত্যাচার করতে পারে ও!"

"আচ্ছা, সে হবে পরে, এখন মুখে কিছু দেবে এসো।"

"না, পারব না; এখানকার খাবার গলা দিয়ে নামবে না।"

"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?"



"না, রইল না, যা-কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে?"

দাসী! মন পড়ল রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা--

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ -

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু বললে, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?"

"ও মানুষকে এখনো চেন নি। ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হয়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল, তার পরের দু তিন মাস খাইখরচ পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে। এতদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আসছি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না। এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর-চাকরানী পর্যন্ত সবাই গোলাম।"

কুমু একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি সেই গোলামিই করব। আমার রোজকার খোরপোশ হিসেবমত রোজ রোজ শোধ করব! আমি এ বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী বাঁদী হয়ে থাকব না। চলো আমাকে কাজে ভরতি করে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো আমাকে তুমি তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রানী বলে কেউ যেন ঠাট্টা না করে।"

মোতির মা হেসে কুমুর চিবুক ধরে বললে, "তা হলে তো আমার কথা মানতে হবে। আমি হুকুম করছি, চলো এখন খেতে।"

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে কুমু বললে, "দেখো ভাই, নিজেকে দেব বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু এ কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

মোতির মা বললে, "কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, সে গাছ পায় না, কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখতে জানে, সে পায় ফুল, পায় ফল। তুমি পড়েছ কাঠুরের হাতে, ও যে ব্যবসাদার। ওর মনে দবদ নেই কোথাও।"

এক সময়ে শোবাব ঘরে ফিরে এসে কুমু দেখলে, তার টিপাইয়ের উপব একশিশি লজেঞ্জস। হাবলুতাব ত্যাগের অর্ঘ্য গোপনে নিবেদন করে নিজে কোথায় লুকিয়েছে। এখানে পাষাণের ফাঁক দিয়েও ফুল ফোটে। বালকের এই লজেঞ্জসের ভাষায় একসঙ্গে ওকে কাঁদালে হাসালে। তাকে খুঁজতে বেরিয়ে দেখে বাইরে সে দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মা তাকে এ ঘরে যাতায়াত করতে বারণ করেছিল। তাব ভয় ছিল পাছে কোনো কিছু উপলক্ষে কর্তার বিরক্তি ঘটে। মোটের উপরে মধুসূদনের নিজের কাজ ছাড়া অন্য বাবদে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই নিরাপদ, এ কথা এ বাড়ির সবাই জানে।

কুমু হাবলুকে ধরে ঘরে নিয়ে এসে কোলে বসালে। ওর গৃহসজ্জার মধ্যে পুতুলজাতীয় যা-কিছু জিনিস ছিল সেইগুলো দুজনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কুমু বুঝতে পারলে একটা কাগজচাপা হাবলুর ভারি পছন্দ--- কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙিন ফুল যে কী করে দেখা যাচ্ছে সেইটে বুঝতে না পেরে ওর ভারি লেগেছে।

কুমু বললে, "এটা নেবে গোপাল?"

এতবড়ো অভাবনীয় প্রস্তাব ওর বয়সে কখনো শোনে নি। এমন জিনিসও কি ও কখনো আশা করতে পারে? বিস্ময়ে সংকোচে কুমুর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইল।



কুমু বললে, "এটা তুমি নিয়ে যাও।"

হাবলু আহ্লাদ রাখতে পারলে না- সেটা হাতে নিয়েই লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল।

সেইদিন বিকেলে হাবলুর মা এসে বললে, "তুমি করেছ কী ভাই? হাবলুর হাতে কাঁচের কাগজচাপা দেখে বড়োঠাকুর হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছে। কেড়ে তো নিয়েইছে- তার পর তাকে চোর বলে মার। ছেলেটাও এমনি, তোমার নামও করে নি। হাবলুকে আমিই যে জিনিসপত্র চুরি করতে শেখাচ্ছি এ কথাও ক্রমে উঠবে।"

কুমু কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

এমন সময়ে বাইরে মচ্‌মচ্‌ শব্দে মধুসূদন আসছে। মোতির মা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। মধুসূদন কাঁচের কাগজচাপা হাতে করে যথাস্থানে ধীরে ধীরে সেটা গুছিয়ে রাখলে। তার পরে নিশ্চিতপ্রত্যয়ের কণ্ঠে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "হাবলু তোমার ঘর থেকে এটা চুরি করে নিয়েছিল। জিনিসপত্র সাবধান করে রাখতে শিখো।"

কুমু তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "ও চুরি করে নি।"

"আচ্ছা, বেশ, তা হলে সরিয়ে নিয়েছে।"

"না, আমিই ওকে দিয়েছি।"

"এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালোবাসি নে।"

কুমু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তুমি নাও নি আমার নীলার আংটি?"

মধুসূদন বললে, "হাঁ নিয়েছি।"

"তাতেও তোমার ঐ কাঁচের ঢেলাটার দাম শোধ হল না?"

"আমি তো বলেছিলুম, ওটা তুমি রাখতে পারবে না।"

"তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?"

"এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।"

"কিছু নেই? তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।"

কুমু যেই গেছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে শ্যামা ঘরে প্রবেশ করে বললে, "বউ কোথায় গেল?"

"কেন?"

"সকাল থেকে ওর খাবার নিয়ে বসে আছি, এ বাড়িতে এসে বউ কি খাওয়াও বন্ধ করবে?"

"তা হয়েছে কী? নুরনগরের রাজকন্যা না হয় নাই খেলেন? তোমরা কি ওঁর বাঁদী নাকি?"

"ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষের উপর অমন রাগ করতে নেই। ও যে এমন না খেয়ে খেয়ে কাটাবে এ আমার সহ্য করতে পারি নে। সাধে সেদিন মূর্ছো গিয়েছিল?"

মধুসূদন গর্জন করে উঠল, "কিছু করতে হবে না, যাও চলে! খিদে পেলে আপনিই খাবে।"

শ্যামা যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে চলে গেল।

মধুসূদনের মাথার রক্ত চড়তে লাগল। দ্রুতবেগে নাবার ঘরে জলের ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে তার নীচে মাথা পেতে দিলে।

২৭

সন্ধ্যে হয়ে এল, সেদিন কুমুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষকালে দেখা গেল, ভাঁড়ারঘরের পাশে একটা ছোটো কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ পিলসুজ তেলের ল্যাম্প



প্রভৃতি জমা করা হয় সেইখানে মেজের উপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছে।

মোতির মা এসে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কী কাণ্ড দিদি?"

কুমু বললে, "এ বাড়িতে আমি সেজবাতি সাফ করব, আর এইখানে আমার স্থান।"

মোতির মা বললে, "ভালো কাজ নিয়েছ ভাই, এ বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেছ, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সেজবাতির তদারক করতে হবে না। এখন চলো।"

কুমু কিছুতে নড়ল না।

মোতির মা বললে, "তবে আমি তোমার কাছে শুই।"

কুমু দৃঢ়স্বরে বললে, "না।" মোতির মা দেখলে এই ভলোমানুষ মেয়ের মধ্যে হুকুম করবার জোর আছে। তাকে চলে যেতে হল।

মধুসূদন রাত্রে শুতে এসে কুমুর খবর নিলে। যখন খবর শুনলে, প্রথমটা ভাবলে, "বেশ তো ঐ ঘরেই থাক্ না, দেখি কতদিন থাকতে পারে। সাধ্যসাধনা করতে গেলেই জেদ বেড়ে যাবে।'

এই বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গেল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রত্যেক শব্দেই মনে হচ্ছে ঐ বুঝি আসছে। একবার মনে হল, যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। যতই রাত হয় মনের মধ্যে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কুমুকে যে অবজ্ঞা করবে কিছুতেই সে শক্তি পাচ্ছে না। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে হার মানবে এটা ওর পলিসি-বিরুদ্ধ। ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শুল, কিন্তু ঘুম আসে না। ছট্‌ফট্ করতে করতে উঠে পড়ল, কোনোমতেই কৌতূহল সামলাতে পারলে না। একটা লণ্ঠন হাতে করে নিদ্রিত কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে অন্তঃপুরের সেই ফরাশখানার সামনে এসে একটুক্ষণ কান পেতে রইল। ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা খুলে দেখে, কুমু মেজের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে, সেই মাদুরের এক প্রান্ত গুটিয়ে সেইটেকে বালিশ করেছে। মধুসূদনের যেমন ঘুম নেই, কুমুরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দেখলে সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে; এমন-কি, তার মুখের উপর যখন লণ্ঠনের আলো ফেললে তাতেও ঘুম ভাঙল না। এমন সময় কুমু একটুখানি উসখুস করে পাশ ফিরলে। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন করে পালায় মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাল। ভয় হল পাছে কুমু ওর পরাভব দেখতে পায়, পাছে মনে মনে হাসে।

বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সামনে দেখে শ্যামা। তার হাতে একটি প্রদীপ।

"একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে?"

মধুসূদন তার কোনো উত্তর না করে বললে, "তুমি কোথায় যাচ্ছ বউ?"

"কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে তারই জোগাড়ে চলেছি -তোমারও নেমন্তন্ন রইল। কিন্তু তোমাকে দক্ষিণে দেবার মতো শক্তি নাই ভাই।"

মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আসছিল, সেটা চেপে গেল।

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামা একটু হেসে বললে, "আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।"

ভাগ্যবান শব্দটার উপর একটু জোর দিলে—মধুসূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনাল। কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে শ্যামার সাহস হল না। "কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো, মাথা খাও," বলে সে চলে গেল।



ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাইরে লণ্ঠনটা রাখলে, যদি কুমু আসে। কুমুদিনীর সেই সুপ্ত মুখ কিছুতে মন থেকে নড়তে চায় না; আর কেবলই মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি শালের বাইরে এলিয়ে। বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিল তখন একে সম্পূর্ণ দেখতে পায় নি—আজ দেখে দেখে চোখের আর আশ মিটতে চায় না। এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে? বিছানায় আর টিকতে পারে না; উঠে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুললে। দেখলে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বেরোল বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি—"ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন"—তার পরে একখানি ফেটোগ্রাফ, ওর দুই দাদার ছবি—আর একখানি কাগজের টুকরো, বিপ্রদাসের হাতে-লেখা গীতার এই শ্লোক—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্।

ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে—অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর যে-উনিশটা বছর মধুসূদনের আযত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া। পুঁতির থলিটি আজ সাহস করে ফেলে দিতে পারলে না—যেদিন আংটি হরণ করে নিয়েছিল সেদিন ওর সাহস আরো বেশি ছিল; তখনো জানত কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন-কি, শাসনই পছন্দ করে। আজ বুঝেছে কুমুদিনী যে কী করতে পারে এবং পারে না কিচ্ছু বলবার জো নেই।

কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।

এমনি করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। কিন্তু শীতরাত্রির অন্ধকার তখনো যায় নি। আর কিছুক্ষণ পরেই আলো উঠবে, আজকের রাত হবে ব্যর্থ। মধুসূদন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলল—ফরাশখানার সামনে পায়ের শব্দটা বেশ একটু স্পষ্টই ধ্বনিত করলে—দরজাটা শব্দ করেই খুললে—দেখলে ভিতরে কুমু নেই। কোথায় সে?

উঠোনের কলে জল পড়ার শব্দ কানে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলে, যত রাজ্যের পুরানো অব্যবহার্য মরচে-পড়া পিলসুজগুলো নিয়ে কুমু তেঁতুল দিয়ে মাজছে। এ কেবল ইচ্ছা করে কাজের ভার বাড়াবার চেষ্টা, শীতের ভোরবেলায় নিদ্রাহীন দুঃখকে বিস্তারিত করে তোলা।

মধুসূদন উপরের বারান্দা থেকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। অবলার বলকে কী করে পরাস্ত করতে হয় এই তার ভাবনা। সকালে উঠে বাড়ির লোকে যখন দেখবে কুমু পিলসুজ মাজছে কী ভাববে! যে চাকরের উপরে মাজাঘষার ভার, সেই বা কী মনে করবে? বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে তাকে হাস্যস্পদ করবার এমন তো উপায় আর নেই।

একবার মধুসূদনের মনে হল কলতলায় গিয়ে কুমুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়। কিন্তু সকালবেলায় সেই উঠোনের মাঝখানে দুজনে বচসা করবে আর বাড়িসুদ্ধ লোকে তামাশা দেখতে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এই প্রহসনটা কল্পনা করে পিছিয়ে গেল! মেজো ভাই নবীনকে ডাকিয়ে বললে, "বাড়িতে কী-সব ব্যাপার হচ্ছে চোখ রাখ কি?"

নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার। সে ভয় পেয়ে বললে, "কেন দাদা, কী হয়েছে?"

নবীন জানে, দাদার যখন রাগ করবার একটা কারণ ঘটে তখন শাসন করবার একটা মানুষ



চাই। দোষী যদি ফসকে যায় তো নির্দোষী হলেও চলে---নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না, নইলে সংসারে ওর রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রেস্‌টিজ চলে যায়।

মধুসূদন বললে, "বড়োবউ যে পাগলের মতো কাণ্ডটা করতে বসেছে, তার কারণটা কী সে কি আমি জানি নে মনে কর?"

বড়োবউ কী পাগলামি করছে সে প্রশ্ন করতে নবীন সাহস করলে না পাছে খবর না-জানাটাই একটা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

মধুসূদন বললে, "মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন সন্দেহ নেই।"

বহু সংকোচে নবীন বলতে চেষ্টা করলে, "না, মেজোবউ তো—"

মধুসূদন বললে, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

এর উপরে আর কথা খাটে না। স্বচক্ষে দেখার মধ্যে সেই কাগজচাপার ইতিহাসটা নিহিত ছিল।

২৮

মোতির মা যখনই কুমুকে অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে আদরযত্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখনই নবীন বুঝেছিল এটা সইবে না; বাড়ির মেয়েরা এই নিয়ে লাগালাগি করবে। নবীন ভাবলে সেই রকমের একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু মধুসূদনের আন্দাজি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই; তাতে জেদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা কী হয়েছে মধুসূদন তা স্পষ্ট করে বললে না---বোধ করি বলতে লজ্জা করছিল; কী করতে হবে তাও রইল অস্পষ্ট, কেবল ওর মধ্যে যেটুকু স্পষ্ট সে হচ্ছে এই যে, সমস্ত দায়িত্বটা মেজোবউয়েরই, সুতরাং দাম্পত্যের আপেক্ষিক মর্যাদা অনুসারে জবাবদিহির ল্যাজামুড়োর মধ্যে মুড়োর দিকটাই নবীনের ভাগ্যে।

নবীন গিয়ে মোতির মাকে বললে, "একটা ফ্যাসাদ বেধেছে।"

"কেন, কী হয়েছে?"

সে জানেন অন্তর্যামী, আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি; কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।"

"কেন বলো দেখি?"

"যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানির।"

"তা আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা শুরু করো দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।"

নবীন কাত হয়ে বললে, "দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামি ডিনার-সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েছে, জান তো---কেননা জিনিসগুলো আমারই জিম্মে। কিন্তু এবারে যে-জিনিসটা ঘরে এল সেও কি আমারই জিম্মে? তবু জরিমানাটা তোমাতে-আমাতেই বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয় করো, আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না মেজোবউ।"

"জরিমানা বলতে কী বোঝায় শুনি।"

"রজবপুরে চালান করে দেবেন। মাঝে মাঝে তো সেইরকম ভয় দেখান।"

"ভয় পাও বলেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে



আনতে হয় নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে ঠকা ওঁর সইবে না।"

"বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলো না।"

"তোমার দাদাকে বোলো, যতবড়ো রাজাই হোন-না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না-- মানের বোঝা নিজেকেই মাথায় করে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপার মুটে ডাকতে বারণ কোরো।"

"মেজোবউ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমার দরকার হবে না, দুদিন বাদে নিজেরই হুঁশ হবে। ইতিমধ্যে দূতীগিরির কাজটা করো, ফল হোক বা না হোক। দেখাতে পারব নিমক খেয়ে সেটা চুপচাপ হজম করছি নে।"

মোতির মা কুমুকে গেল খুঁজতে। জানত সকালবেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে। উঁচু প্রাচীর-দেওয়া ছাদ, তার মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। এলোমেলো গোটাকতক টব, তাতে গাছ নেই। এক কোণে লোহার জাল-দেওয়া একটা বড়ো ভাঙা চৌকো খাঁচা; তার কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ। কোনো এক সময় খরগোশ কিংবা পায়রা এতে রাখা হত, এখন আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দুরে দেবার কাজে লাগে। এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম আকাশে একটা লোহার কারখানার চিমনি। যে দুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে ঐ চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল সমস্ত আকাশের মধ্যে ঐ কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

পিলসুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাকতেই স্নান করে পুব দিকে মুখ করে কুমু ছাদে এসে বসেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সুতোর সাদা শাড়ি, শরু কালো পাড়, আর শীতনিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি রেশমের ওড়না।

কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পূজা, যত ব্রত, যত পুরাণকাহিনী, সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিণী তার মানস বৃন্দাবনে ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে

হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
শুন মনমোহন প্যারে

যে অনাগত মানুষটির উদ্দেশে উঠছে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য, সমুখে এসে পৌঁছবার আগেই সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তার পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ঐ গান -

বাজে ঝননন মেরে পায়েরিয়া
কৈস করো যাউ ঘরোয়ারে।

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে ঝননন--উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোনোকালে ফিরবে কেমন করে ঘরে! যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে



সে কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়াল না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন-কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল-আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে। সেইজন্যেই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে-- -জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার তোমাকেই তো পাব?'' অপরাজিতার ফুল বললে, 'এই তো পেয়েইছ।'

অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল---একেবারে ঠন্ করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল! থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল! তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।'

কিন্তু আজ এ গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৌঁছোল না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠল। আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?

মোতির মা দূরে পিছনে বসে রইল। সকালের নির্মল আলোয় নির্জন ছাদে এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত করে দিয়েছে। ভাবছে, এ বাড়িতে ওকে কেমন করে মানাবে? এখানে যে-সব মেয়ে আছে এর তুলনায় তারা কোন্ জাতের? তারা আপনি ওর থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে, ওর উপরে রাগ করছে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতে সাহস করছে না।

বসে থাকতে থাকতে মোতির মা হঠাৎ দেখলে কুমু দুই হাতে তার ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠেছে। ও আর থাকতে পারলে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ''দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে বলো আমাকে।''

কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলে না, একটু সামলে নিয়ে বললে, ''আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কী হয়েছে তাঁর বুঝতে পারছি না।''

''চিঠি পাবার কি সময় হয়েছে ভাই?''

''নিশ্চয় হয়েছে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেছি। তিনি জানেন, খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কী রকম করছে।

মোতির মা বললে, ''তুমি ভেবো না, খবর নেবার আমি একটা-কিছু উপায় করব।''

কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেছে, কিন্তু কাকে দিয়ে করাবে। যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন বলে বড়াই করেছিল সেইদিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখমাত্র করতে ওর মুখে বেধে যায়। আজ মোতির মাকে বললে, ''তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পার তো আমি বাঁচি।''

মোতির মা বললে, 'তাই করব, ভয় কী?''

কুমু বললে, ''তুমি জান, আমার কাছে একটিও টাকা নেই।''

''কী বল দিদি, তার ঠিক নেই। সংসারখরচের যে টাকা আমার কাছে থাকে, সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি।''

কুমু জোর করে বলে উঠল, ''না না না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, সিকি পয়সাও না।''

''আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে না হয় আমার নিজের টাকা থেকে কিছু খরচ করব। চুপ করে রইলে কেন? তাতে দোষ কী? টাকাটা আমি যদি অহংকার করে দিতুম, তুমি অহংকার করে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই, তা হলে ভালোবেসেই নেবে না কেন?''



কুমু বললে, "নেব।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে?"

কুমু বললে, "ওখানে আমার জায়গা নেই।"

মোতির মা পীড়াপীড়ি করলে না। তার মনের ভাবখানা এই যে, পীড়াপীড়ি করবাব ভার আমার নয়; যার কাজ সে করুক। কেবল আস্তে আস্তে সে বললে, "একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?"

কুমু বললে, "এখন না, আর একটু পরে।" তার ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এখনো বাকি আছে। এখনো মনের মধ্যে কোনো জবাব পাচ্ছে না।

মোতির না আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে বললে, "শোনো একটি কথা। বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ করে এসো গো, দিদিব কোনো চিঠি এসেছে কিনা দেরাজ খুলেও দেখো।"

নবীন বললে, "সর্বনাশ!"

"তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।"

"এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো!"

"কর্তা গেছেন আপিসে, তাঁর কাজ সেরে আসতে বেলা একটা হবে এর মধ্যে

"দেখো মেজোবউ, দিনের বেলায় এ কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না, এখন চারি দিকে লোকজন। আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পারব।"

মোতির মা বললে, "আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু নুরনগবে এখনই তার করে জানতে হবে বিপ্রদাসবাবু কেমন আছেন।"

"বেশ কথা, তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো?"

"না।"

"মেজোবউ, তুমি যে দেখি মরিযা হয়ে উঠেছ! এ বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধবতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া, আব আমি "

"দিদির নামে তাব যাবে তোমার তাতে কী?"

"আমার হাত দিয়ে তো যাবে।"

"বড়োঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো রোজ দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা, দিদি দিয়েছেন।"

কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত না থাকত তা হলে এতবড়ো দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পারত না।

২৯

যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এল। যথানিয়মে আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে বসে কেউ-বা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, কেউ-বা পরিবেশন করছে। পূর্বেই বলেছি, মধুসূদনের অন্তঃপুরে ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। তার আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাসমতই। মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামি। রুপোর থালা, রুপোর বাটি, রুপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী, তার পরে সব-শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সমাধা করে পানের বাটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও দুটো পান



ডিবেয় ভরে পনেরো মিনিট কাল তামাক টানতে টানতে বিশ্রাম করে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান। অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর আর ব্যতিক্রম হয় নি। আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নাই।

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয়, সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো, বেলা যায় যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামি বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা। মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের জাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনও সংকল্প ছিল। মধুসূদনের মন যে কোনোদিন টলে নি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মানল না; তার কারণ, মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবলমাত্র যে বুদ্ধি তা নয়, সে হচ্ছে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি করেছে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে গভীর করে সে মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জানত ধনসৃষ্টির যে তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন — ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেছে, বার বারই সে সামলে নিয়েছে। সুবিধা ছিল এই যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্মের পার্বণী উপলক্ষে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকত বলে বোঝা যায়। কিন্তু কোনোদিন শ্যামাকে সে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্ধা বাড়ে। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁকটা ঠিক ধরেছে, তবুও ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচল না।

মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে; আজও ছিল। সদ্য স্নান করে এসেছে — তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা পিঠের উপর মেলে দেওয়া — তার উপর দিয়ে অমলশুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া — ভিজে চুল থেকে মাথাঘষা মসলার মৃদু গন্ধ আসছে।

দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে বললে, "ঠাকুরপো, বউকে কি ডেকে দেব?"

মধুসূদন কোনো কথা না বলে তার ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে। তার ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতমত খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করে বললে, "তোমার খাবার সময় কাছে বসলে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা করতে—"

মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী বাক্য শেষ না করেই চুপ করে গেল। মধুসূদন আবার মাথা হেঁট করে আহারে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে, "বড়োবউ এখন কোথায়?"

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আমি দেখে আসছি।"

মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করে আঙুল নেড়ে নিষেধ করলে। প্রশ্নের যে উত্তর পাবার আশা আছে



সেটা এর মুখে শুনলে সহ্য হবে না অথচ মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল। আহার-শেষে তেতলায় যখন তার শোবার ঘরে গেল, মনের কোণে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল। একবার ছাদ এল ঘুরে। পাশের নাবার ঘরে ঢুকে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট যায় - বিশ মিনিট পার হয়ে যখন আধঘন্টা পুরো হতে চলল তখন বুকের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে একবার সময়টা দেখলে। বৎসরের পর বৎসর গেছে, আপিসে যাবার পূর্বে কখনো পাঁচ মিনিট দেরি হয় নি। আপিসে একটা রেজিস্টারি বই আছে, কে ঠিক কোন্ সময়ে এল এবং গেল সেই বইয়ে তার হিসাব থাকে - সেই হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে। আপিসের সকল কর্মচারীদের মধ্যে মধুসূদনের জরিমানার অঙ্ক সব চেয়ে সংখ্যায় কম। অথচ এ সম্বন্ধে নিজের প্রতি তার পক্ষপাত নেই। বস্তুত নিজের কাছ থেকে কর্মচারীদের চেয়ে ডবল হারে জরিমানা আদায় করে। মনে মনে আজ সে পণ করেছে যে, অপরাহ্ণে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ক্ষতিপূরণ করে নেবে। বেলা যতই পড়ে আসছে, কাজে মন দিতে আর পারেনা। এমন কি, আজ আধঘন্টা সময় থাকতেই কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এল। কেবলই ইচ্ছে করছিল অসময়ে একবার শোবার ঘরে এসে ঢুকতে। হয়তো কাউকে দেখতে পেতেও পারে। দিন থাকতে সে কখনোই শোবার ঘরে আসে না। আজ আপিসের সাজসুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে।

ঠিক সেই সময়ে মোতির মা ছাদের রোদ্দুরে-মেলা আমসিগুলো ঝুড়িতে তুলছিল। মধুসূদনকে অবেলায় শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে একহাত ঘোমটা টেনে তার আড়ালে অনেকখানি হাসলে। মেজোবউয়ের কাছে তার এই অনিয়ম ধরা পড়তে মধুসূদন লজ্জিত ও বিরক্ত হল। মনে প্ল্যান ছিল অত্যন্ত নিঃশব্দপদে ঘরে ঢুকবে - পাছে ভীরু হরিণী চকিত হয়ে পালায়। সে আর হল না। কৌতুকদৃষ্টির আঘাত এড়াবার জন্য সে নিজেই দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। দেখলে আপিস-পালানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ঘরে কেউ তো নেই-ই, দিনের বেলা কোনো সময় কেউ যে ক্ষণকালের জন্যেও ছিল তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। এক মুহূর্তে তার অধৈর্য যেন অসহ্য হয়ে উঠল। যদিও সে ভাশুর, এবং কোনোদিন মেজোবউয়ের সঙ্গে একটা কথাও কয় নি, তবু তাকে ডেকে কুমু সম্বন্ধে যা-হয় কিছু একটা বলবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল। একবার বের হয়েও এল কিন্তু মোতির মা তখন নীচে চলে গিয়েছে।

নববধূ কর্তৃক পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে অসময়ে একলা যাপন করবার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাইরের দিকে বেগে গেল হন্ হন্ করে। মস্ত একটা জরুরি কাজ করবার ভান করে ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল। সামনে ছিল একখানা খাতা। সাধারণত সেটা সে প্রায় দেখে না, দেখে তার আপিসের হেডবাবু। আজ লোকচক্ষুকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সেটা খুলে বসল। এই খাতায় তার বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম রওনা করবার দিনক্ষণ টোকা থাকে। খাতা খুলে প্রথমেই দেখতে পেলে আজকের তারিখের টেলিগ্রামের ফর্দর মধ্যে বিপ্রদাসের নাম ও ঠিকানা। প্রেরক স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরানী।

"ডাকো দারোয়ানকে।"

দারোয়ান এল।

"এ টেলিগ্রাম কে দিয়েছিল পাঠাতে?"

"মেজোবাবু।"

"ডাকো মেজোবাবুকে।"



মেজোবাবু পাংশুবর্ণ মুখে এসে হাজির।

"আমার হুকুম না নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে কে বললে?" যে বলেছিল শাসনকর্তার সামনে তার নাম মুখে আনা তো সহজ ব্যাপার নয়, কী বলবে কিছুই ভেবে না পেয়ে নবীন ব্যাকুল হয়ে এই শীতের দিনে ঘেমে উঠল।

নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনিই জিজ্ঞাসা করলে, "মেজোবউ বুঝি? মুখ হেঁট করে নিরুত্তর থাকাতেই তার উত্তর স্পষ্ট হল। ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে, মুখ হল লাল টকটকে এত রাগ হল যে, কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোল না। সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করে ঘরের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

৩০

নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুকনো করে মোতির মাকে বললে, "মেজোবউ, আর কেন?"

"হয়েছে কী?"

"এবার জিনিসপত্রগুলো বাক্সয় তোলো।"

"তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি, তা হলে আবার কালই বের করতে হবে। কেন? তোমার দাদার মেজাজ ভালো নেই বুঝি?"

"আমি তো চিনি ওঁকে। এবার বোধ হচ্ছে এখানকার বাসায় হাত পড়বে।"

"তা চলোই-না। অত ভাবছ কেন? সেখানে তো জলে পড়বে না?"

"আমাকে চলতে বলছ কিসের জন্যে? এবারে হুকুম হবে মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দাও।"

"সে হুকুম তুমি মানতে পারবে না জানি।"

"কেমন করে জানলে?"

"আমি কেবল একাই জানি মনে কর, তা নয় — বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমাকে স্ত্রৈণ বলে জানে! পুরুষমানুষ যে কী করে স্ত্রৈণ হতে পারে এতদিন তোমার দাদা সে কথা বুঝতেই পারত না। এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেছে।"

"বল কী?"

"আমি তো দেখছি তোমাদের বংশে ও রোগটা আছে। এতদিন বড়োভাইয়ের ধাতটা ধরা পড়ে নি। অনেক কাল জমা হয়ে ছিল বলে তার ঝাঁজটা খুব বেশি হবে, দেখে নিয়ো এই আমি বলে দিলাম। যে জোরের সঙ্গে জগৎ-সংসার ভুলে টাকার থলে আঁকড়ে বসেছিল, ঠিক সেই জোরটাই পড়বে বউয়ের উপর।"

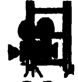
"তাই পড়ুক। বড়ো স্ত্রৈণটি আসর জমান কিন্তু মেজো স্ত্রৈণটি বাঁচবে কাকে নিয়ে?"

"সে ভাবনার ভার আমার উপরে। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই করো। ওঁর দেরাজ তোমাকে সন্ধান করতে হবে।"

নবীন হাত জোড় করে বললে, "দোহাই তোমার মেজোবউ — সাপের গর্তে হাত দিতে যদি বলতে আমি দিতুম, কিন্তু দেরাজে না।"

"সাপের গর্তে যদি হাত দিতে হত তবে নিজে দিতুম কিন্তু দেরাজটা সন্ধান তোমাকেই করতে হবে। তুমি তো জান এ বাড়ির সব চিঠিই প্রথমে ওঁকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই। আমার মন বলছে ওঁর হাতে চিঠি এসেছে।"

"আমারও মনে তাই বলছে, কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলছে ও চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তা হলে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না। বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে।"



"কিছু তোমাকে করতে হবে না, চিঠিতে হাত দিয়ো না, কেবল একবার দেখে এসো দিদির নামে চিঠি আছে কি না।"

মেজোবউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন-কি, নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে। সেইজন্যেই তার জন্যে কোনো-একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ জুটলে যতই ভয় করুক সেইসঙ্গে খুশিও হয়।

সেই রাত্রেই নবীনের কাছে মেজোবউ খবর পেল যে, কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরাজে আছে।

যে উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমু তার শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বেগ থেমেছে। অপমানেব বিরক্তি কমে এসে বিষাদের ম্লানতায় এখন তার মন ছায়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারছে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয়। অথচ সেরকম একটা ব্যবস্থা না হলে কুমু বাঁচবে কী করে? সংসারে আমৃত্যুকাল দিনরাত্রি জোর করে এরকম অসংলগ্নভাবে থাকা তো সম্ভবপর নয়।

এই কথাই সে ভাবছিল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে। ঘরটা বারান্দার এক কোণে, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠরি অবরুদ্ধ। দেয়ালের গায়ে উপর পর্যন্ত কাঠের থাক বসানো। সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম। তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন। দেয়ালের যে অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা ছবিগুলো এঁটে দিয়ে কোনো-এক ভৃত্য সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিসাধন করেছিল। এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়োকরা খড়ি, তার পাশে ঝুড়িতে শুকনো তেঁতুল, এবং কতকগুলো ময়লা ঝাড়ন; আর সারি সারি কেরোসিনের টিন, অধিকাংশই খালি, গুটি দুই তিন ভরা।

অনিপুণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমু তার কাজে লেগেছিল। ভাঁড়ারেব কর্তব্য শেষ করে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমুর কর্মতপস্যার দুঃসাধ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। বুঝতে পারলে দুই-একটা ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের অপঘাত আসন্ন। এ বাড়িতে জিনিসপত্রেব সামান্য ক্ষুণ্ণতাও দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না।

মোতির মা আব থাকতে পারলে না; বললে, "কাজ নেই হাতে, তাই এলুম। ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই, পুণ্যি হবে।" এই বলেই কাঁচের গ্লোব ও চিমনির ঝুড়ি নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা-মোছায় লেগে গেল।

আপত্তি করতে কুমুর আর তেজ নাই, কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। মোতির মা'র সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেল। কিন্তু মোতির মা'রও অশিক্ষিতপটুত্বের সীমা আছে। কেরোসিন ল্যাম্পে হিসাব করে ফিতে যোজনা তার পক্ষে অসাধ্য। কাজটা হয় তারই তত্ত্বাবধানে, বরাদ্দ অনুসারে তেল প্রভৃতির মাপ তারই স্বহস্তে, কিন্তু হাতে কলমে সলতে কাটা আজ পর্যন্ত তার দ্বারা হয় নি। তাই অগত্যা বুড়ো বঙ্কু ফরাশকে সহযোগিতার জন্যে ডাকবার প্রস্তাব তুললে।

হার মানতে হল। বঙ্কু ফরাশ এল, এবং দ্রুতহস্তে অল্পকালের মধ্যেই কাজ সমাধা করে দিলে। সন্ধ্যার পূর্বেই দীপগুলো ঘরে ঘরে ভাগ করে দিয়ে আসতে হয়। সেই কাজের জন্যে পূর্বনিয়মমত তাকে যথাসময়ে আসতে হবে কি না বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে। লোকটা সরল প্রকৃতির বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল-বা। কুমুর কানের ডগা লাল হয়ে উঠল।

সে কোনো জবাব করবার আগেই মোতির মা বললে, "আসবি না তো কী?" কুমুর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, কাজ করতে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।



৩১

দুপুরবেলা আহারের পর দরজা বন্ধ করে কুমু বসে পণ করতে লাগল, মনের মধ্যে কিছুতে এসে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠতে দেবে না। কুমু বললে, 'আজকের দিনটা লাগবে মনকে স্থির করে নিতে; ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসারধর্মের সত্যপথে প্রবৃত্ত হব'। মধ্যাহ্নে আহারের পর তার কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই কাজে সব চেয়ে সহায় ছিল তার দাদার স্মৃতি। সে যে দেখেছে তার দাদার ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা; তাঁর মুখে সেই বিষাদ, যেটি তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া - তার সেই দাদা, তখনকার কালে শিক্ষিতসমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম্ যাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই যাঁর জীবন পূর্ণ করে আবির্ভূত।

অপরাহ্ণে বঙ্কু ফরাশ যখন দরজায় আঘাত করলে, ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেল। মোতির মাকে বললে, আজ রাত্রে সে খাবে না। মনকে বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যেই তার এই উপবাস। মোতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না। ললাটে চক্ষুতে ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখনই যেন সে পূজা সেরে তীর্থস্নান করে এল। অন্তর্যামী দেবতা যেন তার সব অভিমান হরণ করে নিলেন, হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেছে নির্মাল্যের ফুল বহন করে, তারই সুগন্ধ রয়েছে তাকে ঘিরে। তাই কুমু যখন উপবাসী থাকতে চাইলে তখন মোতির মা বুঝলে, এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয়। তাই সে আপত্তিমাত্র করলে না।

কুমু তার ঠাকুরের মূর্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিল। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে দুঃখ যদি তাকে এমন করে ধাক্কা না দিত তা হলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনোই আসতে পারত না। অস্তসূর্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোর করে বললে, "ঠাকুর, আর কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন করে রাখো।"

শীতের দিন দেখতে দেখতে ম্লান হয় এল। ধূলি কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন। ঐ আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েছে, তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তার দুঃসহ ভার কুমুর মনটাকে যেন নীচের দিকে নামিয়ে ধরে রেখে দিলে।

এমনি করে এক দিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ, আর এক দিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার, দুইই একসঙ্গে নিয়ে আবার তার সেই কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। বড়ো ইচ্ছা, এই নিরুপায় ভাবনার বোঝাটাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয়। কিন্তু নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভর পায় না। টেলিগ্রাফ তো করা হয়েছে, তার উত্তর আসে না কেন; এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইল।

নারীহৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পারছে না। যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহমনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন্ দিক থেকে কেমন করে আক্রমণ করবে ভেবে পায় না। কখনো কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয় নি, এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল। নিজের মা'র পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি এ কথা সকলেই জানে। তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে। মধুসূদন আজ



হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাঁধা পথের বাইরে যে শক্তি তাকে এমন করে টানছে সে যে তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এল। যদিও বিশ্বাস করে নি, তবু আশা করেছিল আজ হয়তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম করেই মধুসূদন এল। সুস্থ শরীরে চিরাভ্যাসমত একেবারে ঘড়িধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত দেরি হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু ঘরে আসে তার পরে চলে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেল না। সোফায় খানিকটা বসে রইল, ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগল। মধুসূদনের ঘুমোবার সময় ন'টা — আজ একসময়ে চমকে উঠে শুনলে তার দেউড়ির ঘন্টায় এগারোটা বাজছে। লজ্জা বোধ হল। কিন্তু বিছানার সামনে দু-তিনবার এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতে শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির করলে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করে নেবে।

বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সেও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দিনের বেলা হলে দেখতে পেত এক মুহূর্তে নবীনের মুখ কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "এত রাত্রে তুমি যে এখানে?"

নবীনের মাথায় বুদ্ধি জোগাল, সে বললে, "শুতে যাবার আগেই তো আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই, আর তারিখের কার্ড ঠিক করে দিই।"

"আচ্ছা, ঘরে এসে শোনো।"

নবীন এস্ত হয়ে কাঠগড়ার আসামির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন বললে, "বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি নে। আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমত চলবে, আর-কারও পরামর্শমত চলবে না - এইটে হল নিয়ম।"

নবীন গম্ভীরভাবে বললে, "সে তো ঠিক কথা।"

"তাই আমি বলছি, মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নবীন খুব যেন নিশ্চিন্ত হল এমনি ভাবে বললে, "ভালো হল দাদা, আমি আরো ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।"

মধুসূদন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

নবীন বললে, "কদিন ধরে দেশে যাবার জন্যে মেজোবউ অস্থির করে তুলেছে, জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে, একটা ভালো দিন দেখলেই বেরিয়ে পড়বে।"

বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছা বিদায় করে দেবে, তাই বলে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর। বিরক্তির স্বরে বললে, "কেন, যাবার জন্যে তার এত তাড়া কিসের?"

নবীন বললে, "বাড়ির গিন্নি এ বাড়িতে এসেছেন, এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। মেজোবউ বললে, আমি মাঝে থাকলে কী জানি কখন কী কথা ওঠে।"

মধুসূদন বললে, 'এ-সব কথার বিচারভার কি তারই উপরে?"

নবীন ভালোমানুষের মতো বললে, "কী করব বলো, মেয়েমানুষের জেদ। কী জানি, তার মনে হয়েছে, কোন্ কথা নিয়ে তুমি হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে, সে অপমান তার সইবে না— তাই সে একেবারে পণ করে বসেছে সে যাবেই। আসছে ত্রয়োদশী তিথিতে দিন



পড়েছে— এর মধ্যে কাজকর্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে সে চলে যেতে চায়।"

মধুসূদন বললে, "দেখো নবীন, মেজোবউকে আদর দিয়ে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। তাকে একটু কড়া করেই বোলো, সে কিছুতেই যেতে পারবে না। তুমি পুরুষমানুষ, ঘরে তোমার নিজের শাসন চলবে না, এ আমি দেখতে পারি নে।"

নবীন মাথা চুলকিয়ে বললে, "চেষ্টা করে দেখব দাদা, কিন্তু "

"আচ্ছা, আমার নাম করে বোলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক করে দেব।"

নবীন বললে, "তুমি বললে কিনা মেজোবউকে দেশে পাঠাতে হবে তাই ভাবছি "

মধুসূদন উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি কি বলেছি, এই মুহূর্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে?"

নবীন ধীরে ধীরে চলে গেল। মধুসূদন একটা গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসে রইল। বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক-একবার বাড়ির ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টহলিয়ে আসে। মধুসূদনের অল্প একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়ে উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লণ্ঠন তুলে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হয়তো সে ভাবছিল, মহারাজ মূর্ছাই গেছে না মারাই গেছে। মধুসূদন লজ্জিত হয়ে ধড়ফড় করে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। বাইরের আপিসঘরে বসে সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের কাছে যে অসম্মানকর এ কথাটা মুহূর্তেই তাকে যেন মারলে। উঠেই কিছু রাগের স্বরে চৌকিদারকে বললে, "ঘর বন্ধ করো।" যেন ঘর বন্ধ না থাকাটাতে তারই অপরাধ ছিল। দেউড়ির ঘন্টাতে বাজল দুটো।

মধুসূদন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তার দেরাজ খুললে। ইতস্তত করতে করতে কুমুর নামের টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। তেতালায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না। তাই তার দিনের চরিত্রেব সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি দুটোর সময় চাবি দিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্বসংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই দায়ী নয়, তখন কুমুর কাছে মনে মনে হার-মানা তার পক্ষে অসম্ভব হল না।

৩২

সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরল, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছিল। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজা ভেজানো; দরজা খুলে গেল। সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ করে বাঁ পাশে এসে বসল। এই মুখটি যে মনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ, মুখের মধ্যে তার একটি অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনোদিন বিরোধ ঘটে নি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তার প্রকৃতিকে আঘাত করে নি। যে সংসারে সে ছিল সে সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এই জন্যেই তার মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তার চলাফেরায় তার ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুন্ন মর্যাদা। যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে,



প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয়, তার কাছে কুমুর এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টানছে। বিয়ের পরে বধূ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম আসবামাত্রই যে কাণ্ডটি ঘটল তার সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায় তার নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের ক্রুদ্ধ অক্ষমতা, অন্য দিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ। সাধারণ মেয়েদের মতো তার ব্যবহারে কোথাও কিছু মাত্র অশোভন প্রগল্‌ভতা দেখা গেল না। এ যদি না হত তা হলে তাকে অপমান করবার যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু কী যে হল তা সে নিজে বুঝতেই পারে না; কী একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে না।

মধুসূদন মনে স্থির করলে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি করে জেগে বসে থাকবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে আর কিছুতেই থাকতে পারলে না- -আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তার হাতটি নিজের হাতের উপর তুলে নিলে। কুমু ঘুমের ঘোরে উস্‌খুস্‌ করে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের দিকে পাশ ফিরে শুল।

মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, "বড়োবউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে।"

অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে বসল, বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক হয়ে রইল চেয়ে। মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধরে বললে, "তোমার দাদার কাছে থেকে এসেছে।" বলে ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এল।

কুমু টেলিগ্রামটা পড়ে দেখলে, তাতে ইংরেজীতে লেখা আছে, "আমার জন্যে উদ্‌বিগ্ন হোয়ো না; ক্রমশই সেরে উঠছি; তোমাকে আমার আশীর্বাদ।" কঠিন উদ্‌বেগেব নিরতিশয় পীড়নের মধ্যে এই সান্ত্বনার কথা পড়ে এক মুহূর্তে কুমুর চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে উঠল। চোখ মুছে টেলিগ্রামখানি যত্ন করে আঁচলের প্রান্তে বাঁধলে। সেইটেতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন ঘা পড়ে লাগল। তার পরে কী যে বলবে কিছুই ভেবে পায় না। কুমুই বলে উঠল, "দাদার কি চিঠি আসে নি?"

এর পরে কিছুতেই মধুসূদন বলতে পারলে না যে চিঠি এসেছে। ধাঁ করে বলে ফেললে, "না, চিঠি তো নেই।

এই ঘরটার মধ্যে রাত্রে দুজনে এমন করে বসে থাকতে কুমুর সংকোচ বোধ হল। সে যখন উঠব-উঠব করছে, মধুসূদন হঠাৎ বলে উঠল, "বড়োবউ, আমার উপর রাগ কোরো না।"

এ তো প্রভুর উপরোধ নয়, এ যে প্রণয়ীর মিনতি, আর তার মধ্যে যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানি। কুমু বিস্মিত হয়ে গেল, তার মনে হল এ দৈবেরই লীলা। কেননা, সে যে দিনের বেলা বার বার নিজেকে বলেছে, 'তুই রাগ করিস নে।' সেই কথাটাই আজ অর্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।

মধুসূদন আবার তাকে বললে, "তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ?"

কুমু বললে, "না, আমার রাগ নেই, একটুও না।"

মধুসূদন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। ও যেন মনে মনে কথা কইছে; অনুদ্দিষ্ট কারও সঙ্গে যেন ওর কথা।

মধুসূদন বললে, "তা হলে এ ঘর থেকে এসো তোমার আপন ঘরে।"

কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না। ঘুমের থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন।



কাল সকালে স্নান করে দেবতার কাছে তার প্রতিদিনের প্রার্থনা-মন্ত্র পড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তার সাধনা আরম্ভ হবে এই সংকল্প সে করেছিল। তখন ওর মনে হল, 'ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না, আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন। তাঁকে কেমন করে বলব যে, "না"। মনের ভিতর যে একটা প্রকাণ্ড অনিচ্ছা হচ্ছিল তাকে অপরাধ বলে কুমু ভয় পেলে। এই অনিচ্ছার বাধা তাকে টেনে রাখছিল বলেই কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে, বললে, "চলো।"

উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, "আমি এখনই আসছি দেরি করব না।"

বলে ছাদের কোণে গিয়ে বসে পড়ল। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য আকাশে।

নিজের মনে মনে কুমু বার বার করে বলতে লাগল, 'প্রভু, তুমি ডেকেছ আমাকে, তুমি ডেকেছ। আমাকে ভোল নি বলেই ডেকেছ। আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে— সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।

আর-সমস্তকেই কুমু লুপ্ত করে দিতে চায়। আর-সমস্তই মায়া, আর-সমস্তই যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরই কাঁটা, আর সে তাঁরই পথের কাঁটা। সঙ্গে পাথেয় আছে, তার দাদার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ সে যে আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। সেই আঁচলে-বাঁধা আশীর্বাদ বার বার মাথায় ঠেকালে। তার পরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল, পিছন থেকে মধুসূদন বলে উঠল, "বড়োবউ, ঠাণ্ডা লাগবে, ঘরে এসো।" অন্তরের মধ্যে কুমু যে বাণী শুনতে চায় তার সঙ্গে এ কণ্ঠের সুব তো মেলে না! এই তো তার পরীক্ষা, ঠাকুর আজ তাকে বাঁশি দিয়েও ডাকবেন না। তিনি রইবেন আজ ছদ্মবেশে।

৩৩

যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকার তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান। কিন্তু এ তো দু-তিন ঘণ্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিনরাত্রি বেদনাবোধকে বিতৃষ্ণাবোধকে তাড়িয়ে রাখতে হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে তো সম্ভব হল না। তাই মনে মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে। তার এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ম্।

হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি করে সইতে পার। তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পার তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি। কুমু চোখ বুজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে, 'তুমি তো বলেছ, যে মানুষ আমাকে



সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে, সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করি নে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।'

আজ সকালে স্নান করে চন্দন-গোলা জল দিয়ে তার শরীরকে অনেকক্ষণ ধরে অভিষিক্ত করে নিলে। দেহকে নির্মল করে সুগন্ধি করে সে তাঁকে উৎসর্গ করে দিলে—মনে মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান করতে লাগল যে, নিমেষে নিমেষে তার হাতে তাঁর হাত আছে, তা:: সমস্ত শরীরে তাঁর সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। এ দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে যে শরীরটা সে তো মিথ্যা, সে তো মায়া, সে তো মাটি, দেখতে দেখতে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। যতক্ষণ তাঁর স্পর্শকে অনুভব করি ততক্ষণ এ দেহ কিছুতেই অপবিত্র হতে পারে না। এই কথা মনে করতে করতে আনন্দে তার চোখের পাতা ভিজে এল—তার দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে। পূণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল। যদি কুন্দফুলের মালা হাতের কাছে পেত তা হলে এখনই আজ সে পরত গলায়, বাঁধত কবরীতে। স্নান করে পরল সে একটি শুভ্র শাড়ি, খুব মোটা লাল পাড় দেওয়া। ছাদে যখন বসল তখন মনে হল সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত করলে।

মোতির মা'র কাছে এসে কুমু বললে, "আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।"

মোতির মা হেসে বললে, "এসো তবে তরকারি কুটবে।"

মস্ত মস্ত বারকোশ, বড়ো বড়ো পিতলের খোরা, ঝুড়ি ঝুড়ি শাকসব্‌জি, দশ-পনেরোটা বঁটি পাতা— আত্মীয়া-আশ্রিতারা গল্প করতে করতে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত খণ্ডবিখণ্ডিত তরকারিগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে। তারই মধ্যে কুমু এক জায়গায় বসে গেল। সামনে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের বস্‌তির এক বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ও কি কাজ করছে, না, ওর আঙুলের গতি আশ্রয় করে ওর মন চলে যাচ্ছে কোন্ এক তীর্থের পথে? ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো, আকাশে-তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে। নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের দু ধারে যে জল কেটে কেটে পড়ছে সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই। ঘরে অন্য যারা কাজ করছে তারা যে কুমুর সঙ্গে গল্পগুজব করবে এমন যেন একটা সহজ রাস্তা পাচ্ছে না। শ্যামাসুন্দরী একবার বললে, "বউ, সকালেই যদি স্নান কর, গরম জল বলে দাও না কেন? ঠাণ্ডা লাগবে না তো?"

কুমু বললে, "আমার অভ্যেস আছে।"

আলাপ আর এগোল না। কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলছে—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ম্।

তরকারি-কোটা ভাঁড়ার-দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল, মেয়েরা স্নানের জন্যে অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুললে।

মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু বললে, "দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাফের জবাব পেয়েছি।"

মোতির মা কিছু আশ্চর্য হয়ে বললে, "কখন পেলে?"

কুমু বললে, "কাল রাত্তিরে।"

"রাত্তিরে!"



"হাঁ, অনেক রাত। তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন।"

মোতির মা বললে, "তা হলে চিঠিখানাও নিশ্চয় পেয়েছ।"

"কোন্ চিঠি?"

"তোমার দাদার চিঠি।"

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "না, আমি তো পাই নি। দাদার চিঠি এসেছে নাকি?"

মোতির মা চুপ করে রইল।

কুমু তার হাত চেপে ধরে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, "কোথায় দাদার চিঠি, আমাকে এনে দাও-না।"

মোতির মা চুপি চুপি বললে, "সে চিঠি আনতে পারব না, সে বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরের দেরাজে আছে।"

"আমার চিঠি কেন আমাকে এনে দিতে পারবে না?"

"তাঁর দেরাজ খুলেছি জানতে পারলে প্রলয়-কাণ্ড হবে।"

কুমু অস্থির হয়ে বললে, "দাদার চিঠি তা হলে আমি, পড়তে পাব না?"

"বড়োঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে চিঠি পড়ে আবার দেরাজে রেখে দিয়ো।"

রাগ তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনটা গরম হয়ে উঠল। বললে, "নিজের চিঠিও কি চুরি করে পড়তে হবে?"

"কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয়, সে বিচার এ বাড়ির কর্তা করে দেন।"

কুমু তার পণ ভুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জনী তুলে বলে উঠল, 'রাগ কোরো না।' ক্ষণকালের জন্যে কুমু চোখ বুজলে। নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ম।'

কুমু বললে, "আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই বলে চুরি করে চুরির শোধ দিতে চাই নে।"

বলেই কুমুর তখনই মনে হল কথাটা কঠিন হয়েছে। বুঝতে পারলে, ভিতরে যে রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে। তাকে উন্মূলিত করতে হবে। তার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে সব সময় তো তার নাগাল পাওয়া যায় না। গুহার মধ্যে সে দুর্গ তৈরি করে থাকে, বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই? তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত করে, বদ্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিল, সে হচ্ছে সংগীত। কিন্তু এ বাড়িতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে। সঙ্গে এসরাজ আনেও নি। কুমু গান গাইতে পারে, কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই। গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল, অভিমানের গান। যে গানে ও বলতে পারে, 'আমি তো তোমারই ডাকে এসেছি, তবে তুমি কেন লুকোলে? আমি তো নিমেষের জন্যে দ্বিধা করি নি, তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেললে?' এই সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তা হলেই যেন সুরে এর উত্তর পাবে।

৩৪

কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে, এ বাড়ির ছাদ। সেইখানে চলে গেল। বেলা হয়েছে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভরে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে বসল। একটি গান মনে পড়ল, তার সুরটি আশাবরী। সে গানের আরম্ভটি হচ্ছে, 'বাঁশরী



হমারি রে'— কিন্তু বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী— তার মানে বুঝতে পারা যায় না। কুমু ঐ অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামত নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পালটে পালটে গাইতে লাগল। ঐ একটুখানি কথা অর্থে ভরে উঠল। ঐ বাক্যটি যেন বলছে, 'ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভরে উঠছে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁচচ্ছে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙল না? বাঁশরী হমারি রে, বাঁশরী হমারি রে।'

মোতির মা যখন এসে বললে "চলো ভাই, খেতে যাবে" তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া গেছে লুপ্ত হয়ে, কিন্তু তখন ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর 'পরে কী অন্যায় করেছে সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা, যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল, সে যেন এই রোদভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে। কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে স্নেহবাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তার মনের আগ্রহ তো যায় না।

ঐ ব্যগ্রতাটা তার মনে লেগে রইল। খাওয়া হয়ে গেলে আর সে থাকতে পারলে না। মোতির মাকে বললে, "আমি যাই বাইরের ঘরে, চিঠি পড়ে আসি।"

মোতির মা বললে, "আর একটু দেরি হোক, চাকররা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে, তখন যেয়ো।"

কুমু বললে, "না, না, সে বড়ো চুরি করতে যাওয়ার মতো হবে। আমি সকলের সামনে দিয়ে যেতে চাই, তাতে যে যা মনে করে করুক।"

মোতির মা বললে, "তা হলে চলো আমিও সঙ্গে যাই।"

কুমু বলে উঠল, "না, সে কিছুতেই হবে না। তুমি কেবল বলে দাও কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে।"

মোতির মা অন্তঃপুরের ঝরকা-দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে। কুমু বেরিয়ে এল। ভৃত্যেরা সচকিত হয়ে উঠে তাকে প্রণাম করলে। কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি। তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগল, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। যে বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েছে সেখানে এ-রকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্যন্ত করা যেত না। নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুলল। সে বলে উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ় ম্'—তবু তুফান থামে না—তাই বার বার বললে। বাইরে যে আরদালি ছিল, আপিসঘরে তাদের বউরানীর এই আপন-মনে মন্ত্র-আবৃত্তি শুনে সে অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বলতে বলতে কুমুর মন শান্ত হয়ে এল। তখন চিঠিখানি সামনে রেখে চৌকিতে বসে হাত জোড় করে স্থির হয়ে রইল। চিঠি সে চুরি করে পড়বে না এই তার পণ।

এমন সময়ে মধুসূদন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে দাঁড়াল—কুমু তার দিকে চাইলেও না। কাছে এসে দেখলে, ডেস্কের উপর সেই চিঠি। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখানে যে!"

কুমু নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে। তার মধ্যে নালিশ ছিল না। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে, "এ ঘরে তুমি কেন?"

এই বাহুল্যপ্রশ্নে কুমু অধৈর্যের স্বরেই বললে, "আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কি না তাই দেখতে এসেছিলেম।"

সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, এমনতরো প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্তিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই বললে, "এ চিঠি আমিই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সেজন্যে তোমার এখানে আসবার তো দরকার ছিল না।"



কুমু একটুখানি চুপ করে রইল, মনকে শান্ত করে তার পরে বললে, "এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছে কর নি, সেইজন্যে এ চিঠি আমি পড়ব না। এই আমি ছিঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিয়ো না। এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছু হতে পারে না।"

এই বলে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

ইতিপূর্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। আন্দোলন কিছুতে থামাতে পারছিল না। কুমুর খাওয়া হলেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। আজ সে মাথার চুল আঁচড়ানো সম্বন্ধে একটু বিশেষ যত্ন নিলে। আজ সকালেই একটি ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধি কেশতৈল ও দামি এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার করেছে। সুগন্ধি ও সুসজ্জিত হয়ে সে প্রস্তুত ছিল। আপিসের সময় আজ অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল। হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমন ভাবে সেটাকে দেখতে লাগল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমন-কি, পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের করে দুটো-একটা দাগও টেনে দিলে।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলে শ্যামাসুন্দরী। ভ্রুকুঞ্চিত করে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। শ্যামাসুন্দরী বললে, "তুমি এখানে বসে আছ; বউ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"খুঁজে বেড়াচ্ছে! কোথায়?"

"এই যে দেখলুম, বাইরে তোমার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকল। তা এতে অত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ঠাকুরপো— সে ভেবেছে তুমি বুঝি—"

তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চলে গেল। তার পরেই সেই চিঠির ব্যাপার।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনের তাই হল। তখন আর দেরি করবার লেশমাত্র অবকাশ ছিল না। আপিসে চলে গেল। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলই যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠছে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধরেছে, কার্যশেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এল।

৩৫

এ দিকে নবীন ও মোতির মা বুঝেছে এবারে ভিত গেল ভেঙে, পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইল না। মোতির মা বললে, "এখানে যেরকম খেটে খাচ্ছি সেরকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে আমার মিলবে। আমার দুঃখ এই যে, আমি গেলে এ বাড়িতে দিদিকে দেখবার লোক আর কেউ থাকবে না।"

নবীন বললে, "দেখো মেজোবউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়েও কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, তা দাদা বুঝলে না—সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।"

মোতির মা বললে, "সে কথা তোমার দাদার বুঝতে দেরি হবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।"

নবীন বললে, "লক্ষ্মণ-দেওর হবার ভাগ্য আমার ঘটল না, এইটেই আমার মনে বাজছে। যা



হোক, তুমি জিনিসপত্তর এখনই গুছিয়ে ফেলো, এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না।"

মোতির মা চলে গেল। নবীন আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে তার বউদিদির ঘরের বাইরে এসে দেখলে, কুমু তার শোবার ঘরের মেজের বিছানার উপর পড়ে আছে। যে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছে তার বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। নবীন বলল, "বউদিদি, প্রণাম করতে এসেছি, একটু পায়ের ধুলো দাও।"

বউদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্তা।

কুমু বললে, "এসো, বোসো।"

নবীন মাটিতে বসে বললে, "তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? ক-টা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি, কিছুই করতে পারি নি এই আপসোস মনে রয়ে গেল।"

কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

নবীন বললে, "দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এর পরে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবার সুবিধা হবে না, তাই প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি।" বলে যেই সে প্রণাম করলে মোতির মা ছুটে এসে বললে, "শীঘ্র চলে এসো। কর্তা তোমার খোঁজ করছেন।"

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মোতির মাও গেল তার সঙ্গে।

সেই বাইরের ঘরে দাদা তার ডেস্কের কাছে বসে; নবীন এসে দাঁড়াল। অন্যদিনে এমন অবস্থায় তার মুখে যেরকম আশঙ্কার ভাব থাকত আজ তা কিছুই নেই।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ডেস্কের চিঠির কথা বড়োবউকে কে বললে?"

নবীন বললে, "আমিই বলেছি।"

"হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে?"

"বড়োবউরানী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দাদার চিঠি এসেছে কি না। এ বাড়ির চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ঐ ডেস্কেই জমা হয়, তাই আমি দেখতে এসেছিলুম।"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয় নি?"

"তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই—"

"তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?"

"তিনি তো এ বাড়ির কর্ত্রী, কেমন করে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? তিনি যা বলবেন আমি তা মানব না এতবড়ো আস্পর্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে বলছি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।"

"নবীন, তোমাকে তো এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, এ সব বুদ্ধি তোমার নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেনে তোমাদের দেশে যেতে হবে।"

"যে আজ্ঞে" বলেই নবীন দ্বিরুক্তি না করেই দ্রুত চলে গেল।

এত সংক্ষেপে 'যে আজ্ঞে' মধুসূদনের একটুও ভালো লাগল না। নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিল; যদিও তাতে মধুসূদনের সংকল্পের ব্যত্যয় হত না। নবীনকে আবার ফিরে ডেকে বললে, "মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র জোগাতে পারব না।"



নবীন বললে, "তা জানি, দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চাষ করে খাব।"

বলেই অন্য কোনো কথার অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশেল করে তৈরি, তার একটা প্রমাণ এই যে, মধুসূদন নবীনকে গভীরভাবে স্নেহ করে। তার অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয়সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে, মধুসূদন তাদের বড়ো একটা খোঁজ রাখে না। পিতার মৃত্যুর পর নবীনকে মধুসূদন কলকাতায় আনিয়ে পড়াশুনো করিয়েছে এবং তাকে বরাবর রেখেছে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা। তার কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হচ্ছে, তার কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাসতে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারই 'পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত।

নবীনকে মধুসূদন যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তার একটা প্রমাণ, মোতির মাকে মধুসূদন দেখতে পারে না। যার প্রতি ওর মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই। সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা করে মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈত্রিক অধিকার, বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলই বাধা ঘটায়। নবীনকে মধুসদন যদি বিশেষ ভালো না বাসত তা হলে অনেক দিন আগেই মোতির মার নির্বাসনদণ্ড পাকা হত।

মধুসূদন ভেবেছিল এইটুকু কাজ সেরেই আবার একবার আপিসে চলে যাবে। কিন্তু কোনোমতেই মনের মধ্যে জোর পেলে না। কুমু সেই-যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেই ছবিটি তার মনে গভীর করে আঁকা হয়ে গেছে। সে এক আশ্চর্য ছবি, এমনতরো কিছু সে কখনো মনে করতে পারত না। একবার তার চিরকালের সন্দেহ-করা স্বভাববশত মধুসূদন ভেবেছিল নিশ্চয়ই কুমু চিঠিখানা আগেই পড়ে নিয়েছে, কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্মল সত্যের দীপ্তি আছে যে, বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব।

কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি মধুসূদন দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে-সব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। তার বয়স বেশি এ কথা আজ সে ভুলতে পারছে না। এমন-কি, তার যে চুলে পাক ধরেছে সেটা সে কোনোমতে গোপন করতে পারলে বাঁচে। তার রঙটা কালো, বিধাতার সেই অবিচার এতকাল পরে তাকে তীব্র করে বাজছে। কুমুর মনটা কেবলই তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্ছে, তার কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব, এতে তার সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র সে দুর্বল। চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও করে নি। অথচ এ কথা বলবারও জোর মনে নেই যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হলেই ভালো হত, যার উপরে তার শাসন খাটত।

মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে। সে তার ধনে। তাই আজ সকালেই ঘরে জহরি এসেছিল। তার কাছ থেকে তিনটে আংটি নিয়ে রেখেছে, দেখতে চায় কোন্‌টাতে কুমুর পছন্দ। সেই আংটির কৌটা তিনটি পকেটে নিয়ে সে তার শোবার ঘরে গেল। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের আংটি। মধুসূদন মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনাযোগে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটা অতি ধীরে ধীরে খুললে, কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পরে বেরোল পান্না, তাতে চক্ষু আরো প্রসারিত। তার পর হীরে, তার বহুমূল্য উজ্জ্বলতায় রমণীর



বিস্ময়ের সীমা নেই। মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, 'তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ করে নাও।'' হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ করলে তখন তার লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈষৎ হাস্য করে মধুসূদন তিনটে আংটিই কুমুর তিন আঙুলে পরিয়ে দিলে। তার পরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠল।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল এই ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পর হবে। কিন্তু দুপুরবেলাকার দুর্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর করতে পারলো না। রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্নে সেরে নেবার জন্যে অন্তঃপুরে গেল।

গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেজেতে বসে গোছাচ্ছে। পাশে জিনিসপত্র কাপড়চোপড় ছড়ানো।

''এ কী কাণ্ড! কোথাও যাচ্ছ নাকি?''

''হাঁ।''

''কোথায়?''

''রজবপুরে।''

''তার মনে কী হল?''

''তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েছ। সে শাস্তি আমারই পাওনা।''

'যেয়ো না' বলে অনুরোধ করতে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাববিরুদ্ধ। তার মনটা প্রথমেই বলে উঠল---যাক-না দেখি কতদিন থাকতে পারে। এক মুহূর্ত দেরি না করে হন্ হন্ করে ফিরে চলে গেল।

৩৬

মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, ''বড়োবউকে তোরা খেপিয়েছিস।''

''দাদা, কালই তো আমরা যাচ্ছি, তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে কথা কব না। আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, বড়োবউরানীকে খেপাবার জন্যে সংসারে আর কারও দরকার হবে না---তুমি একাই পারবে। আমরা থাকলে তবু যদি-বা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তোমার সইল না।''

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, ''জ্যাঠামি করিস নে। রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস।''

''এ কথা ভাবতেই পারি নে তো শেখাব কি?''

''দেখ্, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস তোদের ভালো হবে না স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।''

''দাদা, এ-সব কথা বলছ কাকে? যেখানে বললে কাজে লাগে বলো গে।''

''তোরা কিছু বলিস নি?''

''এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি কল্পনাও করি নি।''

''বড়োবউ যদি জেদ ধরে বসে তা হলে কী করবি তোরা?''

''তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পার। তার পরে তোমার শত্রুপক্ষেরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তা হলে মেজোবউকে সন্দেহ করে বোসো না।''

মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললে, ''চুপ্ কর্! বড়োবউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক, আমি ঠেকাব না।''



"আমরা তাঁকে খাওয়াব কী করে?"

"তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। যা, যা বলছি! বেরো বলছি ঘর থেকে।"

নবীন বেরিয়ে গেল। মধুসূদন ওডিকলোন ভিজনো পটি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সংকল্প মনে দৃঢ় করতে লাগল।

নবীনের কাছে মোতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেল কুমুর শোবার ঘরে। দেখলে তখনো সে কাপড়-চোপড় পাট করছে তোলবার জন্যে। বললে, "এ কী করছ বউরানী?"

"তোমাদের সঙ্গে যাব।"

"তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কি আমার!"

"কেন?"

"বড়োঠাকুর তা হলে আমাদের মুখ দেখবেন না।"

"তা হলে আমারও দেখবেন না।"

"তা সে যেন হল, আমরা যে বড়ো গরিব।"

"আমিও কম গরিব না, আমারও চলে যাবে।"

"লোকে যে বড়োঠাকুরকে নিয়ে হাসবে।"

"তা বলে আমার জন্যে তোমরা শাস্তি পাবে এ আমি সইব না।"

"কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে তো শাস্তি নয়, এ আমাদের নিজের পাপের জন্যেই।"

"কিসের পাপ তোমাদের?"

"আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে।"

"আমি যদি খবর জানতে চাই তা হলে খবর দেওয়াটা অপরাধ?"

"কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।"

"তাই ভালো, অপরাধ তোমরাও করেছ আমিও করেছি। একসঙ্গেই ফল ভোগ করব।"

"আচ্ছা বেশ, তা হলে বলে দেব তোমার জন্যে পালকি। বড়োঠাকুরের হুকুম হয়েছে তোমাকে বাধা দেওয়া হবে না। এখন তবে তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই। ওগুলো নিয়ে যে ঘেমে উঠলে!"

দুজনে গোছাতে লেগে গেল।

এমন সময়ে কানে এল বাইরে জুতোর মচ্ মচ্ ধ্বনি। মোতির মা দিল দৌড়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বললে, "বড়োবউ, তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন যেতে পারব না?"

"আমি হুকুম করছি বলে।"

"আচ্ছা, তা হলে যাব না। তার পরে আর কী হুকুম বলো।"

"বন্ধ করো তোমার জিনিস প্যাক করা।"

"এই বন্ধ করলুম।" বলে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মধুসূদন বললে, "শোনো, শোনো।"

তখনই কুমু ফিরে এসে বললে, "কী বলো।"

বিশেষ কিছুই বলবার ছিল না। তবু একটু ভেবে বললে, "তোমার জন্যে আংটি এনেছি।"

"আমার যে-আংটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেছ, আর আমার আংটির দরকার নেই।"

"একবার দেখোই না চেয়ে।"



মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে। কুমু একটি কথাও বললে না।

"এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই তুমি পরতে পারো।"

"তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটেই পরব।"

"আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।"

"হুকুম কর তিনটেই পরব।"

"আমি পরিয়ে দিই।"

"দাও পরিয়ে।"

মধুসূদন পরিয়ে দিলে। কুমু বললে, "আর-কিছু হুকুম আছে?"

"বড়োবউ, রাগ করছ কেন?"

"আমি একটুও রাগ করছি নে।" বলে কুমু আবার ঘর থেকে চলে গেল।

মধুসূদন অস্থির হয়ে বলে উঠল, "আহা, যাও কোথায়? শোনো শেনো।"

কুমু তখনই ফিরে এসে বললে, "কী বলো।"

ভেবে পেলে না কী বলবে। মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা যাও।" রেগে বললে, "দাও, আংটিগুলো ফিরিয়ে দাও।"

তখনই কুমু তিনটে আংটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে বললে, "যাও চলে।"

কুমু তখনই চলে গেল।

এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে যে, সে আপিসে যাবেই। তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। ইংরেজ কর্মচারীরা সকলেই চলে গেছে টেনিস খেলায়। উচ্চতন বড়োবাবুদের দল উঠি-উঠি করছে। এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হয়ে একেবারে খুব কষে কাজে লেগে গেল। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটা বাজে, তখন খাতাপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ল।

৩৭

এতদিন মধুসূদনের জীবনযাত্রায় কখনো কোনো খেই ছিঁড়ে যেত না। প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তই নিশ্চিন্ত নিয়মে বাঁধা ছিল। আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। এই-যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চলেছে, রাত্তিরটা যে ঠিক কী ভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধুসূদন ভয়ে ভয়ে বাড়িতে এল, আস্তে আস্তে আহার করলে। আহার করে তখনই সাহস হল না শোবার ঘরে যেতে। প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। শোবার সময় নটা যখন বাজল তখন গেল অন্তঃপুরে। আজ ছিল দৃঢ় পণ— যথাসময়ে বিছানায় শোবে, কিছুতেই অন্যথা হবে না। শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলেই একেবারে ঝপ্ করে বিছানার উপরে পড়ল। ঘুম আসতে চায় না। রাত্রি যতই নিবিড় হয় ততই ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন তাকে তাড়া করবার কেউ নেই, পাহারাওয়ালারা সকলেই ক্লান্ত।

ঘড়িতে একটা বাজল, চোখে একটুও ঘুম নেই; আর থাকতে পারল না, বিছানা থেকে উঠে ভাবতে লাগল কুমু কোথায়? বঙ্কু ফরাশের উপর কড়া হুকুম, ফরাশখানা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ। ছাদ ঘুরে এল, কেউ নেই। পায়ের জুতো খুলে ফেলে নীচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। মোতির মার ঘরের সামনে এসে মনে হল যেন কথাবার্তার শব্দ। হতে পারে, কাল চলে যাবে, আজ স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ চলছে। বাইরে চুপ করে দরজায় কান পেতে রইল।



দুজনে গুন্ গুন্ করে আলাপ চলছে। কথা শোনা যায় না, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল দুটিই মেয়ের গলা। তবে তো বিচ্ছেদের পূর্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরই মনের কথা হচ্ছে। রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে করতে লাগল লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে। কিন্তু নবীনটা তা হলে কোথায়? নিশ্চয় বাইরে।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে, সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে। তার কাছে লজ্জিত হয়ে মধুসূদন রেগে উঠল বললে, "কী করছ এত রাত্রে এখানে?"

শ্যামা উত্তর করলে, "শুয়েছিলুম। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল, ভাবলুম বুঝি— "

মধুসূদন তর্জন করে বলে উঠল, "আস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়ো না, সাবধান করে দিচ্ছি। যাও শুতে।"

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছিল। আজ বুঝলে, অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে। অত্যন্ত করুণ মুখ করে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে, তার পরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছলে। চলে যাবার উপক্রম করে আবার সে পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের সম্বন্ধ, আমবা সইব কী করে?" বলে শ্যামা দ্রুতপদে চলে গেল।

মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পরে চলল বাইরের ঘরে। ঠিক একেবারে পড়ল চৌকিদারের সামনে, সে তখন টইল দিতে বেরিয়েছে। এমনি নিয়মের কঠিন জাল যে, নিজের বাড়িতে যে চুপি চুপি সঞ্চরণ করবে তার জো নেই। চারি দিকেই সতর্ক দৃষ্টির ব্যূহ। রাজাবাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি-পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েছে এ যে একেবারে অভূতপূর্ব! প্রথমে দূর থেকে যখন চিনতে পারি নি, চৌকিদার বলে উঠেছিল, "কোন্ হ্যায়?" কাছে এসে জিভ কেটে মস্ত প্রণাম করলে, বললে, "রাজাবাহাদুর, কিছু হুকুম আছে?"

মধুসূদন বললে, "দেখতে এলুম ঠিকমত চলছে কি না।" কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসংগত নয়।

তার পরে মধুসূদন বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই, নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়া আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্ছে। মধুসূদন ঘরে একটা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিলে, তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙল না। তাকে ঠেলা দিতেই ধড়্ফড়্ করে জেগে সে উঠে বসল। মধুসূদন তার কোনোরকম কৈফিয়ত তলব না করেই বললে, "এখনই যা, বড়োবউকে বল গে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি।" বলে তখনই সে অন্তঃপুরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। সাদাসিধে একখানি লালপেড়ে শাড়ি পরা। শাড়ির প্রান্তটি মাথার উপর টানা। এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কী অপরূপ আবির্ভাব! কুমু ঘরের প্রান্তের সোফাটির উপরে বসল।

মধুসূদন তখনই এসে বসল মেজের উপরে তার পায়ের কাছে। কুমু সংকুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করবামাত্র মধুসূদন হাতে ধরে টেনে বসালে; বললে, "উঠো না, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেছি।"

মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক হয়ে রইল। মধুসূদন আবার বললে, "নবীনকে মেজোবউকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ করে দেব। তারা তোমার সেবাতেই থাকবে।"



কুমু কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। মধুসূদন ভাবলে, নিজের মান খর্ব করে আমি বড়োবউয়ের মান ভাঙব। হাত ধরে মিনতি করে বললে, "আমি এখনই আসছি। বলো তুমি চলে যাবে না।"

কুমু বললে, "না, যাব না।"

মধুসূদন নীচে চলে গেল। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তার এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর যে কী উত্তর তা সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে দান নিয়ে সে এসেছিল সে তো সব স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে, আর তো তা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চলবে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।'

খানিক বাদে মধুসূদন নবীন ও মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুর সামনে উপস্থিত করলে। তাদের সম্বোধন করে বললে, "কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বড়োবউয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করে দিচ্ছি।"

শুনে ওরা দুজনে অবাক হয়ে গেল। একে তো এমন হুকুম প্রত্যাশা করে নি, তার পরে এত রাত্তিরে ওদের ডেকে এনে এ কথা বলবার জরুরি দরকার কী ছিল।

মধুসূদনের ধৈর্য সবুর মানছিল না। আজ রাত্তিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বা সংকোচ করতে পারলে না। এমন করে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনো করে নি। সে যা চেয়েছিল তা পাবার জন্যে তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তার ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।

এইবার কুমুর মনে বড়ো একটা সংকোচ এল, সে ভাবতে লাগল এই জিনিসটাকে কেমন করে সে গ্রহণ করবে? এর বদলে কী আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবন যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হলে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হতে চায় না। তখন বেরিয়ে পড়ে নিজের ভিতরের প্রতিকূলতা। কুমু হঠাৎ দেখতে পেলে মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিল তখন তার সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তা সহজ ছিল; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হয়েছে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে উঠল। এখন তার ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না, তার সেই ফরাশখানার আশ্রয় চলে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত জোড় করবার কোনো মানে নেই।

মোতির মাকে কোনো ছুতোয় কুমু যদি রাখতে পারত তা হলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু নবীন গেল চলে, হতবুদ্ধি মোতির মাও আস্তে আস্তে চলল তার পিছনে। দরজার কাছে এসে একবার মুখ আড় করে উদ্‌বিগ্নভাবে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে গেল। স্বামীর প্রসন্নতার হাত থেকে এই মেয়েটিকে এখন কে বাঁচাবে?

মধুসূদন বললে, "বড়োবউ, কাপড় ছেড়ে শুতে আসবে না?"

কুমু ধীরে ধীরে উঠে পাশের নাবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে—মুক্তির মেয়াদ যতটুকু পারে বাড়িয়ে নিতে চায়। সে ঘরে দেওয়ালের কাছে একটা চৌকি ছিল সেইটেতে বসে রইল। তার ব্যাকুল দেহটা যেন নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজছে। মধুসূদন মাঝে মাঝে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় আর হিসেব করতে থাকে কাপড় ছাড়বার জন্যে কতটা সময় দরকার। ইতিমধ্যে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখলে, মাথার তেলোর যে জায়গাটাতে কড়া চুলগুলো বেমানান রকম খাড়া হয়ে থাকে বৃথা তার উপরে কয়েকবার বুরুশের চাপ লাগালে আর গায়ের কাপড়ে অনেকখানি দিলে ল্যাভেণ্ডার ঢেলে।



পনেরো মিনিট গেল; বেশ-বদলের পক্ষে সে সময়টা যথেষ্ট। মধুসূদন চুপি চুপি করে একবার নাবার ঘরের দরজার কাছে কান দিয়ে দাঁড়াল, ভিতরে নাড়াচাড়ার কোনো শব্দ নেই— মনে ভাবলে কুমু হয়তো চুলটার বাহার করছে, খোঁপাটা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েরা সাজ করতে ভালোবাসে মধুসূদনেরও এ আন্দাজটা ছিল, অতএব সবর করতেই হবে। আধঘণ্টা হল—মধুসূদন আর একবার দরজার উপর কান লাগালে, এখনো কোনো শব্দ নেই। ফিরে এসে কেদারায় বসে পড়ে খাটের সমনের দেয়ালে বিলিতি যে ছবিটা ঝোলানো ছিল তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এক সময়ে ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, "বড়োবউ এখনো হয় নি?"

একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। কুমুদিনী বেরিয়ে এল যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া। যে কাপড় পরা ছিল তাই আছে; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওআলা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল— একখানি অপরূপ ছবি! নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা—সেকেলে ছাঁদের—বোধ হয় এককালে তার মায়ের ছিল। এই মোটা ভারী বালা তার সুকুমার হাতকে যে-ঐশ্বর্যের মর্যাদা দিয়েছে সেটি ওর পক্ষে এত সহজ যে, ঐ অলংকারটা ওর শরীরে একটুমাত্র আড়ম্বরের সুর দেয় নি। মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন করে দেখলে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হল। মধুসূদনের চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারলে না। সংসারে যে-সব লোকের সঙ্গে মধুসূদনের সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধনগৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তার অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ঐ-যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হল, আমার যথেষ্ট ধন নেই—মনে হল, যদি রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতুম তা হলেই ওকে এ ঘরে মানাত। যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশমর্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে-সে প্রবেশ করতেই পারে না—সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ করছে বিপ্রদাস—তাকেও ঐ কুমুর মতোই একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব সর্বদা ঘিরে রয়েছে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য করতে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটু নেই, আছে একটা দূরত্ব। অতিবড়ো আত্মীয়ও যে হঠাৎ এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বলতে পারে 'কী হে, কেমন?' এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কী রকম খাটো হয়ে থাকে সেইটেতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর করতে পারছে না—আপন সংসারে যেখানে সব চেয়ে তার কর্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হটে গিয়েছে। কিন্তু এখানে তার রাগ হয় না—কুমুর প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ কুমুকে দেখে মধুসূদন স্পষ্টই বুঝলে কুমু তৈরি হয়ে আসি নি—একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী সুন্দর! কী একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা! যেন নির্জন তুষারশিখরের উপর নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।

মধুসূদন একটু কাছে এগিয়ে এসে ধীর স্বরে বললে, "শুতে আসবে না বড়োবউ?"

কুমু আশ্চর্য হয়ে গেল। সে নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন রাগ করবে, তাকে অপমানের কথা বলবে। হঠাৎ একটা চিরপরিচিত সুর তার মনে পড়ে গেল—তার বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন করে তার মাকে বড়োবউ বলে ডাকতেন। সেইসঙ্গেই মনে পড়ল—মা তার বাবাকে কাছে



আসতে বাধা দিয়ে কেমন করে চলে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্তে তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল— মাটিতে মধুসূদনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠল, "আমাকে মাপ করো।"

মধুসূদন তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তুলে চৌকির উপরে বসিয়ে বললে, "কী দোষ করেছ যে তোমাকে মাপ করব?"

কুমু বললে, "এখনো আমার মন তৈরি হয় নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।"

মধুসূদনের মনটা শক্ত হয়ে উঠল; বললে, "কিসের জন্যে সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো।"

"ঠিক বলতে পারছি নে, কউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত—"

মধুসূদনের কণ্ঠে আর রস রইল না। সে বললে, 'কিছুই শক্ত না। তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগছে না।"

কুমুর পক্ষে মুশকিল হল। কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়। হৃদয় ভরে নৈবেদ্য দেবার জন্যেই সে পণ করে আছে, কিন্তু সে নৈবেদ্য এখনো এসে পৌঁছোল না। মন বলছে, একটু সবুর করলেই, পথে বাধা না দিলে, এসে পৌঁছোবে; দেরি যে আছে তাও না। তবুও এখনো ডালা যে শূন্য সে কথা মানতেই হবে।

কুমু বললে, "তোমাকে ফাঁকি দিতে চাই নে বলেই বলছি, একটু আমাকে সময় দাও।"

মধুসূদন ক্রমেই অসহিষ্ণু হতে লাগল—কড়া করেই বললে, "সময় দিলে কী সুবিধে হবে! তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও!"

মধুসূদনের তাই বিশ্বাস। সে ভেবেছে বিপ্রদাসের অপেক্ষাতেই কুমুর সমস্ত ঠেকে আছে। দাদা যেমনটি চালাবে, ও তেমনি চলবে। বিদ্রূপের সুরে বললে, "তোমার দাদা তোমার গুরু!"

কুমুদিনী তখনই মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।"

"তাঁর হুকুম না হলে আজ কাপড় ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আসবে না! তাই নাকি?"

কুমুদিনী হাতের মুঠো শক্ত করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তা হলে টেলিগ্রাফ করে হুকুম আনাই—রাত অনেক হল।"

কুমু কোনো জবাব না দিয়ে ছাতে যাবার দরজার দিকে চলল।

মধুসূদন গর্জন করে ধমকে উঠে বললে, "যেয়ো না বলছি।"

কুমু তখনই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কী চাও বলো।"

"এখনই কাপড় ছেড়ে এসো।" ঘড়ি খুলে বললে, "পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।"

কুমু তখনই নাবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে শাড়ির উপর একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে চলে এল। এখন দ্বিতীয় হুকুমের জন্যে তার অপেক্ষা। মধুসূদন দেখে বেশ বুঝলে এও রণসাজ। রাগ বেড়ে উঠল, কিন্তু কী করতে হবে ভেবে পায় না। প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে; তাই সে থমকে গেল। বললে, "এখন কী করতে চাও আমাকে বলো।"

"তুমি যা বলবে তাই করব।"

মধুসূদন হতাশ হয়ে বসে পড়ল চৌকিতে। ঐ চাদরে-জড়ানো মেয়েটিকে দেখে মনে হল, এ যেন বিধবার মূর্তি—ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জন করে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগলে তরী ভাসবে? কোনো দিন কি ভাসবে?

চুপ করে বসে রইল। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া ঘরে একটুও শব্দ নেই। কুমুদিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না—আবার ফিরে বাইরে ছাতের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদ্‌গদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর



প্রতিবেশীর আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্ছাকে বেঁধে রেখেছে—রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠছে তারই অশ্রান্ত আর্তনাদ।

সময় একটা অতলস্পর্শ গর্তের মতো শূন্য হয়ে যেন হাঁ করে আছে। মধুসূদনের সংসারের কলের সমস্ত চাকাই যেন বন্ধ। কাল তার আপিসের অনেক কাজ, ডাইরেক্টারদের মীটিং - কতকগুলো কঠিন প্রস্তাব অনেকের বাধা সত্ত্বেও কৌশলে পাস করিয়ে নিতে হবে। সে-সমস্ত জরুরি ব্যাপার আজ তার কাছে একেবারে ছায়ার মতো। আগে হলে কালকের দিনের কার্যপ্রণালী আজ রাত্রে নোটবইয়ে টুকে রাখত। সব চিন্তা দূর হয়ে গেল, জগতে যে কঠিন সত্য সুনিশ্চিত সে হচ্ছে চাদর দিয়ে ঢাকা ঐ মেয়ে, ঘরের থেকে বেরিয়ে যাবার পথে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মধুসূদন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, ঘরটা যেন ধ্যান ভেঙে চমকে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে কুমুর কাছে গিয়ে বললে, "বড়োবউ, তোমার মন কি পাথরে গড়া?"

ঐ বড়োবউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তার মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ডাকে তার মা কতদিন কত সহজে সাড়া দিয়েছিলেন। তারই অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। মধুসূদুন গভীর কাতরতার সঙ্গে বললে, "আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না?"

কুমুদিনী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "ছি ছি, অমন করে বোলো না।" মাটিতে পড়ে মধুসূদনের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।"

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "না তোমাকে আদেশ করব না, তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো।"

কুমুদিনী মধুসূদনের বাহুবন্ধনে হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। মধুসূদন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, "না, তোমাকে আদেশ করব না, তবু তুমি আমার কাছে এসো।" এই বলে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিলে।

কুমুদিনীর গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখ নিচু করে বললে, "তুমি আদেশ করলে আমার কর্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারি নে।"

"আচ্ছা, তুমি তোমার ঐ গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলো—ওটাকে আমি দেখতে পারছি নে।"

সসংকোচে কুমুদিনী চাদরখানা খুলে ফেললে। গায়ে ছিল একখানি ডুরে শাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরনা—থেমে আছে মনে হয় না, কেবলই যেন চলছে—যেন কোনো-একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অঙ্গকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে, কিছুতে শেষ করতে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে গেল মধুসূদন, অথচ সেই মুহূর্তে একটু লক্ষ্য না করে থাকতে পারলে না যে, ঐ শাড়িটি এখানকার দেওয়া নয়। কুমুদিনীকে যতই মানাক না কেন, এর দাম তুচ্ছ এবং এটা ওর বাপের বাড়ির। ঐ নাবার ঘরের সংলগ্ন কাপড় ছাড়বার ঘরে আছে দেরাজওয়ালা মেহগিনি কাঠের মস্ত আলমারি, তার আয়না-দেওয়া পাল্লা—বিবাহের পূর্বহতেই নানা রকমের দামি কাপড় ঠাসা। সেগুলির উপরে লোভ নেই—মেয়ের এত গর্ব! মনে পড় গেল সেই তিনটে আংটির কথা, অসহ্য-ঔদাসীন্যে তাকে কুমু গ্রহণ করে নি, অথচ একটা লক্ষ্মীছাড়া নীলার আংটির জন্যে কত আগ্রহ! বিপ্রদাস আর মধুসূদনের মধ্যে কুমুর মমতার কত মূল্যভেদ! চাদর খোলবামাত্র এই-সমস্ত কথা দমকা ঝড়ের মতো মধুসূদনকে প্রকাণ্ড ধাক্কা দিলে। কিন্তু হায় রে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর! আর এই দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও



যেন ওর অলংকার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে—ওকে ধনের দাম কষতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না—মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে!

মধুসূদন বললে, "যাও, তুমি শুতে যাও।"

কুমু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল—নীরব প্রশ্ন এই যে, 'তুমি আগে বিছানায় যাবে না?

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে পুনরায় বললে, "যাও, আর দেরি কোরো না।" কুমু বিছানায় যখন প্রবেশ করলে মধুসূদন সোফার উপরে বসে বললে, "এইখানেই বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাক তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

কুমুর সমস্ত গা এল ঝিম্ ঝিম্ করে—এ কী পরীক্ষা তার! কার দরজায় সে আজ মাথা কুটবে? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে পথ দিয়ে সে এখানে এল সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় বসে বসে মনে মনে সে বললে, "ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনো ভোলাতে পার না, এখনো তোমাকে বিশ্বাস করব। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে বলে।'

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই; রাস্তার মোড়ে সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত তবু মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে।

অল্প সময়কেও অনেক সময় বলে মনে হল, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়তে পারছে না। এই কি তার দাম্পত্যের অনন্তকালের ছবি? দু পারে দুজনে নীরবে বসে—রাত্রির শেষ নেই—মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা! অবশেষে এক সময় কুমু তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমাকে অপরাধিনী কোরো না।"

মধুসূদন গভীরকণ্ঠে বললে, "কী চাও বলো, কী করতে হবে?" শেষ কথাটুকু পর্যন্ত একেবারে নিংড়ে বের করে নিতে চায়।

কুমু বললে, "শুতে এসো।"

কিন্তু একেই কি বলে জিত?

৩৮

পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল, দেখলে কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রঙ হয়েছে পাঁশের মতো। সকালে ছাদের যে কোণে আসন পেতে পুব দিকে মুখ করে সে মানসিক পূজায় বসে, ভেবেছিল সেইখানে কুমুকে দেখতে পাবে। কিন্তু আজ সেখানে নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সে একটুখানি ঢাকা ছাদ, সেইখানেই দেয়ালের গায়ে অবসন্নভাবে ঠেসান দিয়ে সে মাটিতে বসে। আজ বুঝি ঠাকুরের উপরে রাগ করেছে। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ যখন অকারণ মারে তখন সে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না, অভিমান করে আঘাত গায়ে পেতে নেয়, প্রতিবাদ করবারও চেষ্টা করতে মুখে বাধে, ঠাকুরের 'পরে কুমুর আজ সেইরকম ভাব। যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি; যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সে'ই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বার বার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিণীর মন বলছে, তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে



কোন্ দাসীর হাটে—যে হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

মোতির মা যখন দুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করলে, কুমু বললে, "থাক্।"

মোতির মা বললে, "কেন, থাকবে কেন? আমার দুধের বাটির অপরাধ কী?"

কুমু বললে, "এখনো স্নান করি নি, পূজা করি নি।"

মোতির মা বললে, "যাও তুমি স্নান করতে, আমি অপেক্ষা করে থাকব।"

কুমু স্নান সেরে এল। মোতির মা ভাবলে এইবার সে খোলা ছাদের কোণটাতে গিয়ে বসবে। কুমু মুহূর্তের জন্যে অভ্যাসের টানে ছাদের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিল, গেল না, ফিরে আবার সেই মাটিতে এসে বসল। তার মন তৈরি ছিল না।

মোতির মাকে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "দাদার চিঠি কি আসে নি?"

চিঠি খুব সম্ভব এসেছে মনে করেই আজ খুব ভোরে মোতির মা নিজে লুকিয়ে আপিসঘরে গিয়ে চিঠির দেরাজটা টানতে গিয়ে দেখলে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।

মোতির মা বললে, "ঠিক বলতে তো পারি নে, খবর নিয়ে দেখব।"

এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত; বললে, "বউ, তোমাকে এমন শুকনো দেখি যে, অসুখ করে নি তো?"

কুমু বললে, "না।"

"বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে। আহা, তা তো হতেই পারে। তা তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।"

কুমু চমকে উঠে শ্যামার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "এ খবর তুমি কোথায় পেলে বকুলফুল?"

"ঐ শোনো! এ তো সবাই জানে। আমাদের রান্নাঘরের পার্বতী যে বললে, ওঁর বাপের বাড়ির সরকার এসেছিল রাজাবাহাদুরের কাছে, বউয়ের খবর নিতে। তার কাছে শুনেছে, চিকিৎসার জন্যে বউয়ের দাদা আজকালের মধ্যেই কলকাতায় আসছেন।"

কুমু উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তাঁর ব্যামো কি বেড়েছে?"

"তা বলতে পারি নে। তবে এমন কিছু ভাবনার কথা নেই, তা হলে শুনতুম।"

শ্যামা বুঝেছিল ওর দাদার খবর মধুসূদন কুমুকে দেয় নি, যে বউয়ের মন পায় নি, পাছে সে বাড়িমুখো হয়ে আরো অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কুমুর মনটাকে উসকিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুলফুল, চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরি হলে মুশকিল বাধবে।"

মোতির মা দুধের বাটিটা আর-একবার কুমুর কাছে এগিয়ে নিয়ে বললে, "দিদি, দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলো লক্ষ্মীটি।"

এবার কুমু দুধ খেতে আপত্তি করলে না।

মোতির মা কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাঁড়ারঘরে যাবে আজ?"

কুমু বললে, "আজ থাক্—গোপালকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করছে রাহুর মতো। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুগম্ভীর, এ তো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। ওর স্বামীর বয়স বেশি বলে



কুমুর কোনো আক্ষেপ ছিল না, কিন্তু সেই বয়স নিজের মর্যাদা ভুলেছে বলে তার এত পীড়া। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একটা ফলের মতো, আলো-হাওয়ায় মুক্তির মধ্যে যে পাকে, কাঁচা ফলকে জাঁতায় পিষলেই তো পাকে না। সময় পেলে না বলেই আজ ওদের সম্বন্ধ কুমুকে এমন করে মারছে, এত অপমান করছে। কোথায় পালাবে! মোতির মাকে ঐ যে বললে, গোপালকে ডেকে দাও, সে এই পালাবার পথ খোঁজা—বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাসবাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়।

একটা পাতলা তুলো-ভরা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে হাবলু সিঁড়ির দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। ওর মায়ের মতোই বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনিই জলভরা মেঘের মতো সরস শামলা রঙ, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।

কুমু উঠে গিয়ে সংকুচিত হাবলুকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরলে; বললে, "দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আস নি কেন?"

হাবলু কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললে, "জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি?"

কুমু তার গালে চুমু খেয়ে বললে, "মানিক এনেছ গোপাল।"

"আমার পকেটে আছে।"

"আচ্ছা তবে বের করো।"

"তুমি বলতে পারলে না।"

"আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারি নে, যা না দেখি তা আরো ভুল বুঝি।"

তখন হাবলু খুব আস্তে আস্তে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা পুঁটুলি বের করে কুমুর কোলের উপর রেখে দৌড়ে পালাবার উপক্রম করলে।

"না, তোমাকে পালাতে দেব না।"

পুঁটুলিটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হাবলু বললে, "তা হলে এখন দেখো না।"

"না ভয় নেই, তুমি চলে গেলে তখন খুলব।"

"আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেছ?"

"কী জানি, হয়তো দেখে থাকব, কিন্তু চিনতে সময় লাগে।"

"একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধের সময় চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে।"

"চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে!"

"ইচ্ছে করলেই সে খুব ছোট্টো হতে পারে, চোখে প্রায় দেখাই যায় না।"

"সেই মন্তরটা তার কাছে শিখে নিতে হবে তো।"

"কেন, জ্যাঠাইমা?"

"আমি যদি পালাবার জন্যে কয়লার ঘরে ঢুকি তবুও যে আমাকে দেখতে পাওয়া যায়।"

হাবলু এ কথাটার কোনো মানে বুঝতে পারলে না। বললে, "কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জান?"

"বোধ হয় জানি।"

"আচ্ছা, বলো দেখি।"

"ভোরবেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।"

হাবলু থমেক গেল। তাকে ভাবিয়ে দিলে। বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল। কিন্তু জ্যাঠাইমার কথাটা মনে হল বিশ্বাসযোগ্য, তাই কোনো বিরুদ্ধ তর্ক না তুলে



বললে, "যে মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের করে সিঁদুরটিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।"

"সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে নাকি?"

"সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছন্নু যখন সকালে কয়লা বের করতে যায়, রোজ খুদি সেইসঙ্গে যায়—ও একটুও ভয় করে না।"

"ও যে ছেলেমানুষ, তাই রাজরানী হতেও ভয় নেই।"

বাইরে ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল তাই হাবুলকে নিয়ে কুমু ঘরে গেল; সেখানে সোফায় বসে ওকে কোলে তুলে নিলে। পাশের তেপাইয়ে ছোটো রুপোর থালিতে ছিল শীতকালের ফুল—গাঁদা, কুন্দ, দোপাটি, জবা। প্রতিদিনের জোগানমত এই ফুলই মালীর তোলা। কুমু ছাদের কোণে বসে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে দেবতাকে উৎসর্গ করে দেবে বলে এরা অপেক্ষা করে আছে। আজ তার সেই অনিবেদিত ফুল থালাসুদ্ধ নিয়ে সে হাবলুর কাছে ধরল; বললে, "নেবে ফুল?"

"হাঁ, নেব।"

"কী করবে বলো তো?"

"পুজো-পুজো খেলব।"

কুমুর কোমরে একটা সিল্কের রুমাল গোঁজা ছিল, সেইটেতে ফুলগুলি বেঁধে দিয়ে ওকে চুমো খেয়ে বললে, "এই নাও।" মনে মনে ভাবলে, 'আমারও পুজো-পুজো খেলা হল।' বললে, "গোপাল, এর মধ্যে কোন্ ফুল তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে, বলো তো?"

হাবলু বললে, "জবা।"

"কেন জবা ভালো লাগে বলব?"

"বলো দেখি।"

"ও যে ভোর না হতেই জটাইবুড়ির সিঁদুরের কৌটো থেকে রঙ চুরি করেছে।"

হাবলু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে ভাবলে। হঠাৎ বলে উঠল, "জ্যাঠাইমা, জবাফুলের রঙ ঠিক তোমার শাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।" এইটুকুতে ওর মনের সব কথা বলা হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে দেখে মধুসূদন। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় নি। এখন অন্তঃপুরে আসবার সময় নয়। এই সময়টাতে বাইরের আপিসঘরে ব্যাবসাঘটিত কর্মের যত উচ্ছিষ্ট পরিশিষ্ট এসে জোটে; এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো খবর ও কাগজপত্র নিয়ে সেক্রেটারি আসে। আসল কাজের চেয়ে এই-সব উপরি-কাজের ভিড় কম নয়।

৩৯

যে ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেছে চাল জোটে নি, তারই মতো মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অতৃপ্তির আকর্ষণ বড়ো প্রচণ্ড। বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

ওকে দেখেই হাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল, বুক উঠল কেঁপে, পালাবার উপক্রম করলে। কুমু জোর করে চেপে ধরলে, উঠতে দিলে না।

সেটা মধুসূদন বুঝতে পারলে। হাবলুকে খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, "এখানে কী করছিস? পড়তে যাবি নে?"

গুরুমশায়ের আসবার সময় হয় নি এ কথা বলবার সাহস হাবলুর ছিল না—ধমকটাকে নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়ে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে উঠে চলল।

তাকে বাধা দেবার জন্যে উদ্যত হয়েই কুমু থেমে গেল। বললে, "তোমার ফুল ফেলে গেলে



যে, নেবে না?" বলে সেই রুমালের পুঁটুলিকা ওর সামনে তুলে ধরলে। হাবলু না নিয়ে ভয়ে ভয়ে তার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মধুসূদন ফস্ করে পুঁটুলিটা কুমুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ রুমালটা কার?"

মুহূর্তের মধ্যে কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল; বললে, "আমার।"

এ রুমালটা যে সম্পূর্ণই কুমুর, তাতে সন্দেহ নেই —অর্থাৎ বিবাহের পূর্বের সম্পত্তি। এতে রেশমের কাজ-করা যে পাড়টা সেটাও কুমুর নিজের রচনা।

ফুলগুলো বের করে মাটিতে ফেলে মধুসূদন রুমালটা পকেটে পুরলে; বললে, "এটা আমিই নিলুম—ছেলেমানুষ এ নিয়ে কী করবে? যা তুই।"

মধুসূদনের এই রূঢ়তায় কুমু একেবারে স্তম্ভিত। ব্যথিতমুখে হাবলু চলে গেল, কুমু কিছুই বললে না।

তার মুখের ভাব দেখে মধুসূদন বললে, "তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ রুমাল রইল আমারই, মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।"

মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু চোখ নিচু করে সোফার প্রান্তে নীরবে বসে রইল। শাড়ির লাল পাড় তার মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন করে নেমে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নেমেছে তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন করে আছে একগাছি সোনার হার। এই হারটি ওর মায়ের, তাই সর্বদা পরে থাকে। তখনো জামা পরে নি, ভিতরে কেবল একটি শেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে স্তব্ধ। অসিতকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ঐখানে যেন উদ্‌বেল। মধুসূদন নতনেত্রে অভিমানিনীকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, আর চোখ ফেরাতে পারলে না মোটা সোনার কাঁকন-পরা ঐ দুখানি হাতের থেকে। সোফায় ওর পাশে বসে একখানি হাত টেনে নিতে চেষ্টা করলে—অনুভব করলে বিশেষ একটা বাধা। কুমু হাত সরাতে চায় না—ওর হাত দিয়ে চাপা আছে একটা কাগজের মোড়ক।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করল, "ঐ কাগজে কী মোড়া আছে?"

"জানি নে।"

"জান না, তার মানে কী?"

"তার মানে আমি জানি নে।"

মধুসূদন কথাটা বিশ্বাস করলে না; বললে, "আমাকে দাও, আমি দেখি।"

কুমু বললে, "ও আমার গোপন জিনিস, দেখাতে পারব না।"

তীরের মতো তীক্ষ্ণ একটা রাগ এক মুহূর্তে মধুসূদনের মাথায় চড়ে উঠল। বললে, "কী! আস্পর্ধা তো কম নয়।" বলে জোর করে সেই কাগজের মোড়ক কেড়ে নিয়ে খুলে ফেললে—দেখে যে কিছুই নয়, কতকগুলি এলাচদানা। মাতার সস্তা ব্যবস্থায় হাবলুর জন্যে যে জলখাবার বরাদ্দ তার মধ্যে এইটেই বোধ করি সব চেয়ে হাবলুর পক্ষে লোভনীয়—তাই সে গর্ব করে মুড়ে এনেছিল।

মধুসূদন অবাক! ব্যাপারখানা কী। ভাবলে বাপের বাড়িতে এইরকম জলখাবারই কুমুর অভ্যস্ত—তাই লুকিয়ে আনিয়ে নিয়েছে, লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। মনে মনে হাসলে; ভাবলে, লক্ষ্মীর দান গ্রহণ করতে সময় লাগে। ধাঁ করে একটা প্ল্যান মাথায় এল। দ্রুত উঠে বাইরে গেল চলে।



কুমু তখন দেরাজ খুলে বের করলে তার একটি ছোটো চৌকো চন্দনকাঠের বাক্স, তার মধ্যে এলাচদানাগুলি রেখে তার দাদাকে চিঠি লিখতে বসল। দু-চার লাইন লেখা হতেই মধুসূদন ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতড়ি চিঠি চাপা দিয়ে কুমু শক্ত হয়ে বসল। মধুসূদনের হাতে রুপোয় সোনায় মিনের কাজ-করা হাতল-দেওয়া একটি ফলদানি, তার উপরে ফুলকাটা সুগন্ধি একটি রেশমের রুমাল। হাসিমুখে ডেস্কে সেটি কুমুর সামনে রাখলে। বললে, "খুলে দেখো তো।"

কুমু রুমালটা তুলে নিয়ে দেখে সেই দামী ফলদানিতে কানায়-কানায় ভরা এলাচদানা। যদি একলা থাকত হেসে উঠত। কোনো কথা না বলে কুমু গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল। এর চেয়ে হাসা ভালো ছিল। মধুসূদন বললে, "এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কি বলো! রোজ আনিয়ে দেব—কত চাও? আমাকে আগে বললে না কেন?"

কুমু বললে, "তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।"

"পারব না! অবাক করলে তুমি।"

"না, পারবে না।"

"অসম্ভব দাম নাকি এর।"

"হাঁ, টাকায় মেলে না।"

শুনেই মধুর মাথায় চট করে একটা সন্দেহ জাগল—বললে, "তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে কুমুর ইচ্ছে হল না। ফলদানিটা ঠেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মধুসূদন হাত ধরে আবার জোর করে তাকে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদনকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই কুমু তাকে প্রশ্ন করলে, "দাদার বাড়ি থেকে তোমার কাছে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে।"

এ কথাটা কুমু আগেই শুনে ফেলেছে জেনে মধুর মন ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, "সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেছি।" বলা বাহুল্য এটা মিথ্যে কথা।

"দাদা কবে আসবেন?"

"হপ্তাখানেকের মধ্যে।"

মধু নিশ্চিত জানত কালই বিপ্রদাস আসবে, 'হপ্তাখানেক' কথাটা ব্যবহার করে খবরটাকে অনির্দিষ্ট করে রেখে দিলে।

"দাদার শরীর কি আরো খারাপ হয়েছে?"

"না, তেমন কিছু তো শুনলুম না।"

এ কথাটা মধ্যেও একটুখানি পাশ-কাটানো ছিল। বিপ্রদাস চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আসছে—তার অর্থ, শরীর অন্তত ভালো নেই।

"দাদার চিঠি কি এসেছে?"

"চিঠির বাক্স তো এখনো খুলি নি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।"

কুমু মধুসূদনের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে নি, সুতরাং এ কথাটাও মেনে নিলে।

"দাদার চিঠি এসেছে কি না একবার খোঁজ করবে কি?"

"যদি এসে থাকে, খাওয়ার পরে দুপুরবেলা নিজেই নিয়ে আসব।"

কুমু অধৈর্য দমন করে নীরবে সম্মত হল। তখন আর-একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে



নেবার উপক্রম করছে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই বলে উঠল, "ওমা, ঠাকুরপো যে!" বলেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত।

মধুসূদন বললে, "কেন, কী চাই তোমার?"

"বউকে ভাঁড়ারে ডাকতে এসেছি। রাজরানী হলেও ঘরের লক্ষ্মী তো বটে; তা আজ না-হয় থাক।" মধুসূদন সোফা থেকে উঠে কোনো কথা না বলে দ্রুত বাইরে চলে গেল।

আহারের পর যথারীতি শোবার ঘরের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে মধুসূদন কুমুকে ডেকে পাঠালে। তাড়াতাড়ি কুমু চলে এল। সে জানে আজ দাদার চিঠি পাবে। শোবার ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন গুড়গুড়ির নলটা রেখে পাশে দেখিয়ে দিলে বললে, "বোসো।"

কুমু বসল। মধুসূদন তাকে যে চিঠি দিলে তাতে কেবল এই কয়টি কথা আছে--

প্রাণপ্রতিমাসু

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু

চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি। সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্মের অবকাশমত মাঝে মাঝে কুশলসংবাদ দিলে নিরুদ্‌বিগ্ন হই।

এই ছোটো চিঠিটুকু মাত্র পেয়ে কুমুর মনে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগল। মনে মনে বললে, 'পর হয়ে গেছি।" অভিমানটা প্রবল হতে না হতেই মনে এল, 'দাদার হয়তো শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোটো মন! নিজের কথাটাই সব-আগে মনে পড়ে।'

মধুসূদন বুঝতে পারলে কুমু উঠি-উঠি করছে; বললে, "যাচ্ছ কোথায়, একটু বোসো।"

কুমুকে তো বসতে বললে, কিন্তু কী কথা বলবে মাথায় আসে না। অবিলম্বে কিছু বলতেই হবে, তাই সকাল থেকে যে কথাটা নিয়ে ওর মনে খটকা রয়েছে সেইটেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললে, "সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত হাঙ্গামা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিল?"

"ও আমার গোপন কথা।"

"গোপন কথা! আমার কাছেও বলা চলে না?"

"না।"

মধুসূদনের গলা কড়া হয়ে এল, বললে, "এ তোমাদের নুরনগরি চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসল, "ঐ চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি তা হলে আমার নাম মধুসূদন না।"

"কী তোমার হুকুম, বলো।"

"সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বলো।"

"হাবলু।"

"হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন?"

"ঠিক বলতে পারি নে।"

"আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

"ঐ পর্যন্তই; আর কোনো কথা নেই।"

"তবে এত লুকোচুরি কেন?"



"তুমি বুঝতে পারবে না।"

কুমুর হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে মধু বললে, "অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি।"

কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল, শান্ত স্বরে বললে, "কী চাও তুমি, বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই সে কথা মানি।"

মধুসূদনের কপালের শিরদুটো ফুলে উঠল। কোনো জবাব ভেবে না পেয়ে ইচ্ছে হল ওকে মারে। এমন সময় বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি শোনা গেল, সেইসঙ্গে আওয়াজ এল "আপিসের সায়েব এসে বসে আছে।" মনে পড়ল আজ ডাইরেক্টরদের মীটিং। লজ্জিত হল যে সে এজন্যে প্রস্তুত হয় নি— সকালটা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেছে। এতবড়ো শৈথিল্য এতই ওর স্বভাব ও অভ্যাস বিরুদ্ধে যে, এটা সম্ভব হল দেখে ও নিজে স্তম্ভিত।

৪০

মধুসূদন চলে যেতেই কুমু খাট থেকে নেমে মেজেব উপর বসে পড়ল। চিরজীবন ধরে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই? মধুসূদন ঠিকই বলেছে ওদের সঙ্গে তার চাল তফাত। আর সকল রকম তফাতের চেয়ে এইটেই দুঃসহ। কী উপায় আছে এর?

এক সময়ে হঠাৎ কী মনে পড়ল, কুমু চলল নীচের তলায় মোতির মার ঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখে শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠে আসছে।

"কী বউ, চলেছ কোথায়? আমি যাচ্ছিলুম তোমার ঘরেই।"

"কোনো কথা আছে?"

"এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে জানি, নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কী রকম করে বনিয়ে চলতে হয়, সে পরামর্শ আমারই দিতে পারি। বকুলফুলের ঘরে চলেছ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।"

আজ হঠাৎ কুমুর মনে হল শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া এক কুমোরের চাকে। কেন এ কথা মাথায় এল বলা শক্ত। চরিত্র বিশ্লেষণ করে কিছু বুঝেছে তা নয়, আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও নয়, তবু দুজনের ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে, যেন শ্যামাসুন্দরীর জগতে আর মধুসূদনের জগতে একই হাওয়া। শ্যামাসুন্দরী যখন বন্ধুত্ব করতে আসে তাও কুমুকে উলটো দিকে ঠেলা দেয়, গা কেমন করে ওঠে।

মোতির মার শোবার ঘরে ঢুকেই কুমু দেখলে নবীনে তাতে মিলে কী একটা নিয়ে হাত-কাড়াকাড়ি চলছে। ফিরে যাবে যাবে মনে করছে, এমন সময় নবীন বলে উঠল, "বউদিদি, যেয়ো না যেয়ো না। তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম, নালিশ আছে।"

"কিসের নালিশ?"

"একটু বোসো, দুঃখের কথা বলি।"

তক্তপোশের উপব কুমু বসল।

নবীন বললে, "বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই রেখেছেন লুকিয়ে।"

"এমন শাসন কেন।"

"ঈর্ষা—যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী-জাতির এডুকেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হওয়াতে ওঁর আক্রোশ। অনেক পরে বোঝালেম যে, এতবড়ো যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের



পিছনে পিছনেই চলতেন, বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি যে তোমার চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে এগিয়ে চলছি এতে বাধা দিয়ো না।"

"তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না বলছি।"

নবীনের মহা বিপদের ভান করা মুখভঙ্গি দেখে কুমু খিল খিল করে হেসে উঠল। এ বাড়িতে এসে অবধি এমন মন খুলে হাসি এই ওর প্রথম। এই হাসি নবীনের বড়ো মিষ্টি লাগল। সে মনে মনে বললে, 'এই আমার কাজ হল, আমি বউরানীকে হাসাব।'

কুমু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে , "কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেছ?"

"দেখো তো দিদি, শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালার গুরুমশায় বসে আছেন? খেটেখুটে রাত্তিরে ঘরে এসে দেখি একটা পিদ্দিম জ্বলছে, তার সঙ্গে আর-একটা বাতির শেজ, মহাপণ্ডিত পড়তে বসে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁশ নেই।"

"সত্যি ঠাকুরপো?"

"বউরানী, খাবার ভালোবাসি নে এতবড়ো তপস্বী নই, কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেইজন্যেই ইচ্ছে করে খেতে দেরি হয়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে।"

"ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।"

"আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।"

"তাও কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?"

"দুটো একটা খুব তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হলে। অশ্রুজলের উজ্জ্বল অক্ষরে মনে লেখা রয়েছে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেছেন।"

"ঘরের লোকের নামে তো পুলিস-কেস করতে পারি নে, তাই চোরকে চুরি দিয়ে শাসন করতে হয়। আগে দাও আমার বই।"

"তোমাকে দেব না, দিদিকে দিচ্ছি।" ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম-পশম, টুকরা কাপড়, ছেঁড়া মোজা জমে ছিল; তারই তলা থেকে একখানা ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বের করে মোতির মা কুমুর কোলের উপর রেখে বললে, "তোমার ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ওঁকে দিয়ো না; দেখি তোমার সঙ্গে কী রকম রাগারাগি করেন।"

নবীন মশারির চালের উপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে কুমুর হাতে দিয়ে বললে, "আর কাউকে দিয়ো না বউদিদি, দেখব আর কেউ তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেন।"

কুমু বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, "এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর শখ?"

"ওর শখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেছেন।"

"নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়ি নে, অতএব এতে লজ্জার কারণ কিছু নেই।"

"দিদি, তোমার কী একটা কথা বলবার আছে। চাও তো, এই বাচালটিকে এখনই বিদায় করে দিই।"

"না, তার দরকার নেই। আমার দাদা দুই-একদিনের মধ্যে আসবেন শুনেছি।"

নবীন বললে, "হা, তিনি কালই আসবেন।"

"কাল!" বিস্মিত হয়ে কুমু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিশ্বাস ফেলে বললে, "কী করে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি বড়োঠাকুরকে কিছু বল নি?"



কুমু মাথা নেড়ে জানালে যে, না।

নবীন বললে, "একবার বলে দেখবে না?"

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদনের কাছে দাদার কথা বলা বড়ো কঠিন। দাদার প্রতি অপমান ওর ঘরের মধ্যে উদ্যত; তাকে একটুও নাড়া দিতে ওর অসহ্য সংকোচ।

কুমুর মুখের ভাব দেখে নবীনের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, "ভাবনা কোরো না বউদিদি, আমরা সব ঠিক করে দেব, তোমাকে কিছু বলতে কইতে হবে না।"

দাদার কাছে নবীনের শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একটা ভীরুতা আছে। বউদিদি এসে আজ সেই ভয়টা ওর মন থেকে ভাঙালে বুঝি!

কুমু চলে গেলে মোতির মা নবীনকে বললে, "কী উপায় করবে বলো দেখি? সেদিন রাত্রে তোমার দাদা যখন আমাদের ডেকে নিয়ে এসে বউয়ের কাছে নিজেকে খাটো করলেন তখনই বুঝিছিলুম সুবিধে হল না। তার পর থেকে তোমাকে দেখলেই তো মুখ ফিরিয়ে চলে যান।"

"দাদা বুঝেছেন যে, ঠকা হল; ঝোঁকের মাথায় থলি উজাড় করে আগাম দাম দেওয়া হয়ে গেছে, এদিকে ওজনমত জিনিস মিলল না। আমরা ওঁর বোকামির সাক্ষী ছিলুম তাই আমাদের সইতে পারছেন না।"

মোতির মা বললে, "তা হোক, কিন্তু বিপ্রদাসবাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে বসেছে, দিনে দিনে বেড়েই চলল। এ কী অনাছিষ্টি বলো দিকি!"

নবীন বললে, "ও-মানুষের ভক্তির প্রকাশ ঐরকমই; এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে। কেউ কেউ বলে রামের প্রতি রাবণের অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাই বিশ হাত দিয়ে নৈবেদ্য চালাত। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি দাদার সঙ্গে বউরানীর দেখাসাক্ষাৎ সহজে হবে না।"

"তা বললে চলবে না, কিছু উপায় করতেই হবে।"

"উপায় মাথায় এসেছে।"

"কী বলো দেখি।"

"বলতে পারব না।"

"কেন বলো তো?"

"লজ্জা বোধ করছি।"

"আমাকেও লজ্জা?"

"তোমাকেই লজ্জা।"

"কারণটা শুনি?"

"দাদাকে ঠকাতে হবে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।"

"যাকে ভালোবাসি তার জন্যে ঠকাতে একটু সংকোচ করি নে।"

"ঠকানো বিদ্যেয় আমার উপরই দিয়েই হাত পাকিয়েছ বুঝি?"

"ও-বিদ্যে সহজে খাটাবার উপযুক্ত এমন মানুষ পাব কোথায়?"

"ঠাকরুন, রাজিনামা লিখে-পড়ে দিচ্ছি, যখন খুশি ঠকিয়ো।"

"এত ফুর্তি কেন শুনি?"

"বলব? বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে-সব উপায় দিয়েছেন তাতে মধু দিয়েছেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানোকেই বলে মায়া।"

"সেটা তো কাটানোই ভালো।"



সর্বনাশ! মায়া গেলে সংসারে রইল কী? মূর্তির রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড়মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে নেশা জাগাও, যা খুশি করো।"

এর পরে যা কথাবার্তা চলল সে একেবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

৪১

মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ পর্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনো টলায় নি। নিজের 'পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি ওর সহযোগীদেরও তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা করে নেবার আগেই কাজ অনেকদূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠিওয়ালা একটা পত্তনি তালুক ওদের নীলের কারবারের শামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত করছিল। এ নিয়ে খরচপত্রও হয়ে গেছে। প্রায় সমস্তই ঠিকঠাক; দলিল স্ট্যাম্পে চড়িয়ে রেজেস্টারি করে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা; যে-সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হয়েছে; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো ট্রেজারারের পদ খালি হওয়াতে সম্পর্কীয় একটি জামাতার জন্য উমেদারী চলেছিল, অযোগ্য-উদ্ধারণে উৎসাহ না থাকাতে মধুসূদন কান দেয় নি। সেই ব্যাপারটা বীজের মতো চাপা থেকে হঠাৎ বিরুদ্ধতার আকারে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। একটু ছিদ্রও ছিল। তালুকের মালেক মধুসূদনের দূরসম্পর্কীয় পিসির ভাশুরপো। পিসি যখন হাতে পায়ে এসে ধরে তখন ও হিসেব করে দেখলে নেহাত সস্তায় পাওয়া যাবে, মুনফাও আছে, তার উপরে আত্মীয়দের কাছে মুরুব্বিয়ানা করবার গৌরব। যাঁর অযোগ্য জামাই ট্রেজারার পদ থেকে বঞ্চিত তিনিই মধুসূদনের স্বজনবাৎসল্যের প্রমাণ বহু সন্ধানে আবিষ্কার ও যথাস্থানে প্রচার করেছেন। তা ছাড়া কোম্পানির সকল রকম কেনাবেচায় মধুসূদন যে গোপনে কমিশন নিয়ে থাকেন, এই মিথ্যা সন্দেহ কানে কানে সঞ্চারিত করবার ভারও তিনিই নিয়েছিলেন। এ-সকল নিন্দার প্রমাণ অধিকাংশ লোক দাবি করে না, কারণ তাদের নিজের ভিতরে যে লোভ আছে সেই হচ্ছে অন্তরতম ও প্রবলতম সাক্ষী। লোকের মনকে বিগড়িয়ে দেওয়া একটা কারণে সহজ ছিল, সে কারণ হচ্ছে মধুসূদনের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি, এবং তার খাঁটি চরিত্রের অসহ্য সুখ্যাতি। মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায় এই অপবাদে সেই লোলুপরা পরম শান্তি পেল, গভীর জলে ডুব দেবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের মনটা পানকৌড়ি-বিশেষ অথচ হাতের কাছে যাদের জলাশয় নেই।

মালেককে মধুসূদন পাকা কথা দিয়েছিল। ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ করবার লোক সে নয়। তাই নিজে কিনবে ঠিক করেছে, আর পণ করেছে কোম্পানিকে দেখিয়ে দেবে, না কিনে তারা ঠকল।

মধুসূদন বিলম্বে বাড়ি ফিরে এল। নিজের ভাগ্যের প্রতি মধুসূদনের অন্ধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আজ তার ভয় লাগল যে, জীবনযাত্রার গাড়িটাকে অদৃষ্ট এক পর্যায়ের লাইন থেকে আর-এক পর্যায়ের লাইনে চালান করে দিচ্ছে বা। প্রথম ঝাঁকানিতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। মীটিং থেকে ফিরে এসে আপিসঘরে কেদাবা হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির ধূমকুণ্ডলের সঙ্গে নিজের কালো রঙের চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত করতে লাগল।

নবীন এসে খবর দিলে বিপ্রদাসের বাড়ি থেকে লোক এসেছে দেখা করতে। মধুসূদন ঝেঁকে উঠে বললে, "যেতে বলে দাও, আমার এখন সময় নাই।"

নবীন মধুসূদনের ভাবগতিক দেখে বুঝলে মীটিঙে একটা অপঘাত ঘটেছে। বুঝলে দাদার মন



এখন দুর্বল। দৌর্বল্য স্বভাবত অনুদার, দুর্বলের আত্মগরিমা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার রূপ ধরে। দাদার আহত মন বউরানীকে কঠিনভাবে আঘাত করতে চাইবে এতে নবীনের সন্দেহমাত্র ছিল না। এ আঘাত যে করেই হোক ঠেকাতেই হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত ওর মনে দ্বিধা ছিল, সে দ্বিধা সম্পূর্ণ গেল কেটে। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে এসে দেখলে ওর দাদা ঠিকানাওয়ালা নামের ফর্দর খাতা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে। নবীন এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন মুখ তুলে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কিসের দরকার? তোমাদের বিপ্রদাসবাবুর মোক্তারি করতে এসেছ বুঝি?"

নবীন বললে, "না দাদা, সে ভয় নাই। ওদের লোকটা এমন তাড়া খেয়ে গেছে যে তুমি নিজেও যদি ডেকে পাঠাও তবু সে এ-বাড়িমুখো হবে না।"

এ কথাটাও মধুসূদনের সহ্য হল না। বলে উঠল, "কড়ে আঙুলটা নাড়লেই পায়ের কাছে এসে পড়তে হবে। লোকটা এসেছিল কী করতে?"

"তোমাকে খবর দিতে যে বিপ্রদাসবাবুর কলকাতা আসা দুদিন পিছিয়ে গেল। শরীর আর-একটু সেরে তবে আসবেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্য আমার তাড়া নেই।"

নবীন বললে, "দাদা, কাল সকালে ঘন্টা দুয়ের জন্যে ছুটি চাই।"

"কেন?"

"শুনলে তুমি রাগ করবে।"

"না শুনলে আরো রাগ করব।"

"কুম্ভকোনাম থেকে এক জ্যোতিষী এসেছেন তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।"

মধুসূদনের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল, ইচ্ছে করল এখনই ছুটে তার কাছে যায়। মুখে তর্জন করে বললে, "তুমি বিশ্বাস কর?"

"সহজ অবস্থায় করি নে, ভয় লাগলেই করি।"

"ভয়টা কিসের শুনি?"

নবীন কোনো জবাব না করে মাথা চুলকোতে লাগল।

"ভয়টা কাকে বলোই-না।"

"এ সংসারে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করি নে। কিছুদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে মন সুস্থির হচ্ছে না।"

সংসারের লোক মধুসূদনকে বাঘের মতো ভয় করে এইটেতে তার ভারি তৃপ্তি। নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে সে গুড়গুড়ি টানতে টানতে নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করতে লাগল।

নবীন বললে, "তাই একবার স্পষ্ট করে জানতে চাই গ্রহ কী করতে চান আমাকে নিয়ে। আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন নাগাত।"

"তোমার মতো নাস্তিক, তুমি কিছু বিশ্বাস কর না, শেষকালে—"

"দেবতার 'পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না দাদা। ডাক্তারকে যে মানে না হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।"

নিজের গ্রহকে যাচাই করে নেবার জন্যে মধুসূদনের যে পরিমাণ আগ্রহ হল, সেই পরিমাণ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "লেখাপড়া শিখে বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে? যে যা বলে তাই বিশ্বাস কর?"

"লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েছে— যেখানে যে কেউ যে কোনো কালে জন্মেছে,



জন্মাবে, সকলের কুষ্ঠি একেবারে তৈরি, সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এর উপর তো আর কথা চলে না। হাতে হাতে পরীক্ষা করে দেখে নাও।''

''বোকা ভুলিয়ে যারা খায় বিধাতা তাদের পেট ভরাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদের মতো বোকাও সৃষ্টি করে রাখেন।''

''আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও সৃষ্টি করেন। যে মারে তার উপরে তাঁর যেমন দয়া, যাকে মারে তার উপরেও তেমনি। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চালিয়ে দেখোই-না।''

''আচ্ছা, বেশ, কাল সকালেই আমাকে নিয়ে যেয়ো, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।''

''তোমার যেরকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় গোল হয়ে যেতে পারে। সংসারে দেখা যায় মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। গ্রহদেরও ঠিক সেই দশা, দেখো-না কেন সাহেবগুলো গ্রহ মানে না বলে গ্রহের ফল ওদের উপর খাটে না। সেদিন তেরোস্পর্শে বেরিয়ে তোমাদের ছোটোসাহেব ঘোড়দৌড় বাজি জিতে এল— আমি হলে বাজি জেতা দুরস্তাং ঘোড়াটা ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেত। দাদা, এই-সব গ্রহনক্ষত্রের হিসেবের উপর তোমাদের বুদ্ধিখাটাতে যেয়ো না, একটু বিশ্বাস মনে রেখো।''

মধুসূদন খুশি হয়ে স্মিতহাস্যে গুড়গুড়িতে মনোযোগ দিলে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে মধুসূদন নবীনের সঙ্গে এক সরু গলির আবর্জনার ভিতর দিয়ে বেঙ্কট শাস্ত্রীর বাসায় গিয়া উপস্থিত। অন্ধকার একতলার ভাপ্‌সা ঘর; লোনাধরা দেয়াল ক্ষতবিক্ষত, যেন সাংঘাতিক চর্মরোগ আক্রান্ত, তক্তপোশের উপর ছিন্ন মলিন একখানা শতরঞ্চ, এক প্রান্তে কতকগুলো পুঁথি এলোমেলো জড়োকরা, দেয়ালের গায়ে শিবপার্বতীর এক পট। নবীন হাঁক দিলে, ''শাস্ত্রীজি।'' ময়লা ছিটের বালাপোশ গায়ে, সামনের মাথা কামানো, ঝুটিওয়ালা, কালো বেঁটে রোগা এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকলো; নবীন তাকে ঘটা করে প্রণাম করলে। চেহারা দেখে মধুসূদনের একটুও ভক্তি হয় নি— কিন্তু দৈবের সঙ্গে দৈবজ্ঞের কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আধাআধি রকম অভিবাদন সেরে নিলে। নবীন মধুসূদনের একটি ঠিকুজি জ্যোতিষীর সামনে ধরতেই সেটা অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রী মধুসূদনের হাত দেখতে চাইলে। কাঠের বাক্স থেকে কাগজ-কলম বের করে নিয়ে নিজে একটা চক্র তৈরি করে নিলে। মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, ''পঞ্চম বর্গ।'' মধুসূদন কিছুই বুঝলে না। জ্যোতিষী আঙুলের পর্ব গুনতে গুনতে আউড়ে গেল, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এতেও মধুসূদনের বুদ্ধি খোলসা হল না। জ্যোতিষী বললে, ''পঞ্চম বর্ণ। '' মধুসূদন ধৈর্য ধরে চুপ করে রইল। জ্যোতিষী আওড়াল, প, ফ, ব, ভ, ম। মধুসুদন এর থেকেই এইটুকু বুঝলে যে, ভৃগুমুনি, ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকেই তার সংহিতা শুরু করেছেন। এমন সময় বেঙ্কট শাস্ত্রী বলে উঠল, ''পঞ্চাক্ষরকং।''

নবীন চকিত হয়ে মধুসূদন কাছে চুপি চুপি বললে, ''বুঝেছি দাদা।''

''কী বুঝলে?''

''পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তার পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্ম-গ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় মিলেছে।''

মধুসূদন স্তম্ভিত। বাপ মায়ে নাম রাখবার কত হাজার বছর আগেই নামকরণ ভৃগুমুনির খাতায়! নক্ষত্রদের এ কী কাণ্ড! তার পরে হতবুদ্ধি হয়ে শুনে গেল ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভাষা যত কম বুঝলে, ভক্তি ততই বেড়ে উঠলে। জীবনটা আগাগোড়া



ঋষিবাক্য মূর্তিমান। নিজের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে, দেহটা অনুস্বার-বিসর্গ-তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মসলা দিয়ে তৈরি কোন্‌ তপোবনে লেখা একটা পুঁথির মতো। তার পর দৈবজ্ঞের শেষ কথাটা এই যে, মধুসূদনের ঘরে একদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে বলে পূর্ব হতেই ঘরে অভাবনীয় সৌভাগ্যের সূচনা। অল্পদিন হল তিনি এসেছেন নববধূকে আশ্রয় করে। এখন থেকে সাবধান। কেননা ইনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবে।

বেঙ্কট শাস্ত্রী বললে, কোপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। জাতক যদি এখনো সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে। মধুসূদন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। মনে পড়ে গেল বিবাহের দিনই প্রকাণ্ড সেই মুনাফার খবর; আর তার কয়দিনের মধ্যেই এই পরাভব। লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন সেটা সৌভাগ্য, কিন্তু তার দায়িত্বটা কম ভয়ংঙ্কর নয়।

ফেরবার সময় মধুসূদন গাড়িতে স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। এক সময় নবীন বলে উঠল, "ঐ বেঙ্কট শাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করি নে; নিশ্চয় ও কারও কাছ থেকে তোমার সমস্ত খবর পেয়েছে।"

"ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে আগেভাগে তার খবর নিয়ে রেখে দিচ্ছে; সোজা কথা কিনা!"

"মানুষ জন্মাবার আগেই তার কোটি কোটি কুষ্ঠি লেখার চেয়ে এটা অনেক সোজা! ভৃগুমুনি এত কাগজ পাবেন কোথায়, আর বেঙ্কট স্বামীর ঐ ঘরে এত জায়গা হবে কেমন করে?"

"এক আঁচড়ে হাজারটা কথা লিখতে জানতেন তাঁরা।"

"অসম্ভব।"

"যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স! এখন তর্ক রেখে দাও, সেদিন ওদের বাড়ি থেকে যে সরকার এসেছিল, তাকে তুমি নিজে গিয়ে ডেকে এনো। আজই, দেরি কোরো না।"

দাদাকে ঠকিয়ে নবীনের মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। ফন্দিটা এত সহজ, এর সফলতাটা দাদার পক্ষে এত হাস্যকর যে, তারই অমর্যাদায় ওকে লজ্জা ও কষ্ট দিলে। দাদাকে উপস্থিতমত ছোটো অনেক ফাঁকি অনেকবার দিতে হয়েছে, কিছু মনে হয় নি; কিন্তু এত করে সাজিয়ে এতবড়ো ফাঁকি গড়ে তোলার গ্লানি ওর চিত্তকে অশুচি করে রেখে দিলে।

৪২

মধুসূদনের মন থেকে মস্ত একটা ভার গেল নেমে, আত্মগৌরবের ভার—যে কঠোর গৌরব-বোধ ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাথর-চাপা দিয়েছে। কুমুর প্রতি ওর মন যখন মুগ্ধ তখনো সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে চলেছিল লড়াই। যতই অনন্যগতি হয়ে কুমুর কাছে ধরা দিয়েছে, ততই নিজের অগোচরে কুমুর 'পরে ওর ক্রোধ জমেছে। এমন সময় স্বয়ং নক্ষত্রদের কাছ থেকে যখন আদেশ এল যে, লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে, তাঁকে খুশি করতে হবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে ওর দেহমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল; বার বার আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগল— লক্ষ্মী, আমারই ঘরে লক্ষ্মী, আমার ভাগ্যের পরম দান। ইচ্ছে করতে লাগল—এখনই সমস্ত সংকোচ ভাসিয়ে দিয়ে কুমুর কাছে স্তুতি জানিয়ে আসে, বলে আসে, 'যদি কোনো ভুল করে থাকি, অপরাধ নিয়ো না।' কিন্তু আজ আর সময় নেই, ব্যবসায়ের ভাঙন সারবার কাজে এখনই আপিসে ছুটতে হবে, বাড়িতে খেয়ে যাবার অবকাশ পর্যন্ত জুটল না।

এ দিকে সমস্তদিন কুমুর মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে। সে জানে কাল দাদা আসবেন,



শরীর তাঁর অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাটা সহজ হবে কি না নিশ্চিত জানবার জন্যে মন উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে। নবীন কোথায় কাজে গেছে, এখনো এল না। সে নিঃসন্দেহ জানত আজ স্বয়ং মধুসূদন এসে বউরানীকে সকল রকমে প্রসন্ন করবে; আগেভাগে কোনো আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না।

আজ ছাতে বসবার সুবিধা ছিল না। কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ করে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি শুরু হল। শীতকালের বাদলা, অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রঙ নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মনমরা, সূর্যলোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত। সিঁড়ি থেকে উঠেই শোবার ঘরে ঢোকবার পথে যে ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে কুমু মাটিতে বসে। থেকে থেকে গায়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। আজ এই ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হল, তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেছে, তারই ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটুমাত্র ফাঁক নেই। যে দেবতা ওকে ভুলিয়ে আজ এই নিরুপায় নৈরাশ্যের মধ্যে এনে ফেললে তার উপরে যে অভিমান ওর মনে ধোঁয়াচ্ছিল আজ সেটা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠল। হঠাৎ দ্রুত উঠে পড়ল। ডেস্ক খুলে বের করলে সেই যুগলরূপে পট। রঙিন রেশমের ছিট দিয়ে সেটা মোড়া।

সেই পট আজ ও নষ্ট করে ফেলতে চায়। যেন চীৎকার করে বলতে চায়, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি নে। হাত কাঁপছে, তাই গ্রন্থি খুলতে পারছে না; টানাটানিতে সেটা আরো আঁট হয়ে উঠল, অধীর হয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে। অমনি চিরপরিচিত সেই মূর্তি অনাবৃত হতেই আর সে থাকতে পারলে না; তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠল। কাঠের ফ্রেম বুকে যত বাজে ততই আরো বেশি চেপে ধরে।

এমন সময়ে শোবার ঘরে এল মুরলী বেহারা বিছানা করতে। শীতে কাঁপছে তার হাত। গায়ে একখানা জীর্ণ ময়লা র‍্যাপার। মাথায় টাক, বগ টেপা, গাল বসা, কিছুকালের না-কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। অনতিকাল পূর্বেই সে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল, শরীরে রক্ত নেই বললেই হয়, ডাক্তার বলেছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে যেতে, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি।

কুমু বললে, "শীত করছে মুরলী?"

"হাঁ মা, বাদল করে ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"গরম কাপড় নেই তোমার?"

"খেতাব পাবার দিনে মহারাজা দিয়েছিলেন, নাতির খাঁসির বেমারি হতেই ডাক্তারের কথায় তাকে দিয়েছি মা।"

কুমু একটি পুরোনো ছাই রঙের আলোয়ান পাশের ঘরের আলমারি থেকে বের করে এনে বললে, "আমার এই কাপড়টি তোমাকে দিলুম।"

মুরলী গড় হয়ে বললে, "মাপ করো মা, মহারাজা রাগ করবেন।"

কুমুর মনে পড়ে গেল, এ বাড়িতে দয়া করবার পথ সংকীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের জন্যেও যে ওর দয়া চাই, পুণ্যকর্ম তারই পথ। কুমু ক্ষোভের সঙ্গে আলোয়ানটা মাটিতে ফেলে দিলে।

মুরলী হাত জোড় করে বললে, "রানীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ করো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।"

কুমু বললে, "মুরলী, নবীন ঠাকুরপো যদি বাড়ি এসে থাকেন তাঁকে ডেকে দাও।"



নবীন ঘরে ঢুকতেই কুমু বললে, "ঠাকুরপো, তোমাকে একটি কাজ করতেই হবে। বলো, করবে?"

"নিজের অনিষ্ট যদি হয় এখনই করব, কিন্তু তোমার অনিষ্ট হলে কিছুতেই করব না।"

"আমার আর কত অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করি নে।" বলে নিজের হাত থেকে মোটা সোনার বালাজোড়া খুলে বললে, "আমায় এই বালা বেচে দাদার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করাতে হবে।"

"কিছু দরকার হবে না, বউরানী, তুমি তাঁকে যে ভক্তি করো তারই পুণ্যে প্রতিমুহূর্তে তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন হচ্ছে।"

"ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই করতে পারব না। কেবল যদি পারি দেবতার দ্বারে তাঁর জন্যে সেবা পৌঁছিয়ে দেব।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না, বউরানী। আমরা সেবক আছি কী করতে?"

"তোমরা কী করতে পার বলো?"

"আমরা পাপিষ্ঠ, পাপ করতে পারি। তাই করেও যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তা হলে ধন্য হব।"

"ঠাকুরপো, এ কথা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।"

"একটুও ঠাট্টা নয়। পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা অনেক শক্ত কাজ, দেবতা যদি তা বুঝতে পারেন তা হলে পুরস্কার দেবেন।"

নবীনের কথার ভাবে দেবতার প্রতি উপেক্ষা কল্পনা করে কুমুর মনে স্বভাবত আঘাত লাগতে পারত, কিন্তু তার দাদাও যে মনে মনে দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, এই অভক্তির 'পরে সে রাগ করতে পারে না যে। ছোটো ছেলের দুষ্টুমির 'পরেও মায়ের যেমন সকৌতুক স্নেহ, এইরকম অপরাধের 'পরে ওরও সেই ভাব

কুমু একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, "ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার; আমাদের যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমাদের কী দয়া করবার কোথাও কেউ নেই?"

নবীনের চোখ জলে ভেসে উঠল।

"দাদাকে উদ্দেশ্য করে আমাকে কিছু করতেই হবে ঠাকুরপো, কিছু দিতেই হবে। এই বালা আমার মায়ের, সেই আমার মায়ের হয়েই এ বালা আমার দেবতাকে আমি দেব।"

"দেবতাকে হাতে করে দিতে হয় না বউরানী, তিনি এমনি নিয়েছেন। দুদিন অপেক্ষা করো, যদি দেখ তিনি প্রসন্ন হন নি, তা হলে যা বলবে তাই করব। যে দেবতাকে তোমাকে দয়া করেন না তাঁকেও ভোগ দিয়ে আসব।"

রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল—বাইরে সিঁড়িতে ঐ সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। নবীন চমকে উঠল, বুঝলে দাদা আসছে। পালিয়ে গেল না, সাহস করে দাদার জন্যে অপেক্ষা করেই রইল। এ দিকে কুমুর মন এক মুহূর্তে নিরতিশয় সংকুচিত হয়ে উঠল। এই অদৃশ্য বিরোধের ধাক্কাটা এমন প্রবল বেগে যখন তার প্রত্যেক নাড়িকে চমকিয়ে তুললে বড়ো ভয় হল। এ পাপ কেন তাকে এত দুর্জয় বলে পেয়ে বসছে?

হঠাৎ কুমু নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, কাউকে জান যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারেন?"

"কী হবে বউরানী?"



"নিজের মনকে নিয়ে যে পেরে উঠছি নে।"

"সে তোমার মনের দোষ নয়।"

"বিপদটা বাইরের, দোষটা মনের, দাদার কাছে এই কথা বার বার শুনেছি।"

"তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন— ভয় কোরো না।"

"সেদিন আমার আর আসবে না।"

মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে তার ভালোবাসার আপস হয়ে যেতেই সেই ভালোবাসা মধুসূদনের সমস্ত কাজকর্মের উপর দিয়েই যেন উপছে বয়ে যেতে লাগল। কুমুর সুন্দর মুখে তার ভাগ্যের বরাভয় দান। পরাভবটি কেটে যাবে আজই পেল তার আভাস। কাল যারা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল আজ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সুর ফিরিয়ে ওকে চিঠি লিখেছে। মধুসূদন যেই তালুকটা নিজের নামে কিনে নেবার প্রস্তাব করলে অমনি কারও কারও মনে হল ঠকলুম বুঝি। কেউ কেউ এমনও ভাব প্রকাশ করলে যে, কথাটা আর একবার বিচার করা উচিত।

গরহাজির অপরাধে আপিসের দারোয়ানের অর্ধেক মাসের মাইনে কাটা গিয়েছিল, আজ টিফিনের সময় মধুসূদনের পা জড়িয়ে ধরবামাত্র মধুসূদন তাকে মাপ করে দিলে। মাপ করবার মানে নিজের পকেট থেকে দারোয়ানের ক্ষতিপূরণ; যদিচ খাতায় জরিমানা রয়ে গেল। নিয়মের ব্যত্যয় হবার জো নেই।

আজকের দিনটা মধুর পক্ষে বড়ো আশ্চর্যের দিন। বাইরে আকাশটা মেঘে কালো, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এতে করে ওর ভিতরের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিলে। আপিস থেকে ফিরে এসে রাত্রে আহারেরর সময়ের পূর্বে পর্যন্ত মধুসূদন বাইরের ঘরে কাটাত। বিয়ের পরে কয়দিন অসময়ে নিয়মের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যাবার সময়ে বেলায় লোকের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করেছে। আজ সশব্দ পদক্ষেপে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে যেন জানিয়ে দিতে চাইলে যে, সে চলেছে কুমুর সঙ্গে দেখা করতে। আজ বুঝেছে পৃথিবীর লোকে ওকে ঈর্ষা করতে পারে এতবড়ো ওর সৌভাগ্য।

খানিকক্ষণের জন্য বৃষ্টি ধরে গেছে। তখনো সব ঘরে আলো জ্বলে নি। আন্দিবুড়ি ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা চামচিকে উঠোনের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠনজ্বালা অন্তঃপুরের পথ পর্যন্ত কেবলই চক্রপথে ঘুরছে। বারান্দায় পা মেলে দিয়ে দাসীরা ঊরুর উপরে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে ঘোমটা টেনে দৌড় দিলে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্যামাসুন্দরী। হাতে বাটাতে ছিল পান। মধুসূদন আপিসে থেকে এলে নিয়মমত এই পান সে বাইরে পাঠিয়ে দিত। সবাই জানে, ঠিক মধুসূদনের রুচির মতো পান শ্যামাসুন্দরীই সাজতে পারে; এইটে জানার মধ্যে আরো কিছু-একটু জানার ইশারা ছিল। সেই জোরে পথের মধ্যে শ্যামা মধুর সামনে বাটা খুলে ধরে বললে, "ঠাকুরপো, তোমার পান সাজা আছে, নিয়ে যাও।" আগে হলে এই উপলক্ষে দুটো-একটা কথা হত, আর সেই কথায় অল্প একটু মধুর রসের আমেজও লাগত। আজ কী হল কে জানে, পাছে দূর থেকেও শ্যামার ছোঁয়াচ লাগে সেইটে এড়িয়ে পান না নিয়ে মধুসূদন দ্রুত চলে গেল। শ্যামার বড়ো বড়ো চোখদুটো অভিমানে জ্বলে উঠল, তার পরে ভেসে গেল অশ্রুজলের মোটাা মোটা ফোঁটায়। অন্তর্যামী জানেন শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে।

মধুসূদন ঘরে ঢুকতেই নবীন কুমুর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "গুরু-র কথা মনে রইল, খোঁজ করে দেখব।" দাদাকে বললে, "বউরানী গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্র-উপদেশ শুনতে চান। আমাদের গুরুঠাকুর আছেন, কিন্তু—"

মধুসূদন উত্তেজনার স্বরে বলে উঠল, "শাস্ত্র-উপদেশ! আচ্ছা সে দেখব এখন, তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

নবীন চলে গেল।

মধুসূদন আজ সমস্ত পথ মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এসেছিল, "বড়োবউ, তুমি এসেছ আমার ঘর আলো হয়েছে।' এরকম ভাবের কথা বলবার অভ্যাস ওর একেবারেই নেই। তাই ঠিক করেছিল, ঘরে ঢুকেই দ্বিধা না করে প্রথম ঝোঁকেই সে বলবে। কিন্তু নবীনকে দেখেই কথাটা গেল ঠেকে। তার উপরে এল শাস্ত্র-উপদেশের প্রসঙ্গ, ওর মুখ দিলে একেবারে বন্ধ করে। অন্তরে যে আয়োজনটা চলছিল, এই একটুখানি বাধাতেই নিরস্ত হয়ে গেল। তার পরে কুমুর মুখে দেখলে একটা ভয়ের ভাব, দেহমনের একটা সংকোচ। অন্যদিন হলে এটা চোখে পড়ত না। আজ ওর মনে যে একটা আলো জ্বলছে তাতে দেখবার শক্তি হয়েছে প্রবল, কুমু সম্বন্ধে চিত্তের স্পর্শবোধ হয়েছে সূক্ষ্ম। আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা, এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার বলে ঠেকল। তবু মনে মনে পণ পরলে বিচলিত হবে না, কিন্তু যা সহজে হতে পারত সে আরও সহজ রইল না।

একটু চুপ করে থেকে মধুসূদন বললে, "বড়োবউ, চলে যেতে ইচ্ছে করছ? একটুক্ষণ থাকবে না?"

মধুসূদনের কথা আর তার গলার স্বর শুনে কুমু বিস্মিত। বললে, "না, যাব কেন?"

"তোমার জন্যে একটি জিনিস এনেছি খুলে দেখো।" বলে তার হাতে ছোটো একটি সোনার কৌটা দিলে।

কৌটো খুলে কুমু দেখলে দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, কী করবে ভেবে পেল না।

"এই আংটি তোমায় পরিয়ে দিতে হবে?"

কুমু হাত বাড়িয়ে দিলে। মধুসূদন কুমুর হাতে কোলের উপর ধরে খুব আস্তে আস্তে আংটি পরাতে লাগল। ইচ্ছে করেই সময় নিলে একটু বেশি। তার পরে হাতটি তুলে ধরে চুমো খেলে, বললে, "ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে কোনো দোষ নেই।"

কুমুকে মারলে এর চেয়ে কম বিস্মিত হত। ছেলেমানুষের মতো কুমুর এই বিস্ময়ের ভাব দেখে মধুসূদনের লাগল ভালো। দানটা যে সামান্য নয় কুমুর মুখভাবে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন আরো কিছু হাতে রেখেছে, সেইটে প্রকাশ কবলে; বললে, "তোমাদের বাড়ির কালু মুখুজ্যে এসেছে, তাকে দেখতে চাও?"

কুমুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, "কালুদা!"

"তাকে ডেকে দিই। তোমরা কথাবার্তা কও, ততক্ষণ আমি খেয়ে আসি গে।"

কৃতজ্ঞতায় কুমুর চোখ ছল্ ছল্ করে এল।

৪৩

চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। সমস্ত বিশ্বাসের কাজ এর হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়। এর কোনো-এক পূর্বপুরুষ চাটুজ্যেদের জন্যে জেল খেটেছে। কালু আজ বিপ্রদাসের হয়ে এক কিস্তি সুদ দিয়ে রসিদ নিতে মধুসূদনের আপিসে এসেছিল। বেঁটে, গৌরবর্ণ, পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা ড্যাবড্যাবা চোখ, তার উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা



ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা,সযত্নে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরা এবং প্রভু-পরিবারের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরানো দামি জামিয়ার গায়ে। আঙুলে একটা আংটি— তার পাথরটা নেহাত কম দামি নয়।

কালু ঘরে প্রবেশ করতে কুমু তাকে প্রণাম করলে। দুজনে বসল কার্পেটের উপর। কালু বললে "ছোটো খুকি, এই তো সেদিন চলে এলে দিদি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত বৎসর দেখি নি।"

"দাদা কেমন আছে আগে বলো।"

"বড়োবাবুর জন্যে বড়ো ভাবনায় কেটেছে। তুমি যেদিন চলে এলে তার পরের দিন' খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু অসম্ভব জোরালো শরীর কিনা, দেখতে দেখতে সামলে নিলেন। ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেছে।"

"দাদা কাল আসছেন?"

"তাই কথা ছিল। কিন্তু আরো দুটো দিন দেরি হবে। পূর্ণিমা পড়েছে, সকলে তাঁকে বারণ করলে কী জানি যদি আবার জ্বর আসে। সে যেন হল, কিন্তু তুমি কেমন আছ দিদি?"

"আমি বেশ ভালোই আছি।"

কালু কিছু বলতে ইচ্ছে করল না, কিন্তু কুমুর মুখের সে লাবণ্য গেল কোথায়? চোখের নীচে কালি কেন? অমন চিকন রঙ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল কী জন্যে? কুমুর মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না, 'দাদা আমাকে মনে করে কি কিছু বলে পাঠান নি? তার সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরের মতোই যেন কালু বললে, "বড়োবাবু আমার হাত দিয়ে তোমাকে একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।"

কুমু ব্যগ্র হয় বললে, "কী পাঠিয়েছেন, কই সে?"

"সেটা বাইরে রেখে এসেছি।"

"আনলে না কেন?"

"ব্যস্ত হোয়ো না দিদি। মহারাজা বললেন, তিনি নিজে নিয়ে আসবেন।"

"কী জিনিস বলো আমাকে।"

"ইনি যে আমাকে বলতে বারণ করলেন।" ঘরের চারি দিকে তাকিয়ে কালু বললে, "বেশ আদর যত্নে তোমাকে রেখেছে— বড়োবাবুকে গিয়ে বলব, কত খুশি হবেন। প্রথম দুদিন তোমার খবর পেতে দেরি হয়ে তিনি বড়ো ছট্‌ফট্‌ করেছেন। ডাকের গোলমাল হয়েছিল, শেষকালে তিনটে চিঠি একসঙ্গে পেলেন।"

ডাকের গোলমাল হবার কারণটা যে কোন্‌খানে কুমু তা আন্দাজ করতে পারলে।

কালুদাকে কুমু খেতে বলতে চায়, সাহস করতে পারছে না। একটু সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, এখনো তোমার খাওয়া হয় নি?"

" দেখেছি, কলকাতায় সন্ধ্যের পর খেলে আমার সহ্য হয় না দিদি, তাই আমাদের রামদাস কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্ছি। বিশেষ কিছু তো ফল হল না।"

কালু বুঝেছিল, বাড়ির নতুন বউ, এখনো কর্তৃত্ব হাতে আসে নি, মুখ ফুটে খাওয়াবার কথা বলতে পারবে না, কেবল কষ্ট পাবে।

এমন সময় মোতির মা দরজায় আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে বললে, "তোমাদের ওখান থেকে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন, তাঁর জন্যে খাবার তৈরি। নীচের ঘরে তাঁকে নিয়ে এসো, খাইয়ে দেবে।"



কুমু ফিরে এসেই বললে, "কালুদা, তোমার কবিরাজের কথা রেখে দাও, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।"

"কী বিভ্রাট! এ যে অত্যাচার! আজ থাক্, না-হয় আর-একদিন হবে।"

"না, সে হবে না — চলো।"

শেষকালে আবিষ্কার করা গেল, মকরধ্বজের বিশেষ ফল হয়েছে, ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব প্রকাশ পেল না।

কালুদাদাকে খাওয়ানো শেষ হতেই কুমু শোবার ঘরে চলে এল। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেছে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুর-ধারের চাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে— মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুরবেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত, জানত না তার অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধ্যেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর -ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে নি যে, ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েছে মায়া মেলে, ওর যুগল রূপের উপাসনায় সেই করেছে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেছে ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজে মূলতানের মিড়ে মূর্ছনায়। ওর প্রথম যৌবনের সেই না পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায়, সেখানকার চিলেকোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা সরষেখেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা যেখানে বসে পাঁচিলের ছ্যাতলা পড়া সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি- দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানলায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে সাদা পালগুলো দেখতে পেত, দিগন্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ -কামনাব মতো। প্রথম-যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতার ওর পূজার মধ্যে, ওব গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর মতো ভান করে ওকে অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে। অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেল মিলিয়ে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন কখন পিছনে এসে দেয়ালে-ঝোলানো আয়নায়-কুমুর মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলে কুমুর মন যেখানে হারিয়ে গেছে সেই অদৃশ্য অজানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিছুতেই চলবে না। অন্য দিন হলে কুমুর এই আনমনা ভাব দেখলে রাগ হত। আজ শান্ত বিষাদের সঙ্গে কুমুর পাশে এসে বসল; বললে, "কী ভাবছ বড়োবউ?"

কুমু চমকে উঠল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মধুসূদন ওর হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে, "তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না?'

এ কথার উত্তর কুমু ভেবে পেলে না। কেন ধরা দিতে পারছে না সে প্রশ্ন ও যে নিজেকেও করে। মধুসূদন যখন কঠিন ব্যবহার করছিল তখন উত্তর সহজ ছিল, ও যখন নতি স্বীকার করে তখন নিজেকে নিন্দে করা ছাড়া কোনো জবাব পায় না। স্বামীকে মন-প্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হল? মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতীসাবিত্রী হয়ে ওঠা। সেই লক্ষ্যে হতে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়— তাই আজ ব্যাকুল হয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "তুমি আমাকে দয়া করো।"

"কিসের জন্যে দয়া করতে হবে?"

"আমাকে তোমার করে নাও— হুকুম করো, শাস্তি দাও। আমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই।"



শুনে বড়ো দুঃখে মধুসূদনের হাসি পেল। কুমু সতীর কর্তব্য করতে চায়। কুমু যদি সাধারণ গৃহিণীমাত্র হত, তা হলে এইটুকুকে যথেষ্ট হত, কিন্তু কুমু যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি, সেই বেশিটুকুই পাবার জন্যে ও যতই মূল্য হাঁকছে সবই ব্যর্থ হচ্ছে। ধরা পড়ছে নিজের খর্বতা। কুমুর সঙ্গে নিজের দুর্লঙ্ঘ অসাম্য কেবলই ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তুলছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুসূদন বললে, "একটি জিনিস যদি দিই তো কী দেবে বলো।"

কুমু বুঝতে পারলে দাদার দেওয়া সেই জিনিস, ব্যগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"যেমন জিনিসটি তারই উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু," বলে খাটের নীচে থেকে পশমের খোল দিয়ে মোড়া একটি এসরাজ বের করে তার মোড়কটি খুলে ফেললে। কুমুর সেই চিরপরিচিত এসরাজ, হাতির দাঁতের খচিত। বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় এইটি ফেলে এসেছিল।

মধুসূদন বললে, "খুশি হয়েছ তো? এইবার দাম দাও।"

মধুসূদন কী দাম চায় কুমু বুঝতে পারলে না, চেয়ে রইল। মধুসূদন বললে, "বাজিয়ে শোনাও আমাকে।"

এটা বেশি কিছু নয়, তবু বড়ো শক্ত দাবি। কুমু এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে যে, মধুসুদনের মনে সংগীতের রস নেই। এর সামনে বাজানোর সংকোচ কাটিয়ে তোলা কঠিন। কুমু মুখ নিচু করে এসরাজের ছড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মধুসূদন বললে, "বাজাও-না বড়োবউ, আমার সামনে লজ্জা করো না।"

কুমু বললে, "সুর বাঁধা নেই।"

"তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলো না কেন?"

কথাটার সত্যতায় কুমুর মনে তখনই ঘা লাগল; "যন্ত্রটা ঠিক করে রাখি, তোমাকে আর-একদিন শোনাব।"

"কবে শোনাবে ঠিক করে বলো। কাল?"

"আচ্ছা, কাল।"

"সন্ধ্যেবেলায় আপিস থেকে ফিরে এলে?"

"হাঁ, তাই হবে।"

"এসরাজটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছ?"

"খুব খুশি হয়েছি।"

শালের ভিতর থেকে একটা চামড়ার কেস বের করে মধুসূদন বললে, "তোমার জন্যে যে মুক্তার মালা কিনে এনেছি, এটা পেয়ে ততখানিই খুশি হবে না?"

এমনতরো মুশকিলের প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করা? কুমু চুপ করে এসরাজের ছড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"বুঝেছি, দরখাস্ত নামঞ্জুর।'

কুমু কথাটা ঠিক বুঝলে না।

মধুসূদন বললে, "তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল— কিন্তু তার আগেই ডিস্‌মিস্।"

কুমুর সামনে মেজের উপর গয়নাটা রইল খোলা। দুজনে কেউ একটিও কথা বললেন না। থেকে থেকে কুমু যেরকম স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি হয়ে রইল। একটু পরে যেন সচেতন হয়ে



মালাটা তুলে নিয়ে গলায় পরলে, আর মধুসূদনকে প্রণাম করলে। বললে, "তুমি আমার বাজনা শুনবে?"

মধুসূদন বললে, 'হাঁ শুনব।"

"এখনই শোনাব" বলে এসরাজের সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ করলে; ভুলে গেল ঘরে কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌঁছোলে ছায়ানটে। যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল, 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।' সুরের আকাশে রঙিন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রয়ে গেল—'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।'

মধুসূদন সংগীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ববিস্মৃত মুখের উপর যে সুর খেলছিল, এসরাজের পর্দায় পর্দায় কুমুর আঙুল-ছোঁয়ার যে ছন্দ নেচে উঠছিল তাই তার বুকে দোল দিলে, মনে হতে লাগল ওকে যেন কে বরদান করছে। আনমনে বাজাতে বাজাতে কুমু হঠাৎ এক সময়ে দেখতে পেল মধুসূদন তার মুখের উপর একদৃষ্টে চেয়ে, অমনি হাত গেল থেমে, লজ্জা এল, বাজনা বন্ধ করে দিলে।

মধুসূদনের মন দাক্ষিণ্য উদ্‌বেল হয়ে উঠল, বললে, "বড়োবউ, তুমি কি চাও বলো।" কুমু যদি বলত, কিছুদিন দাদার সেবা করতে চাই, মধুসূদন তাতেও রাজি হতে পারত; কেননা আজ কুমুর গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে সে নিজেকে বলছিল, 'এই তো আমার ঘরে এসেছে, এ কী আশ্চর্য সত্য!'

কুমু এসরাজ মাটিতে রেখে, ছড়ি ফেলে চুপ করে রইল।

মধুসূদন আর-একবার অনুনয় করে বললে, "বড়োবউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।"

কুমু বললে, "মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।"

কুমু যদি বলত কিছু চাই নে, সেও ছিল ভালো, কিন্তু মুরলী বেহারার জন্যে গায়ের কম্বল! যে দিতে পারে মাথার মুকুট, তার কাছে চাওয়া জুতোর ফিতে!

মধুসূদন অবাক। রাগ হল বেহারাটার উপর। বললে, "লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করছে?"

"না, আমি আপনিই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিল না। তুমি যদি হুকুম কর তবে সাহস করে নেবে।"

মধুসূদন স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "ভিক্ষে দিতে চাও! আচ্ছা দেখি, কই তোমার আলোয়ান?"

কুমু তার সেই অনেক দিনের পরা বাদামি রঙের আলোয়ান নিয়ে এল। মধুসূদন সেটা নিয়ে নিজের গায়ে জড়াল। টিপায়ের উপরকার ছোটো ঘন্টা বাজিয়ে দিতে একজন বুড়ি দাসী এল; তাকে বললে, "মুরলী বেহারাকে ডেকে দাও।"

মুরলী এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল; শীতে ও ভয়ে তার জোড়া হাত কাঁপছে।

"তোমার মাজি তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন," বলে মধুসূদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে তার ভাঁজ খুলে সেটা দিলে কুমুর হাতে। এরকম অকারণে অযাচিত দান মধুসূদনের দ্বারা জীবনে কখনো ঘটে নি। অসম্ভব ব্যাপারে মুরলী বেহারার ভয় আরো বেড়ে উঠল, দ্বিধাকম্পিত স্বরে বললে, "হুজুর—"



"হুজুর কী রে বেটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত খুশি গরম কাপড় কিনে নিস।"

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হল— সেইসঙ্গে সেদিনকার আর-সমস্তই যেন শেষ হয়ে গেল। যে স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিল সে গেল হঠাৎ বন্ধ হয়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে ঢেউ চিত্তসংকীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল তাও সামান্য বেহারার জন্য তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেল নেমে। এর পরে সহজে কথাবার্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য। আজ সন্ধ্যের সময় সেই তালুক-কেনা ব্যাপার নিয়ে লোক এসে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে, এ কথাটা মধুসূদনের মনেই ছিল না। এতক্ষণ পরে চমকে উঠে ধিক্কার হল নিজের উপরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কাজ আছে, আসি।" দ্রুত চলে গেল।

পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই বললে, "ঘরে আছ?"

শ্যামাসুন্দরী আজ খায় নি; একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজেয় মাদুরের উপর অবসন্ন ভাবে শুয়েছিল। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী-ঠাকুরপো?"

"পান দিলে না আমাকে?"

৪৪

বাইরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে একটি মানুষ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল— হাবলু। কম সাহস না। মধুসূদনকে যমের মতো ভয় করে, তবু ছিল কাঠের পুতুলেব মতো স্তব্ধ হয়ে। সেদিন মধুসূদনের কাছে তাড়া খাওয়ার পর থেকে জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সুবিধে হয় নি, মনের ভিতর ছট্‌ফট্ করেছে। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আসা নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা যখন ঘরকন্নার কাজে চলে গেছে এমন সময় কানে এল এসরাজের সুর। কী বাজছে জানত না, কে বাজাচ্ছে বুঝতে পারে নি, জ্যাঠাইমার ঘর থেকে আসছে এটা নিশ্চিত; জ্যাঠামশায় সেখানে নেই এই তার বিশ্বাস, কেননা তাঁর সামনে কেউ বাজনা বাজাতে সাহস করবে এ কথা মনেই করতে পারে না। উপরের তলায় দরজার কাছে এসে জ্যাঠামশায়ের জুতোজোড়া দেখেই পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু যখন বাইরে থেকে চোখে পড়ল ওর জ্যাঠাইমা নিজে বাজাচ্ছেন, তখন কিছুতেই পালাতে পা সরল না। দরজার আড়ালে লুকিয়ে শুনতে লেগেছে। প্রথম থেকেই জ্যাঠাইমাকে ও জানে আশ্চর্য, আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। মধুসূদন চলে যেতেই মনের উচ্ছ্বাস আর ধরে রাখতে পারলে না— ঘরে ঢুকেই কুমুর কোলে গিয়ে বসে গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে বললে, "জ্যাঠাইমা।"

কুমু তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "এ কী, তোমার হাত যে ঠাণ্ডা! বাদলার হাওয়া লাগিয়েছ বুঝি?"

হাবলু কোনো উত্তর করলে না, ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে জ্যাঠাইমা এখনই বুঝি বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবে। কুমু তাকে শালের মধ্যে ঢেকে নিয়ে নিজের দেহের তাপে গরম করে বললে, "এখনো শুতে যাও নি গোপাল?"

"তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। কেমন করে বাজাতে পারলে জ্যাঠাইমা?"

"তুমি যখন শিখবে তুমিও পারবে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে?"

এমন সময় মোতির মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, "এই বুঝি দস্যি, এখানে লুকিয়ে বসে! আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ দিকে সন্ধ্যাবেলায় ঘরের বাইরে দু পা



চালাতে গা ছম্ ছম্ করে, জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ডর থাকে না। চল্ শুতে চল্।"

হাবলু কুমুকে আঁকড়ে ধরে রইল।

কুমু বললে, "আহা, থাক্-না আর-একটু।"

"এমন করে সাহস বেড়ে গেলে শেষকালে বিপদে পড়বে। ওকে শুইয়ে আমি এখনই আসছি।"

কুমুর বড়ো ইচ্ছে হল হাবলুকে কিছু দেয়, খাবার কিংবা খেলার জিনিস। কিন্তু দেবার মতো কিছু নেই, তাই ওকে চুমো খেয়ে বললে, "আজ শুতে যাও, লক্ষ্মী ছেলে, কাল দুপুরবেলা তোমাকে বাজনা শোনাব।"

হাবলু করুণ মুখে উঠে মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোতির মা ফিরে এল। নবীনের ষড়যন্ত্রের কী ফল হল তাই জানবার জন্যে মন অস্থির হয়ে আছে। কুমুর কাছে বসেই চোখে পড়ল, তার হাতে সেই নীলার আংটি। বুঝলে যে কাজ হয়েছে। কথাটা উত্থাপন করবার উপলক্ষ স্বরূপ বললে, "দিদি, তোমার এই বাজনাটা পেলে কেমন করে?"

কুমু বললে, "দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বড়োঠাকুর তোমাকে এনে দিলেন বুঝি?"

কুমু সংক্ষেপে বললে, "হাঁ।"

মোতির মা কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে উল্লাস বা বিস্ময়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে না।

"তোমার দাদার কথা কিছু বললেন কি?"

"না।"

"পরশু তিনি তো আসবেন, তাঁর কাছে তোমার যাবার কথা উঠল না?"

"না, দাদার কোনো কথা হয় নি।"

"তুমি নিজেই চাইলে না কেন, দিদি?"

"আমি ওঁর কাছে আর যা-কিছু চাই নে কেন, এটা পারব না।"

"তোমার চাবার দরকার হবে না, তুমি অমনিই ওঁর কাছে চলে যেয়ো। বড়োঠাকুর কিছুই বলবেন না।"

মোতির মা এখনো একটা কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি যে মধুসূদনের অনুকূলতা কুমুর পক্ষে সংকট হয়ে উঠেছে; এর বদলে মধুসূদন যা চায় তা ইচ্ছে করলেও কুমু দিতে পারে না। ওর হৃদয় হয়ে গেছে দেউলে। এইজন্যেই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ করে ঋণ বাড়াতে এত সংকোচ। কুমুর এমনও মনে হয়েছে যে, দাদা যদি আর কিছুদিন দেরি করে আসে তো সেও ভালো।

একটু অপেক্ষা করে থেকে মোতির মা বললে, 'আজ মনে হল বড়োঠাকুরের মন যেন প্রসন্ন।"

সংশয়ব্যাকুল চোখে কুমু মোতির মার মুখে তাকিয়ে বললে, "এ প্রসন্নতা কেন ঠিক বুঝতে পারি নে, তাই আমার ভয় হয়; কী করতে হবে ভেবে পাই নে।"

কুমুর চিবুক ধরে মোতির মা বললে, "কিছুই করতে হবে না; এটুকু বুঝতে পারছ না, এতদিন উনি কেবল কারবার করে এসেছেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। একটু একটু করে যতই চিনছেন ততই তোমার আদর বাড়ছে।"

"বেশি দেখলে বেশি চিনবেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা পড়বে। সেইজন্যেই



হঠাৎ যখন দেখি উনি খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেছেন। সেই সেটা ফাঁস হবে সে-ই আরো রেগে উঠবেন। সেই রাগটাই যে সত্য, তাই তাকে আমি তেমন ভয় করি নে।"

"তোমার দাম তুমি কী জান দিদি! যেদিন এদের বাড়িতে এসেছ, সেইদিনই তোমার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হল, এরা সবাই মিলে তা শুধতে পারবে না। আমার কর্তাটি তো একেবারে মরিয়া, তোমার জন্যে সাগর লঙ্ঘন না করতে পারলে স্থির থাকতে পারছেন না। আমি যদি তোমাকে না ভালোবাসতুম তবে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যেত।"

কুমু হাসলে, বললে, "কত ভাগ্যে এমন দেবর পেয়েছি।"

"আর তোমার এই জা-টি বুঝি ভাগ্যস্থানের রাহু না কেতু।"

"তোমাদের একজনের নাম করলে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।"

মোতির মা ডান হাত দিয়ে কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।"

"কী বলো।"

"আমার সঙ্গে তুমি 'মনের কথা' পাতাও।"

"সে বেশ কথা, ভাই! প্রথম থেকে মনে মনে পাতানো হয়েই গেছে।"

"তা হলে আমার কাছে কিছু চেপে রেখো না। আজ তুমি অমন মুখটি করে কেন আছ কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

খানিকক্ষণ মোতির মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কুমু বললে, "ঠিক কথা বলব? নিজেকে আমার কেমন ভয় করছে।"

"সে কী কথা! নিজেকে কিসের ভয়?"

"আমি এতদিন নিজেকে যা মনে করতুম আজ হঠাৎ দেখছি তা নই। মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই এসেছিলুম। দাদারা যখন দ্বিধা করেছেন, আমি জোর করেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু যে মানুষটা ভরসা করে বেরোল তাকে আজ কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে।"

"তুমি ভালোবাসতে পারছ না। আচ্ছা, আমার কাছে লুকিয়ো না, সত্যি করে বলো, কাউকে কি ভালোবেসেছ? ভালোবাসা কাকে বলে তুমি কি জান?"

"যদি বলি জানি, তুমি হাসবে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। কেবলই মনে হয়েছে সূর্য উঠল বলে। সেই সূর্যোদয়ের কল্পনা মাথায় করেই আমি বেরিয়েছি, তীর্থের জল নিয়ে -- ফুলের সাজি সাজিয়ে। যে দেবতাকে এতদিন সমস্ত মন দিয়ে মেনে এসেছি, মনে হয়েছে তাঁর উৎসাহ পেলুম। যেমন করে অভিসারে বেরোয় তেমনি করেই বেরিয়েছি। অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলে মনেই হয় নি, আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কী দেখলুম, বাইরেই বা কী দেখছি! এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কী করে?"

"তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?"

"পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন-কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমত করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে। আমার শরীরের উপরকার নরম



ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারি দিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে, যা-কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি; এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাব না তো।"

"বলা যায় না ভাই।"

"খুব বলা যায়। আজ আমার মনে একটুমাত্র মোহ নেই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মতো আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও নড়ে বসবার একটুও জায়গা নেই? তাদের সংসারটাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এত আঁট করেই তৈরী করেছে?"

এতক্ষণ ধরে এমনতরো উত্তেজনার কথা কুমুর মুখে মোতির মা আর- কোনোদিন শোনে নি। বিশেষ করে আজ যেদিন বড়োঠাকুরকে ওরা কুমুর প্রতি এতটা প্রসন্ন করে এনেছে, সেইদিনই কুমুর এই তীব্র অধৈর্য দেখে মোতির মা ভয় পেয়ে গেল। বুঝলে লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেছে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর একে তাজা করে তুলতে পারবে না।

একটু পরে কুমু বলে উঠল, "জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।"

মোতির মা কোনো উত্তর না ভেবে পেয়ে হতবুদ্ধির মতো বসে রইল। একটু চুপ করে থেকে কুমু বললে, "তোমার কত ভাগ্যি ভাই, কত পুণ্যি করেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছ। আগে মনে করতুম, ভালোবাসাই সহজ - সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে। আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধানায় ঘটে। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালাবাসে?"

মোতির মা একটু হেসে বললে, "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?"

"সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।

"বাইরে থেকে তাতেও বাধা পড়ে।"

"অন্তর থেকে সে বাধা কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। আমি পারব, আমি হার মানব না।"

"তুমি পারবে না তো কে পারবে?"

বৃষ্টি জোর করে চেপে এল। বাতাসে ল্যাম্পের আলো থেকে থেকে চকিত হয়ে ওঠে। দমকা হাওয়া যেন একটা ভিজে নিশাচর পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমুর শরীরটা মনটা শির্ শির্ করে উঠল। সে বললে, 'আমার ঠাকুরের নামে আর জোর পাচ্ছি নে। মন্ত্র আবৃত্তি করে যাই, মনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিছুতে সাড়া দিতে চায় না। তাতেই সব চেয়ে ভয় হয়।"

বানানো কথায় মিথ্যে ভরসা দিতে মোতির মার ইচ্ছে হল না। কোনো উত্তর না করে সে কুমুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলে। এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল, "মেজোবউ।"

কুমু খুশি হয়ে উঠে বললে, "এসো, এসো ঠাকুরপো।"

"সন্ধ্যাবেলাকার ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।"

মোতির মা বললে, "হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে।"



"কে মণি আর কে ফণী তা চক্র নাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বল বউরানী।"

"আমাকে সাক্ষী মেনো না ঠাকুরপো।"

"জানি, তা হলে আমি ঠকব।"

"তা তোমার হারাধনকে তুমি উদ্ধার করে নিয়ে যাও, আমি ধরে রাখব না।"

"হারাধনের জন্যে ওঁর কোনো উৎসাহ নেই দিদি, ছুতো করে বউরানীর চরণ দর্শন করতে এসেছেন।"

"ছুতোর কি কোনো দরকার আছে? চরণ আপনি ধরা দিয়েছে। সব চেয়ে যা অসাধ্য তার সাধনা করবে কে? সে যখন আসে সহজেই আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে আমার চেয়ে যোগ্য, তবু অমন সুন্দর পা দুখানি আমিই পারলুম ছুঁতে, তারা তো পারলে না। নবীনের জন্ম সার্থক হয়ে গেল বিনামূল্যে।"

"আঃ, কী বল ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই। তোমার এন্‌সাইক্লোপীডিয়া থেকে বুঝি--"

"অমন কথা বলতে পারবে না বউরানী। চরণ বলতে কী বোঝায় তা ওরা জানবে কী করে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওয়ালা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী করে রেখেছে। সাইক্লোপীডিয়াওয়ালার সাধ্য কী পায়ের মহিমা বোঝে। লক্ষ্মণ চোদ্দটা বৎসর কেবল সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই নির্বাসন কাটিয়ে দিলেন, তার মানে আমাদের দেশের দেওররাই জানে। তা পায়ের উপর শাড়ি টেনে দিচ্ছ তো দাও। ভয় নেই তোমার, পদ্ম সন্ধ্যেবেলায় মুদে থাকে বলে তো বরাবর মুদেই থাকে না--আবার তো পাপড়ি খোলে।"

"ভাই মনের কথা, এমনিতরো স্তব করেই বুঝি ঠাকুরপো তোমার মন ভুলিয়েছেন?"

"একটুও না দিদি, মিষ্টি কথার বাজে খরচ করবার লোক নন উনি।"

"স্তুতির বুঝি দরকার হয় না?"

"বউরানী, স্তুতির ক্ষুধা দেবীদের কিছুতেই মেটে না, দরকার খুব আছে। কিন্তু শিবের মতো আমি তো পঞ্চানন নই, এই একটিমাত্র মুখের স্তুতি পুরোনো হয়ে গেছে, এতে উনি আর রস পাচ্ছেন না।"

এমন সময় মুরলী বেয়ারা এসে নবীনকে খবর দিলে, "কর্তা-মহারাজা বাইরের আপিসঘরে ডাক দিয়েছেন।"

শুনে নবীনের মন খারাপ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল মধুসূদন আজ আপিস থেকে ফিরেই একেবারে সোজা তার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হবে। নৌকো বুঝি আবার ঠেকে গেল চড়ায়।

নবীন চলে গেলে মোতির মা আস্তে আস্তে বললে, বড়োঠাকুর কিন্তু তোমাকে ভালবাসেন সে কথা মনে রেখো।"

কুমু বললে, "সেইটেই তো আমার আশ্চর্য ঠেকে।"

"বল কী, তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য কেন? উনি কি পাথরের?"

"আমি ওঁর যোগ্য না।"

"তুমি যাঁর যোগ্য নও সে পুরুষ কোথায় আছে?"

"ওঁর কতবড়ো শক্তি, কতসম্মান, কত পাকা বুদ্ধি, উনি কত মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে পারেন? আমি যে কী অসম্ভব কাঁচা, তা এখানে এসে দুদিনে বুঝতে পেরেছি। সেই-জন্যেই যখন উনি ভালোবাসেন তখনই আমার সব চেয়ে বেশি ভয় করে। আমি নিজের মধ্যে যে কিছুই খুঁজে পাই নে। এতবড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা করব কী করে? কাল



রাত্তিরে বসে বসে মনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হয়েছে, খুলে ফেললেই ধরা পড়বে যে ভিতরে চিঠিও নেই।"

"দিদি হাসালে। বড়োঠাকুরের মস্তবড়ো কারবার, কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই, সব জানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ যে যোগ্যতা নেই বলে ভয় পাবে? বড়োঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা করে বলেন তবে নিশ্চয় বলবেন, তিনিও তোমার যোগ্য নন।"

"সে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।"

"বিশ্বাস হয় নি?"

"না। উলটে আমার ভয় করেছিল। মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভুল করলেন, সে ভুল ধরা পড়বে।"

"কেন তোমার এমন মনে হল বলো দেখি।'

"বলব? এই-যে আমার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুললুম— কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষি করে! যা-কিছুতে আমাকে সেদিন ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ যে, সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা তা নিশ্চিত জানতেন বলেই বৃথা বাধা দিলেন না; কিন্তু কত ভয় পেয়েছেন, কত উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন, তা কি আমি বুঝতে পারি নি? বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও সামলাই নি, এতবড়ো অবুঝ আমি। আজ থেকে চিরদিন আমি কেবলই কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর প্রতিদিন মনে জানব এ সমস্তই আমর নিজের সৃষ্টি।"

মোতির মা কী যে-বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মন স্থির করলে, কী ভেবে?"

"তখন নিশ্চিত জানতুম , স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক-না কেন, স্ত্রীর সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষমাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।"

"দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয়নি।"

"আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি-পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্র ভাসতে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।"

মোতির মা নিজে বিশেষ কিছু না বলে কুমুকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতে লাগল।

৪৫

মধুসূদন আপিসে গিয়েই দেখলে খবর ভালো নয়। মাদ্রাজের এক বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল করেছে, তাদের সঙ্গে এদের কারবার। তার পরে কানে এল যে, কোনো ডাইরেক্টরের তরফ থেকে কোনো কর্মচারী মধুসূদনের অজানিতে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। এতদিন কেউ মধুসূদনকে সন্দেহ করতে সাহস করে নি, একজন যেই ধরিয়ে দিয়েছে অমনি যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছুটে গেল। বড়ো কাজের ছোটো ত্রুটি ধরা সহজ, যারা মাতব্বর সেনাপতি তারা কত খুচরো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত করেই জেতে। মধুসূদন বরাবর তেমনি জিতেই এসেছে— তাই বেছে বেছে খুচরো হার কারও নজরেই পড়ে নি। কিন্তু



বেছে বেছে তারই একটা ফর্দ বানিয়ে সেটা সাধারণ লোকের নজরে তুললে তারা নিজের বুদ্ধির তারিফ করে, বলে আমরা হলে এ ভুল করতুম না। কে তাদের বোঝাবে যে, ফুটো নৌকো নিয়েই মধুসূদন পাড়ি দিয়েছে, নইলে পাড়ি দেওয়াই হত না, আসল কথাটা এই যে কূলে পৌঁছোল। আজ নৌকোটা ডাঙায় তুলে ফুটোগুলোর বিচার করবার বেলায়, যারা নিরাপদে এসেছে ঘাটে, তাদের গা শিউরে উঠছে। এমনতরো টুকরো সমালোচনা নিয়ে আনাড়িদের ধাঁধাঁ লাগানো সহজ। সাধারণত আনাড়িদের সুবিধে এই যে, তারা লাভ করতে চায়, বিচার করতে চায় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ বিচার করতে বসে তবে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই-সব বোকাদের উপর মধুসূদনের নিরতিশয় অবজ্ঞা-মিশ্রিত ক্রোধের উদয় হল। কিন্তু বোকাদের যেখানে প্রাধান্য সেখানে তাদের সঙ্গে রফা করা ছাড়া গতি নেই। জীর্ণ মই মচ্ মচ্ করে, দোলে, ভাঙার ভয় দেখায়, যে ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে এই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চলতেই হয়। রাগ করে লাথি মারতে ইচ্ছে করে, তাতে মুশকিল আরো বাড়বারই কথা।

শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যাবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেইরকম মনের অবস্থা। এ যে তার নিজের সৃষ্টি; এর প্রতি তার যে দরদ সে প্রধানত টাকার দরদ নয়। যার রচনাশক্তি আছে, আপন রচনার মধ্যে সে নিজেকেই নিবিড় করে পায়, সেই পাওয়াটা যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন জীবনের আর-সমস্ত সুখদুঃখকামনা তুচ্ছ হয়ে যায়। কুমু মধুসূদনকে কিছুদিন থেকে প্রবল টানে টেনেছিল, সেটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনটা মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে খুব জোরের সঙ্গে অনুভব করেছিল। এই উপসর্গ যখন অকালে দেখা দেয় তখন উদ্দাম হয়েই ওঠে। মধুসূদনকে ধাক্কা কম লাগে নি, কিন্তু আজ তার বেদনা গেল কোথায়?

নবীন ঘরে আসতেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা বাইরের কোনো লোকের হাতে পড়েছে কি, জান?"

নবীন চমকে উঠল, বললে, "সে কী কথা?"

"তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে খাতাঞ্জির ঘরে কেউ আনাগোনা করছে কি না।"

"রতিকান্ত বিশ্বাসী লোক, সে কি কখনো- - "

"তার অজান্তে মুহুরিদের সঙ্গে কেউ কথা চালাচালি করছে বলে সন্দেহের কারণ ঘটেছে। খুব সাবধানে খবরটা জানা চাই কারা এর মধ্যে আছে।"

চাকর এসে খবর দিলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মধুসূদন সে কথায় মন না দিয়ে নবীনকে বললে, "শীঘ্র আমার গাড়িটা তৈরি করে আনতে বলে দাও।"

নবীন বললে, "খেয়ে বেরোবে না? রাত হয়ে আসছে।"

'বাইরেই খাব, কাজ আছে।"

নবীন মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। সে যে কৌশল করেছিল ফেঁসে গেল বুঝি।

হঠাৎ মধুসূদন নবীনকে ফিরে ডেকে বললে, "এই চিঠিখানা কুমুকে দিয়ে এসো।"

নবীন দেখলে বিপ্রদাসের চিঠি। বুঝলে এ চিঠি আজ সকালেই এসেছে, সন্ধেবেলায় নিজের হাতে কুমুকে দেবে বলে মধুসূদন রেখেছিল। এমনি করে প্রত্যেকবার মিলন উপলক্ষে একটা কিছু অর্ঘ্য হাতে করে আনবার ইচ্ছে। আজ আপিসের কাজে হঠাৎ তুফান উঠে তার এই আদরের আয়োজনটুকু গেল ডুবে।



মাদ্রাজে যে ব্যাঙ্ক ফেল করেছে সেটার উপরে সাধারণের নিশ্চিত আস্থা ছিল। তার সঙ্গে ঘোষাল-কোম্পানির যে যোগ সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের বা অংশীদারদের কারও মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। যেই কল বিগড়ে গেল অমনি অনেকেই বলাবলি করতে আরম্ভ করলে যে, আমরা গোড়া থেকেই ঠাউরেছিলুম, ইত্যাদি।

সাংঘাতিক আঘাতের সময় ব্যাবসাকে যখন একজোট হয়ে রক্ষার চেষ্টা দরকার, সেই সময়েই পরাজয়ের সম্বন্ধে দোষারোপ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাদের প্রতি কারও ঈর্ষা আছে তাদেরকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় টলমলে ব্যাবসাকে কাত করে ফেলা হয়। সেইরকম চেষ্টা চলবে মধুসূদন তা বুঝেছিল। মাদ্রাজ-ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ে ঘোষাল-কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ যে কতটা দাঁড়াবে এখনো তা নিশ্চিত জানবার সময় হয় নি, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার আয়োজনে এও যে একটা মসলা জোগাবে তাতে সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, সময় খারাপ, এখন অন্য সব কথা ভুলে এইটেতেই মধুসদূনকে কোমর বাঁধতে হবে।

রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হবার পর নবীন ফিরে এসে দেখলে কুমুর সঙ্গে মোতির মার তখনো কথা চলছে। নবীন বললে, বউরানী, তোমার দাদাব চিঠি আছে।"

কুমু চমকে উঠে চিঠিখানা নিলে। খুলতে হাত কাঁপতে লাগল। ভয় হল হয়তো কিছু অপ্রিয় সংবাদ আছে। হয়তো এখন আসাই হবে না। খুব ধীরে ধীরে খাম খুলে পড়ে দেখলে। একটু চুপ করে রইল। মুখ দেখে মনে হল যেন কোথায় ব্যথা বেজেছে। নবীনকে বললো, "দাদা আজ বিকালে তিনটের সময় কলকাতায় এসেছেন।"

"আজই এসেছেন। তাঁর তো- "

"লিখেছেন দুই-একদিন পরে আসবার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হল।"

কুমু আর কিছু বললে না। চিঠির শেষ দিকে ছিল, একটু সেরে উঠলেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে, সেজন্যে কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্‌বিগ্ন না হয়। এই কথাটাই আগেকার চিঠিতেও ছিল। কেন, কী হয়েছে? কুমু কী অপরাধ করেছে? এ যেন একরকম স্পষ্ট করেই বলা, তুমি আমাদের বাড়িতে এসো না। ইচ্ছে করল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কান্না চেপে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

নবীন বুঝলে চিঠির মধ্যে একটা কী কঠিন মার আছে। কুমুর মুখ দেখে করুণায় ওর মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, "বউরানী, তাঁর কাছে তো কালই তোমার যাওয়া চাই।"

"না, আমি যাব না।" যেমনি বলা অমনি আর থাকতে পারলে না, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

মোতির মা কোনো প্রশ্ন না করে কুমুকে বুকের কাছে টেনে নিলে, কুমু রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, "দাদা আমাকে যেতে বারণ করেছেন।"

নবীন বললে, "না না, বউরানী তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ।"

কুমু খুব জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে, সে একটুও ভুল বোঝে নি।

নবীন বললে, "তুমি কোথায় ভুল বুঝেছ বলব? বিপ্রদাসবাবু মনে করছেন আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দিতে চাইবেন না। চেষ্টা করতে গিয়ে পাছে তোমাকে অপমানিত হতে হয়, পাছে তুমি কষ্ট পাও, সেইটে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিজে থেকে তোমার রাস্তা সোজা করে দিয়েছেন।"

কুমু এক মুহূর্তে গভীর আরাম পেলে। তার ভিজে চোখের পল্লব নবীনের মুখের দিকে তুলে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চুপ করে চেয়ে রইল। নবীনের কথাটা সে সম্পূর্ণ সত্য তাতে একটুও সন্দেহ রইল



না। দাদার স্নেহকে ক্ষণকালের জন্যেও ভুল বুঝতে পেরেছে বলে নিজের উপর ধিক্কার হল। মনে খুব একটা জোর পেল। এখনই দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে দাদার আসার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারবে। সেই ভালো।

মোতির মা চিবুক ধরে কুমুর মুখ তুলে ধরে বললে, "বাস্ রে, দাদার কথার একটু আড় হওয়া লাগলেই একেবারে অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে।"

নবীন বললে, "বউরানী, কাল তা হলে তোমার যাবার আয়োজন করি গে।"

"না, তার দরকার নেই।"

"দরকার নেই তো কী? তোমার দরকার না থাকে তো আমার দরকার আছে বৈকি।"

"তোমার আবার কিসের দরকার?"

"বা! আমার দাদাকে তোমার দাদা যা-কিছু ঠাওরাবেন সেটা বুঝি অমনি সয়ে যেতে হবে! আমার দাদার পক্ষ নিয়ে আমি লড়ব। তোমার কাছে হার মানতে পারব না। কাল তোমাকে ওঁর কাছে যেতেই হচ্ছে।"

কুমু হাসতে লাগল।

"বউরানী, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের বাড়ির অপবাদে তোমার অগৌরব। এখন চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসো, খেতে যাবে। ম্যানেজার সাহেবের ওখানে দাদার আজ নিমন্ত্রণ। আমার বিশ্বাস তিনি আজ বাড়ির ভিতরে শুতে আসবেন না, দেখলুম বাইরের কামরায় তাঁর বিছানা তৈরি।"

এই খবরটা পেয়ে কুমু মনে মনে আরাম পেলে, তার পরক্ষণেই এতটা আরাম পেলে বলে লজ্জা বোধ হল।

রাত্রে শোবার ঘরে মোতির মা'র সঙ্গে নবীনের ঐ কথাটা নিয়ে পরামর্শ চলল। মোতির মা বললে, "তুমি তো দিদিকে আশ্বাস দিলে। তার পরে?"

'তার পরে আবার কী? নবীনের যেমন কথা তেমনি কাজ। বউরানীকে যেতেই হবে, তরে পরে যা হয় তা হবে।"

নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ খুবই উগ্র। এরা নিশ্চয় ঠিক করে আছেন যে, বিবাহ করে নববধূ তার পূর্ব-পদবীর চেয়ে অনেক উপরে উঠেছে। অতএব বাপের বাড়ি বলে কোনো বালাই আছে এ কথা একেবারে ভুলতে দেওয়াই সংগত। এ অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করা যদি অসম্ভব হয় তবে একটা দিক তো রাখতেই হবে। সেই দিকটা যে কোন্‌টা তা নবীন মনে মনে পাকা করে রাখলে। যেখানে দাদার অধিকার চরম,সেখানে ও কোনোদিন দাদার সঙ্গে লড়াই বাধাতে সাহস করতে পারবে এ কথা আর কিছুদিন আগে নবীন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, কাল সকালে কুমু একবার মাএ বিপ্রদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করে আসবে, এই প্রস্তাব মধুসূদনের কাছে করা হবে। যদি রাজি হয় এবং কুমুকে সেখানে পাঠানো যায় তা হলে তার পরে সেখান থেকে দু-চার দিনের মধ্যে তাকে না ফেরাবার সংগত কারণ বানানো শক্ত হবে না।

মধুসূদন বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে, সঙ্গে একরাশ কাগজপত্রের বোঝা। নবীন উঁকি মেরে দেখলে, মধুসূদন শুতে না গিয়ে চোখে চশমা এঁটে নীল পেনসিল হাতে আপিসঘরের ডেস্কে কোনো দলিলে বা দাগ দিচ্ছে, নোটবইয়ে বা নোট নিচ্ছে। নবীন সাহস করে ঘরে ঢুকেই বললে, "দাদা, আমি কি তোমার কোনো কাজ করে দিতে পারি?" মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, "না।" ব্যাবসার এই সংকটের অবস্থাটাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত করে নিতে চায়, সবটা তার



একার চোখে প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার; এ কাজে অন্যের দৃষ্টির সহায়তা নিতে গেলে নিজেকে দুর্বল করা হবে।

নবীন কোনো কথা বলবার ছিদ্র না পেয়ে বেরিয়ে গেল। শীঘ্র যে সুযোগ পাওয়া যাবে এমন তো ভাবে বোধ হল না। নবীনের পণ, কাল সকালেই বউরানীকে রওনা করে দেবে। আজ রাত্রেই সম্মতি আদায় করা চাই।

খানিকক্ষণ বাদে নবীন একটা ল্যাম্প হাতে করে দাদার টেবিলের উপরে রেখে বললে, "তোমার আলো কম হচ্ছে।"

মধুসূদন অনুভব করলে, এই দ্বিতীয় ল্যাম্পে তার কাজের অনেকখানি সুবিধা হল। কিন্তু এই উপলক্ষে কোনো কথার সুচনা হতে পারল না। আবার নবীনকে বেরিয়ে আসতে হল।

একটু পরেই মধুসূদনের অভ্যস্ত গুড়গুড়িতে তামাক সেজে তার চৌকির বাঁ পাশে বসিয়ে নলটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। মধুসূদন তখনই অনুভব করলে এটারও দরকার ছিল। ক্ষণকালের জন্যে পেনসিলটা রেখে তামাক টানতে লাগল।

এই অবকাশে নবীন কথা পাড়লে, "দাদা, শুতে যাবে না? অনেক রাত হয়েছে। বউরানী তোমার জন্যে হয়তো জেগে বসে আছেন।"

'জেগে বসে আছেন' কথাটা এক মুহূর্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টল্‌মল্ করতে করতে চলেছে, একটি ছোটো ডাঙার পাখি উড়ে এসে যেন মাস্তুলে বসল; ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্যে মনে এনে দিলে শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি।

কিন্তু সে কথায় মন দেবার সময় নয়, জাহাজ চালাতে হবে।

মধুসূদন আপন মনের এইটুকু চাঞ্চল্যে ভীত হল। তখনই সেটা দমন করে বললে, "বড়োবউকে শুতে যেতে বলো, আজ আমি বাইরে শোব।"

"তাঁকে না-হয় এখানে ডেকে দিই" বলে নবীন গুড়গুড়ির কলকেটাতে ফুঁ দিতে লাগল।

মধুসূদন হঠাৎ ঝেঁকে বলে উঠল "না না।"

নবীন তাতেও না দমে বললে, "তিনি যে তোমার কাছে দরবার করবেন বলে বসে আছেন।"

রুক্ষস্বরে মধুসূদন বললে, 'এখন দরবারের সময় নেই।"

"তোমার তো সময় নেই দাদা, তাঁরও তো সময় কম।"

"কী, হয়েছে কী?"

"বিপ্রদাসবাবু আজ কলকাতায় এসেছেন খবর পাওয়া গেছে, তাই বউরানী কাল সকালে—"

"সকালে যেতে চান?"

"বেশিক্ষণের জন্যে না, একবার কেবল—"

মধুসূদন হাত ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বললে, "তা যান-না, যান। বাস্, আর নয়, তুমি যাও।"

হুকুম আদায় করেই নবীন ঘর থেকে এক দৌড়। বাইরে আসতেই মধুসূদনের ডাক কানে এসে পৌঁছোল, "নবীন।"

ভয় লাগল আবার বুঝি দাদা হুকুম ফিরিয়ে নেয়। ঘরে এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন বললে, "বড়োবউ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তার জোগাড় করে দিয়ো।"

নবীনের ভয় লাগল, দাদার এই প্রস্তাবে তার মুখে পাছে একটুও উৎসাহ প্রকাশ পায়। এমন-



কি, সে একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। বললে, "বউরানী গেলে বাড়িটা বড়ো খালি-খালি ঠেকবে।"

মধুসূদন কোনো উত্তর না করে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে কাজে লেগে গেল। বুঝতে পারলে প্রলোভনের রাস্তা এখনো খোলা আছে— ও দিকে একেবারেই না।

নবীন আনন্দিত হয়ে চলে গেল। মধুসূদনের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু কখন এই কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উলটো মানস-ধারা খুলে গেছে তা সে অনেকক্ষণ নিজেই বুঝতে পারে নি। এক সময়ে নীল পেনসিল প্রয়োজন শেষ না হতেই ছুটি নিল, গুড়গুড়ির নলটা উঠল মুখে। দিনের বেলায় মধুসূদনের মনটা কুমুর ভাবনা সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নিয়েছিল, তখন আগেকার দিনের মতো নিজের 'পরে নিজের একাধিপত্য ফিরে পেয়ে মধুসূদন খুব আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু যত রাত হচ্ছে ততই সন্দেহ হতে লাগল যে, শত্রু দুর্গ ছেড়ে পালায় নি। সুড়ঙ্গের ঘরে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল করে দিয়েছে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা, মধুসূদনের দেহটা বিছানার ভিতরে একটা গরম কোমল স্পর্শের জন্যে দাবি জানাতে আরম্ভ করেছে। নীল পেনসিলটা চেপে ধরে খাতাপত্রের উপর সে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু মনের গভীর আকাশে একটা কথা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজে বাজছে, 'বউরানী হয়তো এতক্ষণ জেগে বসে আছেন।'

মধুসূদন পণ করেছিল, একটা বিশেষ কাজ আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ করে রাখবে। সেটা কাল সকালের মধ্যে সারতে পারলে যে খুব বেশি অসুবিধা হত তা নয়। কিন্তু পণ রক্ষা করা ওর ব্যবসায়ের ধর্মনীতি। তার থেকে কোনো কারণে যদি ভ্রষ্ট হয় তবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। এতদিন ধর্মকে খুব কঠিনভাবেই রক্ষা করেছে। তার পুরস্কারও পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাত্রের মধুসূদনের সুরের কিছু কিছু তফাত ঘটে আসছে— এক বীণায় দুই তারের মতে। যে দৃঢ় পণ করে ডেস্কের উপর ও ঝুঁকে পড়ে বসেছিল— রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল, সেই পরের কোন্ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা উক্তি ভ্রমরের মতো ভন্ ভন্ করতে শুরু করলে, 'বউরানী হয়তো জেগে বসে আছেন।'

উঠে পড়ল। বাতি না নিভিয়ে খাতাপত্র যেমন ছিল তেমনি ভাবেই রেখে চলল শোবার ঘরের দিকে। অন্তঃপুরে আঙিনা-ঘেরা যে বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর বসে। চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে, তার আলো এসে তাকে ঘিরেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো। অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতিনিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। সে জানত মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়— সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেইজন্যেই তার আকর্ষণটা এত প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে—যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়; অসম্ভব কখন সম্ভব হয়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।

মধুসূদন ওর দিকে একবার কটাক্ষ করে উপরে চলে গেল। শ্যামাসুন্দরী নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করে রেলিং শক্ত করে ধরে তার উপরে মাথা ঠুকতে লাগল।

শোবার ঘরে গিয়ে মধুসূদন দেখে যে কুমু জেগে বসে নেই। ঘর অন্ধকার, নাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে। মধুসূদন একবার ভাবল ফিরে চলে যাই, কিন্তু



পারল না। গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। কুমু বিছানার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে— আলো জ্বালাতেও ঘুম ভাঙল না। কুমুর এই আরামে ঘুমোনোর উপর ওর রাগ ধরল। অধৈর্যের সঙ্গে মশারি খুলে ধপ্ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। খাটটা শব্দ করে কেঁপে উঠল।

কুমু চমকে উঠে বসল। আজ মধুসূদন আসবে না বলেই জানত। হঠাৎ তাকে দেখে মুখে এমন একটা ভাব এল যে, তাই দেখে মধুসূদনের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একট শেল বিঁধল। মাথায় রক্ত চলে গেল, বলে উঠল, "আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ না, না?"

এমনতরো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুমু তা ভেবেই পেলে না। সত্যিই হঠাৎ মধুসূদনকে দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে। তখন ওর মনটা সতর্ক ছিল না। যে ভাবটাকে ও নিজের কাছেও সর্বদা চেপে রাখতে চায়, যার প্রবলতা নিজেও কুমু সম্পূর্ণ জানে না সে তখন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধুসূদন চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "দাদার কাছে যাবার জন্যে তোমার দরবার?"

কুমু এই মুহূর্তেই ওর পায়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু ওর মুখে দাদার নাম শুনেই শক্ত হয় উঠল। বললে, "না।"

"তুমি যেতে চাও না?"

"না, আমি চাই নে।"

"নবীনকে আমার কাছে দরবার করতে পাঠাও নি?"

"না, পাঠাই নি।"

"দাদার কাছে যাবার ইচ্ছে তাকে তুমি জানাও নি?"

"আমি তাঁকে বলেছিলুম, দাদাকে দেখতে আমি যাব না।"

"কেন?"

"তা আমি বলতে পারি নে।"

"বলতে পার না? আবার তোমার সেই নুরনগরি চাল?"

"আমি, যে নুরগরেরই মেয়ে।"

"যাও, তাদের কাছেই যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।"

কুমু কাঠ হয়ে বসে রইল, কোনো উত্তর করলে না। কুমুর হাত ধরে অসহ্য একটা ঝাঁকানি দিয়ে মধুসূদন বললে, "মাপ চাইতেও জান না?"

"কিসের জন্যে?"

"তমি যে আমার এ বিছানার উপরে শুতে পেরেছ তার জন্যে।"

কুমু তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

মধুসূদন বাইরের ঘরে যাবার পথে দেখলে শ্যামাসুন্দরী সেই বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে। মধুসূদন পাশে এসে নিচু হয়ে তার হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করে বললে, "কী করছ, শ্যামা?" অমনি শ্যামা উঠে বসে মধুসূদনের দুই পা বুকে জড়িয়ে ধরলে, গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললে, "আমাকে মেরে ফেলো তুমি।"

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালে, বললে, 'ইস, তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি গে।" বলে তাকে নিজের শালের এক অংশে আবৃত করে ডান হাত দিয়ে সবলে চেপে ধরে শোবার ঘরে পৌছিয়ে দিয়ে এল। শ্যামা চুপি চুপি বললে, 'একটু বসবে না?"



মধুসূদন বললে, "কাজ আছে।"

রাতের বেলা কোথা থেকে ভূত চেপে এতক্ষণ মধুসূদনের কাজ নষ্ট করে দেবার জোগাড় করেছে— আর নয়। কুমুর কাছ থেকে যে উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরম মূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেই অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবনমন দিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলেন। এ দিকে রাত্রে কুমু যে ধাক্কা পেলে তার মধ্যে ওর একটা সান্ত্বনা ছিল। যতবার মধুসূদন তাকে ভালোবাসা দেখিয়েছে, ততবারই কুমুর মনে একটা টানাটানি এসেছে; ভালোবাসার মূল্যেই এর পরিশোধ করা চাই এই কর্তব্যবোধে ওকে অত্যন্ত অস্থির করেছে। এ লড়াইয়ে কুমুর জেতবার কোনো আশা ছিল না। কিন্তু পরাভবটা কুশ্রী, সেটাকে কেবলই চাপা দেবার জন্যে এতদিন কুমু প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। কাল রাত্রে সেই চাপা-দেওয়া পরাভবটা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেল। কুমুর অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে যে কুমুর সমস্ত প্রকৃতি মধুসূদনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ, এইটে নিশ্চিত জানা হয়ে গেল সে ভালো, তার পরে পরস্পরের যা কর্তব্য সেটা অকপটভাবে করা সম্ভব হবে। মধুসূদন ওকে কামনা করে, সেইখানেই সমস্যা; ক্ষোভের সঙ্গে ওকে যে বর্জন করতে চায় সেখানেই সত্য। সত্যই মধুসূদনের বিছানায় শোবার অধিকার ওর নেই। শুয়ে ও কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। এ বাড়িতে ওর যে-পদ সেটা বিড়ম্বনা। আজ রাত্রে এই একটা প্রশ্ন বার বার কুমুর মনে উঠেছে— কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্বন্ধ? ও তো কথায় কথায় নুরনগরি চালের প্রসঙ্গ তুলে কুমুকে খোঁটা দেয়, তার মানে কুমুর সঙ্গে ওদের একেবারে ধাতের তফাত, জাতের তফাত, কিন্তু মধুসূদন কেন তবে ওকে ভালোবাসা জানায়? একি কখনো সত্য ভালোবাসা হতে পারে? কুমুর নিশ্চয় বিশ্বাস, আজ মধুসূদন যাই মনে করুক-না কেন, কুমুকে দিয়ে কখনোই ওর মন ভরতে পারে না। যত শীঘ্র মধুসূদন তা বোঝে ততই সকল পক্ষের মঙ্গল। নবীন কাল রাত্রে দাদার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যত আনন্দ করে শুতে গেল, আজ সকালে তার আর বড়ো-কিছু বাকি রইল না। কাল রাত্রি তখন আড়াইটা। মধুসূদন কাজ শেষ করে তখনই নবীনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। হুকুম এই যে, কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যতদিন মধুসূদন না আপনি ডেকে পাঠায় ততদিন ফিরে আসার দরকার নেই। নবীন বুঝলে এটা নির্বাসনদণ্ড। আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দার যে অংশে কাল রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের বারান্দার সংলগ্ন নবীনের শোবার ঘর। তখন ওরা স্বামীস্ত্রী কুমুর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল এমন সময় গলার শব্দ শুনে মোতির মা ঘরের দরজা খুলতেই জ্যোৎস্নার আলোতে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের ছবি দেখতে পেলে। বুঝতে পারলে কুমুর ভাগ্যের জালে এই রাত্রে নিঃশব্দে আর-একটা শক্ত গিঁঠ পড়ল। নবীনকে মোতির মা বললে, "ঠিক এই সংকটের সময় কি দিদির চলে যাওয়া ভালো হচ্ছে?"

নবীন বললে, "এতদিন তো বউরানী ছিলেন না, কাণ্ডটা তো এতদূর কখনোই এগোয় নি। বউরানী আছেন বলেই এটা ঘটেছে।"

"কী বল তুমি!"

"বউরানী যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েছেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত



করতে বসেছে। আমি তো বলি এই সময়টায় ওর দূরে থাকাই ভালো, তাতে আর-কিছু না হোক অন্তত উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।"

"তবে এটা কি এমনি ভাবেই চলবে?"

"যে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।"

পরদিন সকালে হাবলু সমস্তক্ষণ কুমুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরলে। গুরুমশায় যখন পড়ার জন্যে ওকে বাইরে ডেকে পাঠালে, ও কুমুর দিকে চাইলে। কুমু যদি যেতে বলত তো ও যেত, কিন্তু কুমু বেহারাকে বলে দিলে আজ হাবলুর ছুটি।

বধূ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছে সেই সুরটি আজ কুমুর যাত্রার সময় লাগল না। এ বাড়ি যেন ওকে আজ হারাতে বসেছে। যে পাখিকে খাঁচায় বন্দী করা হয়েছিল, আজ যেন দরজা একটু ফাঁক করতেই সে উড়ে পড়ল, আর যেন এ খাঁচায় সে ঢুকবে না।

নবীন বললে, 'বউরানী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে পারলে বেঁচে যেতুম, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই তুমি থাকো গে। কোনো কালে নবীনকে যদি কোনো কারণে দরকার হয় স্মরণ কোরো।"

মোতির মা নিজের হাতে তৈরি আমসত্ত্ব আচার প্রভৃতি একটা হাঁড়িতে সাজিয়ে পালকিতে তুলে দিলে। বিশেষ কিছু বললে না। কিন্তু মনে তার বেশ একটু আপত্তি ছিল। যতদিন বাধা ছিল স্থূল, যতদিন মধুসূদন কুমুকে বাহির থেকে অপমান করেছে, মোতির মা'র সমস্ত মন ততদিন ছিল কুমুর পক্ষে; কিন্তু যে বাধা সূক্ষ্ম, যা মর্মগত, বিশ্লেষণ করে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তারই শক্তি যে প্রবলতম, এ কথাটা মোতির মা'র কাছে সহজ নয়। স্বামী যে মুহূর্তে প্রসন্ন হবে সেই মুহূর্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করবে, মোতির মা, এইটেকেই স্বাভাবিক বলে জানে। এর ব্যতিক্রমকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। এমন-কি, এখনো যে বউরানী সম্বন্ধে নবীনের দরদ আছে, এটাতে তার রাগ হয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহংকার নয়, এমন-কি, এইটে নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জয় বিরোধ, সা ধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। যে চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত করতে আপত্তি করে নি, সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার এই পর্দসংকোচ পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক বলে মনে করে তবে নিশ্চয় সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয় বলে ওটা ন্যাকামি। যেটা নিগূঢ়ভাবে স্বাভাবিক, সেইটিকেই সে জানে অস্বাভাবিক। মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল, বোধ করি সেইজন্যেই আজ তার মন এত কঠিন হতে আরম্ভ করেছে, প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে, তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে মেয়ে অবিলম্বে সে বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মা'র পক্ষে অসম্ভব—এমন-কি, মার্জনা করাও।

৪৬

বাড়ির সামনে আসতেই পালকির দরজা একটু ফাঁক করে কুমু উপরের দিকে চেয়ে দেখলে। রোজ এই সময়টা বিপ্রদাস রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ত, আজ দেখলে সেখানে কেউ নেই। আজ যে কুমু এখানে আসবে সে খবর এ বাড়িতে পাঠানো হয় নি। পালকির সঙ্গে মহারাজার তকমা-পরা দরোয়ানকে দেখে এ বাড়ির দরোয়ান ব্যস্ত হয় উঠল, বুঝলে যে দিদিঠাকুরুন এসেছে। বা'র-বাড়ির আঙিনা পার হয়ে অন্তঃপুরের দিকে পালকি চলেছিল। কুমু



থামিয়ে দ্রুতপদে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে চলল। তার ইচ্ছে তাকে আর কেউ দেখবার আগে সব প্রথমেই দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়। নিশ্চয় সে জানত, বাইরের আরাম-কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে জানলা থেকে বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশত্থ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখতেপাওয়া যায়। সকালের রোদ্দুর ডালপালার ভিতর দিয়েএই ঘরেই প্রথম দেখা দেয়। এই ঘরটিই বিপ্রদাসের পছন্দ।

কুমু সিঁড়ির কাছে আসতেই সর্বাগ্রে টম কুকুর ছুটে এসে ওর গায়ের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে লেজ ঝাপটিয়ে অস্থির করে দিলে। কুমুর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে টম চলল। বিপ্রদাস একটা মুড়ে-তোলা কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায়, পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোশ টানা; একখানা বই নিয়ে ডান হাতটা বিছানার উপর এলিয়ে আছে, যেন ক্লান্ত হয়ে একটু আগে পড়া বন্ধ করেছে। চায়ের পেয়ালা আর ভুক্তাবশিষ্ট রুটি সমেত একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে পড়ে। শিয়রের কাছে দেয়ালের গায়ের শেলফে বইগুলো উলটপালট এলোমেলো। রাত্রে যে ল্যাম্প জ্বলেছিল সেটা ধোঁয়ায় দাগি অবস্থায় ঘরের কোণে এখনো পড়ে আছে।

কুমু বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। ওর এমন বিবর্ণ রুগ্‌ণ মূর্তি কখনো দেখে নি। সেই বিপ্রদাসের সঙ্গে এই বিপ্রদাসের যেন কত যুগের তফাত! দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে কুমু কাঁদতে লাগল।

"কুমু যে, এসেছিস? আয়, এইখানে আয়।" বলে বিপ্রদাস তাকে পাশে টেনে নিয়ে এল। যদিও চিঠিতে বিপ্রদাস তাকে আসতে একরকম বারণ করেছিল, তবু তার মনে আশা ছিল যে কুমু আসবে। আসতে পেরেছে দেখে ওর মনে হল, তবে হয়তো কোনো বাধা নেই— তবে কুমুর পক্ষে তার ঘরকন্না সহজ হয়ে গেছে। এদের পক্ষ থেকেই কুমুকে আনবার জন্যে প্রস্তাব, পালকি ও লোক পাঠানোই নিয়ম—কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও কুমু এল, এটাতে ওর যতটা স্বাধীনতা কল্পনা করে নিলে ততটা মধুসূদনের ঘরে বিপ্রদাস একেবারেই প্রত্যাশা করে নি।

কুমু তার দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে, "দাদা তোমার এ কী চেহারা হয়েছে!"

"আমার চেহারা ভালো হবার মতো ইদানীং তো কোনো ঘটনা ঘটে নি— কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী! ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস যে।"

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্ষেমাপিসি এসে উপস্থিত। সেইসঙ্গে দরজার কাছে একদল দাসী চাকর ভিড় করে জমা হল। ক্ষেমাপিসিকে প্রণাম করতেই পিসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে। দাসদাসীরা এসে প্রণাম করলে। সকলের সঙ্গে কুশলসম্ভাষণ হয়ে গেলে পর কুমু বললে, "পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।"

"সাধে হয়েছে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হতে চায় না। কতদিনের অভ্যেস।"

বিপ্রদাস বললে, "পিসি, কুমুকে খেতে বলবে না?"

"খাবে না তো কী! সেও কি বলতে হবে? ওদের পালকির বেহারা-দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেছি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসি গে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চললুম।"

বিপ্রদাস ক্ষেমাপিসিকে ইশারা করে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলে দিলে। কুমু বুঝলে ওদের বাড়ির লোকদের কী ভাবে বিদায় করতে হবে তারই পরামর্শ। এই পরামর্শের মধ্যে কুমু আজ অপর পক্ষ হয়ে উঠেছে। ওর কোনো মত নেই। এটা ওর একটুও ভালো লাগল না। কুমুও



তার শোধ তুলতে বসল। এ বাড়িতে তার চিরকালের স্থান ফিরে দখলের কাজ শুরু করে দিলে।

প্রথমত, দাদার খানসামা গোকুলকে ফিস্ ফিস্ করে কী একটা হুকুম করলে, তার পরে লাগল নিজের মনের মতো করে ঘর গোছাতে। বাইরের বারান্দায় সরিয়ে দিলে পিরিচ পেয়ালা, ল্যাম্প, খালি সোডা-ওয়াটারের বোতল, একখানা বেত-ছেঁড়া চৌকি, গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি। শেলফের উপর বইগুলো ঠিকমত সাজালে, দাদার হাতের কাছাকাছি একখানি টিপাই সরিয়ে এনে তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস, ছোটো একটি আয়না এবং চিরুনি ব্রুশ।

ইতিমধ্যে গোকুল একটা পিতলের জগে গরম জল, একটা পিতলের চিলম্‌চি, আর সাফ তোয়ালে বেতের মোড়ার উপর এনে রাখলে। কিছুমাত্র সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কুমু গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বিপ্রদাসের মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দিলে, বিপ্রদাস শিশুর মতো চুপ করে সহ্য করল। কখন কী ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং পথ্যের নিয়ম কী সমস্ত জেনে নিয়ে এমন ভাবে গুছিয়ে বসল যেন ওর জীবনে আর কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই।

বিপ্রদাস মনে মনে ভাবতে লাগল এর অর্থটা কী? ভেবেছিল, দেখা করতে এসেছে আবার চলে যাবে, কিন্তু সেরকম ভাব তো নয়। শ্বশুরবাড়িতে কুমুর সম্বন্ধটা কী রকম দাঁড়িয়েছে সেটা বিপ্রদাস জানতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট করে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করে। কুমুর নিজের মুখ থেকেই শুনবে এই আশা করে রইল। কেবল আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোকে কখন যেতে হবে?"

কুমু বললে, "আজ যেতে হবে না।"

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এতে তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?"

"না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। কুমু ঘরের কোণের টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?"

"না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।"

টম কুকুরটা কৌচের নীচে শান্ত হয়ে নিদ্রার সাধনায় নিযুক্ত ছিল, কুমু তাকে আদর করে তার প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত করে তুললে। সে লাফিয়ে উঠে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ করে দিলে। বিপ্রদাস বুঝতে পারলে কুমু হঠাৎ এই গোলমালটা সৃষ্টি করে তার পিছনে একটু আড়াল করলে আপনাকে।

খানিক বাদে কুকুরের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে কুমু মুখ তুলে বললে, "দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে, এনে দিই।"

"না সময় হয় নি" বলে কুমুকে ইশারা করে বিছানার পাশের চৌকিতে বসালে। আপনাব হাতে তার হাত তুলে নিয়ে বললে, "কুমু, আমার কাছে খুলে বল্, কী রকম চলছে তোদের।"

তখনই কুমু কিছু বলতে পারলে না। মাথা নিচু করে বসে রইল, দেখতে দেখতে মুখ হল লাল, শিশুকালের মতো করে বিপ্রদাসের প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল; বললে, "দাদা, আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।"

বিপ্রদাস আস্তে আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খানিক বাদে বললে, "আমি তোকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুড়বাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।"



কুমু বললে, "আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা- কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।"

বিপ্রদাস কোনো কথা না বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। মুধুসূদন যে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক জগতের মানুষ, তা সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকেই বুঝতে পেরেছে। তারই বিষম উদ্‌বেগে ওর শরীর যেন কোনোমতেই সুস্থ হয়ে উঠছে না। এই দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই। সকলের চেয়ে মুশকিল এই যে, এই মানুষের কাছে ঋণে ওর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা। এই অপমানিত সম্বন্ধের ধাক্কা যে কুমুকেও লাগছে। এতদিন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিপ্রদাস কেবলই ভেবেছে মধুসূদনের এই ঋণের বন্ধন থেকে কেমন করে সে নিষ্কৃতি পাবে। ওর কলকাতায় আসবার ইচ্ছে ছিল না, পাছে কুমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের সহজ ব্যবহার অসম্ভব হয়। কুমুর উপর ওর যে স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার আছে, পাছে তা পদে পদে লাঞ্ছিত হতে থাকে, তাই ঠিক করেছিল নুরনগরেই বাস করবে। কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করবে বলে। জানে যে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই এর দুশ্চিন্তার বোঝা ওর বুকের উপর চেপে বসে আছে।

খানিক বাদে কুমু বিপ্রদাসের থেকে অন্য দিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বললে, "আচ্ছা দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন করতে পারছি না, এটা কি আমার পাপ?"

"কুমু তুই তো জানিস, পাপপূণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।"

অন্যমনস্কভাবে কুমু একটা ছবিওয়ালা ইংরেজি মাসিক পত্রের পাতা ওলটাতে লাগল। বিপ্রদাস বললে, "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে, ভালোমন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।"

কুমু মাসিক পত্রটার দিকে চোখ নিচু করে বললে, "যেমন মীরাবাই-এর জীবন।"

নিজের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখনই কঠিন হয়ে উঠেছে, কুমু তখনই ভেবেছে মীরাবাই-এর কথা। একান্ত মনে ইচ্ছা করেছে কেউ ওকে মীরাবাই-এর আদর্শটা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

কুমু একটু চেষ্টা করে সংকোচ কাটিয়ে বলতে লাগল, "মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?"

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস।"

"এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছি নে! আমার সব চেয়ে দুঃখ সেই।"

"'কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস নে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা বলে তো মরে না। যা পেয়েছিস তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হয়ে গেছে।"

"সেই আশীর্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন বলেই। দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত করছি।"

"কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস। আজ যদি তোর



কথা জানা বন্ধ হয়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হলে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাতড়াতে গিয়ে তো মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।''

কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, ''আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।''

''আচ্ছা, থাক্ ও-সব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি করে আজ তোকে শেখাই।''

''ভাগ্যি শিখিয়েছিলে দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও। আজ আমি বরঞ্চ তোমাকে একটা গান শোনাই।''

দাদার শিয়রের কাছে বসে কুমু আস্তে আস্তে গাইতে লাগল—

পিয়া ঘর আয়ে, সোহী পীতম পিয় প্যার রে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণকমল বলিহার রে।

বিপ্রদাস চোখ বুজে শুনতে লাগল। গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভরে উঠল এক অপরূপ দর্শনে। ভিতরের আকাশ আলো হয়ে উঠল। প্রিয়তম ঘরে এসেছেন, চরণকমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্ছে। অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠল অন্তরলোক, যেখানে মিলন ঘটে। গান গাইতে গাইতে ও সেইখানে পৌঁচেছে। 'চরণকমল, বলিহার রে'—সমস্ত জীবন ভরে দিলে সেই চরণকমল, অন্ত নেই তার—সংসারে দুঃখ-অপমানের জায়গা রইল কোথায়। 'পিয়া ঘর আয়ে' তার বেশি আর কী চাই। এই গান কোনোদিন যদি শেষ না হয় তা হলে তো চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে গেল কুমু।

কিছু রুটি-টোস্ট আর এক পেয়ালা বার্লি গোকুল টিপাই-এর উপর রেখে দিয়ে গেল। কুমু গান থামিয়ে বললে, ''দাদা কিছুদিন আগে মনে মনে গুরু খুঁজছিলুম, আমার দরকার কী? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।'

''কুমু, আমাকে লজ্জা দিস নে। আমার মতো গুরু রাস্তায় ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাকতে পারবি ঠিক করে বল্ দেখি?''

''যতদিন না ডাক পড়ে।''

''তুই এখানে আসতে চেয়েছিলি?''

''না, আমি চাই নি।''

''এর মানে কি?''

''মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। যতদিন থাকতে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্ছে না, খেয়ে নাও।''

চাকর এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। বিপ্রদাস একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, ''ডেকে দাও।''

৪৭

কালু ঘরে ঢুকতেই কুমু তাকে প্রণাম করলে।

কালু বললে, ''ছোটোখুকি, এসেছ? এইবার দাদার সেরে উঠতে দেরি হবে না।''



কুমুর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। অশ্রু সামলে নিয়ে বললে, "দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?"

বিপ্রদাস উদাসীন ভাবে হাত ওল্‌টালে, অর্থাৎ না হলেই বা ক্ষতি কী? কুমু জানে বিপ্রদাস বার্লি খেতে ভালেবাসে না, তাই ও যখনই দাদাকে বার্লি খাইয়েছে বার্লিতে নেবুর রস এবং অল্প একটু গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে দিত। সে আয়োজন আজ নেই, তবু বিপ্রদাস আপন ইচ্ছে কাউকে জানায়ও নি, যা পেয়েছে তাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেয়েছে।

বার্লি ঠিকমত তৈরি করে আনবার জন্যে কুমু চলে গেল।

বিপ্রদাস উদ্‌বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, খবর কী বলো।"

"তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজিখেলার মতো করে—অত্যন্ত বেশি সুদে চায়, সে আমাদের পোষাবে না।"

"কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরি করলে তো চলবে না।"

"আমারও ভালো ঠেকছে না। সেবারে তোমার সেই আংটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হল না; তখনই বুঝলুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জিমত একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধরবে।

বিপ্রদাস চুপ করে ভাবতে লাগল।

কালু বললে, "দাদা, ছোটোখুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে আসে নি তো? মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।"

"কুমু বলছে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েছে।"

"সম্মতির চেহারা কী রকম না জানলে মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী বলব দাদা। রাগে সর্ব অঙ্গ যখন জ্বলছে তখনো ঠাণ্ডা হয়ে সব সয়েছি, গৌরীশংকরের পাহাড়টার মতো দুপুর-রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, একে সামলে চলা কি সোজা কথা!"

বিপ্রদাস কোনো জবাব না করে চুপ করে ভাবতে লাগল।

কুমু এল বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধরে বললে, "দাদা, খেয়ে নাও।"

বিপ্রদাস তার ভাবনা থেকে হঠাৎ চমকে উঠল। কুমু বুঝতে পারলে, গভীর একটা উদ্‌বেগের মধ্যে দাদা এতক্ষণ ডুবে ছিল।

কালু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুমু তার পিছন পিছন গিয়ে বারান্দায় ওকে ধরে বললে, "কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।"

"কী কথা বলতে হবে দিদি?"

"তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাবনা চলছে।"

"বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকি? ও যে কাঁটাগাছের ফল, খিদের চোটে পেড়ে খেতেও হয়, পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।

"সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হয়েছে।"

"বিষয়কর্মের কথা মেয়েদের বলতে নিষেধ।"

"আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হচ্ছে। বলব?"

"আচ্ছা, বলো।"

"আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।"



কোনো জবাব না দিয়ে কালু তার বড়ো বড়ো দুই চোখ সকৌতুক বিস্ময়হাস্যে বিস্ফারিত করে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমাকে বলতেই হবে, ঠিক বলেছি কি না।"

"দাদারই বোন তো, কথা না বলতেই কথা বুঝে নেয়।"

বিয়ের পরে প্রথম যেদিন বিপ্রদাসের মহাজন বলে মধুসূদন আস্ফালন করে শাসিয়ে কথা বলেছিল, সেইদিন থেকেই কুমু বুঝেছিল দাদার সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের অগৌরব। প্রতিদিনই একান্তমনে ইচ্ছে করেছিল এটা যেন ঘুচে যায়। বিপ্রদাসের মনে এর অসম্মান যে বিঁধে আছে তাতে কুমুর সন্দেহ ছিল না। সেদিন নীবন সেই বিপ্রদাসের চিঠির ব্যাখ্যা করলে, অমনি কুমুর মনে এল সমস্তর মূলে আছে এই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। দাদার শরীর কেন যে এত ক্লান্ত, কোন্ কাজের বিশেষ তাগিদে দাদা কলকাতায় চলে এসেছে, কুমু সমস্তই স্পষ্ট বুঝতে পারলে।

"কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেছে।"

"তা, ধার করেই তো ধার শুধতে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হয়ে থাকাটা তো ভালো নয়।"

"সে তো ঠিক কথা, তা টাকার জোগাড় করতে পেরেছ?"

ঘুরে ঘেরে দেখছি, হয়ে যাবে, ভয় কী।"

"না, আমি জানি, সুবিধে করতে পার নি।"

"আচ্ছা ছোটোখুকি, সবই যদি জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলেবেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, গোঁফ হল কেমন করে? বলেছিলুম, সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম বলে। তাতেই প্রশ্নটার তখনই নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এখন হলে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।"

"আমি তোমাকে বলে রাখছি কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।"

"কী করে দাদার গোঁফ উঠল, তাও?"

"দেখো, অমন করে মাথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেছি টাকার সুবিধে করতে পার নি।"

"নাই যদি পেরে থাকি, সেটা জেনে তোমার লাভ হবে কী?"

"সে আমি বলতে পারি নে, কিন্তু আমাকে জানতেই হবে। টাকা ধার পাও নি তুমি?"

"না, পাই নি।"

"সহজে পাবে না?"

"পাব নিশ্চয়ই, কিন্তু সহজে নয়। তা দিদি, তোমার কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে পাবার চেষ্টায় বেরোলে কাজ হয়তো কিছু এগোতে পারে। আমি চললুম।"

খানিকটা গিয়েই অবার ফিরে এসে কালু বললে, "খুকি, এখানে যে তুমি আজ চলে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটা খোঁচা নেই? ঠিক সত্যি করে বলো?"

"আছে কি না তা আমি খবু স্পষ্ট করে জানি নে।"

"স্বামীর সম্মতি পেয়েছ?"

"না চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।"

"রাগ করে?"

"তাও আমি ঠিক জানি নে; বলেছেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।"



"সে কোনো কাজের কথা নয়, তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।"

"গেলে হুকুম মানা হবে না।"

"আচ্ছা, সে আমি দেখব।"

দাদা আজ এই-যে বিষম বিপদে পড়েছে, এর সমস্ত অপরাধ কুমুর, এ কথা না মনে করে কুমু থাকতে পারল না। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে, খুব কঠিন মার। শুনেছে এমন সন্ন্যাসী আছে যারা কণ্টকশয্যায় শুয়ে থাকে, ও সেইরকম করে শুতে রাজি, যদি তাতে কোনো ফল পায়। কোনো যোগী কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয় তা হলে চিরদিন তার কাছে বিকিয়ে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যায়? যদি মেয়েমানুষ না হত তা হলে যা হয় একটা কিছু উপায় সে করতই। কিন্তু মেজদাদা কী করছেন? একলা দাদার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে ইংলণ্ডে বসে আছেন?

কুমু ঘরে ঢুকে দেখে বিপ্রদাস কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে আছে। এমন করলে শরীর কি সারতে পারে! বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।

দাদার শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কুমু বললে, "মেজদাদা কবে আসবেন?"

"তা তো বলতে পারি নে।"

"তাকে আসতে লেখো-না।"

"কেন বল্ দেখি!"

"সংসারের সমস্ত দায় একলা তোমারই ঘাড়ে, এ তুমি বইবে কী করে?

"কারও -বা থাকে দাবি, কারও- বা থাকে দায়; এই দুই নিয়ে সংসার। দায়টাকেই আমি আমার করেছি, এ আমি অন্যকে দেব কেন?"

"আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম জোর করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতুম।"

"তা হলেই তো বুঝতে পারছিস কুমু, দায় ঘাড়ে নেবার একটা লোভ আছে। তুই নিজে নিতে পারছিস নে বলেই তোব মেজদাদাকে দিয়ে সাধ মেটাতে চাস। কেন, আমিই -বা কী অপরাধ করেছি।"

"দাদা, তুমি টাকা ধার করতে এসেছ?"

"কিসের থেকে বুঝলি?"

"তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। আচ্ছা, আমি কি কিছুই করতে পারি নে?"

"কী করে বলো?"

"এই মনে করো, কোনো দলিলে সই করে। আমার সইয়ের কি কোনা দামই নেই?"

"খুবই দাম আছে; সে আমাদের কাছে, মহাজনের কাছে নয়।"

"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বলো, আমি কি করতে পারি।"

"লক্ষ্মী হয়ে শাস্ত হয়ে থাক, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, মনে রাখিস সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ। তুফানের মুখে নৌকো ঠিক রাখাও যেমন একটা কাজ, মাথা ঠিক রাখাও তেমনি। আমার এসরাজটা নিয়ে আয়, একটু বাজা।"

"দাদা, আমার বড়ো ইচ্ছে করছে একটা কিছু করি।"

"বাজানোটা বুঝি একটা কিছু নয়।"

"আমি চাই খুব একটা শক্ত কাজ।"

"দলিলে নাম সই করার চেয়ে এসরাজ বাজানো অনেক বেশি শক্ত। আন যন্ত্রটা।"



৪৮

একদিন মধুসূদনকে সকলেই যেমন ভয় করত, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিল তেমনি। ভিতরে ভিতরে মধুসূদন তার দিকে কখনো কখনো যেন টলেছে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ করেছিল। কিন্তু কোন দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে যে ওর কাছে যাওয়া যায় তা ঠাহর করতে পারত না। হাতড়ে হাতড়ে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে, প্রত্যেকবার ফিরেছে ধাক্কা খেয়ে। মধুসূদন একনিষ্ঠ হয়ে ব্যাবসা গড়ে তুলেছিল, কাঞ্চনের সাধনায় কামিনীকে সে অত্যন্তই তুচ্ছ করেছে, মেয়েরা সেইজন্যে ওকে অত্যন্তই ভয় করত। কিন্তু এই ভয়েরও একটা আকর্ষণ আছে। দুরু দুরু বক্ষ এবং সংকুচিত ব্যবহার নিয়েই শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ একটা আবরণের আড়ালে মুগ্ধমনে মধুসূদনের কাছে কাছে ফিরেছে। এক-একবার যখন অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়েছে, সেই সময়েই যথার্থ ভয়ের কারণ ঘটেছে; তার অনতিপরেই কিছুদিন ধরে বিপরীত দিক থেকে মধুসূদন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ওর জীবনে মেয়েরা একেবারেই হেয়। তাই এতকাল শ্যামাসুন্দরী নিজেকে খুবই সংযত করে রেখেছিল।

মধুসূদনের বিয়ের পরে থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা করত, তা হলে সেটা একরকম সহ্য হত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখলে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদন ও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে, তখন সংযম রক্ষা তার পক্ষে তার সহজ রইল না। এ কয়দিন সাহস করে যখন একটু একটু এগিয়ে আসছিল, দেখেছিল এগিয়ে আসা চলে। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বাধা পেয়েছে কিন্তু সেও দেখলে কেটে যায়। মধুসূদনের দুর্বলতা ধরা পড়েছে, সেইজন্যেই শ্যামার নিজের মধ্যেও ধৈর্য বাঁধ মানতে আর পারে না। কুমু চলে আসবার আগের রাত্রে মধুসূদন শ্যামাকে যত কাছে টেনেছিল এমন তো আর কখনোই হয় নি। তার পরেই ওর ভয় হল পাছে উলটো ধাক্কাটা জোরে এসে লাগে। কিন্তু এটুকু শ্যামা বুঝেনিয়েছে যে, ভীরুতা যদি না করে তবে ভয়ের কারণ আপনি কেটে যাবে।

সকালেই মধুসূদন বেরিয়ে গিয়েছিল, বেলা একটা পেরিয়ে বাড়ি এসেছে। ইদানীং অনেক কাল ধরে স্নানাহারের নিয়মের এমন ব্যতিক্রম ঘটে নি। আজ বড়োই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বাড়িতে যেই এল, প্রথম কথাই মনে হল, কুমু তার দাদার ওখানে চলে গেছে এবং খুশি হয়েই চলে গেছে। এতকাল মধুসূদন আপনাতে আপনি খাড়া ছিল, কখন এক সময়ে ঢিল দিয়েছে, শরীরমনের আতুরতার সময় কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আশ্রয় করবার সুপ্ত ইচ্ছা ওর মনে উঠেছে জেগে, সেইজন্যেই অনায়াসে কুমুর চলে যাওয়াতে ওর এমন ধিক্কার লাগল। আজ ওর খাবার সময়ে শ্যামাসুন্দরী ইচ্ছা করেই কাছে এসে বসে নি; কী জানি কাল রাত্রে নিজেকে ধরা দেবার পরে মধুসূদন নিজের উপর পাছে বিরক্ত হয়ে থাকে। খাবার পর মধুসূদন শূন্য শোবার ঘরে এসে একটুখানি চুপ করে থাকল, তার পরে নিজেই শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। শ্যামা লাল রঙের একটা বিলিতি শাল গায়ে দিয়ে যেন একটু সংকুচিতভাবে ঘরে ঢুকে একধারে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। মধুসূদন ডাকলে, "এসো, এইখানে এসো, বসো।"

শ্যামা শিয়রের কাছে বসে "তোমাকে যে বড়ো রোগা দেখাচ্ছে আজ" বলে একটু ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুসূদন বললে, "আঃ, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা।"

রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এল শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে বললে, "আহা, তুমি একলা।" শ্যামাসুন্দরী একটু যেন স্পর্ধার সঙ্গেই কোনো আর আবরণ রাখতে দিলে না। যেন অসংকোচে



সবাইকে সাক্ষী রেখেই ও আপনার অধিকার পাকা করে তুলতে চায়। সময় বেশি নেই, কবে আবার কুমু এসে পড়বে, তার মধ্যে দখল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দখলটা প্রকাশ্য হলে তার জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখলে চলবে না। অবস্থাটা দেখতে দেখতে দাসীচাকরদের মধ্যেও জানাজানি হল। মধুসূদন মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যতবড়ো জোরে চাপা ছিল, ততবড়ো জোরেই তা অবারিত হল, কাউকে কেয়ার করলে না, মত্ততা খুব স্থূলভাবেই সংসারে প্রকাশ করে -দিলে।

নবীন মোতির মা দুজনেই বুঝলে এ বান আর ঠেকানো যাবে না।

"দিদিকে কি ডেকে আনবে না? আর কি দেরি করা ভালো?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। দাদার হুকুম নইলে তো উপায় নেই। দেখি চেষ্টা করে।"

যেদিন সকালে কৌশলে দাদার কাছে কথাটা পাড়বে বলে নবীন এল, দেখে যে দাদা বেরোবার জন্যে প্রস্তুত, দরজার কাছে গাড়ি তৈরি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় বেরোচ্ছ নাকি?"

মধুসূদন একটু সংকোচ কাটিয়ে বললে, "সেই গনৎকার বেঙ্কটস্বামীর কাছে।"

নবীনের কাছে দুর্বলতা চাপা রাখতেই চেয়েছিল। হঠাৎ মনে হল ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই সুবিধা হতে পারে। তাই বললে, 'চলো, আমরা সঙ্গে।"

নবীন ভাবলে, সর্বনাশ। বললে, "দেখে আসি গে সে বাড়িতে আছে কি না। আমার তো বোধ হচ্ছে সে দেশে চলে গেছে, অন্তত সেইরকম তো কথা।"

মধুসূদন বললে, "তা বেশ তো, দেখে আসা যাক-না।"

নবীন নিরুপায় হয়ে সঙ্গে চলল, কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনলে।

গনৎকারের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই নবীন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে একটু উঁকি মেরেই বললে, "বোধ হচ্ছে কেউ যেন বাড়িতে নেই।"

যেমন বলা, সেই মুহূর্তেই স্বয়ং বেঙ্কটস্বামী দাঁতন চিবোত চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল। নবীন দ্রুত তার গা ঘেঁষে প্রণাম করে বললে, "সাবধানে কথা কবেন।"

সেই এঁদো ঘরে তক্তপোশে সবাই বসল। নবীন বসল মধুসূদনের পিছনে। মধুসূদন কিছু বলবার আগেই নবীন বলে বসল, "মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে, কবে গ্রহশান্তি হবে বলে দাও শাস্ত্রীজি।"

মধুসূদন নবীনের এই ফাঁস-করে-দেওয়া প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে তার উরুতে খুব একটা টিপনি দিলে।

বেঙ্কটস্বামী রাশিচক্র কেটে একেবারে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলে মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে।

গ্রহের নাম জেনে মধুসূদনের কোনো লাভ নেই, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা শক্ত। যে যে মানুষ ওর সঙ্গে শত্রুতা করছে স্পষ্ট করে তাদেরই পরিচয় নাই, বর্ণমালার যে বর্গেই পড়ুক নাম বের করতে হবে। নবীনের মুশকিল এই যে, সে মধুসূদনের আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ইশারাতেও সাহায্য খাটবে না। বেঙ্ককস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায় আর মধুসূদনের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়। আজকের দিনের নামের বেলায় ভৃগুমুনি সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ শাস্ত্রী বলে বসল, শত্রুতা করছে একজন স্ত্রীলোক।

নবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই স্ত্রীলোকটি যে শ্যামাসুন্দরী এইটে কোনোমতে খাড়া করতে পারলে আর ভাবনা নেই। মধুসূদন নাম চায়। শাস্ত্রী তখন বর্ণমালার বর্গ শুরু করলে। 'ক' বর্গ



শব্দটা বলে যেন অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে রইল— কটাক্ষে দেখতে লাগল মধুসূদনের দিকে। 'ক' বর্গ শুনেই মধুসূদনের মুখে ঈষৎ একটু চমক দিলে। ও দিকে পিছন থেকে 'না' সংকেত করে নবীন ডাইনে বাঁয়ে লাগাল ঘাড়া-নাড়া। নবীনের জানাই নেই যে মাদ্রাজে এ সংকেতের উলটো মানে। বেঙ্কটস্বামীর আর সন্দেহ রইল না— জোরগলায় বললে, 'ক'বর্গ। মধুসূদনের মুখ দেখে ঠিক বুঝেছিল 'ক' বর্গের প্রথম বর্ণটাই। তাই কথাটাকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রী বলে, এই কয়ের মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু।

এর পরে পুরো নাম জানবার জন্য পীড়াপিড়ী না করে ব্যগ্র হয়ে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "এর প্রতিকার?"

বেঙ্কটস্বামী গম্ভীরভাবে বলে দিলে, "কণ্ঠকেনৈব কণ্টকং— অথাৎ উদ্ধার করবে অন্য একজন স্ত্রীলোক।

মধুসূদন চকিত হয়ে উঠল। বেঙ্কটস্বামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করেছে।

নবীন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজি, ঘোড়দৌড় মহারাজের ঘোড়াটা কি জিতেছে?"

বেঙ্কটস্বামী জানে অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না, একটু হিসাবের ভান করে বলে দিলে, "লোকসান দেখতে পাচ্ছি।"

কিছুকাল আগেই মধুসূদনের ঘোড়া মস্ত জিত জিতেছে। মধুসূদনকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, 'স্বামীজি, আমার কন্যাটার কীগতি হবে?"বলা বাহুল্য, নবীনের কন্যা নেই।

বেঙ্কটস্বামী নিশ্চয় ঠাওরালে পাত্র খুঁজছে। নবীনের চেহারা দেখেই বুঝলে মেয়েটি অপ্সরা নয়। বলে দিলে, পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে।

মধুসূদনকে একটু অবসর না দিয়ে পরে পরে দশ-বারোটা অসংগত প্রশ্নের অদ্ভুত উওর বের করে নিয়ে নবীন বললে, "দাদা, আর কেন? এখন চলো।"

গাড়িতে উঠে নবীন বলে উঠল, "দাদা, ওর সমস্ত চালাকি। ভণ্ড কোথাকার!"

"কিন্তু সেদিন যে—"

"সেদিন ও আগে থাকতে খবর নিয়েছিল।"

"কেমন করে জানলে যে আমি আসব?"

"আমারই বোকামি। ঘাট হয়েছে ওর কাছে তোমাকে এনেছিলুম।"

জ্যোতিষীর প্রতারণার প্রমাণ যতই পাক, 'ক'বর্গের কু মধুসূদনের বিঁধে রইল। ভেবে দেখলে যে, নক্ষত্র অনাদর করে খুচরো প্রশ্নের যা তা জবাব দেয়, কিন্তু আদত প্রশ্নের জবাবে ভুল হয় না। মধুসূদন যার প্রত্যাশাই করে নি সেই দুঃসময় ওর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এল। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কী হবে?

নবীন আস্তে আস্তে কথা পাড়ল, "দাদা, দুই সপ্তাহ তো কেটে গেল, এইবার বউরানীকে আনিয়ে নিই।"

"কেন, তাড়া কিসেরে? দেখো নবীন, তোমাকে বলে রাখলুম আর কখনোই এ-সব কথা আমার কাছে তুলবে না। যেদিন আমার খুশি আমি আনিয়ে নেব।"

নবীন দাদাকে চেনে, বুঝলে এ কথাটা খতম হয়ে গেল।

তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, "মেজোবউ যদি বউরানীকে দেখতে যায় তা হলে কী দোষ আছে?"

মধুসূদন অবজ্ঞা করে সংক্ষেপে বললে, "যাক-না।"



৪৯

ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস বললে, "আসুন নবীন বাবু, এইখানে বসুন।"

নবীন বললে, "আমার পরিচয়টা পান নি বোধ হচ্ছে। মনে করেছেন আমি রাজবাড়ির কোন্ আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান করে আমায় আশীর্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেছেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেছেন!"

"শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।"

কুমু ঘরে ঢুকেই বললে, "ঠাকুরপো, চলো কিছু খাবে।"

"খাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে পড়ে থাকবে।"

"শর্তটা কী শুনি।"

"আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাই নি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ঐ তো সামনেই ঝুলছে!"

ভালো ছবি দৈবাৎ হয় থাকে, কুমুর ঐ ছবিটি তেমনি যেন দৈবের রচনা। কপালে যে আলোটি পড়লে কুমুর মনের চেহারাটি মুখে প্রকাশ পায়, সেই আলোটিই পড়েছিল। ললাটে নির্মল বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা। দাঁড়ানো ছবি। কুমুর সুন্দর ডান হাতটি একটা শূন্য চৌকির হাতার উপরে। মনে হয় যেন সামনে ও আপনারই একটা দূরকালের ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিজের এই ছবিটি কুমুর চোখে পড়ে নি। কলকাতা থেকে ছবিওয়ালা আনিয়ে বিবাহের কয়দিন আগে ওর দাদা এটি তুলিয়েছিল। তার পরে নিজের ঘরে ছবিটি টাঙিয়েছে, এইটেতে কুমুর হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। ফোটোগ্রাফের কপি আরো নিশ্চয় আছে, তাই দাদার মুখের দিকে চাইলে। নবীন বললে, "বুঝতে পারছেন বিপ্রদাসবাবু, বউরানীর দয়া হয়েছে। দেখুন-না, ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য বলেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।"

বিপ্রদাস হেসে বললে, "কুমু, আমার ঐ চামড়ার বাক্সয় আরো খানকয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।"

কুমু নবীনকে খাওয়াতে নিয়ে গেলে পর কালু এল ঘরে। বললে, "আমি মেজোবাবুকে তার করেছি, শীঘ্র চলে আসবার জন্যে।"

"আমার নামে?"

"হ্যাঁ, তোমারই নামে দাদা। আমি জানি, তুমি শেষ পর্যন্ত হাঁ-না করবে, এ দিকে সময় বড়ো কঠিন হয়ে আসছে। ডাক্তারের কাছে যা শোনা গেল, তোমার উপর এত চাপ সইবে না।"

ডাক্তার বলেছে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, শরীরমন শান্ত রাখা চাই। এক সময়ে বিপ্রদাসের যে অতিরিক্ত কুস্তির নেশা ছিল এটা তারই ফল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মনের উদ্‌বেগ।

সুবোধকে এরকম জোর-তলব করে ধরে আনা ভালো হবে কিনা বিপ্রদাস বুঝতে পারলে না; চুপ করে ভাবতে লাগল। কালু বললে, "বড়োবাবু, মিথ্যে ভাবছ, বিষয়কর্মের একটা শেষ ব্যবস্থা



এখনই করা চাই, আর এতে তাঁকে না হলে চলবে না। বারো পার্সেন্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারব না। তারা আবার দু লাখ টাকা আগাম সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তার উপর দালালি আছে।"

বিপ্রদাস বললে, "আচ্ছা, আসুক সুবোধ। কিন্তু আসবে তো?"

"যতবড়ো সাহেব হোক-না, তোমার তার পেলে সে না এসে থাকতে পারবে না। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, বললে, "মধুসূদন না ডেকে পাঠালে যাবার বাধা আছে।"

"কেন, খুকি কি মধুসূদনের পাটখাটা মজুর? নিজের ঘরে যাবে তার আবার হুকুম কিসের?"

আহার সের নবীন একলা এল বিপ্রদাসের ঘরে। বিপ্রদাস বললে, "কুমু তোমাকে স্নেহ করে।"

নবীন বললে, "তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য বলেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।"

"তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।"

"কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে বলতে আমার বাধবে।"

"কুমু যে এখানে এসেছে আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।"

"আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।"

"অনাদর ঘটেছে তবে?"

"সেই লজ্জায় এসেছি। আর তো কিছুই পারি নে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।"

"কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি?

"সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করি নে।"

ঠিক যে কী হয়েছে বিপ্রদাস সে কথা নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে না। মনে করলে, জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে। কুমুকেও প্রশ্ন করে কোনো কথা বের করতে বিপ্রদাসের অভিরুচি নেই। মনের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কালুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তো ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা কর, মধুসূদনের সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় কিছু জান।"

"কিছু আভাস পেয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ না জেনে তোমার কাছে কিছু বলতে চাই নে। আর দুটো দিন সবুর করো, খবর তোমাকে দিতে পারব।"

আশঙ্কায় বিপ্রদাসের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রতিকার করবার কোনো রাস্তা তার হাতে নেই বলে দুশ্চিন্তাটা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিতে লাগল।

৫০

কুমু অনেকদিন যেটা একান্ত ইচ্ছা করেছিল সে ওর পূর্ণ হল; সেই পরিচিত ঘরে, সেই ওর দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে এল ফিরে, কিন্তু দেখতে পেলে ওর সেই সহজ জায়গাটি নেই। এক-একবার অভিমানে ওর মনে হচ্ছে যাই ফিরে, কেননা, ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি রয়েছে, 'ও ফিরে যাচ্ছে না কেন, কী হয়েছে ওর?' দাদার গভীর স্নেহের মধ্যে ঐ একটা উৎকণ্ঠা, সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে স্পষ্ট আলোচনা চলে না, তার বিষয় ও নিজে, অথচ ওর কাছে সেটা চাপা রইল।

বিকেল হয়ে আসছে, রোদ্দুর পড়ে এল। শোবার ঘরের জানলার কাছে কুমু বসে। কাকগুলো ডাকাডাকি করছে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর লোকালয়ের নানা কলরব। নতুন বসন্তের হাওয়া শহরের ইঁটকাঠের উপর রঙ ধরাতে পারলে না। সামনের বাড়িটাকে অনেকখানি আড়াল



করে একটা পাতবাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারই ঘনসবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্ণের আলোটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে লাগল। এইরকম সময়েই পোষা হরিণী তার অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁওয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের দিকে। যা-কিছু চার দিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে, আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইশারার মধ্যে, মন তাকেই বলে সব চেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করছে সব-কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু এ কী বেড়া! আজ এ বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর করে তুললে। মনে মনে বললে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরণ, চলেছি তারই অভিসারে, দিনের পর দিনে--- কত দীর্ঘ পথ কত দুঃখের পথ। মনে পড়ে গেল, দাদার অসুখ বেড়েছে-সেবা করতে এসে আমি অসুখ বাড়িয়েছি, এখন আমি যা করতে যাব তাতেই উলটো হবে। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থামলে স্থির করলে বাড়ি ফিরে যাবে, তা যা হয় তাই হবে -- সব সহ্য করবে- -শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে আঁকড়ে ধরল ততই ওর বোধ হল জীবনের ভার একেবারে দুর্বহ হবে না, গুন গুন করে গাইতে লাগল—

পথপর রয়নি অঁধেরী,
কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা।

দুপুরবেলা কুমু দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, এতক্ষণে ওষুধ আর পথ্য খাওয়াবার সময় হয়েছে। ঘরে বসে দেখলে বিপ্রদাস উঠে বসে পোর্টফোলিয়ো কোলে নিয়ে সুবোধকে ইংরেজিতে এক লম্বা চিঠি লিখছে, ভর্ৎসনার সুরে কুমু তাকে বললে, "দাদা, আজ তুমি ভালো করে ঘুমোও নি।"

বিপ্রদাস বললে, "তুই ঠিক করে রেখেছিস ঘুমোলেই বিশ্রাম হয় ! মন যখন চিঠি লেখার দরকার বোধ করে তখন চিঠি লিখলেই বিশ্রাম।"

কুমু বুঝলে, দরকারটা ওকে নিয়েই। সমুদ্রের এপারে এক ভাইতে ব্যাকুল করেছে, সমুদ্রের ওপারে আর-এক ভাইকে ছট্‌ফটিয়ে দেবে, কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল তাদের এই বোন! দাদাকে চা-খাওয়ানো হলে পর আস্তে আস্তে বললে, "অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাওয়া ঠিক করেছি।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে কথাটা কী ভাবের। এতদিন দুই ভাইবোনের মধ্যে যে স্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল আজ আর তা নেই, এখন মনের কথার জন্যে হাতড়ে বেড়াতে হয়। বিপ্রদাস লেখা বন্ধ করলে। কুমুকে পাশে বসিয়ে কিছু না বলে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কুমু তার ভাষা বুঝল। সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার একটুকুও অভাব হয় নি। চোখ দিয়ে জল পড়তে চাইল, জোর করে বন্ধ করে দিলে। কুমু মনে মনে বললে, এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না। তাই আবার বললে, "দাদা, আমি যাওয়া ঠিক করেছি।"

বিপ্রদাস কী জবাব দেবে ভেবে পেলে না, কেননা কুমুর যাওয়াটাই হয়তো ভালো, অন্তত সেটাই তো কর্তব্য। চুপ করে রইল। এমন সময় কুকুরটা ঘুম থেকে জেগে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে বিপ্রদাসের প্রসাদ রুটির টুকরোর জন্য কাকুতি জানালে।

রামস্বরূপ বেহারা এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। কুমু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, "আজ



দিনে তোমার ঘুম হয় নি, তার উপরে কালুদার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমি বরঞ্চ যাই, কিছু যদি কথা থাকে শুনে নিই গে, তার পরে তোমাকে সময়মত এসে জানাব।"

"ভারি ডাক্তার হয়েছিস তুই! একজনের কথা যদি আর-একজন শুনে নেয় তাতে রোগীর মনে খুব সুস্থির হয় ভেবেছিস?"

"আচ্ছা আমি শুনব না, কিন্তু আজ থাক্।"

"কুমু, ইংরেজ কবি বলেছে, শ্রুত সংগীত মধুর, অশ্রুত সংগীত মধুরতর। তেমনি শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হতে পারে, কিন্তু অশ্রুত সংবাদ আরো অনেক ক্লান্তিকর, অতএব অবিলম্বে শুনে নেওয়াই ভালো।"

"আমি কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই আসব, আর তখনো যদি তোমার কথাবার্তা না থামে তবে আমি তার মধ্যেই এসরাজ বাজাব— ভীমপলশ্রী।"

"আচ্ছা, তাতেই রাজি।"

আধঘন্টা পরে এসরাজ হাতে করেই কুমু ঘরে ঢুকল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের ভাব দেখে তখনই এসরাজটা দেয়ালের কোণে ঠেকিয়ে রেখে দাদার পাশে বসে তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে দাদা?"

কুমু এতদিন বিপ্রদাসের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল তার মধ্যে একটা গভীর বিষাদ ছিল। বিপ্রদাসের জীবন দুঃখতাপ অনেক গেছে, কেউ তাকে সহজে বিচলিত হতে দেখে নি। বই পড়া, গানবাজনা করা, দুরবীন নিয়ে তারা দেখা, ঘোড়ায় চড়া, নানা জায়গা থেকে অজানা গাছপালা নিয়ে বাগান করা প্রভৃতি নানা বিষয়েই তার উৎসুক্য থাকাতে সে নিজের সম্বন্ধীয় দুঃখকষ্টকে নিজের মধ্যে কখনো জমতে দেয় নি। এবার রোগের দুর্বলতায় তাকে নিজের ছোটো গণ্ডির মধ্যে বড়ো বেশি করে বদ্ধ করেছে। এখন সে বাইরে থেকে সেবা ও সঙ্গ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমত না পেলে উদ্‌বিগ্ন হয়, ভাবনাগুলো দেখতে দেখতে কালো হয়ে ওঠে। তাই দাদার 'পরে কুমুর স্নেহ আজ যেন মাতৃস্নেহের মতো রূপ ধরেছে—তার অমন ধৈর্যগম্ভীর আত্মসমাহিত দাদার মধ্যে কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এল, এত আবদার, এত চাঞ্চল্য, এত জেদ। অর সেইসঙ্গে এমন গভীর বিষাদ আর উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কুমু এসে দেখলে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েছে। তার চোখে যে আগুন জ্বলছে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়—সে তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে দগ্ধ করা চাই। কুমুর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের দেয়ালে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বিপ্রদাস চুপ করে বসে রইল।

কুমু আর খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলে, দাদা, কী হয়েছে বলো।"

বিপ্রদাস যেন এক দূর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।"

"তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো-একজন মেয়ের নয়।"

কুমু ভালো করে তার দাদার কথার মানে বুঝতে পারলে না।

বিপ্রদাস বললে, "ব্যথাটাকে আমারই আপনার মনে করে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারছি, এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সকলের হয়ে।"

বিপ্রদাসের ফ্যাকাশে গৌরবর্ণ মুখের উপর লাল আভা এল। ওর কোলের উপর রেশমের



কাজ-করা একটা চৌকো বালিশ ছিল সেটাকে ঠেলে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে দিল। বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওয়ালা চৌকির উপর বসতে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধরে বললে, "শান্ত হও দাদা, উঠো না, তোমার অসুখ বাড়বে।" বলে একটু জোর করেই পিঠের দিকের উঁচু-করা বালিশের উপর বিপ্রদাসকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলে।

বিপ্রদাস গায়ের কাপড়টাকে মুঠো দিয়ে চেপে ধরে বললে, "সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি? ও বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।"কালুর কাছ থেকে বিপ্রদাস আজ অনেক কথা শুনেছে।

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের যে সম্বন্ধ ঘটেছে তার মধ্যে অপ্রকশ্যতা আর ছিল না। ওরা দুই পক্ষই অকুণ্ঠিত। লোকে ওদেরকে অপরাধী মনে করছে মনে করেই ওরা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে। এই সম্বন্ধটার মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ কিছুই ছিল না বলেই পরস্পরকে এবং লোকমতকে বাঁচিয়ে চলা ওদের পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। শোনা গেছে শ্যামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনো কখনো মেরেওছে, শ্যামা যখন তারস্বরে কলহ করেছে তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই বলেছে, 'দূর হয়ে যা বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।' কিন্তু এতেও কিছু আসে যায় নি। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে, ইচ্ছে করে মধুসূদন নিজে তাকে যা দিয়েছে শ্যামা যখনই তার বেশি কিছুতে হাত দিতে গেছে অমনি খেয়েছে ধমক। শ্যামার ইচ্ছে ছিল সংসারের কাজে মোতির মা'র জায়গাটা সে'ই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্যামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেন শীতকালের বহুব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্যামাকে সামলিয়ে চলবার একটুও দরকার নেই; তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মনপ্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো বলে মানে, ওর জন্যে সব সইতে সব করতে সে রাজি, এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুন মধুসূদনের আত্মমর্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাকতে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।

মধুসূদনের এই আধুনিক ইতিহাসটা জানবার জন্যে কালুকে খুব বেশি সন্ধান করতে হয় নি। ওদের বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট বলাবলি চলেছিল, অবশেষে নিতান্ত অভ্যস্ত হওয়াতে বলাবলির পালাও একরকম শেষ হয়ে এসেছে।

খবরটা শোনবামাত্র বিপ্রদাসকে যেন আগুনের তীর মারলে। মধুসূদন কিছু ঢাকবার চেষ্টামাত্র করে নি, নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ—স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম। স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয় নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কী রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর!

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।"

কুমু বললে, "দাদা, তুমি কোন অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।"



বিপ্রদাস বললে, "তুই কি তবে সব কথা জানিস নে?"

কুমু বললে, "না।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, "মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। কেন তা জানিস?"

কুমু কিছু না বলে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "চিরজীবন মা যা দুঃখ পেয়েছিলেন আমি তা কোনোমতে ভুলতে পারি নে, আমাদের ধর্মবুদ্ধিহীন সমাজ সেজন্যে দায়ী।"

এইখানে ভাইবোনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কুমু তার বাবাকে খুব বেশি ভালোবাসত, জানত তাঁর হৃদয় কত কোমল। সমস্ত অপরাধ কাটিয়েও তার বাবা ছিলেন খুব বড়ো এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারত না, এমন-কি, তার বাবার জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল সেজন্যে সে তার মাকেই মনে মনে দোষ দিয়েছে।

বিপ্রদাসও তার বাবাকে বড়ো বলেই ভক্তি করেছে। কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পান নি এটা সে কোনোমতে ক্ষমা করতে পারলে না। তার মাও ক্ষমা করেন নি বলে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।

বিপ্রদাস বললে, "আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবি নে।"

কুমু মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, "বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে কথা ভুলো না দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জনা হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তা মানি, কিন্তু এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি এত সহজে মায়ের সম্মানহানি করতে পারতেন, সে পাপ সমাজের। সমাজকে সেজন্য ক্ষমা করতে পারব না, সমাজের ভালোবাসা নেই, আছে কেবল বিধান।"

"দাদা, তুমি কি কিছু শুনেছ?"

"হাঁ শুনেছি, সে-সব কথা তোকে আস্তে আস্তে পরে বলব।"

"সেই ভালো। আমার ভয় হচ্ছে আজকেকার এই-সব কথাবার্তায় তোমার শরীর আরো দুর্বল হয়ে যাবে।"

"না কুমু, ঠিক তার উলটো। এতদিন দুঃখের অবসানে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।"

"কিসের লড়াই দাদা?"

"যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।"

"তুমি তার কী করতে পার দাদা?"

"আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরো আরো কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই শুরু হল কুমু। এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর-কারও সঙ্গে আপস করে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।"

"আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা কোয়ো না।"

এমন সময় খবর এল, মোতির মা এসেছে।



৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বসল। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হয়ে এল, বেহারা এল আলো জ্বালতে, কুমু নিষেধ করে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে; চুপ করে রইল।

মোতির মা বললে, "বাড়িতে ভূতে পেয়েছে বউরানী, ওখানে টিকে থাকা দায়। তুমি কি যাবে না?"

"আমার কি ডাক পড়েছে?"

"না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চলবেই না।"

"আমার কি করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী করব?"

"বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।"

"সংসার বলতে কী বোঝ ভাই? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েছি, এখন কি ঐ-সব বাইরের জিনিস নিয়ে লোভ করা চলে?"

"কী বলছ ভাই বউরানী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?"

"সব কথা ভালো করে বুঝতে পারছি নে। আর কিছুদিন আগে হলে ঠাকুরের কাছে সংকেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়েমুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাটল না। আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি নে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।"

"তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?"

"কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।"

"আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা বলে দেখব। দেখি তিনি কি বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?"

"চলো-না, এখনই নিয়ে যাচ্ছি।"

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তার চেহারা দেখে মোতির মা থমকে দাঁড়াল, মনে হল যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চূড়ো-ভাঙা মন্দির। ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, "এই যে চৌকি আছে।"

মোতির মা মাথা নেড়ে বললে, "না, এখানে বেশ আছি।"

ঘোমটার ভিতর থেকে তার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগল। বুঝতে পারলে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজছে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ করে দেবার জন্যে বললে, "দাদা, ইনি বিশেষ করে এসেছেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।"

মোতির মা বললে, "না না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেছি ওঁর চরণ দর্শন করতে।"

কুমু বললে, "উনি জানতে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না।"



বিপ্রদাস উঠে বসল; বললে, "সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কী করে?" যদি ক্রোধের সুরে বলত তা হলে কথাটার ভিতরকার আগুন এমন করে জ্বলে উঠত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস্ ফিস্ করে কী বললে। তার অভিপ্রায় ছিল পাশে বসে কুমু তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হল না, বললে, "তুমিই গলা ছেড়ে বলো।"

মোতির মা স্বর আর-একটু স্পষ্ট করে বললে, "যা ওঁর আপনারই, কেউ তাকে পরের করে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক-না।"

"সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। তাঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হত।"

এমন কথার কী জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ-যে উলটো কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়ের যে বাঁচে না; পুরষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।"

"স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্তী-সম্রাটেরও না।"

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালোবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মা'র কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর-অপমানও না-হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন-কি, তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটাকে মোতির মা স্পর্ধা মনে করে। মেয়েজাতের এত গুমর কেন? মধুসূদন যত অযোগ্য হোক যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষমানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে?

মোতির মা বললে, "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।"

"যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।"

"মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল,তা তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

বিপ্রদাস বুঝতে পারলে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তার পরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থতা। না—মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নিচু করে বসে ছিল। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না বলে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বললে, "একটা কথা তোকে বলি কুমু, বোঝবার চেষ্টা



করিস। ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস। তুই যখন বিশেষ করে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস কোনোদিন বাধা দিই নি, কেবল বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে করে সমাজে শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এরকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারছিস নে, এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। যত-সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।"

কুমু মাথা নিচু করেই বললে, "দাদা, তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?"

"অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না -এই আমার মত।"

"যদি করে, স্ত্রী কি তাই বলে—"

কুমুর কথা শেষ না হতেই বিপ্রদাস বললে, "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।"

মোতির মা একটু অধৈর্যের স্বরেই বললে, "আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।"

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, "তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবছ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন?"

কুমু তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তুমি আর কথা কোয়ো না। তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুতেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।"

বিপ্রদাস বললে, 'সেইজন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিনীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র বলেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো করেই মানে।"

কুমু বললে, "কী করব দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেইজন্যেই ভাবি দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।"



বিপ্রদাস কিছুই বললে না, চুপ করে বসে রইল।

সেই ওর চুপ করে বসে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠিক করলে বউরানী?"

কুমু বললে, "যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।"

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্তই হল। শ্বশুরবাড়ির প্রতি ওর শ্রদ্ধা যে বেশি তা নয়, তবে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে। সেখানকার কোনো বউ যে তাকে লঙঘন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগল না। কুমুকে যা বললে তার ভাবটা এই, পুরুষমানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তার অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েছি তাকে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। 'ওরা ঐরকমই' বলে মনটাকে তৈরি করে নিয়ে যেমন করে হোক সংসারটাকে চালানোই চাই। কেননা সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক, সংসারটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হলে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে বললে, "না হয় তাই হল। মরণের অপরাধ কী?"

মোতির মা উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলে উঠল, 'অমন কথা বোলো না।"

কুমু জানে না, অল্পদিন হল ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার এম. এ. পাস-করা স্বামী—গবর্মেণ্ট আপিসে বড়ো চাকরি করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রুপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেছে, মা'র কাছ থেকে এই নালিশ শুনে লোকটা তাকে লাথি মেরেছিল। মোতির মা'র সেই কথা মনে পড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময় নবীনের প্রবেশ। কুমু খুশি হয়ে উঠল। বললে, "জানতুম ঠাকুরপোর আসতে বেশি দেরি হবে না।"

নবীন হেসে বললে, "ন্যায়শাস্ত্রে বউরানীর দখল আছে, আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকে নি।"

মোতির মা বললে, "বউরানী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ। ও বুঝে নিয়েছে ওকে দেখলে তুমি খুশি হও, সেই দেমাকে—"

"আমাকে দেখলেও খুশি হতে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!"

"ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা-কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, এখন আমি চললুম।"

মোতির মা বললে, "সে কি কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়িভাড়া করে ও কি আমাকে দেখতে এসেছে ভেবেছ?"

"না, ওর জন্যে খাবার বলে দিই গে।" বলে কুমু চলে গেল।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু খবর আছে বুঝি?"

"আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চলে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা



গিল্টি-করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যার অধিকারে সেটা এসেছে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা বলেই ঠাউরেছেন, নইলে পরকাল খোয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জান তো তুচ্ছ একটা জিনিস নড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিতটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা একদমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আমার ডেস্কের উপর বউরানীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থমকে গেলেন। বুঝলুম আড়-চাহনিটাকে সিধে করে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্ছে। বললুম, "দাদা, একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মা'র ছোটো ভাজের সাধ তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হতে পারে। খুব বেশি হয় তো ন-টাকা সাড়ে ন-টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।"

মোতির মা অবাক হয়ে বললে, "ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বলতে তোমার আজকাল দেখছি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েছেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।"

"বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।"

"পণ করেছি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন করে যাব, বউরানীর চরণে এই আমার দান।"

"কিন্তু সাড়ে ন-টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখনই-তখনই তোমার জুটল কোথায়?"

"কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বললুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেছে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারই কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারও হলে ছবিটা খাঁ করে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।"

"তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে না-হয় সেটা দিতেই।"

"তা দিয়েছি, কিন্তু সহজ মনে দিই নি। বললেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েলপেন্টিং করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীনভাবে বললে, আচ্ছা দেখা যাবে। বলেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। তার পরে কী হল ঠিক জানি নে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয় নি, আর ঐ ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখি নে।"

"তোমার বউরানীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছ, তখন না-হয় একখানা ছবিই বা খোওয়ালে।"

"স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল ঠিক সেই শুভযোগটি ঐ ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঐ ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি করে দেখা যায়।"

"দেখো, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?"

"ভয় যদি থাকত তা হলেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য



কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হল কী করে? আমি যে ওঁকে বউরানী বলতে পারছি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হল কী করে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।"

"বাস্ রে, বউরানীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।"

"মেজোবউ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।"

"না, কক্খনো না।"

"হাঁ, অল্প একটু। কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নুরনগরে স্টেশনে প্রথম বউরানীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ও-সব তর্ক থাক্, এখন কী বলতে চাচ্ছিলে বলো।"

"আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা বউরানীকে ডেকে পাঠাবেন। বউরানী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চলে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখির কেন লোভ নেই। নির্বোধ পাখি, অকৃতজ্ঞ পাখি!"

"তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান না। সেই কথাই তো ছিল।"

"আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বউরানী যদি যান ভালো হয়, দাদার ঐটুকু অভিমানের না-হয় জিত রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাসবাবু তো চান বউরানী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।"

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কী কথা হয়েছে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বললে, "বিপ্রদাসবাবুর কাছে গিয়ে বলোই-না।"

"তাই যাই, তিনি শুনলে খুশি হবেন।"

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে বললে, "ঘরে ঢুকব কি?"

মোতির মা বললে, "তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।"

"জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।"

"আঃ ঠাকুরপো! এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পার কী করে?"

"নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, বুঝতে পারি নে।"

"আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।"

"খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কয়ে আসি গে।"

"না, সে হবে না।"

"কেন?"

"আজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, আজ আর নয়।"

"ভালো খবর আছে।"

'তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।"

'কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুশি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।"

"আচ্ছা, আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।"



খাওয়া হয়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এল। দেখলে দাদা তখনো ঘুমোয় নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানলা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হু হু করে বইছে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার করে কেঁপে কেঁপে উঠছে; মেঝের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন-তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। আধ-শোওয়া অবস্থায় বিপ্রদাস স্থির হয়ে বসে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েছে, মনে হচ্ছে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হল ওর মতো এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই।

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাই নে। একটি কথা বলে যাব। সময় হয়েছে, এইবার বউরানী ঘরে ফিরে আসবেন বলে আমরা চেয়ে আছি।"

বিপ্রদাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির হয়ে বসে রইল।

খানিক পরে নবীন বললে, "আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে বসেছে। বিপ্রদাস তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বললে, "মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েছে তা হলে যা কুমু।"

কুমু বললে, "না দাদা, যাব না।" বলে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানলা খড়্ খড়্ করছে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্মরিয়ে উঠছে। কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বললে, "চলো আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।"

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বললে, "এতটা কিন্তু ভালো না।"

"অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেমনি হোক-না, চোখটা রাঙা হয়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।"

"না গো না, ওটা ওঁদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবাই উপরে।"

"মেজোবউ, এতবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।"

"তাই বলে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে!"

"আত্মীয়স্বজন বললেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধরে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ হয়।"

"যিনি যতবড়ো লোকই হোন-না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।"

নবীন বুঝতে পারলে এই আলোচনার মধ্যে কুমুর 'পরে মোতির মা'র একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না করে বললে, "আর কিছুদিন দেখাই যাক-না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।"

৫৩

মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা হয়েছে বলেই শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা করতে পারত, কিন্তু সে কথা অনুভব করতে পারছে না। বাড়ির চাকরবাকরদের 'পরে ওর কর্তৃত্বের দাবি জন্মেছে বলে প্রথমটা ও মনে করেছিল, কিন্তু পদে পদে বুঝতে পারছে যে তারা ওকে মনে মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। ওকে সাহস করে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা দেখাতে পারলে তারা যেন বাঁচে এমনি অবস্থা। সেইজন্যেই শ্যামা তাদেরকে যখন-তখন অনাবশ্যক ভর্ৎসনা ও অকারণে ফরমাশ করে



কেবলই তাদের দোষত্রুটি ধরে। খিট্ খিট্ করে। বাপ মা তুলে গাল দেয়। কিছুদিন পূর্বে এই বাড়িতেই শ্যামা নগণ্য ছিল, সেই স্মৃতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেলবার জন্যে খুব কড়াভাবে মাজাঘষার কাজ করতে গিয়ে দেখে যে সেটা সয় না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার তর্জন না সইতে পেরে কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিয়ে শ্যামাকে মাথা হেঁট করতে হল। তার কারণ, নিজের ধনভাগ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আছে। যে-সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্তী, তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে ও দুর্লক্ষণ মনে করে। অনুরূপ কারণেই সেই সময়কার একটা মসীচিহ্নিত অত্যন্ত পুরোনো ডেস্ক অসংগতভাবে আপিসঘরে হাল আমলের দামি আসবাবের মাঝখানেই অসংকোচে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দোয়াত আর-একটা সস্তা বিলিতি কাঠের কলম, যে কলমে সে তার ব্যবসায়ের নবযুগে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম সই করেছিল। সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না, উলটে সে লোকটার ভাগ্যে বকশিশ জুটে গেল। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখতে হল। শ্যামার মুশকিল এই মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্ সীমায় স্পর্ধায় এসে পৌঁছোবে খুব ভয়ে ভয়ে তারই আন্দাজ করে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদার-ঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সংকোচ করলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প। অথচ শ্যামাকে নিয়ে ওর একটা স্থূল রকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে ষোল-আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অনায়াসে সামলিয়ে চলতে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়- এর ব্যতিক্রম হলে বন্ধন ছিঁড়ে যেত। কর্মের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কর্মের জন্যে ওর সব চেয়ে দরকার অবিচলিত আত্মকর্তৃত্ব। তারই সীমার মধ্যে শ্যামার কর্তৃত্ব প্রবেশ করতে সাহস পায় না, অল্প একটু পা বাড়াতে গিয়ে উচোট খেয়ে ফিরে আসে। শ্যামা তাই কেবলই আপনাকে দানই করে, দাবি করতে গিয়ে ঠকে। টাকাকড়ি-সাজসরঞ্জামে শ্যামা চিরদিন বঞ্চিত---তার 'পরে ওর লোভের অন্ত নেই। এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা করে চলতে হয়। এতবড়ো ধনীর কাছে যা অনায়াসে প্রত্যাশা করতে পারত তাও ওর পক্ষে দুরাশা। মধুসূদন মাঝে মাঝে এক-একদিন খুশি হয়ে ওকে কাপড়চোপড় গহনাপত্র কিছু কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের ক্ষুধা মেটে না। ছোটোখাটো লোভের সামগ্রী আত্মসাৎ করবার জন্যে কেবলই হাত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেখানেও বাধা। এইরকমেরই একটা সামান্য উপলক্ষে কিছুদিন আগে ওর নির্বাসনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্যামার সঙ্গ ও সেবা মধুসূদনের অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল---পানতামাকের অভ্যাসেরই মতো সস্তা অথচ প্রবল। সেটাতে ব্যাঘাত ঘটলে মধুসূদনের কাজেরই ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কায় এবারকার মতো শ্যামার দণ্ড রদ হল। কিন্তু দণ্ডের ভয় মাথার উপর ঝুলতে লাগল।

নিজের এইরকম দুর্বল অধিকারের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই ছিল কবে আবার কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে। এই ঈর্ষার পীড়নে তার মনে একটুও শান্তি নেই। জানে কুমুর সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা চলবেই না, ওরা এক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে, তার ব্যবহার আছে মূল্য নেই। এই নিয়ে শ্যামা অনেক কান্নাই কেঁদেছে, কতবার মনে করেছে আমার মরণ হলেই বাঁচি। কপাল চাপড়ে বলেছে এত বেশি সস্তা হলুম কেন? তার পরে ভেবেছে সস্তা বলেই জায়গা পেলুম, যার দর বেশি তার আদর বেশি, যে সস্তা সে হয়তো সস্তা বলেই জেতে।



মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করে নি তখন শ্যামার এত অসহ্য দুঃখ ছিল না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম করে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হত। আজ অধিকার পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘটছে না। হারাই হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের রেল-লাইন এমন কাঁচা করে পাতা যে, ডিরেলের ভয় সর্বত্রই এবং প্রতি মুহূর্তেই! মোতির মা'র কাছে মন খোলাখুলি করে সান্ত্বনা পাবার জন্যে একবার চেষ্টা করেছিল। সে এমনি একটা ঝাঁঝের সঙ্গে মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে যে, তার একটা কোনো সাংঘাতিক শোধ তুলতে পারলে এখনই তুলত, কিন্তু জানে সংসার-ব্যবস্থায় মধুসূদনের কাছে মোতির মা'র দাম আছে, সেখানে একটুও নাড়া সইবে না। সেই অবধি দুজনের কথা বন্ধ, পারতপক্ষে মুখ দেখাদেখি নেই। এমনি করে এ বাড়িতে শ্যামার স্থান পূর্বের চেয়ে আরো সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কোথাও তার একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।

এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর দেয়ালে হেলানো কুমুর ফোটোগ্রাফ। যে বজ্র মাথায় পড়বে তারই বিদ্যুৎশিখা ওর চোখে এসে পড়ল। যে মাছকে বঁড়শি বিঁধেছে তারই মতো করে ওর বুকের ভিতরটা ধড়্‌ফড়্ ধড়্‌ফড়্ করতে লাগল। ইচ্ছা করে ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল, মুখ বিবর্ণ, দুই চোখে একটা দাহ, মুঠো দৃঢ় করে বন্ধ। একটা কিছু ভাঙতে, একটা কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ ঘরে থাকলে এখনই কিছু একটা লোকসান করে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে চাদরখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।

রাত হয়ে এল। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলবার শক্তি নেই যে যাব না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে একটা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেল শোবার ঘরে। ছবিটা যাতে চোখে না পড়ে এই তার চেষ্টা। কিন্তু ঠিক সেই ছবিটার সামনেই বাতি-- সমস্ত আলো যেন কারও দীপ্ত দৃষ্টির মতো ঐ ছবিকে উদ্‌ভাসিত করে আছে। সমস্ত ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটিই সব চেয়ে দৃশ্যমান। শ্যামা নিয়মমত পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যে-কোনো কারণেই হোক আজ মধুসূদন প্রসন্ন ছিল। বিলাতি দোকানের থেকে একটা রুপোর ফোটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিল। গম্ভীরভাবে শ্যামাকে বললে, "এই নাও।" শ্যামাকে সমাদর করবার উপলক্ষেও মধুসূদন মধুর রসের অবতারণায় যথেষ্ট কার্পণ্য করে। কেননা সে জানে ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিলেই ও আর মর্যাদা রাখতে পারে না। ব্রাউন কাগজে জিনিসটা মোড়া ছিল। আস্তে আস্তে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে বললে, "কী হবে এটা?"

মধুসূদন বললে, "জান না, এতে ফোটোগ্রাফ রাখতে হয়।"

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, বললে, "কার ফোটোগ্রাফ রাখবে?"

"তোমার নিজের। সেদিন সেই যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।"

"আমার এত সোহাগে কাজ নেই।" বলে সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য হয়ে বললে, "এর মানে কী হল?"

"এর মানে কিছুই নেই।" বলে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠল, তার পরে বিছানা থেকে মেঝের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। মধুসূদন ভাবল, শ্যামার কম দামের জিনিস পছন্দ হয় নি, ওর বোধ করি ইচ্ছে ছিল একটা দামি গয়না পায়। সমস্ত দিন আপিসের কাজ সেরে এসে এই উপদ্রবটা একটুও ভালো লাগলো না। এ-যে প্রায় হিস্‌টিরিয়া। হিস্‌টিরিয়ার 'পরে ওর বিষম অবজ্ঞা। খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, "ওঠো বলছি, এখনই ওঠো!"



শ্যামা উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মধুসূদন বললে, "এ কিছুতেই চলবে না।"

মধুসূদন শ্যামাকে বিশেষ ভাবেই জানে। নিশ্চয় ঠাওরেছিল একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে মাপ চাইবে— সেই সময়ে খুব শক্ত করে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দশটা বাজল, শ্যামা এল না। আর-একবার শ্যামার ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "মহারাজ বোলায়া।"

শ্যামা বললে, "মহারাজকে, বলো আমার অসুখ করেছে।"

মধুসূদন ভাবলে, আস্পর্ধা তো কম নয়, হুকুম করলে আসে না।

মনে ঠিক করে রেখেছিল আরো খানিক বাদে আসবে। তাও এল না। এগারোটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি, বিছানা ছেড়ে মধুসূদন দ্রুত পদে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বেশ দেখা গেল—শ্যামা মেজের উপর পড়ে আছে। মধুসূদন ভাবলে এ-সমস্ত কেবল আদর-কাড়বার জন্যে।

গর্জন করে বললে, "উঠে এসো বলছি, শীঘ্র উঠে এসো। ন্যাকামি কোরোনা।"

শ্যামা কিছু না বলে উঠে এল।

৫৪

পরদিন আপিসে যাবার আগে খাবার পরে শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে এসেই মধুসূদন দেখলে ছবিটি নেই। অন্যদিনের মতো আজ শ্যামা পান দিয়ে মধুসূদনের সেবার জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। আজ সে অনুপস্থিতও। তাকে ডেকে পাঠানো হল। বেশ বোঝা গেল, একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে এল। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "টেবিলের উপর ছবি ছিল, কি হল?"

শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করে বললে, "ছবি! কার ছবি?"

ভানের পরিমাণটা কিছু বেশি হয়ে পড়ল। সাধারণত পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তির 'পরে মেয়েদের অশ্রদ্ধা অছে বলেই এতটা সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদন ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "ছবিটা দেখ নি!"

শ্যামা নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললে, "না, দেখি নি তো।"

মধুসূদন গর্জন করে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা বলছ।"

'মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কী।"

"কোথায় রেখেছ বের করে নিয়ে এসো বলছি। নইলে ভালো হবে না।"

"ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব?"

বেহারাকে ডাক পড়ল। মধু তাকে বললে। "মেজোবাবুকে ডেকে আনো।"

নবীন এল। মধুসূদন বললে, "বড়োবউকে আনিয়ে নাও।"

শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল।

নবীন খানিকক্ষণ পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বল তা হলে বউরানী খুশি হবেন।"

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ গুড়গুড়ি টেনে বললে, "আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাব।"

নবীন মোতির মা'র কাছে এসে বললে, "একটা কাজ করে ফেলেছি।"

"আমার পরামর্শ না নিয়েই?"

"পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।"



"তা হলে তো দেখছি তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"অসম্ভব নয়। কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এইজেন্য সর্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—দাদা আজ হুকুম করলেন বউরানীকে আনানো চাই। আমি ফস্ করে বলে বসলেম, তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোল ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন রাজি হয়ে গেলেন। তার পর থেকেই ভাবছি এর ফলটা কী হবে।"

"ভালো হবে না, বিপদাসবাবুর যেরকম ভাবখানা দেখলুম কী বলতে কী বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন?"

"প্রথম কারণ বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেদিন বউরানী যখন বললেন, 'আমি যাব না', তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ণ শরীর নিয়ে কলকাতায় এলেন তবু একদিনের জন্যে মহারাজ দেখতে গেলেন না, এই অনাদরটা তাঁর মনে সব চেয়ে বেজেছিল।"

শুনেই মোতির মা একটু চমকে উঠল, কথাটা কেন যে আগে তার মনে পড়ে নি এইটেই তার আশ্চর্য লাগল। আসলে নিজের অগোচরেও শ্বশুরবাড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে ওর একটা অহংকার আছে।

অন্য সাধারণ লোকের মতো মহারাজ মধুসূদনের কুটুম্বিতার দায়িত্ব আছে এ কথা তার মন বলে না।

সেদিনকার তর্কের অনুবৃত্তিস্বরূপে নবীন একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে বললে, "নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।"

"কী রকম শুনি।"

"ঐ যে সেদিন বললে, কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো। তাই মনে করতে সাহস হল যে মহারাজার মতো অতবড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।"

মোতির মা হার মানতে রাজি নয়, কথাটাকে উড়িয়ে দিলে, "কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পার! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাব দেখি।"

"গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে ঠকতে হয়। আশু ভাবা উচিত প্রথম কর্তব্যটা কী। সেটা হচ্ছে বিপ্রদাসবাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হতে পারে তার উপায় এখনই চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতিচিন্তাশীলতা।"

"কী জানি, আমার বোধ হচ্ছে মুশকিল বাধবে।"

৫৫

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে কুমু তার দাদার ঘরে বসে গানবাজনা করেছে। সকালবেলাকার সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিস হয়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপগুলো যেমন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হয়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তার রূপ বদলে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"



এমন সময়ে খবর এল, 'মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।''

এক মুহূর্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজল, বললে, ''কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।''

কুমু দ্রুতপদে চলে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে করেই খবর না দিয়েই এসেছে। এ পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার সংকল্পের মধ্যে। বড়ো ঘরের লোক বলে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে বলে মুধসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা সে সইতে পারে না। তাই আজ সে এমনভাবে এল যেন দেখা করতে আসে নি, দেখা দিতে এসেছে।

মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হয়ে এমনতরো বেশ। ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙিন ফুলকাটা ওয়েস্টকোর্ট, কাঁধের উপর পাট-করা চাদর, যত্নে, কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্নিশ-করা কালো দরবারি জুতো, বড়ো বড়ো হীরেপান্নাওয়ালা আংটিতে আঙুল ঝল্‌মল্‌ করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন করে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি শৌখিন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতির মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের পাশের একটা কেদারায় বসে বললে, ''কেমন আছেন বিপ্রদাসবাবু, শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।''

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, ''তোমার শরীর ভালোই আছে দেখছি।''

''বিশেষ ভালো যে তা বলতে পারি নে— সন্ধের দিকটা মাথা ধরে, আর খিদেও ভালো হয় না। খাওয়াদাওয়া অল্প একটু অযত্ন হলেই সইতে পারি নে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ঐটেতে সব চেয়ে দুঃখ দেয়।''

শুশ্রূষার লোকের যে সর্বদা দরকার তারই ভূমিকা পাওয়া গেল।

বিপ্রদাস বললে, ''বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।''

''এমনিই কী! আপিসের কাজকর্ম আপনিই চলে যাচ্ছে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। ম্যাক্‌নটন্‌ সাহেবের উপরেই বেশীর ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।''

গুড়গুড়ি এল, পানের বাটায় পান ও মসলা নিয়ে চাকর এসে দাঁড়াল, তার থেকে একটি ছোটো এলাচ নিয়ে মুখে পুরল, আর কিছু নিলে না। গুড়গুড়ির নল নিয়ে দুই-একবার মৃদু মৃদু টান দিলে। তার পরে গুড়গুড়ির নলটা বাঁ হাতে কোলের উপরেই ধরা রইল। আর তার ব্যবহার হল না। অন্তঃপুর থেকে খবর এল জলখাবার প্রস্তুত। ব্যস্ত হয়ে বললে, ''ঐটে তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।''

বিপ্রদাস দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না। চাকরকে বললে, ''পিসিমাকে বলো গে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবে না।''

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। মধুসূদন আশা করেছিল, কুমুর কথা আপনিই উঠবে। এতদিন হয়ে গেল, এখন কুমুকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনিই উদ্‌বিগ্ন হয়ে করবে— কিন্তু কুমুর নামও করে না যে! ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে রাগ জন্মাতে লাগল। ভাবলে এসে ভুল করেছি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনই গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

এমন সময়ে সাদাসিধে সরু কালাপেড়ে একখানি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে কুমু ঘরে



প্রবেশ করলে। বিপ্রদাস এটা আশা করে নি। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে স্বামীর, পরে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাশের ঘরে এসো।"

মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে পড়ল। কোল থেকে গুড়গুড়ির নলটা মাটিতে পড়ে গেল। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চেয়েই বললে, "আচ্ছা, তবে আসি।"

প্রথম ঝোঁকটা হল হন্ হন্ করে গাড়িতে উঠে বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু মন পড়েছে বাঁধা। অনেকদিন পরে আজ কুমুকে দেখেছে। ওকে অত্যন্ত সাদাসিধে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখলে। ওকে এত সুন্দর আর কখনো দেখে নি। এমন সংযত এত সহজ। মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিল পোশাকি মেয়ে, যেন বাইরের মেয়ে, এখানে সে একেবারে ঘরের মেয়ে। আজ যেন ওকে অত্যন্ত কাছের থেকে দেখা গেল। কী স্নিগ্ধ মূর্তি! মধুসূদনের ইচ্ছে করতে লাগল একটু দেরি না করে এখনই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারই, ও আমার ঘরের, আমার ঐশ্বর্যের আমার সমস্ত দেহমনের, এই কথাটা উলটেপালটে বলতে ইচ্ছে করে।

পাশের ঘরে একটা সোফা দেখিয়ে কুমু যখন বসতে বললে, তখন ওকে বসতেই হল। নিতান্ত যদি বাইরের ঘর না হত তা হলে কুমুকে ধরে সোফায় আপনার পাশে বসাত। কুমু না বসে একটা চৌকির পিছনে তার পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে কিছু বলতে চাও?"

ঠিক এমন সুরে প্রশ্নটা মধুসূদনের ভালো লাগল না, বললে, "যাবে না বাড়িতে?"

"না।"

মধুসূদন চমকে উঠল— বললে, "সে কী কথা।"

"আমাকে তোমার তো দরকার নেই।"

মধুসূদন বুঝলে শ্যামাসুন্দরীর খবরটা কানে এসেছে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগল। বললে, "কী যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?"

এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে কুমুর প্রবৃত্তি হল না। সংক্ষেপে আর একবার বললে, "আমি যাব না।"

"মানে কী? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না- -?"

কুমু সংক্ষেপে বললে, "না।"

মধুসূদন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কী! যাবে না। যেতেই হবে।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন বললে, "জান পুলিশ ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে? 'না' বললেই হল!"

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদন গর্জন করে বললে, "দাদার স্কুলে নুরনগরি কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে?"

কমু দাদার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বললে, "চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।"

"কেন? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জান এই মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি?"

পরক্ষণেই কুমু দেখে ওর দাদা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বালাময়, একটা মোটা সাদা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কুমুকে ডেকে বললে, "আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।"



মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠলে, বললে, "মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা। তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।"

ঘরে গিয়ে বিপ্রদাস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, কিন্তু ঘুমে নয়, ক্লান্তিতে ও চিন্তায়।

কুমু শিয়রের কাছে বসে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এমনি করে অনেকক্ষণ কাটলে পর ক্ষেমাপিসি এসে বললে, "আজ কি খেতে হবে না কুমু? বেলা যে অনেক হল।"

বিপ্রদাস চোখ খুলে বললে, "কুমু, যা খেতে যা। তোর কালুদাকে পাঠিয়ে দে।"

কুমু বললে, "দাদা, তোমার পায়ে পড়ি এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

বিপ্রদাস কিছু না বলে গভীর বেদনার দৃষ্টিতে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে নিশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজলে। কুমু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা দিল ভেজিয়ে।

একটু পরেই কালু খবর পাঠালে যে আসতে চায়। বিপ্রদাস উঠে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। কালু বললে, "জামাই এসে অল্পক্ষণ পরেই তো চলে গেল। কী হল বলো তো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?"

"হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।"

কালু বিষম ভীত হয়ে বললে, "বল কী দাদা! এ যে সর্বনেশে কথা!"

"সর্বনাশকে আমরা কোনোকালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।"

"তা হলে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায়? জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্তত দু লাখ টাকা লোকসান করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো ও তোমাদের পৈতৃক শখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই; তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে। কিন্তু বাঁচব কী করে?"

বিপ্রদাস উঁচু বাঁ-হাঁটুর উপর ডান পা তুলে দিয়ে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে খানিকক্ষণ ভাবলে। অবশেষে চোখ খুলে বললে, "দলিলের শর্ত অনুসারে মধুসূদন ছ মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে --তখন একটা উপায় হতে পারবে।"

কালু একটু বিরক্ত হয়েই বললে, "উপায় হবে বৈকি। বাতিগুলো এক দমকায় নিবত, সেইগুলো একে একে ভদ্ররকম করে নিববে।"

"বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্বলছে, এখন যে-ফরাশ এসে তাকে যেরকম ফুঁ দিয়েই নেবাক না---তাতে বেশি হা-হুতাহ করবার কিছু নেই। ঐ তলানির আলোটার তদ্‌বির করতে আর ভালো লাগে না, ওর চেয় পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।

কালুর বুকে ব্যথা বাজল। সে বুঝলে এটা অসুস্থ মানুষের কথা, বিপ্রদাস তো একরকম হালছাড়া প্রকৃতির লোক নয়। পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতদিন নানারকম প্ল্যান করছিল। তার বিশ্বাস ছিল কাটিয়ে উঠবে। আজ ভাবতেও পারে না—বিশ্বাস করবারও জোর নেই।

কালু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা করবার আমিই করব। যাই একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।"

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরেজী চিঠি এল—মধুসূদনের লেখা। ভাষাটা ওকালতি ছাঁদের—হয়তো বা অ্যাটর্নিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। নিশ্চিত করে জানতে চায় কুমু ওদের ওখানে ফিরে আসবে কি না, তার পরে যথাকর্তব্য করা হবে।



বিপ্রদাস কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুমু, ভালো করে সব ভেবে দেখেছিস?"

কুমু বললে, "ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্ছে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি— মাঝে যা-কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।"

"যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর্ করে সামলাতে পারবি?"

"তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারব।"

"এইজন্য জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হলে যত দেরি করে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েছে কি?"

"কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মাকে, হাবলুকে ভালোবাসি। কিন্তু তারা ঠিক যেন অন্য বাড়ির লোক।"

"দেখ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোর উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে-বাইরে চারি দিকে নিন্দের তুফান উঠবে তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।"

"দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না?"

"অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে? যদি জানি যে, যে ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে। বাবা তোকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনার দরকার আছে তা তিনি মনেই করতে না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ করে তুলেছি। তোর বাপ-মা'র চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে কী আজ তা বুঝতে পারছি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস তা হলে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে থাকব? যদি আমার ছোটো ভাই হতিস তা হলে যেমন করে থাকতিস তেমনি করেই চিরদিন থাক্-না আমার কাছে।"

দাদার বুকের কাছে খাটের প্রান্তে মাথা রেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কুমু বললে, "কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হয়ে থাকব না? ঠিক বলছ?"

কুমুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিপ্রদাস বললে, "ভার কেন হবি বোন? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমরা সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন করে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা ছাড়া জানিস আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে, অনেক দিন থেকে পারসি পড়বার শখ আমার আছে। একলা পড়তে ভালে লাগে না। তোকে নিয়ে পড়ব, তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস।"

শুনতে শুনতে কুমুর মন পুলকিত হয়ে উঠল, এর চেয়ে জীবনে সুখ আর কিছু হতে পারে না।

খানিক পরে বিপ্রদাস আবার বললে, "আরো-একটা কথা তোকে বলে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই



আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।"

কুমুর চোখে জল এল, বললে, "আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।"

বিপ্রদাস মধুসূদনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।

৫৬

দুদিন পরেই নবীন মোতির মা হাবলুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। হাবলু জ্যাঠাইমার কোলে চড়ে তার বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিলে। কান্নাটা কিসের জন্যে স্পষ্ট করে বলা শক্ত— অতীতের জন্যে অভিমান, না বর্তমানের জন্যে, আবদার, না ভবিষ্যতের জন্যে ভাবনা?

কুমু হাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললে, "কঠিন সংসার গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে! কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে ভালোবাসা আপনাকে দেয় তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস; জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।" বলে তার গালে চুমো খেলে।

নবীন বললে, "বউরানী, এবার রজবপুরে পৈতৃক ঘরে চলেছি; এখানকার পালা সাঙ্গ হল।"

কুমু ব্যাকলু হয়ে বললে, "আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।"

নবীন বললে, "ঠিক তার উলটো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই করছিল। বেঁধে-সেধে তৈরি হয়ে ছিলুম, এমন সময়ে তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব করেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।"

সেদিন মধুসূদন ফিরে গিয়ে তুমুল একটা বিপ্লব বাধিয়েছিল তা বোঝা গেল।

নবীন যাই বলুক, কুমুই যে ওদের সংসারের সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে মোতির মা'র তাতে সন্দেহ নাই, আর সেই অপরাধ সে সহজে ক্ষমা করতে চায় না। তার মত এই যে, এখনো কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট করে, তার পরে যত লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। গলা বেশ একটু কঠিন করেই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেছ?"

কুমু তার উত্তরে শক্ত করেই বললে, "না, যাব না।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে তোমার গতি কোথায়?"

কুমু বললে, "মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো-এক জায়গায় আমারও একটুখানি ঠাঁই হতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।"

কুমু বুঝতে পারছিল, মোতির মা'র মন ওর কাছ থেকে অনেক খানি সরে এসেছে। নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, তা হলে কী করবে এখন?"

"নদীর ধারে কিছু জমি আছে তার থেকে মোটা ভাতও জুটবে, কিছু হাওয়া খাওয়াও চলবে।"

মোতির মা উষ্মার সঙ্গেই বললে, "ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ঐ মির্জাপুরের অন্নজলে দাবি রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগী হয়ে চলে যাবে। তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই বলে রাখলুম।"

নবীন একটু ক্ষুণ্ন হয়ে বললে, "সে কথা জানি মেজোবউ, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করি নে।



পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হয়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।"

বস্তুত নবীন অনেকবারই দাদার আশ্রয় ছেড়ে গ্রামে চাষবাসের সংকল্প করেছে। মোতির মা মুখে তর্জনগর্জন করেছে, কাজের বেলায় কিছুতেই সহজে নড়তে চায় নি, নবীনকে বারে বারে আটকে রেখেছে। সে জানে ভাশুরের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি আছে। ভাশুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। তার মতে ভাশুর অন্যায় করতে পারে কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না। কুমুর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যেমনই হোক তাই বলে কুমু স্বামীর ঘর অস্বীকার করতে পারে, এ কথা মোতির মা'র কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া।

খবর এল ডাক্তার এসেছে। কুমু বললে, "একটু অপেক্ষা করো, শুনে আসি ডাক্তার কী বলে।"

ডাক্তার কুমুকে বলে গেল, নাড়ি আরো খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেছে, বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্ছে না।

অতিথিদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় কালু এসে বললে, "একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে, জাল বড়ো জটিল হয়ে এসেছে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরো ঘনিয়ে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি নে।"

কুমু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বললে, "তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেছে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।"

কুমু বারান্দায় রেলিং চেপে ধরে বললে, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।" এই বলে কুমু দ্রুতপদে চলে গেল।

দাদার ঘরে যখন কুমু ছিল, সেই অবকাশে ক্ষেমাপিসির সঙ্গে মোতির মা'র কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে দুজনেরই মনে সন্দেহ হয়েছে কুমু গর্ভিণী। মোতির মা খুশি হয়ে উঠল, মনে মনে বলল, মা কালী করুন তাই যেন হয়। এইবার জব্দ! মানিনী শ্বশুরবাড়িকে অবজ্ঞা করতে চান, কিন্তু এ যে নাড়িতে গ্রন্থি লাগল, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন করে!

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোতির মা তার সন্দেহের কথাটা বললে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে হাত মুঠো করে বললে, "না না, এ কখনোই হতে পারে না, কিছুতেই না।"

মোতির মা বিরক্ত হয়েই বললে, "কেন হতে পারবে না ভাই; তুমি যতবড়ো ঘরেরই মেয়ে হও-না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল-বংশের ইষ্টিদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।"

স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে ভেদটা সব চেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদানগুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইশারায়, যখন কিছুই করছে না তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেইজন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত



দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার বার তলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মতো চারি দিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কতবড়ো হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। কুমু অত্যন্ত উদ্‌বিগ্নমুখে মোতির মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কী করে তুমি নিশ্চয় জানলে?"

মোতির মা'র ভারি রাগ হল, সামলে নিয়ে বললে, "ছেলের মা আমি, আমি জানব না তো কে জানবে? তবু একেবারে নিশ্চয় করে বলবার সময় হয় নি। ভালো দাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।"

নবীন, মোতির মা, হাবলুর যাবার সময় হল। কিন্তু দৈবের এই চরম অন্যায়ের কথা ছাড়া কুমু আর কোনো কিছুতে আজ মন দিতে পারছিল না। তাই খুব সাধারণভাবেই শ্বশুরাবাড়ির বন্ধুদের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হল। নবীন যাবার সময় বললে, "বউরানী, সংসারে সব জিনিসেরই অবসান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা করবার যে অধিকার হঠাৎ একদিনে পেয়েছি সে যে এমন খাপছাড়াভাবে হঠাৎ আর-একদিন শেষ হতে পারে, সে কথা ভাবতেও পারি নে। আবার দেখা হবে।" নবীন প্রণাম করলে, হাবলু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল, মোতির মা মুখ শক্ত করে রইল, একটি কথাও কইলে না।

৫৭

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেল। দাই এল, সন্দেহ রইল না যে কুমুর গর্ভাবস্থা। মধুসূদনের কানেও সংবাদ পৌঁচেছে। মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই জমেছে. ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেছে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এ সংসারে তার কর্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোবে। মনটা যতই খুশি হল ততই অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব কুমুর উপর থেকে সরিয়ে বোঝাই করলে বিপ্রদাসের উপর। দ্বিতীয় একখানা চিঠি তাকে লিখলে, শুরু করলে whereas দিয়ে, শেষ করলে Your obedient servant মধুসূদন ঘোষাল সই করে। মাঝখানটাতে ছিল I shall have the painful necessity ইত্যাদি। এরকম ভয়-দেখানো চিঠিতে চাটুজ্যে-বংশের উপর উলটো ফল ফলে, বিশেষত ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে। বিপ্রদাস চিঠিটা দেখালে কালুকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে, "এরকম চিঠিতে আমারই মতো সামান্য লোকের দেহে একেবারে বাদশাহি মাত্রায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অদৃশ্য কোতোয়াল বেটাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, শির লেও উসকো।"

দিনের বেলা নানাপ্রকার লেখাপড়ার কাজ ছিল, সে-সমস্ত শেষ করে সন্ধ্যাবেলা বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু আজ সারাদিন দাদার কাছে আসেই নি। নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোগীর মতো শুয়ে থাকলে মনটা দুর্বল থাকে। সামনের দিকে কুমুর জন্যে একটা ছোটো চৌকি ঠিক করে রেখেছে। আলোটা ঘরের



কোণে একটু আড়াল করে রাখা। মাথার উপর বড়ো একটা টানা পাখা হুস্ হুস্ করে চলছে। বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনো গরম জমে আছে, দক্ষিণে হাওয়া এক-একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই থেমে যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ। সমুদ্রের মোহানায় গঙ্গা যেখানে নীলজলকে ফিরে করে দিয়েছে, অন্ধকারটা যেন সেইরকম। দীর্ঘবিলম্বিত গোধূলির শেষ-আলোটা তখনো তার কালিমার ভিতরে ভিতরে মিশ্রিত। বাগানের পুকুরটা ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে থাকত, কিন্তু খুব একটা জ্বলজ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব আকাশের অঙ্গুলি সংকেতের মতো তাকে নির্দেশ করে দিচ্ছে। গাছতলার নীচে দিয়ে চাকররা ক্ষণে ক্ষণে লণ্ঠন হাতে করে যাতায়াত করছে আর পেঁচা উঠছে ডেকে।

কুমু বোধ হয় একটু ইতস্তত করে একটু দেরি করেই এল। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে বসেই বললে, "দাদা, আমার একটু ও ভালো লাগছে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে।"

বিপ্রদাস বললে, "ভুল বলছিস কুমু, তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।"

"কিন্তু তা হলে—" বলে কুমু থেমে গেল।

"তা জানি—এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?"

"তবে কি যেতে হবে দাদা?'

"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়?"

কুমু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, বিপ্রদাসও কিছু বললে না।

অবশেষে খুব মৃদুস্বরে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে কবে যেতে হবে?"

"কালই, আর দেরি সইবে না।"

"দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারছ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আসতে দেবে না।"

"তা আমি খুবই জানি।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।"

"না কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

"ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনই আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?"

"দাদা, সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।"

"আচ্ছা, আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।"

"তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু মা'র কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছামৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।"



আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। হঠাৎ হু হু করে বাতাস উঠল, টিপায়ের উপর বিপদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো ফর্ ফর্ করে উলটে যেতে লাগল। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভরে।

কুমু বললে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা? সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিই মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যেরকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি, আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারি দিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলে নি জগৎটাকে। এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে— কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর, এ যদি না বুঝতুম তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে কথা বুঝতে পেরেছি।" এই বলেই কুমু চৌকি থেকে নেবে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে পড়ে রইল। রাত বেড়ে চলল, বিপ্রদাস জানালার বাইরে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু এসে দেখে বিপ্রদাস বিছানায় বসে, একটি এসরাজ আছে কোলের উপর, আর একটি পাশে শোওয়ানো। কুমুকে বললে, "নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।" তখনো অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হয়ে অশথপাতার মধ্যে ঝির্ ঝির্ করছে, কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ শুরু করলে, গম্ভীর শান্ত সকরুণ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো। বাজাতে বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, সূর্য দেখা দিল বাগানের পাঁচিলের উপরে। চাকররা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। ঘর সাফ করা হল না। রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এল, দরোয়ান আস্তে আস্তে এসে খবরের কাগজ টিপাইয়ের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দপদে চলে গেল।

অবশেষে বাজনা বন্ধ করে বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারি নে। তুই আজ চলে যাচ্ছিস কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম। শকুন্তলা পড়েছিস—দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি



বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ-অপমান। কিন্তু সেইখানেই থামল না, তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্বাদ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সব অপমানকে প্লাবিত করুক।''

কুমু কোনো কথা বললে না। বিপ্রদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বললে, ''দাদা, তোমার চা রুটি আমি তৈরি করে নিয়ে আসি গে।''

মধুসূদন আজ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে শুভযাত্রার লগ্ন ঠিক করে রেখেছিল। সকালে দশটার কিছু পরে। ঠিক সময়ে জরির-কাজ-করা লাল বনাতের ঘেরাটোপওয়ালা পালকি এল দরজায়, আসাসোটা নিয়ে লোকজন এল, সমারোহ করে কুমুকে নিয়ে গেল মির্জাপুরের প্রাসাদে। আজ সেখানে নহবত বাজছে, আর চলছে ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণবিদায়ের আয়োজন।

মানিক এল বার্লির পেয়ালা হাতে বিপ্রদাসের ঘরে। আজ বিপ্রদাস বিছানায় নেই,জানলার সামনে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির বসে আছে। বার্লি যখন এল কোনো খবরই নিলে না। চাকর ফিরে গেল। তখন ক্ষেমাপিসি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাসের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ''বিপু, বেলা হয়ে গেছে, বাবা।''

বিপ্রদাস চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষেমা পিসির ইচ্ছা ছিল কেমন ধুমধাম করে আদর করে ওরা কুমুকে নিয়ে গেল তার বিস্তারিত বর্ণনা করে গল্প করেন। কিন্তু বিপ্রদাসের গভীর নিস্তব্ধতা দেখে কোনো কথাই বলতে পারলেন না, মনে হল বিপ্রদাসের চোখের সামনে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা।

বিপ্রদাস যখন বলে উঠল পিসি, কালুকে পাঠিয়ে দাও' তখন এই সামান্য কথাটাও অদৃষ্টের একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ ছায়ার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হল। পিসির গা ছম্ ছম্ করে উঠল।

কালু যখন এল, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। বিলেতের চিঠি, সুবোধের লেখা। সুবোধ লিখেছে, বারের ডিনার শেষ না করেই যদি সে দেশে আসে তা হলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তার চেয়ে শেষ-ডিনার সেরে মাঘ-ফাল্গুন নাগাত দেশে ফিরে এলে তার সুবিধে হয়, অনর্থক খরচের আশঙ্কাও বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস বিষয়কর্মের প্রয়োজন ততদিন সবুর করতে পারে।

আজকের দিনে বিষয়কর্মের সংকট নিয়ে বিপ্রদাসকে পীড়া দিতে কালুর একটুও ইচ্ছে ছিল না। কালু বললে, ''দাদা, এখনো তো টাকা তুলে নেবার কোনো কথা ওঠে নি, আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে না ঘাঁটাই, তা হলে শীঘ্র কোনো উৎপাতে ঘটবে না। যাই হোক, তুমি কোনো ভাবনা কোরো না।''

বিপ্রদাস বললে, ''আমার কোনো ভাবনা নেই কালু, লেশমাত্র না।''

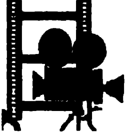
বিপ্রদাসের ভাবনা কালুর ভালো লাগে না—এত অত্যন্ত নির্ভাবনা তার আরো খারাপ লাগে।

বিপ্রদাস খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগল, কালু বুঝলে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে বিপ্রদাসের একটুও ইচ্ছা নেই। অন্যদিন কাজের কথা শেষ হলেই কালু চলে যায়, আজ সে চুপ করে বসে রইল, ইচ্ছা করতে লাগল অন্য কিছু কথা বলে, যা হয় কোনো একটা সেবায় লেগে যায়, জিজ্ঞাসা করলে, ''বাইরের দিকে ঐ জানলাটা বন্ধ করে দেব কি? রোদ্দুর আসছে।''

বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে যে, দরকার নেই।

কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই, এ শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভালো করে বোঝাতে পারছে না।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন



❑ ১৯৬০ সাল।
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন—রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ (১৮৯১) সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
সাদা কালো। ১৪ রিল। ৩৫ মি মি।
চিত্রনাট্য—বিনয় চট্টোপাধ্যায়।
পরিচালনা—অগ্রদূত।
প্রযোজনা—অগ্রদূত চিত্র।
চিত্রগ্রাহক—বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ।
শিল্প নির্দেশক—সত্যেন রায়চৌধুরী।
সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সঙ্গীত পরিচালনা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
কণ্ঠদানে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
অভিনয়ে—রাইচরণ—উত্তমকুমার, রাইচরণের স্ত্রী—সুমিতা সান্যাল, অনুকূলবাবু—অসিতবরণ, তাঁর স্ত্রী—দীপ্তি রায়। এছাড়া জহর গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, মাস্টার বাবুয়া, শোভা সেন, সুমিতা দাশগুপ্ত প্রমুখ।
পরিবেশনা—পরশমল দীপচাঁদ।
মুক্তি—২৮ এপ্রিল, ১৯৬০, উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে্ বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে ; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন ; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, ''মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।''

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব



চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যায়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক, শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারের জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো, দেখো ও-- ই দেখো পাখি, ওই উড়ে- - এ গেল। আয় রে পাখি, আয় আয়।" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলবর করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।



রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধরে গেল—এটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল -দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু—লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না ; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া অসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চার দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু—খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানি নে, মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে, এমন-কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত, দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না—যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—"তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল, প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্মল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জড়ির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'



এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল—সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত ; এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদাই খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, "আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসাতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, "জয় হোক, মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

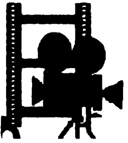
অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—"

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কী রে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশু আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষুধিত পাষাণ



❑ ১৯৬০ সাল।

ক্ষুধিত পাষাণ —রবীন্দ্র ছোটগল্প। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩০২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১২ রিল। ৩৫ মি.মি।

চিত্রনাট্য—মন্মথ রায়।

পরিচালনা—তপন সিংহ।

প্রযোজনা—ইস্টার্ন সার্কিট প্রাইভেট লিমিটেড।

চিত্রগ্রাহক—বিমল মুখোপাধ্যায়।

শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা—সুবোধ রায়।

গীতরচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ভূষণ।

সঙ্গীত পরিচালনা—ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

কণ্ঠদানে—আমির খান, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অরুন্ধতী দেবী, ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, দিলীপ রায়, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ।

পরিবেশনা—ইস্টার্ন সার্কিট প্রাইভেট লিমিটেড।

মুক্তি—৬ মে, ১৯৬০। মিনার, বিজলী ও ছবিঘর।

পুরস্কার—দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র—রাষ্ট্রপতি পুরস্কার; ১৯৬০ সার্টিফিকেট অব মেরিট এবং প্রযোজককে দশ হাজার টাকা ও পরিচালককে আড়াই হাজার টাকা।

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরো ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেনঃ There happen more things in heaven and earth. Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে ; বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো-এক রকমের আলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে—কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।—



রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমনীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড় শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপর একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না।" আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম ; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরীর জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।



সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল—এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল ; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না ; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি— সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে ; শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার



পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুর ঘৃতপক্ক মসলা-সুগন্ধি রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-টুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্ত কার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না ; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল-শূন্যতাভরে অহর্নিশি গম গম করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাঁধিয়া গেল- -যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানালা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহারা ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্বন, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক-দোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চর্তুদিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি- -অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি



বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম— ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ডশূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি-ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনো যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে ; টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিময় বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।



ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্‌রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশপাতি, নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্‌খাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে – এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষেব জনশূন্য পথে "তফাত যাও" "তফাত যাও" কবিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল --কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত কবিতে থাকিতাম—আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যান্ট্‌লুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া—ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে—এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো



চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্‌রান রঙের পায়জামা, এবং দুটি শুভ্ররক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু-তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া—মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত ; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারংবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম- কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না - কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে- -যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও- -কঠিন মায়া, গভীর



নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব ! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ার কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুইন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইযা গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে ; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাব্‌শি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে ; চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম---মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না---যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা



করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি ; বলি, 'হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে, এবার তাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল ; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম- একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই , কাহাকে সান্ত্বনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

দেখিলাম, ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।"

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই ঃ এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব



মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃদ্ধ কহিল, "একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শ্রাবণ ১৩০২

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.... 

১৯৬০-এ 'ক্ষুধিত পাষাণ' নিয়ে ছবি করেন তপনবাবু। এই গল্পের কারুকাজ হল এর অপরূপ, ক্লাসিক ভাষা। অতীত দিনের এক কল্পকাহিনীকে জাদুকরী ভাষার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখের সামনে মূর্ত করে তোলেন। কিন্তু তপনবাবুব এই ছবিটি যেন শেষমেষ ভয়ের পরিবেশই সৃষ্টি করে। ছবিটি যেন ভৌতিক হয়েই প্রতিভাত হয় আমাদের চোখের সামনে। চলচ্চিত্রশিল্প হিসেবে এটি নিঃসন্দেহ উঁচুমানের। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে ব্যর্থ প্রেমের যে হাহাকার তা যেন পরিচালক ঠিকভাবে চলচ্চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে আমাদের হতাশ করেন।

—রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ—নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র সংখ্যা; মে, ২০০৬।

'ক্ষণিকের অতিথি'র পর কী ছবি করব ভাবছি। আমাকে দিয়ে ছবি করানোর জন্য একের পর এক প্রোডিউসার আসছেন আমার কাছে। ঠিক এই সময় একদিন গ্র্যান্ড হোটেল থেকে এক ভদ্রলোকের টেলিফোন এল। নাম বললেন হেমেন গাঙ্গুলি। ফোনে বললেন আমায়, 'আপনাকে দিয়ে আমি একটা ছবি করাতে চাই। আপনি একবার গ্র্যান্ডে আসতে পারবেন? কথাটা বলেই একটু থামলেন। তারপর ফের বললেন, "আপনাকে দিয়ে আমি কী ছবি করাতে চাই সেটা আগে শুনুন। যদি সাবজেক্টটা পছন্দ হয় তবেই আমার কাছে আসবেন, না হলে আসার কোন দরকার নেই। সাবজেক্টটা হল রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'।" নামটা শুনেই ছবিটা করার খুব ইচ্ছে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে জানিয়ে দিলাম যে আমি এখুনি যাচ্ছি তাঁর কাছে।



একে রবীন্দ্রনাথ, তার ওপরে 'ক্ষুধিত পাষাণ' রাতের ঘুম চলে যাবার উপক্রম আমার। তবুও হার মানছি না। 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই আমায় করতে হবে। একটা মস্তবড় চ্যালেঞ্জ এসে গেল। এই প্রথম আমি স্ক্রিপ্ট করলাম সেটের গ্রাফ করে। কাহিনীর গোটা বাড়িটার একটা কল্পিত ছক করে নিয়েছিলাম। সত্যজিৎ রায় এ ব্যাপারে আমাকে দারুণ সাহায্য করেছিলেন। ফতেপুরী আর্ট-এ জাফরির সাজেশনটা সত্যজিৎবাবুই দিয়েছিলেন আমায়। সে আমলে ডিরেক্টরদের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। পরস্পরের প্রতি একটা রেসপেক্ট ছিল। একজন আর একজনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন।

সত্যজিৎবাবু যখনই ছবি করেছেন, বরাবরই প্রথম স্ক্রিনিং-এর সময় আমায় ডাকতেন। ওর সঙ্গে আমার একটা ভাল সম্পর্ক ছিল। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর ভূপালে লোকেশন দেখতে গিয়ে নবাববাড়ির সেই বিশাল বড় বড় পিলার দেখে বিরাট সমস্যায় পড়ে গেলাম। রাতে আউটডোরের নাইট সিকোয়েন্সের শুটিং করব কী করে ওই বিরাট বিরাট থাম আর বিশাল বারান্দা নিয়ে।

নিউ থিয়েটার্স এক সম্বর স্টুডিওর এডিটিং রুমে তখন নিয়মিত আসতেন সত্যজিৎবাবু তাঁর ছবি এডিট করতেন। লোকেশন থেকে ফিরে এসে ভূপালের নবাববাড়ির পিলারের সমস্যার কথা একদিন স্টুডিওর চত্বরে বললাম ওঁকে। সত্যজিৎবাবু শুনে বললেন, 'এ অসম্ভব ব্যাপার! বিদেশে যেমন মিনিয়েচার ফর্মে শুটিং হয়, সেই রকম কিছু ভাবুন তাহলে।' কথাটা বলে তিনি চলে গেলেন এডিটিং রুমে। শেষে আমার আর্ট ডিরেক্টার সুনীতি মিত্রকে বললাম, নবাব বাড়ির সেটের একটা ডিজাইন কর। তবে টিপিক্যাল বাংলা ছবির মতো সেট করতে যাস না।

পরের দিন স্টুডিওর এডিটিং করছি, হঠাৎ দেখি এডিটিং রুমের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎবাবু হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ দিয়ে আমায় বললেন, 'এই যে দেখুন স্কেচটা, চলবে কিনা।'

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলে উনি ওটা দিলেন আমায়। কাগজটা খুলে দেখলাম, আর্চ আর পিলার দিয়ে একটা ডিজাইন করেছেন সত্যজিৎবাবু। বললেন, 'আট-দশটা পিলার দিয়ে মিনিয়েচার ফর্মে এরকম একটা সেট তৈরি করলেই মনে হয় আপনার কাজ চলে যাবে।'

ফতেপুরী আর্ট ছিল সেটা। সত্যজিৎবাবুর ড্রয়িং পেয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আমার। নিশ্চিন্তে তাঁর স্কেচটা সুনীতির হাতে দিয়ে তৈরি করতে বললাম সেটটা। শিল্পী নির্বাচন আগেই করে রেখেছিলাম। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে নিলাম অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, দিলীপ রায় আর বীণা চাঁদকে। রিহার্সাল দেবার পর শুরু করলাম শুটিং ৫৯ সালের শেষে। অরুন্ধতী দেবী আর সৌমিত্রবাবু খুব ভাল কাজ করলেন। রাধামোহনবাবুর অভিনয়, আলি আকবার খাঁ সাহেবের মিউজিক এবং বিমল মুখার্জির ক্যামেরার কাজ ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে রাধামোহনদার নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের কথা আমি আজও ভুলতে পারি না। কী অসামান্য ক্ষমতা ছিল চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে উপযোগী করে নেওয়ার। কী পরিশ্রমই না করেছিলেন ওই করিম খাঁর রোলটার জন্য। আরবি আর ফার্সির ট্রেনিং নিতে দিনের পর দিন তিনি গেছেন ইসলামিয়া কলেজে। ফার্সি ভাষার 'ওমর খৈয়াম' আবৃত্তি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

'ক্ষুধিত পাষাণ' ১৯৬০ সালের ৬ মে মুক্তি পায় মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও শহরতলির অন্যান্য চিত্রগৃহে। কয়েকদিন বাদেই ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, পঁচিশে বৈশাখ। পুরো বর্ষাকাল তখন। অনেকেই বারণ করেছিল ওই সময় ছবিটা রিলিজ না করতে। কিন্তু ছবির প্রযোজক হেমেনবাবু কারও কথা শুনলেন না। বললেন, 'যা হবার হবে, কবিগুরুর জন্মদিনের সপ্তাহেই রিলিজ হবে।'

ছবিটা সুপারহিট করল। চলল সেই পুজো পর্যন্ত।। প্রশংসিতও হল। জাতীয় পুরস্কার পেল দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে। রাধামোহনদা পেয়েছিলেন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের হাত থেকে স্মারক পুরস্কার। পুরস্কৃত হয়েছিল অরুন্ধতী দেবী এবং প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলি। আমার কপালেও জুটেছিল একটা পুরস্কার। ৬০ সালে আয়ার্ল্যান্ডের কোর্ক ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কার হয়। আমার একটাই আক্ষেপ, দেশে বা বিদেশে মিউজিকের জন্য আলি আকবর খাঁ একটা পুরস্কার পেলে আমি খুব খুশি হতাম। বড় ভাল মিউজিক করেছিলেন তিনি।

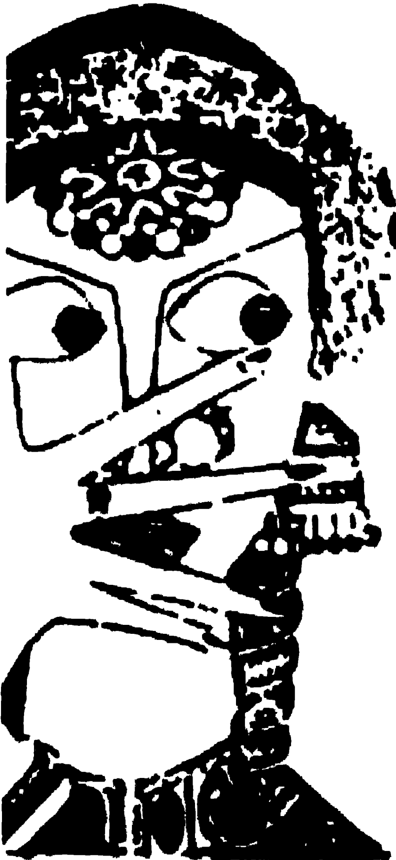
এ প্রসঙ্গে আলি আকবর খাঁ সাহেবের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মিউজিকের ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা বলি। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাগেশ্রী আর কানাড়ার ওপর সব মিউজিক করলে কেমন হয়?



একটু ভেবে আলিদা মুহূর্তের মধ্যে সরোদ বাজিয়ে শোনালেন পাঁচ-ছ'খানা বাগেশ্রী মুখ। তারপর বললেন, 'এর মধ্যে যেটা আপনার পছন্দ হবে তার ওপরে মিউজিক করব।'

একসঙ্গে অতগুলো বাগেশ্রীর সুর শুনে ঠিক করতে পারলাম না কোনটা নেব। সবগুলোই দারুণ। শেষে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' গানটির কাছাকাছি একটা সুরের ওপর মিউজিক করলেন তিনি।

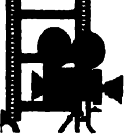
মিউজিক ও এফেক্ট সাউন্ড লাগিয়ে রিরেকর্ডিং করছি। হঠাৎ এক জায়গায় মনে হল দৃশ্যটা খালি খালি লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টুডিও থেকে ফোন করলাম আলিদাকে। দৃশ্যটা কী জানতে চাইলেন। বললাম, এক স্বপ্নের মধ্যে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে পাগলের মত। দৃশ্যটা শুনে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সরোদ নিয়ে চলে এলেন আলিদা। প্রোজেকশানে দুয়েকবার দৃশ্যটা দেখে রেকর্ডিং রুমের কাঁচের ঘরে বসে সৌমিত্রর ঘোড়া ছোটানোর দৃশ্যের সঙ্গে এমন ঝঙ্কার তুললেন যে মনে হল একসঙ্গে বাজছে গোটা পঞ্চাশেক সরোদ। তাঁর অনবদ্য সুর-ঝঙ্কারে ভরে গেল দৃশ্যটা।



ক্ষুধিত পাষাণ

তিনকন্যা

(পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি ও মণিহার)



❑ ১৯৬১ সাল।

তিনকন্যা—রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে তিনটি রবীন্দ্র ছোটগল্প—'পোস্ট মাস্টার', 'সমাপ্তি' এবং 'মণিহারা'-র চলচ্চিত্রায়িতরূপ।

'পোস্ট মাস্টার' গল্পটি হিতবাদী পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সমাপ্তি' গল্পটি সাধনা পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

'মণিহার' গল্পটি ভারতী পত্রিকায় ১৩০৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো, ১৯ রীল মি.মি. ৩৫।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়।

প্রযোজনা—সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স।

চিত্রগ্রাহক—সৌমেন্দু রায়।

সম্পাদনা—দুলাল দত্ত।

শিল্প নির্দেশক—বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

সঙ্গীত পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়।

কণ্ঠসঙ্গীতে—রুমা গুহঠাকুরতা, খনা রায়চৌধুরী।

অভিনয়ে—পোস্টমাস্টার—অনিল চ্যাটার্জী, রতন—চন্দনা বন্দোপাধ্যায়, এছাড়া নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, গোপাল রায় প্রমুখ। (পোস্টমাস্টার)

মৃন্ময়ী—অপর্ণা দাশগুপ্ত, অপূর্ব—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, মা—সীতা মুখোপাধ্যায়, এছাড়া মৃন্ময়ীর মা—গীতা দে, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ। (সমাপ্তি)

ফনিভূষণ সাহা—কালী ব্যানার্জী, মণিমালিকা—কণিকা মজুমদার (মণিহারা)



ডিসট্রিবিউটর্স—ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তি—৫ মে, ১৯৬১; রূপবাণী, অরুণা, ভারতী।

○ *সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক চলচ্চিত্র তিনকন্যা।*

পুরস্কার—আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি রূপে 'সমাপ্তি' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়,—রাষ্ট্রপতি রৌপ্য পদক, ১৯৬১। একাদশ তম মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসব (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৬২ সালে পোষ্টমাস্টার ও সমাপ্তির জন্য পুরস্কার।
বার্লিন-এ ১৯৬৩ তে পুরস্কৃত হয়।
লরেল পুরস্কার-'পোস্টমাস্টার' ও 'সমাপ্তি'র জন্য।

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটা পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্ট্‌মাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে



কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্ট্‌মাস্টার ডাকিতেন—"রতন।" রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না ; বলিত "কি গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্ট্‌মাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে- -হেঁশেলের--

পোস্ট্‌মাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন - একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্ট্‌মাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্ট্‌মাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল- বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্ট্‌মাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত- তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্ট্‌মাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন---ছোটভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠীর গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল ; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল ; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে ; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্ট্‌মাস্টারের হাতে কাজ ছিল না--- সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল ; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের



পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্ট্‌মাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্ট্‌মাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন "রতন।" রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল ; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্ট্‌মাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ- নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্ট্‌মাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্ট্‌মাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল—'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্ট্‌মাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ্‌ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্ট্‌মাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্ট্‌মাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"



পোস্ট্‌মাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্ট্‌মাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্ট্‌মাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্ট্‌মাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন. দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে ; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্‌টপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চট্‌পট্‌ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্ট্‌মাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্ট্‌মাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্ট্‌মাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল—'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্ট্‌মাস্টার দেখিলেন তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে ; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই ; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন গত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন ; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্ট্‌মাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্ট্‌মাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্ট্‌মাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি. তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না ; তোমার দুটি



পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"—বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্ট্‌মাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট্‌আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮?



সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ, বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা-অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বল্ জ্বল্ এবং বাতাসে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বর আগমনসংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ-সমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশত্থ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে, মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল। তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত



শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা ; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার একটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না ; অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃন্ময়ীর চোখে অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত, ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-পূর্বক মৃন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না ; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিযা এই বন্ধনহীন বালিকাটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন-কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে, কিন্তু এক-একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর-একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না ; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয় সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে ; সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য ; মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক, দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স ; অবশ্য ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টে নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, 'বি. এ পাস না করিয়া বিবাহ করিব না।' এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর-কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব ঐ ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই; কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, "আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।'

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া, সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয়ে মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া, রঙ করিয়া, খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া, একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই, তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার-প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথমভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ্



শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাযোগ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠনমোচনে রাখালটি খিল্ খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাত সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত ; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী-সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বার্নিশকরা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহু চেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল। এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া, প্যান্টলুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রাম্য পথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ঐ অসংগত চটি জুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুত বেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে



মৃন্ময়ীর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্বণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্ত দিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো, এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ-নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং 'হারমোনিয়ম শিক্ষা' বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ রায়, বি. এ. কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি।"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, 'মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিন দিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু, তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন



দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জব্‌জবে করিয়া তেল লেপিয়া, কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানি রূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয়-কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া, সে পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, "এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয়ে ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা-অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত হৃদয়ে মৃন্ময়ী মনে করিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তারপরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ি সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশুড়ি যে ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল, এ ঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ি মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃন্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।



রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্‌খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন্, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।"

মৃন্ময়ী কহিল "তুমি, আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু, অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ি মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথমে অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড় ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলেব উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এসো আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃন্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতিকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী শাশুড়িকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই ; বলে "বাবার কাছে যাব।" অনাসৃষ্টি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃন্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে



হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্ দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্‌ঝম্ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানি নে।" এই বলিয়া ঘাটে-বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিল নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও! মিনু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মৃন্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্। বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি ; সে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত ; সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতি স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-এক দিনের জন্য একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, 'মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"



মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল ; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্‌বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লগিল। ঐ নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই-সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুন্‌সেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা।" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী ; এই-সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার --সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়---আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা ; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকারে জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-



এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর-জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপণার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শন-পূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরো কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ, নিস্তব্ধ অভিমান, লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন "বউয়ের কী করবে।"

অপূর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন, "না বাপু, কাজ নাই ; তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে 'তুই' সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃন্ময়ী কহিল "না।"

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?"

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না।



"বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারও বেশি হতে পারে।"

মৃন্ময়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?"

মৃন্ময়ী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

মৃন্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল ; কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃন্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপূর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সংবরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল ; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্ক-পত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়া ছিলেন সে জানিতে পারে নাই ; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর একটা ঘর, আর-একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।"

এ দিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া অসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই-যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম



আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।"

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একেবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পুষ্করিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, "আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।'

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই। মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন। অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না, ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্‌কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।' মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালী-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।" আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর-একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল ; এইজন্য আরো অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, 'আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।



লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরো যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর-কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই লজ্জায় চিঠিখানা একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলাবাহুল্য, এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন, ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনো সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল, অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানা মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরো ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরো অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া, বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, 'মা, আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।'—শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো?" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল "সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা—" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশুনা—" ইত্যাদি।



ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভগ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁৎকে উঠতে পারে।"

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না--সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।"

দাদা কহিল, "না, বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে এক রাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপূর্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি করো না, চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি। তা, আলো এনে দেব, কি দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না, দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখি নে।"

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্বণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন ১৩০০



মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা ঝুলিয়া পড়া জরাগ্রস্থ বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময় মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাক্‌রের যেমন একরকম বহুকালজীর্ণ সংস্কারবিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম- খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপান পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।'

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"



আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টান্ট্-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা



চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল-- ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

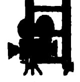
ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উলটা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় না ; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা-কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা



বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিলুপতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময় ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসা-মান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত ; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু



সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন--

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে ; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ডনোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয় ; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন-সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া



কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাঁহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে ; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ কবিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল 'এখন পরামর্শ কী।''

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল —অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই ; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার- -সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, ''গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ,



এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হু হু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে সে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের ; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-স'কে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।'' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।



দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রী সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রা গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়া ছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরে দেওয়ালে আর্টস্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো ; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যাণ্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি, শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো ; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প্ সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী ; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর



উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়-সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো ; এই সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠকঠক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকাব এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল- স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দারোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধদ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীব ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং হৃদপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রাব ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দারোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণীভূষণ হুকুম দিল, আজ



সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা 'রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দারোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরদ্ধ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্ন প্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রারগানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনেব মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্ এবং ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজেব মনকে দমন করিবাব জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুবিতে ঘুরিতে শব্দ উপবে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহাব বক্ষ তুফানেব ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলবর এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল!

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না। এবং উৎসব-জাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা



দেখিতেছিল ; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচামুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, 'সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ!'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরে গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে এক কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাতায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব ; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ সে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না ; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল ; হাড়েতে



হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠকঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল ; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্‌ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না ; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্যে দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথ প্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারাংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মনিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটা যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহায়ণ ১৩০৫



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

তিনকন্যার তিনটি গল্প তিনটি স্ত্রী চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত। চরিত্র তিনটির বয়স রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে অথবা আভাসে বলে গেছেন। তবে বয়স যাই হোক না কেন না কেন নারীত্বের তিন অভিব্যক্তি এ গল্পগুলোতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন। রতন কিশোরী, মৃণ্ময়ী তরুণী, মণিমালা যুবতী। রতনের বয়স এগার বারো, মৃন্ময়ী তার তুলনায় খানিক বড় এবং মণিমালা প্রগাঢ় যৌবনা। নারীত্বের তিনটি ধরন, পুরুষকে অভিমুখ করে তাদের প্রকাশে আছে ভিন্নতা।

পোষ্টমাষ্টার এমনই এক প্রেমের গল্প যেখানে সন্নিহিত পুরুষ ও নারী পরস্পরের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয়। রতন যদি শুধুমাত্র কাজের মেয়ে অথবা ঝি হত তাহলে পোষ্টমাষ্টার চলে যাওয়ার পরেও রতনের ব্যাকুলতা নিয়ে প্রতীক্ষা করার মানে হয় না। নন্দবাবুর (সত্যজিৎ পোষ্টমাস্টারের নাম দিয়েছেন নন্দলাল) আগের পোষ্টমাষ্টার ও পরের পোষ্টমাষ্টার সম্পর্কেও রতনের মনোভাব নিশ্চয়ই এক ছিল না। সব পোষ্টমাষ্টারের প্রতি যদি রতনের আকর্ষণ একই ধরনের থাকে তাহলে গল্পের ভরকেন্দ্র মাধ্যাকর্ষণ হারায়। সত্যজিৎ কিন্তু রবীন্দ্রগল্পের এ ভরকেন্দ্রটি অস্বীকার করেছেন। প্রায় ঘষে ঘষে তিনি নরনারীর যৌন আকর্ষণটিকে তিনি মুছে দিয়েছেন। তার ফলে উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনটি এড়িয়ে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন গল্পে বহির্বাস্তবে। এক পাগলের আমদানি করেছেন এবং কিছু গ্রামবৃদ্ধকে এনেছেন যারা হয়তো ঠিক রবীন্দ্রনাথের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। গ্রামবৃদ্ধদের গান নিয়ে সান্ধ্য আসর অথবা এমন এক বৃদ্ধকে উপস্থাপনা করা হয়েছে যার ভ্রমণের বিশ্ব মাত্রা রাণাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। ছবিগুলো ভালো কিন্তু সেগুলো মনে পড়িয়ে দেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাণাঘাট পর্যন্ত ভ্রমণকারী বৃদ্ধটি যেন বিভূতিভূষণে সিঁদুর চরণ।

তবে এ ছবিতে এ বিষয়গুলোর যোজনা বেমানান মনে হয় না, কেননা সত্যজিতের সচেতন অভিপ্রায় ছিল রতন ও নন্দবাবু মধ্যে প্রণয়ের আকর্ষণটিকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া। তাই পারিবারিক ফটোর মানুষগুলোকে বার বার রতনের সঙ্গে প্রতিস্থাপন করে তাকে বোনের পর্যায়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গল্পের সঙ্গে না মিললেও অথবা গল্পের মেজাজটিকে সচেতনভাবে অগ্রাহ্য করলেও গ্রাম-শহরের মানুষের মধ্যে একটি লিরিক্যাল সংবেদন এ ছবিতে পরিস্ফুট হয়েছে। নন্দবাবুর প্রস্থানের সময়ে তার দেওয়া বকশিস অগ্রাহ্য করে রতনের নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বালিকার যে দুরন্ত অভিমান প্রকাশ পেয়েছে তার সৌন্দর্য দর্শকদের অবশ্যই মুগ্ধ করে। গ্রাম্য দৃশ্যের যেসব খুঁটি নাটি বা ডিটেইল রচনায় সত্যজিৎ পথের পাঁচালী অথবা অপরাজিততে দেখিয়েছিলেন, তিনকন্যায় বিশেষ করে পোষ্টমাষ্টারে তা যেন পূর্ণতা পেয়েছে। বস্তুত গ্রামের ডিটেইল তিনকন্যার পর সত্যজিতের ছবিতে আর তেমন করে আসেনি। অশনি সংকেতে তা খানিকটা এলেও তার প্রকাশ ছিল বেশ রঙিন, আক্ষরিক অর্থেই।

সমাপ্তিতেও গ্রামের ডিটেইলিং অসামান্য। গ্রামের নদী, কাদা ভর্তি পাড়, ধাবন্ত রানার, গাছের দোলনা, কাঠবিড়ালি চরকি মৃন্ময়ীকে এক ধরনের পূর্ণতা দিয়েছে তাই মূল গল্প থেকে সমাপ্তির বেশ খানিকটা সরে যাওয়া দর্শকদের খুব বিচলিত করে না।

এ ছবিতেও সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছেন অনেকটা। বিশেষ করে উভয়ের বাড়িতে না জানিয়ে মৃণ্ময়ীকে নিয়ে অপূর্বর শ্বশুরের কাছে চলে যাওয়ার অংশ বাদ পড়ায় বিষয়ের মধ্যে বিচলন এসে পড়েছে। প্রবাসী বাবার কাছে গিয়ে সাংসারিক কাজে অপটু মৃণ্ময়ী সাংসারিক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে এগিয়েছিল। তার ফলে সংসারধর্ম পালনের জন্য অস্ফুট বাসনা তার মধ্যে এসেছিল। বাবার কাছ থেকে ফিরে এসে তাই বাপের বাড়িতে মৃণ্ময়ীর ভাল লাগেনি। সে অপূর্ববিহীন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছিলেন বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের প্রয়োজন।

আরও বড়ো বদল সত্যজিৎ ঘটিয়েছিলেন চুম্বন নিয়ে। কলকাতায় যাওয়ার আগে অপূর্ব মৃণ্ময়ীর কাছে একটি চুম্বন চেয়েছিল কিন্তু হাস্যমুখর কিশোরী তাতে ব্যর্থ হয়েছিল। অপূর্বের প্রতি মৃণ্ময়ীর মনোভাবের বদলে, মৃণ্ময়ীর কিশোরী থেকে তরুণী হয়ে ওঠার পরিণতিতে চুম্বনকর্ম সাধিত হয়েছিল। সমাপ্তি থেকে এ অংশটি বর্জন করলে গল্পের সমাপ্তি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হতে পারে কিনা সন্দেহ। সম্ভবত সত্যজিতের তৎকালীন মানসিকতা ও সেন্সর বোর্ডের চলিত বিধিবদ্ধ নিষেধ এ দৃশ্য রচনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্যজিৎ কিন্তু ঘরে বাইরে ছবিতে একাধিক চুম্বন দৃশ্য রেখেছেন। তা অবশ্য প্রায় দু দশকেরও বেশি পরবর্তীতে। চুম্বন প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও



সত্যজিৎ যেভাবে মৃণ্ময়ীর মনোজগতে নারীত্বের আবির্ভাব দেখিয়েছেন তার শিল্পমূল্য কম নয়।

বদল ঘটানো হয়েছে মণিহারা গল্পেও। একটি সুন্দরী যুবতী গ্রামের এক অট্টালিকায় প্রায় নিঃসঙ্গ বসবাস করে, তার কর্মমনস্ক স্বামী তার সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হলেও নারীত্বের প্রতি থাকে প্রায় উদাসীন। ফণিভূষণ মণিমালাকে সঙ্গদানের অভাবটি মোচন করতে চায় শুধু অলংকার উপহার দিয়ে যা অনেকটা সান্ত্বনার প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। মণি যদি সন্তানহীনা না হত তাহলে সমস্য এত প্রকট হয়ে উঠত না। নিঃসন্তান রমনী নির্জন একাকিত্বে আত্মরতিতে নিমগ্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বামীর প্রদত্ত গয়নাগুলির মধ্যে নিজের অস্তিত্বের একমাত্র অবলম্বন খুঁজতে থাকে। মণির জীবনে, এবং ফণিভূষণেরও, এটাই ছিল ট্রাজেডি। তার এ দুর্বলতার ছিদ্রমুখ দিয়ে জ্ঞাতিভাই আবির্ভূত হয়ে মণিকে নিয়ে অলংকারের বাক্সসমেত উধাও হয়। মণিমালা তারপর কোথায় গেল, তার পরিণতি কোথায় পৌঁছল সেকথা রবীন্দ্রনাথ আর স্পষ্ট করেননি। বরং মণির এ আকস্মিক অন্তর্ধান মণিভূষণের মনে কী অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, মণির প্রতি আসক্তি তার মনন ও মানসিকতায় কী প্রতিক্রিয়া এনেছিল তারই বিশ্বাসযোগ্য অনুকথন হল এ গল্প। মণিহারা অলৌকিক গল্প নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো গল্পেই প্রচলিত অলৌকিকত্বকে প্রশ্রয় দেননি। এ সুগভীর মনোবিচলনের বিষয়টির মধ্যে অনাবশ্যক অপ্রাকৃতকে এনে সত্যজিৎ গল্পের অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করেছেন চিত্রনাট্যের দরকার মূল কাহিনির বদল অবশ্যই ঘটানো যেতে পারে কিন্তু লেখকের অভিপ্রায়কে বিসর্জন দিয়ে নয়। তাই মণিহারা ছবির অন্তিমে পব পর দুটি দৃশ্য খাপ খায়নি। গয়না পরা একটি হাতের কঙ্কাল দেখিয়ে দর্শকদের ভীত করে তোলা যায় অথবা ফণিভূষণের অন্তর্ধান চমক দিতে পারে বটে কোনো গভীর শিল্পসুষমায় প্রতিষ্ঠিত করে না।

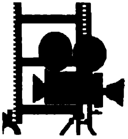
মণিহারা ছবির এ অন্তর্গত দুর্বলতার দরুনই হয়তো বিদেশে প্রদর্শনের সময় এটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিদেশে তিনকন্যার একটি কন্যা নিযুক্ত হয়ে টু ডটার্স হিসেবেই পরিচালিত হয়েছে। বাদ গিয়েছিল মণিহারা।

—'সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ'---বিষ্ণু বসু

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, —রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র সংখ্যা, মে, ২০০৬

অর্ঘ্য

('পুরাতন ভৃত্য', 'পূজারিণী', 'অভিসার' ও নটীর পূজা)



❑ ১৯৬১ সাল।

অর্ঘ্য—('পূজাবিণী', 'অভিসার' ও 'পুরাতন ভৃত্য' ববীন্দ্রনাথেব ৩টি কবিতা এবং 'নটীব পূজা' রবীন্দ্রনাট্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্ররূপ। ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে 'কথা' কাব্যগ্রন্থে এই তিনটি কবিতা সংকলিত হযেছিল পরে 'কাহিনী' অংশে স্থান পায়। পরবর্তীকালে 'কথা ও কাহিনী' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ৮ রিল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—দেবকীকুমার বসু।

প্রযোজনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকাব।

চিত্রগ্রাহক—দেওজীভাই পাধিয়ার, বিমল মুখোপাধ্যায় ও বিশু চক্রবর্তী।

শিল্প নির্দেশক—চারু রায, কার্তিক বোস।

সম্পদনা—গোবর্ধন অধিকারী।

সঙ্গীত পরিচালনা—সন্তোষ সেনগুপ্ত।

কণ্ঠদানে—সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র।

অভিনযে—মঞ্জুশ্রী চাকী, বনানী চৌধুবী, সন্ধ্যা রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অনুপকুমার, অমব গাঙ্গুলী প্রমুখ।

পরিবেশনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মুক্তি—৮ মে, ১৯৬১, দর্পণা, জ্যোতি।

❍ রবীন্দ্র কবিতা অবলম্বনে চলচ্চিত্রায়নের প্রথম প্রচেষ্টা রূপে 'অর্ঘ্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

❍ এখানে 'পুরাতন ভৃত্য', 'পূজারিণী' এবং 'অভিসার' কবিতাটি দেওয়া হল। 'নটীর পূজা' নাট্যটি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রথম সবাক চলচ্চিত্ররূপে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন   নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন,   'কেষ্টা বেটাই চোর।'
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত,   শুনেও শোনে না কানে—
যত পায় বেত না পায় বেতন,   তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ,   চীৎকাব করি 'কেষ্টা'--
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া,   খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে,   বাকি কোথা নাহি জানে—
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে   তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে   নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে   'পাজি হতভাগা গাধা'
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে,   দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার—   বড়ো পুরাতন ভৃত্য॥
ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি   বলে, 'আর পারি নাকো—
রহিল তোমার এ ঘরদুয়ার,   কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন   অশন আসন যত।
কোথায় কী গেল—শুধু টাকাগুলো   যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর   দেখা পাওয়া তার ভার।
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি   ভৃত্য মেলে না আব!'
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে,   আনি তার টিকি ধ'রে—
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই,   দূর করে দিনু তোরে।'
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়।   পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে   বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ নাহি কোনো দুখ,   অতি অকাতরচিত্ত—
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে,   মোর পুরাতন ভৃত্য॥



সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা   করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন   বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,   বুঝায়ে বলিনু তারে-
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য,   নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি   পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে   গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে   কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম, 'আরে রাম রাম।   নিবারণ সাথে যাবে।'

রেলগাড়ি ধায়, হেরিলাম হায়   নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত   তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর   কত-বা সহিব নিত্য?
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি   হেরি পুরাতন ভৃত্য॥
নামিনু শ্রীধামে , দক্ষিণে বামে   পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা   করিল কণ্ঠাগত।
জন-ছয়-সাতে মিলি একসাথে   পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা ; মনে হল আশা   আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা,   কোথা বনমালী হবি।
কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত।   আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে-যত স্বপ্নের মতো   বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ---
আমি একা ঘবে, ব্যাধিখরশবে   ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ, ক্ষীণ,   'কেষ্ট, আয় রে কাছে,
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে   প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।'
হেবি তার মুখ ভরে ওঠে বুক,   সে যেন পরম বিত্ত---
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিযবে   মোর পুরাতন ভৃত্য॥

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,   শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম,   মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার   কোনো ভয় নাই, শুন---
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে   দেখিতে পাইবে পুন।'
লভিয়া আবাম আমি উঠিলাম,   তাহারে ধবিল জ্বরে ,
নিল সে আমাব কালব্যাধিভার   আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন,   বন্ধ হইল নাড়ী---
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,   এত দিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে   ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই   মোর পুরাতন ভৃত্য॥

[শিলাইদহ]

১২ ফাল্গুন ১৩০১



পূজারিণী

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে,
পিতার আসনে আসি
পিতাব ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে—
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।



কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।'

সেদিন শারদ দিবা-অবসান,
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
'এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে!'

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, 'অবোধ, কী সাহসবলে
এনেছিস পূজা! এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদ্‌পাত।'

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী



পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী—
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে-কানে,
'রাজার আদেশ আজি কে না জানে—
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে!'

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি।
'হে পুরবাসিনী' সবে ডাকি কয়,
'হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।'
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে—
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান'
দ্বারী ফুকারিয়া বলে॥

এমন সময়ে হেরিল চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো?



মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি?'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।'

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

১৮ আশ্বিন ১৩০৬



অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে ;
নিশীথের তাবা শ্রাবণগগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে!
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে॥

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীলবরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ,
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদত্তা॥

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি—



সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি॥

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা---
'ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর,
এ নহে তোমার শয্যা!'

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী—
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।'

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য॥

.....

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র॥



নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসাররাত্রি?।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির-প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে
তাঁহার চরণোপান্তে?

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তাব অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

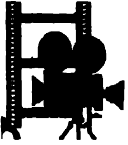
সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতচন্দনপঙ্কে॥

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা!'

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

নটীর পূজা প্রথম সবাক রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপ হিসেবে এই বইয়ের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। আগ্রহী পাঠককে দেখে নিতে অনুরোধ করছি

বীরপুরুষ



১৯৬১ সাল।

বীরপুরুষ—রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের একটি বিশিষ্ট কবিতা।

'শিশু' মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগ রূপে ১৩১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো।

পরিচালনা—ফণী মজুমদার।

(বাংলা ছাড়া অন্যান্য দশটি ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী ভাষায় পাওয়া যায়)

ছবিটি সম্বন্ধে অন্য কোনো বিশেষ তথ্য জানা যায় নি।

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্‌কিতে, মা, চ'ড়ে
দর্‌জা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন-মনে তাই
ভয় পেয়েছ— ভাবছ 'এলেম কোথা'।
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে—
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো?'



এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে!
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো।'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর—
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে রে রে রে'॥

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে!'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা॥
এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পাল্‌কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,
কী দুর্দশাই হত তা না হলে!'

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা?

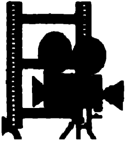


ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন করে হবে,
        খোকার গায়ে এত কি জোর আছে!'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
        'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

[আলমোড়া
২৮~৩০ শ্রাবণ ১৩১০]

সন্ধ্যারাগ

(কঙ্কাল)



❑ ১৯৬১ সাল।

সন্ধ্যারাগ—রবীন্দ্র ছোটগল্প 'কঙ্কাল' অবলম্বনে সন্ধ্যারাগ' চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। 'কঙ্কাল' গল্পটি সাধনা পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১২ রীল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রযোজক—জ্বালা প্রোডাকসন্স।

চিত্রগ্রাহক—দীনেন গুপ্ত।

শিল্প নির্দেশক—প্রসাদ মিত্র।

সম্পাদনা—কমল গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—রবিশংকর।

কণ্ঠদানে—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, বন্দনা সিংহ।

অভিনয়ে—কল্যাণী ঘোষ, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, রেণুকা রায় প্রমুখ।

পরিবেশনা—ইষ্টার্ন ফিল্ম ক্রাফ্‌টস।

মুক্তি—১৭ নভেম্বর, ১৯৬১; শ্রী ও ইন্দিরা।

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল, আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল, একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের শেজ জ্বলিতেছিল, সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আর মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না, এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু তবু গা ছমছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, "কে ও!" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল



এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, "আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখানো কিছু নয়-- পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, "এই দুপুর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক ?"

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, "বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল - একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।"

সে বলিল, "তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।"

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।"

সে বলিল, "সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।"

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

"যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে—কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়িকে কহিলেন, 'শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই।' সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। শুনিতেছ ? কেমন লাগিতেছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।"

"তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম, আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না।—তোমার কী মনে হয়।"

"খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।"

"দেখো নাই! কেন। আমার সেই কঙ্কাল। হি হি হি হি! আমি ঠাট্টা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না ; এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায়



এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনকচাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর-সকল মনুষ্যই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমিই সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনকচাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে।

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।

"কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এইজন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষে নিদ্রা ছুটাইয়া দিক, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"

আমি বলিলাম "তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর, তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।"

"আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম ; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

"দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন—পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়—এইজন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

"তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এইজন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম, এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।—শুনিতেছ? কী মনে হইতেছে।"

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, "মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।"



"আগে সবটা শোনো।

"একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

"আমি জানালার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ; অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

"ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, 'একবার হাতটা দেখিতে হইবে।'

"আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন, তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।—বিশ্বাস হইতেছে না?"

আমি বলিলাম, "অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।"

"কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

"আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

"কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্ত হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হূহু করিয়া উঠিত।

"সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না। যখন চলিতাম নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে। মধ্যাহ্নে জানালার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত ; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর করিয়া 'চাই খেলেনা চাই, চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত ; আমি একখানি ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম ; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর



একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে-- মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।"

আমি বলিলাম, "মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে ; কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।"

"কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত-ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

"তার পরে শোনো। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

"আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বড়ো বাকি নাই।"

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।"

"কিছুদিন হইতে দেখিলাম, ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমনস্ক, এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম, তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।'

"সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, 'মরিতে।'

"আমি বলিলাম, 'না, সত্য করিয়া বলো-না।"

"তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, 'বিবাহ করিতে।'

"আমি বলিলাম, 'সত্য নাকি'—বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।'

"অল্পে অল্পে শুনিলাম, এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

"ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'কি ডাক্তার-মহাশয়, আজ নাকি আপনার বিবাহ।"

"আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

"জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাজনা-বাদ্য কিছু নাই যে।"

"শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।"

"শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।"

"দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে, দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব।



জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ডাক্তার-মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন।''

''হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

''অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

''আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, 'ডাক্তার-মশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার যে সময় হইয়াছে।''

''এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

''ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'তবে চলিলাম।'

''বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম ; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম ; সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

''বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

''বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘরদুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারি দিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

''ইচ্ছা ছিল, যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল, যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসর-ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতে মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসর-ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে! বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্ করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত, সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থি'র কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর, সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি।

''গল্পটা কেমন লাগিল।''

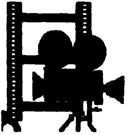
আমি বলিলাম, ''গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।''

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, ''এখনো আছ কি।'' কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন ১২৯৮

নিশীথে



❑ ১৯৬৩ সাল।

নিশীথে—রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'নিশীথে' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় মাঘ, ১৩০১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো।১৪ রীল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অগ্রগামী। (সরোজ দে)

প্রযোজনা—অগ্রগামী প্রোডাকসন্স।

চিত্রগ্রাহক—রামানন্দ সেনগুপ্ত।

শিল্প নির্দেশক—সুধীর খান।

সম্পাদনা—কালী রাহা।

সঙ্গীত পরিচালনা—সুধীন দাশগুপ্ত।

কণ্ঠদানে—আরতি মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—দক্ষিণাচরণ বাবু—উত্তমকুমার, ঐ স্ত্রী—সুপ্রিয়া চৌধুরী, ডাক্তারবাবু—রাধামোহন ভট্টাচার্য, মনোরমা—নন্দিতা বোস, মনোরমার পিতা—গঙ্গাপদ বসু। এছাড়া ছায়া দেবী, শিশির বটব্যাল প্রমুখ।

পরিবেশনা—চণ্ডীমাতা ফিল্মস্।

মুক্তি—৮ মার্চ ১৯৬৩; মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

❍ অগ্রগামী পরিচালিত প্রথম রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র। রবীন্দ্র গল্পের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব নির্ভব মূল কথাটি পরিচালক ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

পুরস্কার—রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, ১৯৬৩ সার্টিফিকেট অব মেরিট।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম ; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।



তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল ; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধকরিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা-উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্রা সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"



আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটা উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল ; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার, ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া গেছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ুপরির্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকেচাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।



তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, ‘‘যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।’’

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, ‘‘যতদিন এই দেহে জীবন আছে—’’

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, ‘‘নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!’’

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, ‘‘এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।’’

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি ; এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না ; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্‌ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যত জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন। সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন



চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো ; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহার ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলো মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে এক গ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম ; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।



এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কোরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলে-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে।—তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে। ও কে গো।"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা।"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিনীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে।"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইযা উঠিলেন, বলিলেন "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসনু-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছটফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?"



বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন।"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল ; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত ; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল ; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল ; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না



আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম ; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরেব বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে কবিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে ; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহু দূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন



করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিযা যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ও কে। ও কে। ও কে গো।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম কবিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল ; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না ; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া



উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!" বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম "একটু জল খান।"

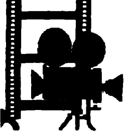
এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্‌ দপ্‌ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার।"

মাঘ ১৩০১

চারুলতা

(নষ্টনীড়)



❑ ১৯৬৪ সাল।

চারুলতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড় গল্প অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র। 'নষ্টনীড়' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১২ রীল। ৩৫ মি মি।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়।

প্রযোজনা—আর. ডি. বনসাল।

চিত্রগ্রাহক—সুব্রত মিত্র।

শিল্প নির্দেশক—বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

সম্পাদনা—দুলাল দত্ত।

সঙ্গীত পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়।

গীতরচনা—রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত, তানসেন, বৈজু বাওরা।

কণ্ঠদানে—কিশোরকুমার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্যাল।

অভিনয়ে—চারুলতা—মাধবী মুখার্জী, অমল—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ভূপতি—শৈলেন মুখার্জী, মন্দার—গীতালি রায়, মন্দারের স্বামী—শ্যামল ঘোষাল। এছাড়া দিলীপ বোস, নীলোৎপল দে, সুব্রত সেন, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ।

পরিবেশনা—আর ডি. বনশল এণ্ড কোং।

মুক্তি—১৭ এপ্রিল, ১৯৬৪; শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা।

পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র—রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক, ১৯৬৪, প্রযোজককে ২০ হাজার টাকা এবং পরিচালককে ৫ হাজার টাকা।

পঞ্চদশতম আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব, বার্লিন ১৯৬৫,—রৌপ্যভল্লুক— শ্রেষ্ঠ পরিচালক।

মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৬৫—শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র।

১

ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনোপ্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি-ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল, "ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যেরকম অসাধারণ" ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পুরাদমে ছুটাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্পবয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অল্পবয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল।

ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।



এমন অবস্থায় সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল, "তাই তো, চারুর একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবাই নাই।"

শ্যালক উমাপতিকে কহিল, "তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো-না—সমবয়সী স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।"

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইরূপ বুঝিল এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্‌তুতো ভাই অমল থার্ড্ ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ চারুলতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিসতুতো ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো-একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বৌঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাবু রাজঅন্তঃপুরের খাস হাতের বুননি কার্পেটের জুতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না—একজোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারছি না।"

চারু। হাঁ, তাই বই-কি। আমি বসে বসে তোমার জুতো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চারু জুতা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চায় না, অমল চায়—সংসারের সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে যাইত সে সময়ে সে লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় চারু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে।



বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল ; দেখিল, থালায় একজোড়া নূতন-বাঁধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে। চারুলতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরো বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চারুলতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু যত্নে ও স্নেহে শৌখিন অমলের সখ মিটাইয়া দেয়। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বউঠান, কতদূর হইল।"

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, "কিছুই হয় নি।" কখনো বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইযা দেয এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলেব সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবাব জন্যই চারু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারও জন্য কিছুই কারতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমড়াগাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতিসাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটি কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সে কালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চারু কহিল, "আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর-একটি ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।"

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

চারু কহিল, "ঘাট অবশ্য সাদা মার্বেলের হবে।"

অমল পেনসিল কাগজ লইয়া, রুল কাটিয়া, কম্পাস ধরিয়া, মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্তন করিতে করিতে বিশ-পাঁচিশখানা নূতন ম্যাপ আঁকা হইল।



ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্‌টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল—চারু নিজের বরাদ্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আস্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্‌টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারুর সংগতিতে কুলায় না। অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চারু কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ না'ই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই—ও থাক্।"

মরিশস হইতে লবঙ্গ, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল ; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"

এস্‌টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এস্‌টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য, এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো ; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।

চারু কহিল, "না, তাঁকে বললে মজা কী হল। আমরা দুজনে বাগান তৈরি ক'রে তুলব। তিনি তো সাহেব-বাড়িতে ফরমাস দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিয়ে দিতে পারেন—তা হলে আমাদের প্ল্যানের কী হবে।"

আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, "এত বেলায় বাগানে তোরা কী করছিস।"

চারু কহিল, "পাকা আমড়া খুঁজছি।"

লুব্ধা মন্দা কহিল, "পাস যদি আমার জন্যে আনিস।"

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দার আর যা-কিছু গুণ থাক্, কল্পনা ছিল না ; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া। সে এই দুই সভ্যের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জিত।

অসাধ্য বাগানের এস্‌টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কীভাবে বাঁধাইতে হইবে অমল একটি ছোটো কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল—এমন সময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, "অমল, তুমি যদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"



অমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চারু। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বুঝতে পারত না, বেশ মজা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখো-না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আচ্ছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।"

চারু কহিল, "তুমি কী চাও।"

অমল কহিল, "আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এঁকে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।"

চারু কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি। মশারির চালে আবার কাজ!"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো-আনা লোকের যে সৌন্দর্যবোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সে কথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো-আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুশি হইল।

কহিল "আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।"

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও।"

অমল। আজ থাক্, বউঠান।

চারু। না, আজই দেখাতে হবে—মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসো গে।

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতিব্যগ্রতাতেই অমলকে এতদিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া, একটুখানি কাশিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুড়িতে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল 'আমার খাতা'। অমল লিখিয়াছিল—'হে আমার শুভ্র খাতা, আমার কল্পনা এখনো তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্বে শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব সেদিন আজ কোথায়। তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না।'— ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি আবার লিখতে পার না!"

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল ; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"



মূঢ় মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।"

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে ; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়—এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চারু কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নহে ; তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা কাহারও সাধ্য নহে। অমল নিজেই বার বার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।"

চারু বলিত, "না, আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি ; তুমি এইটে লিখে ফেলো, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা বুঝিয়া, খানিকটা না বুঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী-একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা যায়।"

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কই, তুমি সেটা লিখলে না?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একটু ভাবি।'

চারু রাগ করিয়া বলিত, "তবে যাও!"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার জো করিত তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটুখানি বাহির করিত।

মুহূর্তে চারুর মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, "ঐ-যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও!

অমল বলিত, "এখনো শেষ হয় নি, আর-একটু লিখে শোনাব।"

চারু। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত ; কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেন্সিল লইয়া দুই-এক জায়গায় দুটো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতটুকুই হোক চারুকে সদ্য-সদ্য



শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল, তখনই চারু অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভেতর আসিতে দেরি করিত না ; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এইজন্য অমল তাহাকে কখনো প্রশংসা করিত না ; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রূপ করিত। চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দত্তর 'কলকণ্ঠ'-নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল, চারু লক্ষও করিল না। অমল কহিল, "কী বোঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দত্তর গলগণ্ড।"

চারু কহিল, "আঃ, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও।" পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ ; ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মস্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহুস্বরে জগৎ মাতায় না — তবু ভাই অশোক, তোমার ঐ পুষ্পিত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়ো না ; তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিয়ো না।"

অমল এইটুকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গৃহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চারু কৌতূহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না ; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংসুটে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।"

চারু। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না ; পকেটে কী আছে বের করে ফেলো।

অমল। কী আছে আন্দাজ করো।

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোরুহ'-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল, কাগজে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।



চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খুব খুশি হইবে। কিন্তু খুশির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বলিল, "সরোরুহ পত্রে যে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বুঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, একশো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু খুশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল ; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া-দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুশিও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চারু, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুশি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে, এ কথা তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলে চারু যেন গর্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে, 'অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা বুঝিলে ; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নহে।"

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?"

ভূপতি কহিল, "হাঁ—না, ঠিক পড়ি নি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত প'ড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।



চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এখনো বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না? দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিক, চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।'

ভূপতি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালায় সব উলটো নিয়ম—ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নিয়মিত পড়ায় ব'লে তো বোধ হয় না।"

চারু কহিল, "আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?"

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—"

চারু। ইস্‌ ইস্‌ তুমি আর বোলো না। স্বামী হয়েই রক্ষে নেই তা আরো কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চারু। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসেবটা একটু রাখবে? এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চারু। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে নবগোপালবাবু তাকে বাংলার রাস্কিন নাম দিয়েছেন।

শুনিয়া ভূপতি কিছু সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম "আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবর্মেন্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মতো তাহার মস্তিষ্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল—এমন সময়ে হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইরূপে শুরু হইয়াছে—'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লজ্জের মতো উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—আর আজ তাহার সেই ঢলঢল হাসিখানি—শিশুর স্বপ্নের মতো, প্রিয়ার স্মৃতির মতো, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার



মতো—' ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি বুঝি।"

চারু সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।"

চারু কহিল, "মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া কহিল, "এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙ্কণচণ্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তবু অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, 'বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।"

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত, অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্তই বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিদ্বেষ ছিল না, সেইজন্য তাহার বাংলা লাইব্রেরি গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্রুফ-সংশোধনকার্যে সাহায্য করিত ; কোনো-একটা কাপির দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা তালের উপর যত-খুশি লেখো, আমি তাতে কোনো আপত্তি করি নে—আমি কারও স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে—কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ। সেগুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বোঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিয়া কহিল, "তাই তো বোঠান, আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জুলুম করবার উপায় বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নয়। তাদের যত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিয়ে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে



থাকতে হয়, চারু বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি অমল, ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয়, ভালোও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান যদি আরো একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিন্তু চারু বাংলা লেখার ভালোমন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।"

অমল। ওঁর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়, তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার বউঠাকরুনকে যদি গড়ে তুলতে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কী দেবে শুনি।

ভূপতি। তোমার বউঠাকরুনের জুড়ি একটি খুঁজে-পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব।

দুটি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে যেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্যপ্রবন্ধ পাঠ করে—সম্পাদক ও সম্পাদকের দূত তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা-কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল ও চারুর হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমানুষি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজকর্ম করিত ; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার প্রায়ই লুঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোরদুটির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইত সেইটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে



অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নূতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারুর এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুকবন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল ; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মুখোমুখি হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরটুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহূত প্রবেশ চারুর কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। বিমুখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদু স্বরে বলিত, 'ঐ আসছেন' তখন অমলও বলিত, 'তাই, তো, জ্বালালে দেখছি।' পৃথিবীর অন্য সকল সঙ্গের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল ; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্তিনী হইলে অমল যেন বলপূর্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছু দেখলে!"

মন্দা। যখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশি।

মন্দা। তোমরা কী পড়ছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শুনতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপূর্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু 'কালোহি বলবত্তরঃ'।

চারুর ইচ্ছা নহে, অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারু। অমল কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মুখ্খু, তবু শুনলে কি একেবারেই বুঝতে পারি নে।

তখন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারুতে মন্দাতে বিন্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চারুকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, "তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসি গে।"



চারু অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, "আঃ, বোসো-না, যাও কোথায়।" বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল, "তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বুঝি? তবে আমি উঠি।"

চারু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো না, ভাই।"

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁশ কিছুই বুঝি নে; আমার কেবল ঘুম পায়। -বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, "তা বেশ তো, মন্দা-বউঠান, তুমি শুনবে সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিয়া পাত উল্‌টাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারু তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরী থেকে পুরোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আজ নয়।

চারু। আজই তো। বেশ! ভুলে গেছ বুঝি?

অমল। ভুলব কেন। তুমি যে বলেছিলে—

চারু। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই গে। -বলিয়া চারু উঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে বুঝিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই চারুর প্রতি তাহাব মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চারু চলিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি না ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যাও ভাই, মান ভাঙাও গে; চারু রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মুশকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেন, মুশকিল কিসের।" বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "কাজ নেই ভাই, পোড়ো না।" বলিয়া, যেন অশ্রু সংবরণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না ; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদৃষ্ট।" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গল্প বলো, আমি শুনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔৎসুক্যজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের



গ্রামটি কিরূপ, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনো প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল ; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে, বলে যাও।" মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ একদিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সকৌতুকে হাসিতেছে এমন সময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সভা ভাঙিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে যে?"

চারু কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।" বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিলুম, কখন না জানি ফিরবে। মন্মথ দত্তর 'সন্ধ্যার পাখি' বলে নূতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি।"

চারু। এখন থাক্, আমার কাজ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হুকুম করো, আমি করে দিচ্ছি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে ; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রূপ করিতে থাকবে। এই-সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় লঙঘন করিয়া অসুখের ছুতায় গৃহে চলিয়া আসিতেছে। এখন বার বার মনে করিতেছে, 'সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।"

মন্দাও তো কম বেহায়া নয়। একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চারুর পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ কবিয়া জবাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মতলব কেমন করিয়া বুঝাইবে। বুঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উলটা হয়।

বেচারা দাদা! তিনি তাহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চারু কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, যেদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেইদিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে



সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের 'পরে তাহার পূর্বের মতো জোর খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ। চারুকে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না ; চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী একটা লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দুই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে ; চারুর কাছে সেইগুলিই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!"

হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল ; তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল ; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।"

অমল। কী অন্যায় করেছি।

চারু। নুকিয়ে নুকিয়ে দেখছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে ব'লে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্‌ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিয়ে আসি গে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, "চমৎকার হয়েছে।"

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, "যাও! আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "খাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব।"

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বৈ-কি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বার বার শপথ করিয়া কহিল, "কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তখন চারু যেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!"



অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল ; খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না। তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তুমি ভারি ভুল বুঝছ! দাদা মুখে যাই বলুন, তোমার লেখা দেখলে খুব খুশি হবেন।

চারু। তা হোক, আমার খুশিতে কাজ নেই।

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে ; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয়দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে ; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগুলিই ভালো, বাকিগুলা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে-সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে ।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, 'ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব-একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি।' হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল, জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ' এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিযাছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চারু লিখিয়াছিল, 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল ; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প—এই-সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লিগ্রামের ভাষা-ভঙ্গি-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সবস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চারু কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কী বল।"

অমল। অনেকগুলি রৌপ্যচক্র না হলে, সে কাগজ চলবে কী করে।

চারু। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো— হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারও লেখা বেরোবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু কপি ক'রে বের হবে ; একটি তোমার জন্যে, একটি আমার জন্যে।

কিছুদিন পূর্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত ; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোনো রচনায় সে সুখ পায়



না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বেশ মজা হবে।"

চারু কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকেরা যে মেরেই ফেলবে।

চারু। আর আমার হাতে বুঝি মারের অস্ত্র নেই?

সেইরূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, "কাগজের নাম দেওয়া যাক চারুপাঠ। চারু কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই নূতন বন্দোবস্তে চারু মাঝের কয়দিনের দুঃখবিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চারু, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, পূর্বে এমন তো কোনো কথা ছিল না।"

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কখ্‌খনো না।"

ভূপতি। বামালসুদ্ধ গ্রেফ্‌তার। প্রমাণ হাতে হাতে!—বলিয়া ভূপতি একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গুপ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামসুদ্ধ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি!" বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার ঢঙ' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ প'ড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোনো কোনো লেখকশ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে-পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইরূপ রচনাপ্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানীর নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।"

চারু তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসায় এক-একবার খুশি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত



হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খুশি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনায় অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চারুকে দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারু আরামের জন্য অতিনিভৃতে যে-একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা-শিলাবৃষ্টির একটা বড়োরকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল। চারুর ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারু তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; সম্মুখে সরোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চারুকে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দপদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারু নিমগ্নচিত্তে বসিয়া আছে।

পুনরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।' মুহূর্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে মূর্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ করিল। চারুর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা।

চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেলুম! আজ আমার কী ভাগ্যি।

অমল। আমার নূতন লেখা দু-একটা শুনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনাব শোনাব' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না তো। কাজ নেই ভাই--আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে-- আমার কী।

অমল কিছু তীব্রস্বরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই-বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পায় না। সেইজন্যই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত ব্যগ্রতার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল—'অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহপ্রবেশ করিতে শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন শেখে নাই—নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষাণ-জঠরের মধ্যে



থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার — যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সে পথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এইরূপ ভান করিয়া অনিমেষদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযাগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়াছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটিকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে ; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা ; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শুনা যায়! এ যেন মন্দার ঘরে! শরবিদ্ধের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে-লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনো চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল—'মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়—অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও বুঝিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্বোধ মূঢ়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধ পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত করিল। অমল মনে মনে কহিল, 'বউঠানের এ কী দৌরাত্ম্য। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জুলুম।' এই ভাবিয়া সে আরো উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বুঝিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নূতন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁইফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই।



জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্ ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া, প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন্ সান্ত্বনা-প্রত্যাশায় চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল না। খোলা জানলার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল; ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে পাইয়াও চারু মুখ ফিরাইল না—মূর্তিটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চারু।"

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে তুমি যে একলাটি ব'সে আছ, চারু? মন্দা কোথায় গেল।"

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে—সেজন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি ব্যস্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, কী হয়েছে, চারু।"

কী হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছুই হয় নাই। অমল নিজের নূতন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে, এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না। এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্‌খানে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চারু, তোমার কী হয়েছে। আমি কি তোমার উপর কোনো অন্যায় করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে আমি কীরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছা করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেজন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল ; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চারু, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।"

চারু অধীর হইয়া বলিল, "সেজন্যে নয়।"

ভূপতি কহিল, "তবে কী জন্যে।" বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্, রাত্রে বলব।"

ভূপতি মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, এখন থাক্।" বলিয়া আস্তে আস্তে



উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা-কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, "ফিরিয়া ডাকি।" কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চারু আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় শুনিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রজ, ব্রজ।" ব্রজ-চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলবাবুর খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রজ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলি নে যে?" মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল, চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে ভালো করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাচ্ছ না যে?"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চারু কহিল, "দেখো, কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।"

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হাঃ, তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলেমানুষ। সেদিনকার ছেলে—"

চারু। তুমি তো ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও। যাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন, না খেলেন, মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিগ্ধ, তা বলতে হয়।

চারু রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আমরা সন্দিগ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চারুর এই-সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খুশিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোন



গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাকটিস্ করতে যাচ্ছে, মন্দাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

অবশেষে নিজের দুশ্চিন্তা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও না, চারু।"

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি স্থির হয়ে শুনব যে তোমার ভ্রম হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না— দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা-আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া, এ-সমস্তই উমাপদর উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০্ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।"

উমাপদ কহিল, "নিশ্চয় এরা ভুল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমি তো আর নিরুদ্দেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব— তোমার সিকি-পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।"

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোনো সান্ত্বনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়াছিল।

উমাপদ পরদিনেই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার পূর্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপূর্বক উমাপদর সহিত কথা কহিল না— ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা বৌঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধূম যে?"



মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন। এখানে অসুবিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে ছিলুম, সুখেই ছিলুম। কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগল যে।—বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লজ্জা। বাবু কী মনে করলেন।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটুকু স্থির করিল, চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ— সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব সুস্পষ্ট—আর একদণ্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শুষ্ক মনোদুঃখের কেহ দোসর ছিল না—চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "খবর কী অমল।"

অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বুঝি আর-একটা কী গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে মনে ভাবিল, 'সংসার যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোনদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।'

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ এই ব্যাপার! বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বুঝি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু গুরুতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্য সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহাব সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"



অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু বলেন নি?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "অমল, তুমি কী ছেলেমানুষি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশুনো করো, কাজকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্ষমুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্যপ্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমাখরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বুঝিয়াছে যে, তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই ; তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতার—ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না— পূর্ণিমা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল—সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোটো অক্ষরে সহস্র দুর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার স্বরে কহিল, "এসো এসো—আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, 'কোন্ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখোস খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চূড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে



অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ; মনে মনে কহিল, 'আর যাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।'

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোনো কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্মী ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা-কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-যন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া,' এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চারুর ঘরে দ্রুতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যন্ত শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, ''দাদা, তোমার অসুখ করেছে?''

অমলের স্নিগ্ধ স্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুরাশি লইয়া বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসংবরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, ''কিছু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরোচ্ছে কি।''

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল। তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।''

চারু কহিল, ''কই, তা তো কিছু বুঝতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।''

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল—কহিল, ''আজ আমি অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিলুম ; আর-একটু হলেই তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন।''

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতাখানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কী বুঝিল, কী ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে



যাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়নঘরে আসিয়া চারুকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল, "চারু, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চারু অন্যমনস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনো অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যদিই-বা হয়ে থাকে, আমার তো একটা ছোটোখাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়ছি নে।"

চারু। আঃ, কী বকছ তা ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।- চারুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম। বক্শিশ পাবার তো আশা ছিল না।

চারু। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তাঁব মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত?"

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চারু। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকেএকবার ডেকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না?

চারু। আমি তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চারু। আরো তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাজি হয়নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে তো আমি আর সেরকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে, বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।"

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চারু তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "দাদার অনুমতি থাকিলেই উনি মত দেবেন! কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই! দাদার' পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল, ঠাকুরপো।"



অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারু যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণতর ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না। পেটে খিদে মুখে লাজ!"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমারই খাতিরে এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসে হয়।"

চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে! তা বৈকি! কখ্‌খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম ক'রে বলা তোমার ভারি অন্যায়।"

ভূপতি। ঐ দেখো। নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও করতে পারব না।

চারু। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গুরুতর অপরাধ করেছি। মাপ করো। যা হোক, বিয়ের প্রস্তাবটা তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হাঁ।"

চারু। মেয়েটি ভালো কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখতে যাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি, মেয়েটি সুন্দরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চারু। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ঐ নিয়ে মিথ্যে দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই বাপু— দেরি হলে বুক ফেটে যাবে। তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়!

অমলকে চারু কোনো ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়চ্ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলুম না ধরছিলুম? হ্যাট কোট প'রে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আর বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সমুদ্র পেরোনো। তা ভয় কী চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।"

ভূপতি খুশি হইয়া তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপুল নির্মম পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘকাল দিনরাত্রি একান্তমনে নিযুক্ত ছিল সেটা একমুহূর্তে বিসর্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমস্ত



চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশুসন্তানদের মতো ভূপতির মুখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল, 'এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খুব ভালোই। কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারও একটুখানির জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেমনি বিদায় লইবার একটুখানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মুখে কতই মিষ্ট, কতই ভালোবাসা। মানুষকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র নাই।'

নিজের হৃদয়প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্‌বেগ তপ্ত শূলের মতো তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল, 'অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে, তবু এ কয়দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।' চারু প্রতিক্ষণে মনে করে, অমল আপনি আসিবে— তাহাদের এতদিনকার খেলাধুলা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল, "আর-একটু পরে যাচ্ছি।" চারু তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে—চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার বুকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, 'নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী।' কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

দূর গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনই ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনো আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনো অমল যদি আসে। যেমন করিয়া হোক, তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে—অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবয়সি দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে—অনেক ভাব, আড়ি, অনেক স্নেহের দৌরাত্ম্য, অনেক বিশ্রদ্ধ সুখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান— অমল সে কি আজ ধুলায় লুটাইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদূরে চলিয়া যাইবে। একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না—তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ-সম্বন্ধের শেষ অশ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু দ্রুতবেগে আঙুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অশ্রু সংবরণ করা আর যায় না। চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকরুন, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"



চারু আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খুলিয়া ঝন্ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল— সে আশ্চর্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বুকের কাছ হইতে কী-একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্যমুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা-হাতে আহারস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চারু তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চারু কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবাব আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল ; কহিল, "যাও।"

অমল চারুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত, তাই আজ অন্তঃপুরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুন্ন হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারছি নে— আজ অনেক ঝঞ্ঝাট।"

চারু বলিল, "তা যাও-না।"

ভূপতি ভাবিল, চারু অভিমান করিল। বলিল, "তাই ব'লে যে এখনই যেতে হবে তা নয়; একটু জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বসিল। দেখিল চারু বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অনুতপ্ত চিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে যাচ্ছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।"

চারু তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যেন কী-একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল, অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে— তাহার মুখে তরুণতার সেই স্ফূর্তি একেবারেই নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদই যে অমলকে ক্লিষ্ট করিতেছে, চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না ; কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার কেন। কেন সে দূরে দূবে পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপূর্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল। মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "বোঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্ত্বনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখদুর্দশার সহিত একলা লড়াই করিতেছে,



কাহারও কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, "চুলোয় যাক আষাঢ়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ।"

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল, অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে—সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনো কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তো, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, "এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।"

ভূপতি মনে মনে কহিল, "যাক্, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।" সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল, 'বাস্, এখন আর কোথাও নয় ; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি।'

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল—স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া সকাল-সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতযাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনো অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে। তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনো চারু আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, আজ যে এত দেরি করলে?"



চারু তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল।"

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল ; চারু কোনো প্রশ্ন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। তবে কি চারু অমলকে ভালোবাসে না। অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিল, আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন। এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল; সে ভাবিতে লাগিল, তবে কী চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়েমানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুজনের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল ; অমলকে চারু সর্বদা যে যত্ন-আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুশি হইত। আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথাও ভূপতি আশ্রয় পাইবে।

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চারু, তুমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চারু তৎকালোচিত একটা-কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না ; সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনো কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না, কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখতে বেশ।—চারু ঘুমোচ্ছ?

চারু কহিল, "না।"

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল—দেখে এই বুড়োবয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, অসুখ করেছে?"

কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল, চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কী ভুল বুঝিয়াছিলাম। চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছের হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালোবাসা সুগভীর এবং তাহাদের



বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে, ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কখনো দেখে নাই ; আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু ; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়াবেগের সুগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কী করিয়া সান্ত্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনোপ্রকার দূরাশা দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়াশুনা ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো সুখ সবচেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল, সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, "বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।' সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়-- -সে দুই-একটা কথা বলে, চারু দুই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত। সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কল্পনা করিয়াছিল সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে 'উঠিয়া যাই'—কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, "চারু, তাস খেলবে?" চারু অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, "আচ্ছা।" বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়—সে খেলায় কোনো সুখ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল "চারু, মন্দাকে আনিয়ে নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ।"



চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুশি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না।

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে । ভূপতি আর-কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই; ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই ; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কী চাই, কী হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না ; কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে।

চারু কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "আমার দেখাশুনো! কিছু দরকার নেই।'

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, "আমি বড়ো নীরস লোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।"

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনো বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বঙ্কিমের গল্প, এই-সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড়ো বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্তত করিল ; পরে কহিল, "একটা কিছু প'ড়ে শোনাব?

চারু কহিল, "শোনাও-না"

ভূপতি। কী শোনাব।

চারু। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা-কিছু তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চারু কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চারুর শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন



দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরো দুই একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্যচর্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘুম থেকে উঠিয়াই বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয় অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো-একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই ; কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শৌখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কেন। এত কষ্ট কেন হইতেছে: অমল আমার এতই কী যে তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মুটেমজুরগুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।"

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে. কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল ; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা



করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বার বার করিয়া বলিত, "অমল, অমল, অমল!" সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত, 'অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদায় লইয়া যাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।" অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, 'অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।"

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষা গৃহকর্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্বে যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ আরামের পর যেন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন-কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, 'কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।'

ভূপতি চারুকে বলিল, "চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।"

চারু বলিল, "ভারি তো আমার লেখা!"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারও দেখি নি। 'বিশ্ববন্ধু'তে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বলিয়া একখণ্ড 'সরোরুহ' বাহির করিয়া চারু ও অমলের



ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, 'লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না ; রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।'

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বার বার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে, এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহুদুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধু নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বুঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখো দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল ; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমানুষি করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা কেন। সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত, তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্তী বারান্দায় ফুলের টব-পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ।"

চারু। এত চমৎকার হয়েছে—প্রথম লেখা ব'লে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কী উপায়ে।

ভূপতির খাতা ভয়ংকর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চারু সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে; সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও পুনশ্চ-নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া উলটিয়া



পালটিয়া বার বার করিয়া পড়িয়া দেখিল -প্রণামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয়দিন যে-একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়া-ছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে, চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে, চারু দক্ষিণের ঘরের জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, "ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি।"

ভূপতি উদ্‌বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা-টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, "আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও।" এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম-কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে "তোমার নামে চিঠি নাই" এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে?"

চারু ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কই দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, "সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না।"

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল ; সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছলছল করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই-এক মেল তাহাব পত্র না আসাতে সমস্ত সংসাব চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।



সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।

চারু। ওঃ তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়— বলা তো যায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চারু। তাই নাকি। আমি ভেবেছিলুম, বড়োজোর এক টাকা কি দু টাকা লাগবে।

ভূপতি। বলো কী, প্রায় একশো টাকার ধাক্কা।

চারু। তা হলে তো কথাই নেই।

দিন-দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, "আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে, আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি।

চারু। না অসুখ না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া-স্টেশন-অভিমুখে ছুটিল। পথে এক সার গোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল, অমলের হয়তো অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, "আমি ভালো আছি।"

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি নে।" অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো— এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তবু সে চিঠি লেখে না। একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র—পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।



চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনামাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে কয়দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয়দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না তাহাকে ঝুঁটা পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চারুর যে-সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সেগুলো মনে আসিয়া তাহাকে 'মূঢ় মূঢ় মূঢ়' বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের, বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশতাড়িতের মতো চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগুলো কোথায়।"

চারু কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল ; "সেগুলো দাও।"

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল ; কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।"

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "থাক্।"

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরি ভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর খাতা নষ্ট করিবার সংকল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত নির্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরী করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল তাহার জন্য চারুর এই যে-সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা, ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বঞ্চনা এ তো ছলনাকারিণীর হেয়



ছলনামাত্র নহে ; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চর্তুগুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল, "হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই—আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।"

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া—ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর হইতে দেখিল। ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের দ্বারা চারি দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায় ; এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে—অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মতো, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কিছু বলিল না, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী। এত ব্যস্ত কেন।"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তারা সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধু। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুটল না।

ভূপতি। মানুষের যা-হোক-একটা কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে।"

ভূপতি কহিল, "তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।



ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে, চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।—'কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরো কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইঁটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠো করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো, চারু, আমার সঙ্গেই চলো।"

চারু বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮

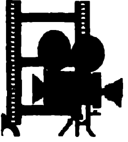
বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

মূল গল্প থেকে সরে এসেও যে অসামান্য ফিল্ম তৈরি হতে পারে তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ 'চারুলতা'। 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প, 'চারুলতা'ও সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। সত্যজিৎ নাকি এ ছবিটিকেই নিজের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করতেন। অথচ ওয়াকিবহাল মানুষ মাত্রেই জানেন 'চাকুলতা' নির্মাণের সময় সত্যজিৎ মূল গল্প থেকে কতটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন।

মণির মতোই চারু নিঃসঙ্গ। উনিশ শতকের শেষে সময়ে বাঙালি রমণীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে অথচ তার উপযোগী পরিবেশ তেমন তৈরি হয়নি যাতে তার কর্মসংলগ্নতা একাকিত্ব ঘোচাতে পারে। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অথবা তার মতো মহিলা সেকালীন সমাজে কমই ছিলেন। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা গরিব পরিবারের মেয়েদের যে সাংসারিক ব্যস্ততা থাকে ধনী গৃহিণীর চারুর তাও নেই। তাই তার সময় কাটে সেলাই করে, তাসের গাধা পেটাপেটি খেলে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খেয়াল রেখে এবং বই পড়ে।

চিত্রনাট্য রচনার সময় সত্যজিৎ এ ধরনের প্রভূত স্বাতন্ত্র্য নিয়েছিলেন বলেই চারুলতা ফিল্ম হিসেবে অসামান্য হতে পেরেছিল। গল্পের কাঠামোটুকু নিয়ে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিস্থিতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ এ অসামান্যতা অর্জন করেছিলেন ছবিতে। মূল গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ছবিটি দেখলেই তার সত্যতা প্রকাশ পায়।

সুভা ও দেবতার গ্রাস



❑ ১৯৬৪ সাল।

সুভা ও দেবতার গ্রাস—রবীন্দ্র ছোটগল্প 'সুভা' ও রবীন্দ্র কবিতা 'দেবতার গ্রাস' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র। 'সুভা' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় মাঘ, ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে 'কথা' কাব্যগ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়েছিল।

সাদা কালো। ১৩ রীল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

প্রযোজক—সাজ ও আওয়াজ সিনে এন্টারপ্রাইজ।

চিত্রগ্রাহক—দীনেন গুপ্ত।

শব্দ—বাণী দত্ত, শ্যামসুন্দর ঘোষ।

শিল্প নির্দেশক—কার্তিক বসু।

সম্পাদনা—তরুণ দত্ত।

সঙ্গীত পরিচালনা—ভি. বালসারা।

গীতরচনা—মুকুন্দ দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কণ্ঠদানে—সবিতাব্রত দত্ত, রুমা দাস, রুমা গুহঠাকুরতা, সরোজিনী দাসী।

অভিনয়ে—শর্মিলা ঠাকুর, কালী ব্যানার্জি, অনুভা গুপ্ত, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে (সুভা)।

বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, মাস্টার সৌমিত্র, ভোলা দত্ত, মাস্টার অপরেশ প্রমুখ। (দেবতার গ্রাস)

পরিবেশনা—দিবাকর চিত্রম।

মুক্তি ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা।

○ রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প এবং একটি কবিতা নিয়ে চলচ্চিত্র সৃষ্টির এটিই প্রথম প্রয়াস।

সুভা

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন ; কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন ; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল-- এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো ; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু, কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে ; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে



ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায় ; দুই ধারেব গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চ তট ; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিসম্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহি-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া-নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত— তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহার ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া



অনিয়মিত আগমনও ছিল ; গৃহে যে দিন কোনো কঠিন কথা শুনিত সে দিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধুদুটির আছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী-একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল ; কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবে মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপরে বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা-আবশ্যক তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে, সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'



মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত, আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে— কে বসিয়া? আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না। তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমাপ্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্‌ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলো, কলিকাতায় চলো।"

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা-বশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত--ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী-একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।"

বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল ; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না। বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।



কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল--দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে ; পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধুসঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মন্দ নহে।"

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন ইহার হৃদয় আছে, এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'যে হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।' শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ-মা 'দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়—ভাষা পায় না—যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

মাঘ ১২৯৯



দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকাদুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে॥

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।' বিধবা যুবতী.
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। 'স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে এক ধারে।' ভিজে গেল মন ;
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে



মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধালো ; সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
'যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্, সঙ্গে যাক।' মা রাগিয়া বলে,
'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপিচুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি!' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,



কে তাহাবে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও ;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন, শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই— যাতায়াতে মাস-দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে॥

যাত্রীদল ফিরে আসে ; সাঙ্গ হল মেলা,
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্নবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন্ আজি আসিবে জোয়ার?'



সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তরবায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীরহু চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ-বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান! শুন এই বেলা,



কবহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা .
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্।'

ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী,
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
একবাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে॥

ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'
মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা।
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।'

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি,
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি! মাসি! মাসি!'



বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্! রাখ্! রাখ্!'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি,
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে'— কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না! সূর্য গেল অস্তাচলে॥

১৩ কার্তিক, ১৩০৪

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা......

১৯৬৪ সালে পার্থপ্রতিম চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প ও একটি কবিতাকে অবলম্বন করে দুটিকে একত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। গল্পটি হল সুভা এবং কবিতাটি দেবতার গ্রাস। রবীন্দ্রনাথের গল্পকে আয়তনে অযথা না বাড়িয়ে মাত্র কয়েকটি রীলের মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রয়াসের মধ্যে পরিচালকের চলচ্চিত্র মাধ্যম সম্বন্ধে ক্ষমতার পরিচয় মেলে.... সুভা একটি মূক মেয়ের কাহিনী...... যার সঙ্গে এই মূক পৃথিবীর ভাব প্রবল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে পৃথক হয়ে পড়ে। পরিচালক হয়তো এই সব ভাবনায় চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন।....রবীন্দ্রনাথের কল্পিত সুভা চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় মনে রাখার মতো। কয়েকটি দৃশ্যে বিশেষ করে ছবির গোড়ার দিকে একটি দীর্ঘ প্যানিং শটের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনকে যেভাবে পরিচালক ধরতে চেয়েছেন তাতে তাঁর আধুনিকতার পরিচয় মেলে। চলচ্চিত্র যে স্বতন্ত্র মাধ্যম এই বোধ পুরোমাত্রায় পরিচালকের কাজে ছড়িয়ে আছে। ফলে এই ছোট্ট ছবিটি রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণের তালিকায় উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে সর্বদা স্বীকৃত হবে কারণ এই চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালককেও আমরা বেশ কিছু জায়গায় চলচ্চিত্র শিল্পী হিসেবে পাই।

দেবতার গ্রাস কবিতাটি বেশ ঘটনাবহুল এবং মানবজীবনে অদৃষ্ট বা নিয়ন্ত্রা কোনো শক্তির কাকতালীয় যোগে কীভাবে কোন ঘটনার মোকাবিলায় মানবের রূপ প্রকাশ পায় তা এই কবিতায় আছে। পরিচালকের

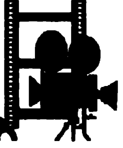


ছবিতে এটি ধরা পড়েছে। চরিত্রগুলির সু-অভিনয় এবং বিভিন্ন ঘটনায় তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি চলচ্চিত্রে যথাযথ রূপে ধরা পড়েছে। .... কবিতাকে চলচ্চিত্রে আনতে গেলে পরিচালকের কবিত্ববোধ এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমের ওপর যে দখলের প্রয়োজন এই দুইয়ের সুষ্ঠ সমন্বয় এই ছোট চলচ্চিত্রে পাওয়া গেছে। পরিচালক এই ধরনের আরও কিছু ছবি করার কথা ভাবতে পারেন।

—রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র : শ্রী অরুণ কুমার রায়।



অতিথি



❑ ১৯৬৫ সাল।

অতিথি—রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'অতিথি' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় ভাদ্র-কার্তিক, ১৩০২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১১ রিল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—তপন সিংহ।

প্রযোজনা—নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাইভেট লিমিটেড।

চিত্রগ্রাহক—দিলীপ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

শিল্পী নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।

শব্দ—অতুল চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু অধিকারী।

সম্পাদনা—সুবোধ রায়।

সংগীত পরিচালনা—তপন সিংহ।

কণ্ঠদানে—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন,

অভিনয়ে—পার্থ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ ব্যানার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, বাসবী ব্যানার্জী, মিতা মুখার্জী, অঞ্জনা ঘোষাল প্রমুখ।

পরিবেশনা—ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

মুক্তি—৪ জুন, ১৯৬৫, রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী।

পুরস্কার—রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ১৯৬৫-দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র।

অল ইন্ডিয়া সার্টিফিকেট অব মেরিট। প্রযোজককে দশ হাজার টাকা এবং পরিচালককে আড়াই হাজার টাকা।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ভেনিস, ১৯৬৬

সার্টিফিকেট অব মেরিট।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়।" প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার?"

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপস-বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "রসুন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না ; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যে সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল ; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার



নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, 'আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।'

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে ; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে ; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পবে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না।"

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী কথা। পাঁচটি আঙুল আছে ব'লে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল ; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল ; তাহার বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন-কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না ; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের



বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনো সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্ক-ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, আরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি, নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্‌ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিলিয়া মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিম্‌ন্যাস্টিকের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্‌ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরের বাঁশি বাজাইতে হইত— এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন—শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।



তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি-প্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে, পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকে সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল ; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাট্টুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্‌ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলেব সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়ি-মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল;



মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তুমি কি খাও।"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই ; সকল দিন খাইও না।"

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল, কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপরে দুই-তিনদিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকাচালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা ও তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে ; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে ; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ—ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এদিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন ; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সংবরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল ; দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল ; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল ; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ছেলেটিকে যদি



কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।' কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্যসকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, 'সংগীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, কেমন লাগল।" সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল-সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত ; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ-সরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত।

এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে



স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনুদেহখানি নানা সন্তরণ-ভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না ; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল ; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনোরূপ তাড়া ছিল না ; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এদিকে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাট্টুঘোড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক-বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা, সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে ; ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, "দাদাঠাকুর, একটু বসো তো ভাই, আমি আসছি"— তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।



কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকরুনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয় ; সে-ই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ-নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকরুনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যখন শুনিল তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে সহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টক-শাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্‌বেগ কেন।—বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেইদিনই অপর একটা তুচ্ছ সূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছ কেন।" চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ করছি, খুব করছি" বলিয়া আরো বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, 'ইংরিজি



শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।" তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুলের হেড্‌মাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না ; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না ; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত— কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জিদ ধরিয়া বসিল, "আমিও ইংরাজি শিখিব।" তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন— কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না ; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্ণমুখে বসিয়া ছিল ; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুর্‌ঘুর্‌



করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারংবার এত কাছে ধরা দিল যে তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনো খাতায় কালি মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এদিকে সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, "কী সোনা, খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেকদিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা ; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোরূপে জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত ; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।' চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, "যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামুনঠাকরুনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সের চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া



চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারংবার বলিতে লাগিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্‌ব্যবহার করিবে, কখনো তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায়, কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে, তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব-আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল ; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল ; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটে ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়। তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।'

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো ; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে



পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক শ্বশুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো, রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য-সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহত ভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত ; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি-চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারংবার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল—শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চড়িয়া এই



গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদুর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা-নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে ; কলিকাতার কন্‌সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পুবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত্ব এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

'কাবুলিওয়ালা'র পর আবার রবীন্দ্রনাথের কাহিনি নিয়ে ছবি করার সুযোগ হল। 'নির্জন সৈকত'-এর প্রযোজক এস এন সরকার আর একটি ছবি করার জন্য অনেক দিন ধরে তাগাদা দিচ্ছিলেন আমাকে। কিন্তু হয়ে উঠছিল না। শেষে একটু ফুরসত পেয়ে মিস্টার সরকারকে বললাম, আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' করতে পারি। আমার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। লিখতে বসে গেলাম চিত্রনাট্য। দুঃসাহসিক হলেও রবীন্দ্রনাথের কাহিনি নিয়ে ছবি করতে আমি আনন্দ পাই। আমি বরাবরই একটু অ্যাডভেঞ্চারিস্ট।

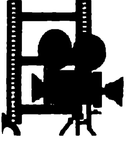
'অতিথি'-র চিত্রনাট্য লিখতে লিখতে আমার বারবার মনে হয়েছে, কাহিনীর নায়ক তারাপদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মনের ভেতর একটা পলাতক বাউলের মানসিকতা কাজ করেছে। শরীরিকভাবে তিনি যা করতে পারেননি, তারাপদকে দিয়ে তিনি তা করিয়েছেন। 'অতিথি' লিরিক্যাল ছবি। একটা কাব্যিক মেজাজ খুঁজে পাওয়া যায় গল্পের মধ্যে। আর সেটাকেই আমি নিষ্ঠাভাবে ছবিতে ধরতে চেষ্টা করেছি। জানি না, কতটা কী করতে পেরেছি। পত্রিকার সমালোচনা তুলে ধরলে বোঝা যাবে কতটা সফল বা অসফল হয়েছি। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে শিল্পী-নির্বাচনের কথাটা একটা বলে নিই।

'অতিথি'-র প্রধান চরিত্র তারাপদ-র ভূমিকায় একেবারে নতুন শিল্পী নিলাম পার্থ মুখোপাধ্যায়কে। প্রায় দুশো আড়াইশো ছেলের ইন্টারভিউ নিয়ে পার্থকে পেয়েছি। তারাপদর চেহারার বর্ণনায় ছিল তার চোখ দুটো সুন্দর, গৌরবর্ণ আর ব্রাহ্মণ হতে হবে। পার্থ যেদিন ইন্টারভিউ দিতে এল, সেদিনই ওকে দূর থেকে দেখে বুঝতে পেরেছি, রবীন্দ্রনাথের তারাপদকে আমি পেয়ে গেছি। পার্থ এর আগে অভিনয় করেনি। ওকে তৈরি করতে প্রায় দুমাস একটানা রিহার্সাল করেছি। সেই সঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে বাসবীকেও। ওরা খেটেছিল খুব। দুজনের খুব ভালো অভিনয় করেছে। শুধু ওরা কেন, অন্যান্য নবাগতরাও। দু-একজন পুরনো শিল্পী ছাড়া এ ছবিতে সবাই নতুন।......

—রবীন্দ্রনাথের কাহিনীভিত্তিক ছবি—তপন সিংহ (নির্বাচিত অংশ)
রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা; মে, ২০০৬ সংখ্যা।



ইচ্ছাপূরণ



❑ ১৯৭০ সাল।

ইচ্ছাপূরণ —রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩০২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

চিত্রনাট্য ও পবিচালনা—মৃণাল সেন।

প্রযোজনা—চিলড্রেনস্ ফিল্ম সোসাইটি।

চিত্রগ্রাহক—কে কে মহাজন।

সম্পাদনা—গঙ্গাধর নস্কর।

সংগীত—অলোকনাথ দে/ বিজয় রাঘব রাও (?)

অভিনয়ে—বাজু, সাধু মেহের, শেখর চ্যাটার্জী প্রমুখ।

মুক্তি—১৯৭০

○ মৃণাল সেনের পরিচালনায় একমাত্র রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ইচ্ছাপূবণ'।
ইচ্ছাপূরণ হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়।

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্য সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন ; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত. আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময়ে ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানে আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, "রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে?" তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নাই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে



ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে, "আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।"

ইচ্ছাঠাকুরণ সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া এক লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন, পড়া দাঁত সবগুলি উঠিযাছে ; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই অস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এত লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না ; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলি গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে ; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে ; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না ; মাথায় এক মাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই—পরিষ্কার টাক তক্ তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল ; অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিল ; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে ; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই



খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস কিনে আন্।"

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস সাজানো দেখিত ; দু-চার পয়সা যাহা পাইত, তাহাতেই লজঞ্জুস কিনিয়া খাইত ; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকার একরাশ লজঞ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল ; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল ; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক ; আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে ; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল ; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বৈকি? ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে,



তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন ; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি-গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটি কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল ; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলে অম্বল হইত— সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে ; সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল ; তহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকে কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টনটন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল্ ছুড়িয়া মারিত— বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সে'ও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়ামানুষেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত ; শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্ গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া



মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত "আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল?" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে "হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকুরন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'দোহাই, ঠাকুরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছাঠাকুরুন বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকলে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

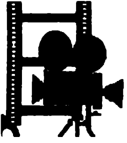
আশ্বিন ১৩০২

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা......

১৯৭০ সালে চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় মৃণাল সেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ হিন্দি ও বাংলায় চলচ্চিত্রায়িত করেন।...... গল্পটির মধ্যে যে ফ্যান্টাসির বিষয়বস্তু এবং বিশুদ্ধ মজা আছে তাই হয়তো মৃণাল সেনকে এই ছবিটি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।.... মৃণাল সেন এই মজাটি চলচ্চিত্রের ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বাস্তবের চরিত্র থেকে যখনই ফ্যান্টাসির স্তরে গেছেন তখন অদ্ভুত কৌশলে শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ ছেলের মুখে বাবার গলা বসিয়েছেন, বাবার মুখে ছেলের। চলচ্চিত্রে এই ধরনের সামান্য পরিবর্তন ছাড়া গল্পটিকে কিছুতেই পর্দায় আনা যেত না বলেই মনে হয়।..... রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি তাঁর ছোটগল্পের তালিকায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আনন্দদানই এর উদ্দেশ্য। পরিচালক মৃণাল সেন সঠিকভাবেই এই ব্যাপারটি ধরেছেন তাই আমাদের দেশে শিশুদের জন্য যেখানে সত্যিকারের ভাল ছবির অভাব সেখানে একটি প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন এই ছবিটি তৈরি করে। গল্পেতে যে মজা বা আনন্দ আছে তা এই চলচ্চিত্রেও অনুভব করা যায়। কোন গভীর বক্তব্যবাহী না হওয়ায় এবং মূলত শিশুদের জন্য নির্মিত হওয়ায় ছবিটি বহুলভাবে প্রচারিত হয়নি বা সমালোচকদের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকর্ষিত করেনি।

—রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র : শ্রী অরুণ কুমার রায়

শাস্তি



❑ ১৯৭০ সাল।

শাস্তি —রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'শাস্তি' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩০০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১১ রীল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য—বীরু মুখার্জী।

পরিচালনা—স্বদেশ সরকার।

প্রযোজনা—ছায়ালিপি।

চিত্রগ্রাহক—মনীষ দাশগুপ্ত।

শিল্প নির্দেশনা —সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা—গোবর্ধন অধিকারী।

সঙ্গীত পরিচালনা—পবিত্র চ্যাটার্জী।

গীতরচনা—প্রণব রায়, জগদীশ মন্ডল;

কন্ঠদানে—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়; অনুপ ঘোষাল, শিপ্রা বসু, বনশ্রী সেনগুপ্ত।

অভিনয়ে—সাবিত্রী চ্যাটার্জী, কালী ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, অজিতেশ ব্যানার্জী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, গীতা দে, জ্ঞানেশ মুখার্জী প্রমুখ।

পরিবেশনা—পিয়ালী পিকচার্স।

মুক্তি—২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০; রাধা, পূর্ণ, পূরবী ও প্রাচী।

○ পরিচালক স্বদেশ সরকারের প্রথম রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র শাস্তি। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে তিনি দ্বিতীয় রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক ছবি 'দিদি' নির্মাণ করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব দিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার্ মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যে দিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্‌ ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, সে দিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্‌ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।



অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি, ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবর্দস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে - উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রু-বর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে ; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল ; তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল। দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল দেখিল, উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল "ভাত দে।"

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষ বচন, বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি!" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এ পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া



নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি ; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া, চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া, ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল, আর রক্ষা হয় না ; হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী কবিয়া রক্ষা পাইব।' মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, 'রাম রাম! সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে!' ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না ; কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্ গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল ; উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু, যখন নিজের স্ত্রীর নামে



দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন ; কহিলেন, "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃ শব্দে পুলিশ আসিয়া পড়িল ; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা গাঁ-সুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে ; এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর্, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল ; শরীরটি অনতিদীর্ঘ ; আঁটসাঁট ; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো ; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে ; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে, এবং কুম্ভ কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ইষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক তাহার উল্‌টা ; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা, অগোছালো মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া-মাগিয়া বকিয়া-ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলো খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্‌চকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া



তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য-বর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে- বেশভূষা সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত । উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন-কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে-কর্মে কোথাও এক দণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি, ও কোনদিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভয় কিসের।" এই—দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জবর্দস্তি করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টন্‌টনে



হইয়া উঠিল। এমন-কি, এক-একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বার বার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল দুখি বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।"

ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল, যে, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিত ভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামে সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিশ যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল চন্দরা কহিল, "হাঁ আমি খুন করিয়াছি।"

"কেন খুন কবিয়াছ।"

"আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

"কোনো বচসা হইয়াছিল?"

"না।"

"সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?"

"না।"

"তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?"

"না।"

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারেই অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমত জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল—বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে



ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া. রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সই-সাঙাতারা কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ-বা আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিযাছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি যদি বলি, আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, "খর্বদার হারামজাদা, আদালতে এক-বর্ণও মিথ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই!" ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলো গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন্ ভাবিল, "ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভালো।' এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামি এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্‌বর্তী একটি ডোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কত শত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর-কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।



চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বার বার কত বার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জান?"

চন্দরা কহিল "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু, চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটা কালোকালো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, "যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সদগতি করিয়া গেলাম।"

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

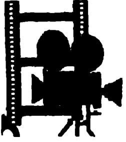
চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ—"

শ্রাবণ ১৩০০

মেঘ ও রৌদ্র



১৯৭০ সাল।
মেঘ ও রৌদ্র —রবীন্দ্র ছোটগল্প। মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
সাদা কালো। ১২ রিল। ৩৫ মি মি.।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অরুন্ধতী দেবী।
প্রযোজনা—কে এল. কাপুর প্রোডাকসন্স।
আলোকচিত্র—বিমল মুখার্জী।
শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।
সম্পাদনা—সুবোধ রায়।
শব্দ—অতুল চ্যাটার্জী ও নৃপেন পাল।
সংগীত পরিচালনা—অরুন্ধতী দেবী।
কণ্ঠদানে—মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর গুহঠাকুরতা, অমল পাল।
অভিনয়ে— শশীভূষণ—স্বরূপ দত্ত, গিরিবালা —হাঁসু ব্যানার্জী, এছাড়া অজিতেশ ব্যানার্জী, সুচিত্রা রায়, দেবাবতী সেন, কল্যাণ চ্যাটার্জী, শমিত ভঞ্জ, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ।
পরিবেশনা-কে এল. কাপুর ডিস্ট্রিবিউশন।
মুক্তি—১৩ মার্চ, ১৯৭০, মিনার বিজলী ও ছবিঘর।

○ অরুন্ধতী দেবীর পরিচালনায় প্রথম রবীন্দ্র কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র 'মেঘ ও রৌদ্র'।
○ রবীন্দ্র সাহিত্য নির্ভর করে কোন মহিলা পরিচালকের চলচ্চিত্র নির্মাণের এটিই প্রথম প্রয়াস।

পুরস্কার—মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকাল ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপের গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিম্নে সংসাররঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জালনা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণহস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোনোমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, 'সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।'

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সুতরাং অনেকক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।



যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই-চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টা সহকারে নিরীক্ষণপূর্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জাম-পরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবাপুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কী জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে, এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে ; শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্তত করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্, ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখের তক্তপোষের উপর রাশীকৃত ছিল ; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনির্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো-একটি আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন-কি পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এ কি উচিত। যখন সে



আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদেবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল-বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ-দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়োই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র • ির প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, [illegible] বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক একদিন যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হয় ; আবার এক একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি, তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে ; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ আর গিরিবালা।

ইহাতে কাহারও ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম. এ. বি. এল.। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এক কালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগণায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবি, সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম. এ. পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাঁহার দ্বারা



হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরো একটা কারণ ছিল ; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন ; যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ—বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্বেই আভাসে বলা গিয়াছে, মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, পৃথিবীর আকার কিরূপ ; কোনোদিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্য বড়ো না পৃথিবী বড়ো—সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে-দেওয়া রাস্তার ধারের ছোটো বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে



নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত, শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এইজন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাতা উল্‌টাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে---অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্যহৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই-চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালোরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম. এ. বি. এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম. এ. বি. এল. তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার



নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক্, শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটিদুইচারি কথা বলিলেন যাহা তাঁহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল, শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্‌টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে---এমন-কি সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসতবাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে, এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কন্‌স্টেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে শঙ্কিত কৌতূহল-সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য-শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন। জয়েন্ট-সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুণ্ণচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশত সেটা তাঁহার সহ্য হইল না—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন-কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব-লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয়, তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নায়েবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টুমি কী কারণ-বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে?"

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না ; তবে কিনা কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের



ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েন্ট-সাহেব ক্রোধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল ; তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল, কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।"

স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের নামে মকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন ; শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, "বাপু, শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, "শশীবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।"

শশীবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণ দৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।"

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত



করা সম্ভব নহে, কহিলেন, "অল্‌রাইট্ বাবু, দেখা যাউক কত দূর কী হয়।"

এই বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বলভ্রমণে বাহির হইলেন।

এ দিকে জয়েন্ট-সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, "তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।"

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেবের মেথর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।"

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।"

জমিদার কহিলেন, "তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।"

হরকুমার কহিলেন, "ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ঐ আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।"

শুনিয়া জমিদাব শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন, মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন, সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন, রাগের মাথায় নায়েববাবুকে 'ডণ্ডবিঢাণ' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন, কখনো বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দুঃখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েন্ট-সাহেবের ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার মুখে শশিভূষণের স্পর্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েববাবুকে বরাবর ভালো লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার। এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।"



অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেন্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্মেন্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেসওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিস্ট্রেটের মনে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিস্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শাণ দিতেছে, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাশ্য আদালতের লোকারণ্যদৃশ্য এবং যুদ্ধপর্বের ভাবী পর্বাধ্যায়গুলি মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফুল, কখনো ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোনোদিন আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতায়-মোড়া কেতকীকেশরসুগন্ধি গৃহনির্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছেন সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে-সকল গ্রন্থ পড়িতেন তাহার মধ্য হইতে কোনো-না কোনো অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূলকায় কালো-মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না। তা না থাক্‌, তাই বলিয়া ঐ বইখানি কি এতই বড়ো আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।

প্রথমটা, গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালাকে সুর করিয়া, বানান করিয়া, বেণী-সমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।



তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই-একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরুগৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে-অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস সিসিরো বার্ক্ শেরিডন প্রভৃতি বাগ্মীগণ বাক্যবলে যে-সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন—যেরূপ শব্দভেদী শর-বর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না; সেদিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না ; পূর্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল। এমন-কি, শশীভূষণ যদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, "গিরি, আজ জাম নেই?" সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সক্ষোভে "যাঃও" বলিয়া তর্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "স্বর্ণ ভাই, তুই যাস্ নে, আমি এখনি যাচ্ছি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা-নামক কোনো দূরবর্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে শুনিতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক—এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হউক, তাহাকে "এখনি যাচ্ছি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না ; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু



লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারুপাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোনোমতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিত্যাজ্য জামের আঁটির মতো সে-সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, দ্বিতীয়বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে, তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি—একটি—একটিরও না! তখন! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে।

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবলমাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে। উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের আইন-সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেবদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নির্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে ধূলিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভূষণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয়দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সুঁচসুতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল ; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে



বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান তো এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল, গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যেদিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস।" গিরি কহিল, "শশিদাদার বাড়ি।" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশিদাদার বাড়ি যেতে হবে না, ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্নশ্বশুরগৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব কেয়াখয়ের এবং জারক নেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশী তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমানবৃত্তান্ত ক্রমশ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সংকোচ এবং সেইসঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মতো লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকালবেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন



নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়ানির্মিত মায়ামরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেইজন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই স্টিমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার-সাহেব এবং অল্পসংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশীভূষণের গ্রাম হইতে কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। একস্থানে স্টিমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার-সাহেব আগ্রহের ভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হাত-দুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে ; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে—এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সি ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি—



সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মতো, তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকারভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তি বিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কী উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহে শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, "নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না।" প্রথমত, পুলিসকে দর্শনি দিতে হইবে ; তাহার পর কাজকর্ম আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে ঘুরিতে হইবে ; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফললাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন! অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা স্টিমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই ; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ-ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্ ঘট্ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোনো আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা হইয়াছিল। স্টিমার তখন পূর্ণাবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক 'ডার্টি র‍্যাগ' অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর সিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার-সাহেব চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইসট্ খেলিতে গেল, যে লোকটা নৌকার মধ্যে মশলা পিষিতেছিল নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল, সেখানে না গিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া



দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক ঝিক করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! "শশীদাদা!"—কোথায় রে কোথায়। কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুনরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই ; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারিদিকে ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া, তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশ দিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই-সমস্ত সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সংকীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূকবিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার-শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া, জুতা হস্তে, ছাতি মাথায়, বাহির হইতেছে—



অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহনার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পা'টারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল এক পার্শ্বে নৌকা-চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডন্ট বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব হইতে পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিশ-সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলে চারটে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরো টুকরো করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্স্টেবল পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড়হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিস-বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্ চট্ করিতে করিতে উর্ধ্বশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পুলিসের বড় কর্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি তাহা জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।



যে-সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতে আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রী পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারাযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল। সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফ্যাসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যেদিন বেঞ্চে কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাবু, শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্রজন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা।"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস-সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায় যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন, তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ— আঘাত, অনধিকার প্রবেশ, পুলিসের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি সব ক'টাই তাঁহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইলে শশিভূষণ বারংবার নিষেধ করিলেন ; কহিলেন, "জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সৎসঙ্গের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত - -বাহিরে অনেক বেশি।"

দশম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্ট্রাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন,



দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানে তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি যাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদিকে যে পরিমাণ দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগৎসংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম শশিভূষণবাবু?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ।"

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে।"

সে কহিল, "আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌতূহলদৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে—নাহয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক—

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল ; পথের প্রান্তবর্তী বর্ষার জল-প্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদূরবর্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল করতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে, ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে, ফিরে এসো!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এসো হে। আমার করুণ কোমল, এসো!
ওগো সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর, ফিরে এসো!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতেই যেন থামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সুখ, ফিরে এসো!
আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো।



আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো!
আমার চিতসঞ্চিত, এসো!
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন,
ভুজ -বন্ধনে ফিরে এসো!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো!
আমার মুখের হাসিতে এসো হে,
আমার চোখের সলিলে এসো!
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এসো!
আমার সর্বস্মরণে এসো,
আমার সর্বভরমে এসো—
আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন, সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কী কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ স্লেট, তাহার উপরে গুটিকয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

স্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা— গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগুলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন— সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্য পথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুতেই অসামান্য বা অত্যধিক নহে ; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়নকার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীত রূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত



সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সংগীতময় জ্যোতির্ময় অপূর্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত, কর্দমাক্ত, সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতিগভীর অতিবেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল। এবং মনে হইল যেন সেই পল্লী বালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রুপার থালায় ফলমূলমিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাঁহার দুই চক্ষু ঝরিয়া, দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না ; নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল— এসো এসো হে!

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা..... 

১৯৭১ সালে অরুন্ধতী দেবী রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' কে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। মেঘ ও রৌদ্র রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প হলেও বিস্তারে ও আয়তনে এটি একটি বড় গল্পের সমতুল। প্রকৃতিতে মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মতো মানুষের জীবনে আলো ছায়ার খেলায় ক্ষণেক আনন্দ, ক্ষণেক দুঃখ। রবীন্দ্রনাথের মেঘ ও রৌদ্র গল্প অনেকদিক দিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় অনেকগুলি বক্তব্যকে ছুঁয়ে গেছে। গল্পটিতে যে প্রেমের ব্যাপার আছে তা কিছুটা অসমবয়সী দুটি মানুষের মধ্যেকার প্রেম। বাস্তবক্ষেত্রে এটি বোধহয় চলচ্চিত্রের রূপ দেবার ক্ষেত্রে বড় বাধা। অথচ ইংরেজের অত্যাচার একে একটি পিরিয়ড ফিল্ম হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষে আদর্শ। পরিচালক এই দুটি ব্যাপারকেই প্রাধান্য দিতে গিয়ে ছবির সমতা (balance)-র অভাব ঘটিয়েছেন। গল্পের মধ্যেও অনেক ছোটখাটো অমিল আছে, চলচ্চিত্রে সেগুলিকে অতিক্রম করা উচিত ছিল।



অবশ্য পরিচালক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে অনুসরণ করার। পিরিয়ড ফিল্ম হিসেবে পোশাক-পরিচ্ছদ, নদীর বুকে বজরা, সাহেবের আচার-ব্যবহার, নায়েব চরিত্র ইত্যাদিকে যেভাবে তিনি জীবন্ত রূপে চলচ্চিত্রের পর্দায় গড়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু শশীর চরিত্রায়ণ চলচ্চিত্রের বক্তব্য প্রকাশে তেমন সহায়ক হয়নি।...... একজন পর্যবেক্ষকের চোখ দিয়ে দেখার জন্য গল্পে রবীন্দ্রনাথের সংসার -রঙ্গভূমির খেলাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়েছে। পরিচালক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে হয়তো চলচ্চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের গল্পে যথাযোগ্য চলচ্চিত্রীয় সমালোচনারূপ হিসেবে আমরা পেতাম।.....

—রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র : শ্রী অরুণ কুমার রায





কাহিনী

ববীন্দ্রনাথ

কে এল কাপুব প্রোডাকসন্সেব নিবেদন

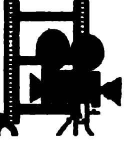
পবিচালনা

অরুন্ধতী দেবী

●●●●●●●●●●●●●●●●

মিনার - বিজলী - ছবিঘর

মাল্যদান



❑ ১৯৭১ সাল।

মাল্যদান— রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'মাল্যদান' গল্পটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় চৈত্র, ১৩০৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১২ রীল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য—সলিল সেন।

পরিচালনা—অজয় কর।

প্রযোজনা—চিত্রলিপি ফিল্মস্।

চিত্রগ্রাহক—বিশু চক্রবর্তী।

শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র।

সম্পাদনা—দুলাল দত্ত।

সঙ্গীত পরিচালনা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়;

গীতরচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

কণ্ঠদানে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, প্রমুখ।

অভিনয়ে— যতীন—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, কুড়ানি—নন্দিনী মালিয়া, পটল—সাবিত্রী চ্যাটার্জী, পটলের স্বামী—শৈলেন মুখার্জী, এছাড়া ভানু ব্যানার্জী, গীতা দে, বিকাশ রায়, নৃপতি চক্রবর্তী প্রমুখ।

পরিবেশনা—চিত্রলিপি ফিল্মস।

মুক্তি—১৪ মে, ১৯৭১; শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা।

পুরস্কার—রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ১৯৭০-আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (বাংলা) -রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক এবং প্রযোজককে নগদ ৫ হাজার টাকা।

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়াছিল, সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-একদিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূধূ করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কী যতীন, পূর্ব-জন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি?"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না! আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে—তার সঙ্গে দুই বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না। আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশায়, সাত জন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না—কেবল হাঁসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদ্‌গদ্ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জ্বালা করে।"



যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল, "থাক, থাক, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনা'ই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব তাহারই গলায় মালা দিব--- ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না, না, একটা-কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।—বলিয়া সে দ্রুতপাদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়োর কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল—ওর ঐরকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না—অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতায় আবকারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুনমধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল—কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, "ও কুড়ানি!"



মেয়েটি কহিল, "কী দিদি।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, ভালো।"

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি করিতেছ।"

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না--ফাল্গুন-চৈত্রে লগ্ন নাই—এখনো হাতে সময় আছে।"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে—মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে, কিন্তু তাহা বোকামি নহে ; তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিযা অসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন, 'এই-যে যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল ; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিসনে—আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি, সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী, তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্‌সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্‌ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "বৃথা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্‌ করিতেছে—এখনো শাঁসের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।



যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল—কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, "শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।"

পটল ফস্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ—ভারি অন্যায়। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশয় দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও যে উহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে—তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে—ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই—আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কর্মই কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কতবড়ো হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল—ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখদুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে ; ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্‌ঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।



পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে, শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসাব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বার বার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে—ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন ; তুমি যাও, পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বৈ-কি। ছট্‌ফট্‌ কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে-- তোমার পেটে যে এত ছিল তা কে বুঝিবে।"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম—হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে—আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধুলা নে।"

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধুলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্‌ থাক্‌, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, "পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তবে আমি খাইব না---আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল ; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না,



ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল ; ভাবটা এই যে, "কেমন ধরা পড়িয়াছ।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে—পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।'

কুড়ানিকে বলিল, "ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না!"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত সংকুচিত ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি, তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে-- "পালাইলাম। শ্রীযতীন।"

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কুড়ানিব বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর ; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবেড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল ; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগ-পক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে-একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে—ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই



স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না ; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমুখি, সর্বনাশ করিয়াছিস! মরিয়াছিস!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কহিল, "তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী। আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে আমাকে খুলিয়া বল্।"

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি তোর দিদি বড়ো দুষ্টু ; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভুল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্।"

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না ; সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রইল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে



একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিশের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালের ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে ; দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই-বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বার আঘাত করিতে লাগিল- -কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরীর মতো অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল "কুড়ানি" তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল—যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম-মেঘ সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো।"

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।



হাসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব, কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।"

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিণীর প্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন-ল্যাম্প ছায়াছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্‌টিক্ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে?"

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, "হাঁ।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলায় এটা কী কুড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা, নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুর যুবতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্ রৌদ্রের আলোকে, কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম। অর্ধেক রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না--আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না—তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।

পটল হরকুমারকে কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।"

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকেঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আশা আছে?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।



পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাবু।"

যতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।"

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাবু।"

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।"

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন?"

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টিতে কহিল, "না দিদি।"

পটল কহিল, "যতীন একবার তুমি ও ঘরে যাও।"

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে এক-একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, "যতীন।"

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

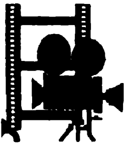
ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপর আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল সে মরে নাই---কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।"

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।"

চৈত্র ১৩০৯

স্ত্রীর পত্র



❏ ১৯৭৩ সাল।
স্ত্রীর পত্র ---রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি 'সবুজ পত্র' পত্রিকায শ্রাবণ, ১৩২১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
সাদা কালো। ১১ রীল। ৩৫ মি মি.।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা---পূর্ণেন্দু পত্রী।
প্রযোজনা---ধ্রুপদী।
চিত্রগ্রাহক---শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিল্প নির্দেশনা---পূর্ণেন্দু পত্রী।
সম্পাদনা---অরবিন্দ ভট্টাচার্য।
সঙ্গীত পরিচালনা---রামকুমার চট্টোপাধ্যায।
কণ্ঠদানে---রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভিনয়ে--- মৃণাল---মাধবী মুখার্জী, বিন্দু---রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী, এছাড়া নিমু ভৌমিক, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্মিতা সিংহ, সীতা মুখোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, রূপক মজুমদার প্রমুখ।
পরিবেশনা-ছায়াবাণী পিকচার্স।
মুক্তি---৪ মে, ১৯৭৩; মিনার, বিজলী ও ছবিঘর।

○ পূর্ণেন্দু পত্রীর পরিচালনায় প্রথম রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'স্ত্রীরপত্র'।

পুরস্কার---রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ১৯৭২-আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (বাংলা)
পরিচালককে একটি ফলক এবং প্রযোজককে নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই এক-সঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত।" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ স্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন।



বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং ক'নের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন-কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল—আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁতগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো



হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম; কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সে দিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সে দিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটু ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো; অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তা হলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালের সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো—দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে



আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড়ো অপমান। দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত কবলেন যে আমার কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মবার কোনো শর্ত ছিল না, তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটি কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ



তাকে ভুলে যায়; কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্য আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়ততো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জাগয়া আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল। হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে; তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু, সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক্, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি, বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না; মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়েপুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি—এত দিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-নাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগোগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।



বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক-একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এ ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এ দিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁতখুত-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন, সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনো রকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়ি-তল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না; কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হতে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এ দিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেসে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতিদেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে ; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, "বিন্দু, তুই ভয় করিস নে—শুনেছি তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।



একে তো মেয়ে ; তাতে কালো মেয়ে ; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচ দিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।"

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম ; কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই—বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটা কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্য তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?"

আমি বললুম, "না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক্-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দু-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস, বিন্দি?"

"এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু, তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"



আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, "ও তো মেয়েমানুষ বৈ তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।"

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল, কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নাই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।"

আমি বললুম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বললুম, "আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললুম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বললুম, "আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ও দিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে—কিন্তু, কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, "তা, দিক্ থানায় খবর।"

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে



ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল, তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। আর শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে!"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয় নি; সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল, কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু, আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল। তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ. এ পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিংবা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।"

আমি বললুম, "সেই যা সব-গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম—কিন্তু, সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।



তোমার কাছে শুনলুম বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধিল। হতভাগিনীর সে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম, অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বলল, "বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।"

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমার যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, "যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, "ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম "কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বললে, "না।"

আমি বললুম, "রাজি করাতে পারলি নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।

তোমরা বললে, এ-সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দুটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনের মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে। মরেছে বই তো না; বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন



কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু, আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলার চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন। এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদ্‌টা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না কেন, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ' ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা; কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন্ দুঃখে কোন অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো



লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখেছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন
মৃণাল

শ্রাবণ ১৩২১

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা....

...একজন পবিচালকের জীবনে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় যখন তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেন। ফিল্ম কবার সমস্ত পর্বেই একজন পরিচালক অন্যের মুখাপেক্ষী। কেবল চিত্রনাট্য রচনাব সময়ই তিনি স্বাধীন। সম্রাট বা ঈশ্বরের মতোই তাঁর একাধিপত্য। তখনই কেবল নিখাদ কল্পনার জয়জয়কার। স্ত্রীর পত্র রচনার দুরূহ দিনগুলোকে মনে পড়লে এখনও যেন এক ঝলক হাওযা ঢুকে পড়ে মনে। সৃষ্টি বা সৃষ্টি সুখের হাওয়া। হাজারটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হচ্ছে তখন। মৃণাল এবং বিন্দু ছাড়া অন্যান্য চরিত্রদের কি নাম হবে। গল্পের পিছনের ঐতিহাসিক সময়টাকে কীভাবে ফোটানো সম্ভব। বিন্দুর উপর সাংসারিক নির্যাতনটাকে কীভাবে শরৎচন্দ্রীয় হয়ে ওঠা থেকে বাঁচাব? ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো একটা সংলাপ। কখনো একটা সিকোয়েন্স সাজানো নিয়ে জাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো অবস্থা। সেই সময় একমাত্র ভরসা মিউজিক। ঘরের দরজা ভেজিয়ে, আলো নিভিয়ে বড়ে গোলাম আলি, আমির খাঁ কিংবা সালাকত-নাজামত অথবা আলি আকবরের সরোদ একটু পরেই সমস্ত গিঁট খুলতে থাকত। যেসব দৃশ্য গড়তে চাইছি, চলচ্চিত্রের মতোই জিয়ন্ত হয়ে উঠত চোখের সামনে। চিত্রনাট্য রচনার সময় সংগীত আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরশীল সঙ্গী। এখনো।......

ধরা বাঁধা চিত্রনাট্যে ভালো ছবি হয় না কখনোই। পরিচালককে হতে হবে খোলামনের মানুষ। অথবা যুদ্ধের সেনাপতির মতো যে কোনো আক্রমণেই অবিচলিত এবং সংকটমোচনে উদ্দীপ্ত.....শুটিং হচ্ছে কাশিমবাজার বাড়িতে। যেটা পি জি হসপিটালের উল্টোদিকে। ছবির নানা অংশের নানা টুকরো-



টাকরা অংশ তোলা হবে। যেমন মৃণাল ভাতের থালা হাতে নিয়ে Spiral সিঁড়ি দিয়ে নামবে। বড় বউ থিয়েটারে যাওয়ার জন্য সাজগোজ করবে সেকেলে আয়নার সামনে। শরৎ-এর মেস বাড়িতে এসে মৃণাল তাকে বিন্দুর খোঁজ আনতে বলবে। এর মধ্যে দুটো দৃশ্য ছিল যাতে প্রচুর বাসন-কোসন দরকার। তার একটা হল বড় বউ পা ছড়িয়ে বসে সেকেলে পানের ডাবর নিয়ে পান সাজছে। আর একটা, রাত্রে খেতে বসেছে ইন্দ্রনাথ ও শরৎ। মৃণাল পাশে বসে বাতাস করছে। কাশিমবাজারের রাজবাড়ির এক জামাইবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই ঢুকেছি এই বাড়িতে। তাঁকে আগেই বলা ছিল এইরকম সব বাসন-কোসনের দরকার, তিনি বলেছিলেন--হয়ে যাবে।

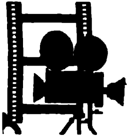
কাজ করতে করতে সন্ধে। এবার পান সাজা আর খাওয়ার দৃশ্য। জামাইবাবুকে ডাকো, জামাইবাবু নেই। তাহলে অন্য কেউ। অন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। যদি বা পায় তারা বাসন-কোসনের ব্যাপারে বোবা শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হল একটা ভাতের থালা, জলের গেলাসও জুটল না। এমনকী একটা আসনও। সবাই মনে মনে বিরক্ত। রাজবাড়ির একী হাল! তাহলে কি বাদ থাকবে দৃশ্য দুটো? পরে কোথাও—আমি বললুম—না। খাওয়ার দৃশ্যই টেক করব থালা গেলাস ছাড়া। রাজবাড়ির ঝি চাকরের ঘর থেকে দুটো তিনটে ডালের বড়া আর এক বাটি পান্তা ভাত কোনোমতে পাওয়া গেল। আমি রূপক এবং শ্যামল ঘোষকে প্রায় শাসিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললুম—

এই পান্তা ভাত আর ডালের বড়া কিন্তু তোমাদের খেতে হবে ঠিক পোলাও বিরিয়ানি খাওয়ার ভঙ্গিতে। শক্তিকে বললুম—ফ্রেম করো, এইভাবে। জলের গেলাসের যা উচ্চতা হয়, সেটা ছেড়ে।

দৃশ্য নেওয়া হল। শ্যামল ঘোষ তারই মধ্যে কথা বলতে বলতে মুখ থেকে মাছের কাঁটা বের করলে। শট হয়ে যাওয়ার পর হাসাহাসির ধুম। মাধবী দেখেশুনে অভিভূত।

—আপনার ক্ষমতা আছে। এখন থেকে আপনাকে ছোট চ্যাপলিন বলব। আমার ক্ষমতা ছিল কিনা জানি না। তবে গোঁ ছিল পুরোদস্তুর। এখনো আছে।

ঘরে বাইরে



❏ ১৯৮৫ সাল।

ঘরে বাইরে —রবীন্দ্র উপন্যাস। 'ঘবে বাইরে' উপন্যাসটি 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দেব বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে।

বঙীন। ১৫ রিল। ৩৫ মি.মি।

চিত্রনাট্য ও পবিচালনা—সত্যজিৎ বায।

প্রযোজনা—ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া।

চিত্রগ্রাহক—সৌমেন্দু বায়।

শিল্প নির্দেশক—অশোক বোস।

সম্পাদনা—দুলাল দত্ত।

সঙ্গীত পবিচালনা—সত্যজিৎ বায।

গীতরচনা—অক্ষয়কুমাব বডাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব।

কণ্ঠদানে—কিশোরকুমার।

অভিনয়ে—সন্দীপ—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ—ভিক্টর ব্যানার্জী, বিমলা—স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, মাস্টার মশাই—মনোজ মিত্র, মেজ বৌঠান—গোপা আইচ, মিস্ গিলবি—জেনিফার কাপুব প্রমুখ।

পবিবেশনা—ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।

মুক্তি—৮ জানুয়ারী, ১৯৮৫; গ্লোব, পূর্ণ, প্রাচী ও টকী শো হাউস

পুরস্কার—রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ১৯৮৪ আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (বাংলা) -প্রযোজককে রজতকমল ও কুড়ি হাজার টাকা। পরিচালককে রজতকমল ও দশ হাজার টাকা।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা-ভিক্টর ব্যানার্জী—রজতকমল ও দশ হাজার টাকা।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ নির্মাণ—হারু দাস ও বিপুল— রজতকমল ও দশ হাজার টাকা।

শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

বিমলার আত্মকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ— শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়—আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম।

বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-



সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় নাহয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্য বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁব সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সেই সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে। তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কি বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়— সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগলপাঠানের, কতক বিধিবিধান মনুপরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়েছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে



তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী. তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো-একদিন আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম—মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নাই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে



আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তি পূজা আরতির আলোর মতো—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্ ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য! এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই পর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতেই হবে। নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমর দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে, তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর



রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা!

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম—এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই-সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বার বার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারি দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যার মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বার বার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করে তা হলে তিনি— সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমরা অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিংবা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান



যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে!—সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না, কেননা এ বাড়ির ঐরকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।—যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন—সে আমার অপরাধ—কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না—মনে হত এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা! বলি, আমাদেরও তো একদিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, নাহয় যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ নাহয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারও উপরেও না, সে কেবল—সে আর বলব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন—তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল —মন যা চায় তা হাতে তুলে দেবার জো নেই।



তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়—ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারী, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সইবে?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না—এই বলে আমি তাঁকে ও-মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বললেন চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ-সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি। এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সেজন্য আমি ভাবছি নে—আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি, তাই বললুম, না,



অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয়? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সইতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরও সইতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে ঘরকর্‌নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন?

এ কথা নানা রকম আকারে বার বার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না— সে তাকে ছাড়া জলেব মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে—তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্য তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ-আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সইতেন; তিনি নিশ্চয় জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুব এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিংবা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে



যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি, তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষমানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন; আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন পুরুষমানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, তাতে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যে ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দর রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবউ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে—এই কথাই বার বার আমার মনে হতে লাগল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব।

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারেব কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি—আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন?

আর, রাজসংসার তো এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত আত্মীয়, সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই বা জানে! আমাদের মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে। এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।

আমি মনে মনে বললুম, পুরুষমানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি



তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই, সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটা তেজ থাকা চাই তো। যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে—সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার—না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

রাত্রির সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেইজন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? হুলু দিতে দিতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র—কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ



করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠতে শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে ঐ পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস? বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবিছস? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট্ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য উটকামন্দে যেতে হবে—নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নাই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি— আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরী আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো—



বেশ তো, ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে?

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমরা সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি— ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই-সমস্ত পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ— এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি, কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক্-না ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন; তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মন হল, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে



নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না-করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিতে তা নিয়ে সদ্‌বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমর বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি না কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া— চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ—এইরকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথ মনে উঠছে— কিন্তু থাক্।

কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের



উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমর-লোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না--- বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চম্‌কানি। আমার মন বললে, আমরই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তা হলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন- —তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু, তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বললুম, কোন মতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।



শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেক বার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমরা স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম করে চাইলেন, আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপবাবুকে বলব, যদি কোনোরকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারও মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু, রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু, বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখতে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুলে একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড় দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে?

তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কি সাজ দেখলে?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ-চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত-ছেড়েছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু, সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে। মনে মনে বললুম, আমি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন— মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম-দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু, খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম, আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।



তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন নাহয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেল জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠবে কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল নিজেকে হাজার বার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন ওঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম।

কোনোরকম করে খাওয়ানাটো হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম; তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাওয়ার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত। আমার স্বামী যে ওঁর পরম বন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন?

তিনি বললেন, আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজবে। বাজলও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগল। আমি বললুম, সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বললেন, দেশের আশীর্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেইজন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলছি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমনি দ্রুতবেগে সচল যে, আর-এক জনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তা হলে ইনিও খালাস পাবেন না।



আমি যখন চলে আসছি তিনি আবার বলে উঠলেন, আমার আর-একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থমকে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে—খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি।

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণরোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কিরকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। অ্যালোপাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কিরকম আশ্চর্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বললেন ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েছেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে-হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বললেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না, তোমার বসবার ঘরের তিনটি শেল্‌ফ্‌ যে একেবারে —

ওগুলো কী জান? প্যুনিটিভ পুলিসের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়—আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে--কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলংকারমাত্রই যে অত্যুক্তি, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুন, গাছপালা-পশুপাখিরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে— মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজো জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে? তিনি ফিস্‌ ফিস্‌ করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বললেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া. হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয় নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখতে পেলেন, সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বললেন, বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল, তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারি নি, মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম।

দেশের মূর্তিমতী নারীশক্তির মতো যেরকম নিঃসংকোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবু কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলুম, এ পর্যন্ত তার কিছুই হল না।



সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমর স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠতে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেছি আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষটুকু ছাড়তেন না।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কী তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বললেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল?

একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই—এতবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়াণের উপাসক---মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

এ কথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে; তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা; ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মানবে না?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? চুরি করতে পারি নে যে তাই। সে কি বুদ্ধি আছে ব'লে না নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না; আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসি জর্মান রুশ এমন কোন সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?



সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে অগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জাবাদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি। আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়; এ কথা বলা শক্ত ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন?

আমি বললুম, আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব—যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠলেন, হুরা! হুরা! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আমি দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন



জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়; মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে—সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর—পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী!
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে
ফিরুক সঞ্চরি।
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ংকরী!

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন— কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিংবা দেশের যে নারী দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন—কিংবা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।

হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।



ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন-কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ-সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলি নি।

কেবল একটা কথা কোনোদিন মনে কল্পনাও করতে পারি নি। আজ সেই কথা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কী? এ কী? কী হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসে ছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ছে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল-ব'লে সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টানছে আমার হৃদয়ের সামনে ততই তার আবরু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েছে—যা দেখবার নয়, যা দেখতে চাই নে, তাও বসে বসে দেখছি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এতবড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই নটা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোল সব চেয়ে বড়ো ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বলতে পারি, হে সত্য, তোমারই জয় হোক।

আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল আমার মতো সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব। মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরিবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেছে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদছে। তার ঘরে অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠছে। আজ তাকে একবার দেখে আসি গে। —ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধুলো আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

জোর করে অহংকার করে কী করব? নাহয় মাথা হেঁট করেই বললুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই



জোর নেই। কিন্তু, জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এইরকম অসংকোচে পায়ের তলায়—কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক করা কেন? ঝগড়া করে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না। অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! নাহয় তাই হল—কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্য তাই, সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে, অযোগ্যের বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে—সে ছিল ঘরগড়া বিমল। ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরী। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে-প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবি নি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তা হলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। এ কথা কেন ভাবি নি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহংকারে? না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে এই অহংকার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্ছে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহংকার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কি, অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন ক'রে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়; অন্য-সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে, কোনো-একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকর-বাকরকে মারধোর করতে পারি নে, কারও উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু-একটা বলতে বা করতে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সংকোচ বোধ হয়। আমি জানি আমার এই সংকোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে; আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে



ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠছে যখন দেখছে আমি 'বন্দে মাতরম্' হেঁকে চারি দিকে যা-ইচ্ছে তাই করে বেড়াই নে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাই নি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিসকে ভয় করি, পুলিস ভাবছে ভিতরে আমার কু মতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো-একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাই নে, যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বললে, তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই, সেইজন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্তিকে তুমি সত্য করে দেখতে পার না। দেখলুম বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেননা, এ তো বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোটো ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোটো আকারেই দেখা দেয়; সেইজন্যে সেটুকুতে মিলন-গানের তাল কেটে যায় না। বড়ো সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়ো; সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেল-বাতি থাকতে পারে. কেবল শিখার অভাব। আমি তো বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চক্‌মকি পাথরের মতো আলোকহীন; তাই এত ঠুকতে হয়, এত শব্দ করতে হয়, তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরোয়—সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহংকার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারি। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে তা বুঝি নি তা নয়, কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে এ কথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করছি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এইজন্যে ও সম্বন্ধে ওকে আমি কোনোরকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ



কিন্তু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে; তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোটো হয়ে যায়, কী জানি হয়তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে—হয়তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন—তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বললেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না; কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল চাদানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বললে, আমরা এই-যে চার দিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেল না। একটু পরে বললে দুরকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার দিকে ঘুরে কাজ করা কিংবা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিংবা স্বভাব অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝাবার একটা কারণ ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাই নি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখি নি। ধিক্, এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখি নে। আমি উপলক্ষ-মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি। না না, আপনি লজ্জা



করবেন না; মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী; আমরা আপনাকে চারি দিকে ঘিরে কাজ করব, কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই, তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর-একদিন এসে বললেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জিলিং বেড়াতে যাও; তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বললুম, বিমল, দার্জিলিঙে বেড়াতে যাবে?

আমি জানি দার্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব শখ ছিল। সেদিন সে বললে, না, এখন থাক্।

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নে তা হলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সেদিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর-জবরদস্তি? কিসের জন্যে! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে!

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এইজন্যেই নীতিকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা এক দল লোক আছে—নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু



দামি সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে। তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবতখানায় রোশনচৌকি বাজছে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর। যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা ক'রে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী—কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল? আশমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল নাকি? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চিঁ চিঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছিবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাই নে, কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে। কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখতে চাও; সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ; আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে। আর যে-সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্য এত চীৎকারে সে-সব কথা কেবলমাত্র দুর্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে-সব কথা মানতে পারে না। কেননা মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়। তার কারণ, কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না, তারাই কৃতকার্য হল; আর যে হতভাগারা এক দিকে প্রকৃতি আর এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

এক দল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব; ওকে নির্জীব বললেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি; কিন্তু কাকে জোর বলো, আর কোন্ দিকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।



আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ।

নিখিলেশ বললে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো— তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এইরকম রূপক দিয়ে কথা কয়; তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এইরকম-রূপক নিয়েই সুখে থাকে তো থাক্—আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে; আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি—আমরা সকালবেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না। আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই, তা এতে আমার বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চলছে তারা এই নিয়মেই চলছে, অথচ বলছে অন্যরকম কথা। এইজন্যে তারা জানে না এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয়, জীবনে তার একটা পরীক্ষা হয় গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়—সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ-ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা—চাই-চাই খাই-খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে, এই দুর্দম ইচ্ছাই হচ্ছে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর-কাউকে মানতে চায় না বলেই চার দিকে জয়ী হচ্ছে। বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর-কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আশমানের দিকেই নিয়ে যাক; দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কতদূর ওঠে আর কতদিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয় নি।

'অ্যাফিনিটি!' জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেছি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এইজন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল। অ্যাফিনিটি একটা কেন? অ্যাফিনিটি হাজারটা। একটা অ্যাফিনিটির খাতির আর-সমস্ত অ্যাফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয নি। সেটিকে স্পষ্ট



দেখতে পাচ্ছি, সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তা হলে আমি কাপুরুষ।

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাই নি—আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণার মতো ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায় নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজো জা হাসতে হাসতে আমার স্বামীকে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়িতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বল ভাই ছোটোরানী? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে-সজ্জায় ভাবে-গতিকে ভিতরের দিক থেকে একটা একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল, তার লেশমাত্র মেজো জায়ের চোখ এড়াতে পারে নি। আজ আমার এ কথা লিখতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা, সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে-সুঝে করি নি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভালো লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সামনে আমার স্বামীকে একদিন বললেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষীরানীকে আমি প্রথম দেখলুম--- সেই জরির-পাড়-দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে—যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এইরকম করে তাকিয়ে—তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল—মনে হল ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন বাইরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই তো চাই, এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষীরানী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আর-একদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী—তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা—কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল—আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মতো আকাশ ফাটিয়া বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করলেন? তার এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য



সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন, তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহনার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে বললেন, মউচাকের মক্ষীরানী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজো জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধে নি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে; সে এমন-একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই-যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল এ জিনিসটা কী, সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না; এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়; এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোটো বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সংকোচ বোধ হত, কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলই বলতেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গড়েছেন। শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাই নি।

দেশের চারি দিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আসত, সে সমস্তই আমি পড়তুম এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক-এক দিন সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিলতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না কিন্তু তার দু দিন পরে সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনই আমাকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, দেখুন, সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল। এক-এক দিন বলতেন, আপনার যে পরামর্শটি নিই নি সেইটেতেই আমি ঠকেছি। আচ্ছা, এর রহস্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে, অথচ কাজে কর্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেইরকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ-সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উলটোরকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতেন। আমার স্বামীর এই-সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধিবিপর্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে, যেন সেইজন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতেন। তাই তিনি নিরতিশয়



স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ি কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না; অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব; তাদের হৃদয়াবেগ যখন এক দিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে তখন অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যেই আমরা প্রলয়ংকরী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো; কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচরজাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল ভিতরের থেকে মক্ষীর বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তা হলে হয়তো লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনই জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা-ঘরে আমাদের সভাটা এমনি জোরে চলতে লাগল যে আর-কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা-ঘরে যখন মক্ষী আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুরির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুলতে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষী শেল্‌ফ্‌ থেকে মনের মতো বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চমকে উঠে আপত্তি করে, তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম, এমন সময় সে পথ আগলে বললে, বাবু, ও দিকে যাবেন না।

যাব না! কেন!

বৈঠকখানা-ঘরে রানীমা আছেন।

তোমার রানীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বললুম, আমি হুকুম করছি তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।



গতিক দেখে দরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, বাবু যাবেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করছে।

তার সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিক তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙা'। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে; যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা, সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওর রঙ শামলা, কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শামলা—কী তেজ আব কী ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে রানী বললে, নন্‌কু, চলা যাও।

আমি বললুম, আপনি রাগ করবেন না, নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্ছি।

মক্ষী কম্পিতস্বরে বললে না, আপনি যাবেন না, ঘরে আসুন।

এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মক্ষী একটা কাগজের টুকরোয় পেন্‌সিল দিয়ে কি লিখে বেহারাকে ডেকে বললে বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বললুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য রাখতে পারি নি, দরোয়ানটাকে মেরেছি।

মক্ষী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই, ও তো কর্তব্য পালন করেছে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষী নিখিলকে বললে, আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন' যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম: ভাবলুম সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষী বললে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আসছিলেন, সে ওঁর পথ আটক করে বললে হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই?

মক্ষী বললে, তা কেমন করে বলব!

রাগে ক্ষোভে মক্ষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর-কি।

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বললে, হুজুর, আমরা তো কসুর নেই। হুকুম তামিল করেছি।

কার হুকুম?

বড়োরানীমা মেজোরানীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন।



ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেল মক্ষী বললে, নন্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করেই রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খটকা লাগল। ওর খটকার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা! সোজা মেয়ে তো নয়। নন্‌কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। নিখিলের ভালোমানুষির 'পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দারোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুনলুম তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে—দরোয়ানজির তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে তো আভাসে বুঝতে পারছি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়—নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

এর ফল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে; কোনোরকম প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।

এমন করেই ভাবভঙ্গি ক্রমে আকার-ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায়, জমে উঠতে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই। এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছানো—সত্যের এ এক আশ্চর্য জয়যাত্রা!

সত্য নয় তো কী! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস; ধুলোর কথা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর, মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধিনিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিস করে বানাতে বসেছে! যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন করবার ফর্মাশ। তার পরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম বলো, বিশ্বাস বলো, কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কত ধিক্কার, কত হাহাকার, কত শাসন! কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কথায়? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়— সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সমানে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা! তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী? এই-যে পা কাঁপতে থাকা, এই-যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি! আর, এই ছলনা শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা, বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়াআবরণ প'রে বেড়াতে হয়। যেরকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি



প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দয়—যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। ঐ-যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে; ঐ-যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চলছে! ঐ-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কাল-বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা! ঐ-যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গি, ঐ-যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ। অথচ এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকছে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়; এইজন্যে, তার গতিবিধি জানতে পারি নে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, এইজন্যেই সাপের মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলেকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডবনৃত্য—তার পরে মরণ-বাঁচন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুচ্ছ!

আমার মক্ষীরানী স্বপ্নের ঘোরেই চলছে, সে জানে না কোন্ পথে চলছে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ্য কবি নে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষীরানী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে-থাকার অর্থটা কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুললেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করি নে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না, না, আপনি—

আমি বললুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে, ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখুন-না আমি কিচ্ছু কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব।



আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কী জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষীরানী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়ছে, পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আর-একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বললুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের; কেননা, আমরা কেউ বা অ্যাটর্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

মক্ষীরানী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্‌যোগ করতেই আমি বললুম, না, সে হবে না, আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্ছি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়ে নি, তা হলে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।

মক্ষী বললেন, কেন?

আমি বললুম, কেননা এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত করে মক্ষী বললে, কেন বলুন দেখি।

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেইজন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি তো দেখছেন সেইজন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে—যেন ফি কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে এইরকম ওর মতলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষী বললে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কী?

আমি বললুম, আপনি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী স্বদেশ কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে; কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে, কথা তৈরী হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে, কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।

মক্ষী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল; তার পরে গম্ভীরভাবে বললে, স্বভাবের চেয়ে বড়ো হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয়?

আমি মনে মনে হাসলুম—ওগো ও রানী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্ টস্ করছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে—এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে



কেন? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন?

আমি বললুম, পৃথিবীতে দুর্বল লোকের সংখ্যাই বেশি; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওই রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্ছে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত ক'রে কাহিল ক'রে রেখেছে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষী বললে, আমরা মেয়েরাও তো দুর্বল, দুর্বলের ষড়্‌যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিতে হবে।

আমি হেসে বললুম, কে বললে দুর্বল? পুরুষমানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ ক'রে ক'রে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ংকরী হয়ে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি লিখে-পড়ে দিচ্ছি। বাইরেই পুরুষরা হাঁকডাক করে বেড়ায়, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখছ— তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়েজাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকত তা হলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা সাজে সাজিয়েছে, নানা নামে পূজো দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েছ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েছ, বাস্তবকে পালন করেছ।

মক্ষী শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না; সে বললে, তাই যদি সত্যি হত তা হলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে; তারা জানে পুরুষজাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে। সেইজন্যে তারা পুরুষের কাছে থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি, এইজন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়; আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না; পুরুষের জন্যেই তো যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাত দায়ে পড়ে।

মক্ষী বললে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন?

আমি বললুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমর কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁওয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না; আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলবার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করি নে।

আমার মনে ছিল যে লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চলছে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম তার ভঙ্গিটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক; জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ; কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁওয়াকে, আর মেয়েরা



ভালোবাসে বস্তুকে, সেইজন্যেই পুরুষ পুজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেছে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাস্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু এই-সব মাস্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল, তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চলল; সংসারে প্রবেশ করলে, সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুকল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুলমাস্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপেব মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত, আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষী, তার মুখ দেখেই মনে হল সে এক মুহূর্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল; তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েণ্ট্স্ম্যানের মতো পথের ধারে বসে থাকে, তারা ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সংকুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা কবছিলেন—'মাপ করবেন আমি'—কথাটা শেষ করতে না করতেই মক্ষী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে আর বললে, মাস্টারমশায়, যাবেন না, আপনি বসুন। সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাস্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিংবা আমি হয়তো ভুল বুঝছি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষী হয়তো আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাবছ তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছ, কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি।—তাই করো না। মাস্টারমশায়দের তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি তো মাস্টারমশাই নই, আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাই নে। আমি তো বলেইছি, ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না—আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুললেন। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁকে একটানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো; তাতে তাদেব মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য আছে এ বদনাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বললেন, দেখুন, আমরা কোনোদিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকতে পারলুম না; আমি বললুম, আমরা তো ফসল চাই নে। আমরা বলি, মা ফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন; বললেন, তবে আপনারা কী চান?

আমি বললুম, কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

মাস্টারমশায় বললেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।



আমি বললুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়ি হাতে বোর্ডে বচন লিখছি নে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেইটেই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব; তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন নাহয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্‌ফট্‌ করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছট্‌ফট্‌ করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিংবা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছটফট্‌ করে নি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখন যাই মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বললুম, মক্ষীরানীকে বইটার কথা বলছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো-আনা মানুষকে মিথ্যেব দ্বারা ফাঁকি দিতে হয় আর এই স্কুলমাস্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠকতে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ করে রইল। আমি বললুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে, এই-সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছে; তাই আমি বলছিলুম, এই বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললুম, তোমার কী বোধ হয়?

নিখিল বললে, এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো, যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বললুম, তার অর্থটা কী?

নিখিল বললে, দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে, নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে, আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এ-সব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোস্ট্‌ যার আলোতে আমরা এ-সব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।



আমি বললুম, দেখো নিখিল, ধর্মনীতির সোনাবাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি; এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখো, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বললে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি নে।

তবে?

মিথ্যা তর্ক করে কী হবে? এ-সব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষী আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি, তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুল-মাস্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কি না। কিন্তু বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিন্ত আছে সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বললুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর একটু হলেই বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বললে, তাতে ক্ষতি কী? ও বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে; আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে, এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব, কিংবা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে নিয়ে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না। তোমরা আমাকে বল আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র; আমি নই, সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোটো করছ, অপমান করছ।

কোথায় দেখছ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও!

একি তোমার পাগলামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি, জেনেশুনে, বুঝেসুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল আর মক্ষীরানী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানষু ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয় না কেন? আমি জানি, ও অপেক্ষা



করে আছে বিমল কী করে। বিমল যদি ওকে বলে 'তোমার সঙ্গে আমার জোর মেলে নি' তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে, তা হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মানলেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়, এ কথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ও-রকম পুরুষমানুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি; ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা।

তার পরে মক্ষী, বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন ওকে জেনেশুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে, একবার পিছবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর, আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে 'যাও যাও' বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে, তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি—রাগ বলো, ভয় বলো, লজ্জা বলো, ঘৃণা বলো, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে— আমরা যেমন করে আপিস করি— কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না, এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্‌ন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্‌ন্ নয়। 'মডার্‌ন্' এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে; কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যাক। এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্তি করে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইছে!

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার



দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন?

মক্ষী একটু হাসলে; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষী একখানা বই খুলে তার পাতা ওলটাতে লাগল। আমি বললুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনোরকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েছি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের; তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেইরকম ছিল। তখনো ইহকাল-পরকালের অনেক জিনিস বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাস ঠকায় বটে, কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই— ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল, আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবি নি। এখন প্রায় মাঝে মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর, সব জিনিসকে বড়োবেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর-কিছু না জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই তো চলছে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্ছি খাচ্ছি; তাকে যদি এক মুহূর্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তা হলে কি মুখে অন্ন রুচত না চোখে ঘুম থাকত?

কেবল নিজেকেই সেই-সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারি নে। মনে করি কেবল অমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর, তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ্-না সেখানে যুগযুগান্তের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছে, জানো বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে।

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায় 'না, আমি আমিই' তখনই আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি! ওটা কি একটা সত্য! ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর, যা-কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেছি, একদিনও ওকে ধুলোর উপর নামাই নি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি। ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তা হলে সেই সঙ্গে আমার—

ঐ দেখো, আবার গাম্ভীর্য! কাকে বলছ নর্দমা, কাকে বলছ ঘোলা জল? ও-সব হল

রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিস আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ কথাটাই আরো বড়ো করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে! তা যাক। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন-কি তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো; সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে; এইজন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে—সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যা হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে করে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মতো এ কথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে; সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসি নি। আমার যা বড়ো ব্যাবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্দোষ। আমি লোভী; আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই; তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফর্মাস খাটছেন না কি?

তা হলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে; মায়ার রঙে যে-সব চিত্রবিচিত্র করেছি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ কথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নাই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে, কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ম্বরসভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন, আমার নয়। আজ আমার এ কথা অহংকার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে না জানি ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে হয়, তা হলে আমি আবর্জনার মতো সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব; আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-



লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়, সে অন্তঃপুরের রোগীর-পথ্যে-মানুষ-করা রোগা আমি নয়; সে বিধাতার শক্ত-হাতের তৈরি আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাস্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বললেন, নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে, কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোন নি কেন?

তিনি একটু হেসে বললেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব যাব করছি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বললে, কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি, আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয়-অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি 'আয়নাটা আমারই করে নিই' 'বাক্সের ভিতরে করে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

একটা শয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এ-সব তোমার ছেলে-ভোলানো কথা! তা হোক-না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে—লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে—কত ছেলের কত কান্না! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না—সে সত্য, সে সত্য—এইজন্যে বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব; ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকোবের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না। যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলো চুলের গন্ধ ভরে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোমটা-খোলা তারা আমাকে বলছে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে, সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব—সব ভুল, সব কান্না, কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন



কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে—কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুকলেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী? লক্ষ্মী ভাই, শুনে যাও— তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারি নে।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি, ভয় করি নি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উল্লাস! নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ংকর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি দিন রাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল, বড়ো মনোহর নিজেকে একেবার ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।

আর, কৌতূহলের অন্ত নেই— যে মানুষকে ভালো করে জানি নে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বলছে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য— সে কী প্রচণ্ড, কী বিপুল! এ তো কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যে সমুদ্র বহু দূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেছি মাত্র, এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

আমি গোড়ায় সন্দপীবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাঁকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমন-কি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে -মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে—কিন্তু, বীণা তো বাজল! আর, সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা-কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।



এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা-কিছু আছে যেটা—কী বলব? যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাস্টারমশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে, তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড়া করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্তেই বড়ো করে দেখতে পাই— বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেছি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু, কী হবে! আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিকে থাক্ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি নে। আমার ননদ মুনুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুনুকে মারত, তার পরে মেরে অনুতাপে হাউ হাউ করে কাঁদত, শপথ করে বলত 'আর কখনো মদ ছোঁব না', আবার তার পরদিন, সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে বসত— দেখে আমার সর্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক—এ মদ কিনে আনতে হয় না, গ্লাসে ঢালতে হয় না—রক্তের ভিতর থেকে আপনা- আপনি তৈরি হয়ে উঠছে। কী করি! এমনি করেই কী জীবন কাটবে?

এক-একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই, এ যে মায়া-জাদুকরের মতো কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙিন করে তুলেছে। এ যে কী হল, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

একদিন আমার মেজো জা এসে হেসে বললেন, আমাদের ছোটোরানীর গুণ আছে। অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না; তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তা হলে কিছুকাল টিকতে পারত—এখন বড়ো সন্দেহ। ছোটো রাক্ষুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিবি কিরকম হয়ে গেছে!

এ-সব কথা একদিন আমার মনে লাগতই না, তখন ভাবতুম আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারি দিকে একটা ভাবের আবরু ছিল; তখন ভেবেছিলুম, আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আমার লজ্জা-শরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা মডার্ন কালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি; সেই-সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাই নি; আমার মনে হতে লাগল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়াল রইল না। কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্ছেন, কেনই বা আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করছি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নাই।



তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজো জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বললুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না, মরে গেলেও না।

দু দিন বাইরে গেলুম না। সেই দু দিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হল যেন একেবারে জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হল কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে, যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল তবু নিজে দাঁড়িয়ে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম। আলমারির ভিতর জিনিসপত্র একভাবে সাজানো ছিল, সে-সমস্ত বের করে ঝেড়ে-ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্যরকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলো চুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হয়ে গেছে; তা নিয়ে কাউকে বকতে সাহস হল না, পাছে এ কথা কেউ মনে মনেও জবাব করে 'এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা'।

সেদিন ভূতে পাওয়ার মতো এইরকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কী পড়লুম কিছুই মনে নেই, কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরের যাবার রাস্তার জানলার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবন-সমুদ্রের ও পারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি! নিজেকে মনে হল আমি যেন পরশুদিনকার আমির ভূতের মতো, সেই-সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম—সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হতে লাগল যেন উঠোনটার উপর, বারান্দায় রেলিংগুলোর উপর রেগে রেগে উঠছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যদি পারতেন তো খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানাব দিকে যাব মনে করছি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজো জা দাঁড়িয়ে।

ওলো, অবাক করলি যে!—এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বললে, ছোটোরানীমা, ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বললুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্। এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে বিলিতি সেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, সন্দীপবাবু দিলেন।— সাহসের আর অন্ত নাই! বেহারাটা কী মনে করলে! বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল— চিঠি খুলে দেখি তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে, 'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ।'

রইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। শাড়িটা যেমন ছিল তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি



তাঁর চোখে এই জ্যাকেটটির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটছেন। আজ আমি কিছুই সংকোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন, বলি চলেছ কোথায়?

আমি বললুম, বৈঠকখানাঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন—

রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে।
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বললেন যে, আর্টিস্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাকতে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদলে এসেছে; সন্দীপের অহংকারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বললেন, তুমি কি ভাব, আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বললেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিস্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চলতে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাসলেন; বললেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্ছে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য ততই বাড়বে। আমি বলছি, অংহকার যার নেই সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনে ভাব ছিল অদ্ভুত রকম। এক দিকে ইচ্ছেটা তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে—সে যেন দামী হীরের ঝক্‌ঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি, সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা, আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালবাসেন আজও আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচে নি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

তাই একবার মুহূর্তকালের জন্য ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই, এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। বললেন, এই যে আপনি এসেছেন।

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবি জন্মেছে তাতে আমার দু-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই।



কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য দিকে চেয়ে ছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কি কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুললে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বললুম, আপনি কী দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চমকে উঠে বললেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব চেয়ে বড়ো তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী?

আমার বুকেব মধ্যে দুর্‌দুর্ করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আসছে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কী করে?

আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজাব জন্যেই এসেছি তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে কথা কি আপনাকে বলি নি? ভূগোলবিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয়; শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি; তবেই তো সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব, সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল— কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল! সে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব! এই-সব জিনিসই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বলতে বলতে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে তার অনেক কায়দা কানুন আছে। কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে সত্য প্রতিদিনের শুকনো কাঠে হেলফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্তি ধরে চারি দিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেছে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল এখনই সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই



কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো করে তুলবেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি, সে কি কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, তখন সংকোচের বাঁধন আর টেকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে! যতদিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধনির্ণয়, আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সে অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল, সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায় রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনই কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না! আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠছে না কেন যা মন্ত্রের মতো এখনই সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়!

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরের ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাত জন্মে এমন—হাউ হাউ হাউ হাউ!

কী? ব্যাপারটা কী?

মেজোরানীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে; তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েছে।

আমি যত বলি 'আচ্ছা, সে আমি বিচার করব' কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকালবেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজাব জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনই অন্তঃপুরে ছুটতে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে একমনে মাথা নিচু করে সুপুরি কাটছেন, মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করছেন 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে'—ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব। দেখো দেখি, এই সকালবেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি ক'রে দিলে! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখছি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছে, একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত—লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে! তা ছোটোরানী, এ-সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মানুষের মন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে!



এই সকালবেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হল যে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরানী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি টল্‌মলে জায়গায় আছি যে এ-সব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে। এই তো সেদিন নন্‌কু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্য প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যেরকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্যন্ত তা টিকল না। দেখতে দেখতে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আমার মেজোরানী এসে আমার স্বামীকে বললেন, ঠাকুরপো, আমারই অপরাধ। দেখো ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না—সেইজন্য ভালো মনে করেই আমি দারোয়ানকে— তা এতে যে ছোটরানীর অপমান হবে সে কথা মনেও করি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো। হায় রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে, পূজার দিক থেকে, যে কথাটাকে এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, চার দিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে। ঐ যে মেজোরানী নিশ্চিন্তমনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছেন, ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোনখানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ-সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হয় উঠে একেবারে ভুলে যাব—না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব সেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমন করে ছারখার করে দিলুম কী করে?

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বউ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক হয়ে গেছে। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্ এক দ্বীপের অনেক দামী এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই কটি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন্ ঐ কটি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয় নি, আশা আছে আবার আর-একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য এই যে, অভ্যাসমত আজও এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্ছি, আশ্চর্য এই যে, সেই নারকেলদড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আলগা হল না—তার পাতাগুলি আজও সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুলতে পারি নে। আজ ছ-দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে



রেখে প্রণাম করেছি। কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে তুলে পুজো কর, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বললেন, শুধু লজ্জা নয়, ঈর্ষা।

আমি বললুম, শোনো একবার কথা। তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বললেন, ঐ মিথ্যে-আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে; তাই আর-একটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্ছ।

আমি বললুম, তোমার এই কথাগুলো শুনলে আমার রাগ হয়

তিনি বললেন, রাগ আমার উপরে করে কী হবে, তোমার অদৃষ্টের উপর করো। তুমি তো আমাকে স্বয়ম্বর সভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুলতে পারি নে।

ঐ-যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছ করাবার উপলক্ষে সেই ফোটোস্ট্যাণ্ডখানা তুলে এনেছি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পুজো করি নে, তাকে প্রণাম করা চলে না; সে রইল আমার হীরে-মানিক-মুক্তের মধ্যে ঢাকা, সে লুকানো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক। ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উসকে তুলে তার সামনে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই; আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে-মানিক-মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে। তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হলে যে বাঁচি।

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বারবার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে 'আমরা চাই'—সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভাল-মন্দ কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টিকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা 'আমরা চাই'। 'আমি চাই'। এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী; সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে আগুন হয়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে। ভয়ংকর তার প্রণয়ের পক্ষপাত; মানুষকে সে কামনা করেছে বলেই যুগযুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেছে। সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী 'আমি চাই' বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী। সেইজন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে



অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। জমছে, জল জমছে--- হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর; আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না; পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে; তখন এতদিনের বোবা শক্তি 'আমি চাই' 'আমি চাই' বলে গর্জন করতে করতে ছুটবে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্‌কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা, সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! 'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি---আমার এই উদীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে, এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই বলে তখনই ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল---মেজের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে!

সন্দীপের আত্মকথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদীসমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে, সেই বাষ্পে সে ঘেরা; তার চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ-মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এইজন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট। যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না; মনে হয় সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি। কিন্তু, আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে, যা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে; আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নি, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ংকর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চার দিকের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ



বলো, জাত বলো এ পর্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেছে। ১ কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই তারই ২ হয়ে উঠতে পারে, নইলে ১ এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে—

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বললুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আনতে পারে? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে; কিন্তু যেখানে আমি--- নিজের দোষে না, ভাগ্যদোষে দুর্বল সকরুণ যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জমে উঠছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না; এইজন্যে তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ-জিনিসটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নাই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জানতে চাই; সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দর থেকে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রক্‌ফেলার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ার কিংবা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেছে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেছে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি যাকে ফল পাওয়া বল সে হচ্ছে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেহাত ঝাপসা হল।

নিখিল বললে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বলব না।



আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখছ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভ্রূর মাঝখানে?

সে বললে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জানছে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তা হলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কী বলবে?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায়; যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোওয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেছ?

মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই, বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারি নে তা নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুশকিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এইজন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি—ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই— তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে। আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো; আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বহাল রাখব, সানাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন কদিন ধরে মাথায় ঘুরছে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে দিচ্ছি? আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে চলবে।

সেই কথাই তো বলছিলুম যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেছে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও আমাকে চায়, ঐ তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে, সেই বোঁটার দাবিকেই চিরকালের বলে মানতে হবে নাকি! ওর যত রস যত মাধুর্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই; সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা; সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি, মনে হচ্ছে আমার জীবনে বিমল



বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে; আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না—শুধু আমিই জানি; কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে, কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না, তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করছি কী? দিনের পর দিন আমার কী নিয়ে কাটছে? ও দিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল।

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি; ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়।

তাই তো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ তো পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই—এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি. এ. পাস করেছি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়ছে বললেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না, জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস-বুনোনি? এ যে জালের মতো; সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোবের সঙ্গেই চলছিলুম, আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে। 'আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে, ছিঁড়ে নেব'—এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা। এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চলতে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে, এই কথা আমি চিরদিন বলে আসছি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখছি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্ করছে; তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত— ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।

আমি জানি দুবার তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না, সেও বুঝতে পারছিল এখনই একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য একেবারে বদলে যাবে—সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি, এই সময়টুকুর মধ্যে একটা-কিছু স্থির হয়ে যাবে তারই জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিশ্বাস রোধ করে যেন থমকে

দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি; নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারছি এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত! এইরকমেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর মোলো নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবি নি; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তার কাছে লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টও বোধ হচ্ছে। এক-একদিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব করে গল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে— এমন-কি, যা কখনো করি নে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিসটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না— এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই-সব হচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মানবামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করি না-কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসংকোচে জানাতে চাই, এ-সব জিনিসকে বড়ো করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে এইবার আমাকে দুর্বল করেছে। আমার এই দুর্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি; আমরা অসংকোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁওয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ম্বরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে, কিন্তু সেটা দেখে ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ; এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে; বিমলাকে আজ আমি স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে—সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারি দিকে গর্জন আর ফেনা - সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে



যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম— সেই দেবী নির্লজ্জ সে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারি দিক টলমল করছে; কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিল্‌মিল্‌ করছে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্‌ করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠছে—এই শরতের প্রভাতসংগীতে আমিই কেবল বোবা! আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ; আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমরা এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পারবে কেন!

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরানো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো; বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে?

হায় রে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে— কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহ'র বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণাপঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যাবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসুতম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়; জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছল্‌ছল্‌-করা জলের উপর যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ, যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতছে— সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়—তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর



মিলন, কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দু বছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেছে; তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেছে, সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। প্রথম তিন দিন তো কেটে গেল; বিমলের মনে পড়েছে কি না জানি নে, কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল, গান থেমে গেছে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে; কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগছে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারও কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। দুটি দাও ছুটি নাও—দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার।

আমার মনে হচ্ছে যেন এইবার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারার কিনারায় এসেছি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এত দূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আনতে পারছি নে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে। প্রবৃত্তিব হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মানব না! সাজে-সজ্জায় লজ্জা-শরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চদেশের পূজার উপচার জোগাচ্ছে, জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ন করতে মানুষ'পারে কী করে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েছে? আমি যে মদ এতদিন পান করেছিলুম তার রঙ এত লাল নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনিই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্ গুন্ করে মরছি—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না? এত বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?

শোবার ঘরের শেলফ থেকে একটা বই আনতে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কতদিন



দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকি নি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো শাড়ি পাকানো রয়েছে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্য অপেক্ষা করছে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের শিশি, সেইসঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি-দেওয়া চটিজুতো— একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্যন্ত এই জুতো পরে যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেছে, কিন্তু এই চটিজোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পুজো কর, আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পুজো করতে এসেছি। বিমল বললে, যাও, তুমি অমন করে বোলো না, তা হলে কক্‌খনো ও জুতো পরব না।—এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর। এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে, আব বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই-সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করি নি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটিজোড়াটা পর্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্নপদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনই রয়েছে, তার সামনে অনেক দিনের শুকনো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতরো পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার। এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ, এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্তিতেই গ্রহণ করলুম— কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্বিকার হতে পারব?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেলফের দিকে যেতে যেতে বললুম, আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল বইখানা নিতে এসেছি। এই কৈফিয়ৎটুকু দেবার কী যে দরকার ছিল তা তো জানি নে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন-কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো—কিছু দেখতে বা শুনতে, বলতে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না—যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট হয়ে অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসল, ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি পঞ্চু? এ কেন?



পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা। মাস্টারমশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপর সে গরিবের একশেষ, ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাবছিলুম বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্নসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্ছি তখনও জোড়হাত করে বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সেকি পঞ্চু?

না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারি বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্‌দিন মরব, তাই শোধ করে দিতে এসেছি।

আমিয়েল্‌স্ জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না, কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো, আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায়। সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে—তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।

এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলাকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলচ্ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তার স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত যাকে বলে মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেছে, কিন্তু ও রানী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ-ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যেই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিকে থাকে। পাড়িকে কেটে



বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে যাতে করে ছেটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলিন্য এবং স্বাতন্ত্রের গর্ব স্থান পায় বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমর নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি, বিমলকে জায়গা দিতে হবে ব'লে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েছি পরিয়েছি শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি; মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টারমশায়; তিনিই আমাকে যতটা পেরেছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এইজন্যে যে, আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেই জন্য আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন এক দিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেছেন তার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি মাস্টারমশায়কে বললুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন. অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বললেন, দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন, কোনোমতেই আমাদের গাড়িঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বলতেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্যন্ত হেটে গিয়ে আপিস করে আমাদের মানুষ করেছেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বললুম, না হয় আমাদের বিষয়কর্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বললেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়োমানুষির ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাকতে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম. এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে। আমি বললুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায় নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনই আমি উৎসাহ করে চন্দ্রনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে



না— তাকে এতবড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর রাগ করেছে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এন্ট্রেন্স স্কুলে হেড্‌মাস্টারি করেন। এতদিন তিনি আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতেন না। এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধেবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা দুপুর পর্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আসছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমাব এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চর্য এই, বড়োমানুষের 'পরেও তাঁর গরিবের মতোই সমান দয়া, বড়োমানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে, আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশী তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি নে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন —

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়ায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া?

যত দুঃখ যত ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন বাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও।

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারি নে। ষাট হাজার সগরসন্তানের ছাইয়ের 'পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল—কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসে মিশালে দানা বাঁধে না—সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল; বললেঃ এই-যে আমি!

বইয়ে পড়েছি, গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়? সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিস হত তা হলেও তো বুঝতুম—অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার



মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠলঃ অয়ময়ং ভোঃ।

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্তে কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছে থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেইজন্য মনে হল, আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমা রইল না। কেবলই মনে হতে লাগলো, এই হল ব'লে, হল ব'লে।

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পকরথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়—আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে, তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই, তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বললেন, দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন, আর তুমি অবিশ্বাস করছ?

আমার স্বামী বললেন, আমি দেবতাকে মানি, সেইজন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এইরকমের কথায় আমার ভারি রাগ হত। আমি তাঁকে বললুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বললেন, শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বললুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বললেন, দাম দেব গো দেব।

স্বামী বললেন, যখন দেবে, তখন আমি উৎসবের রোশনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বললেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না

বলে তিনি, তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—



আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হালকা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুলব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি--
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক-না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা; নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশী তো নয়? রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরান পুরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেছে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টিকতে পারব না আমরা অসাধ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে-চুরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর-গুর করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা-কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল ব'লে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পূণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিতে তাকিয়ে দেখো এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবাদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজো করে এলুম, বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা! তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে 'বন্দে মাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়া তুলেছে 'বন্দে'-- কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!



দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারও পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মতো অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি, এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকছে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি, যেন পৌঁচেছি, যেন এখন চোখ বুজে চললেও কোনো ভয় নেই। না, এ তো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর কাছে কেবল অন্তহীন আবেগ; সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে। কিণ্ড ফিরব কেন মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজালো সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকী না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে; আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে; তার পরে কোথায় ভালো কোথায়-মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলাদেশে সময়ের কলে পুরো ইস্টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবাব নয় তা দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের যে কোণে আমরা থাকি এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগল। এতদিন আমাদের এ দিক বাংলাদেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারও উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বলতেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তার চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাকল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সরল সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি



চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন; কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর-কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন?

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তার একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বলতেন, ঠাকুরপো, শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি---- আমাদের তো ভাই, সাবান মাখার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না থাকে তা হলে মাখতে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেকদিন তো ছেড়েই দিয়েছি, তবু সাবান না মেখে আজও মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুশি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আসতে লাগল। সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা? আমি বুঝি জানি নে? স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সাবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলেছে, একদিনও কামাই নেই। ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়-কাচা চলতে লাগল।

আর-একদিন এসে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে, সে তো আমার চাই। মাথা খাও, আমাকে এক বাণ্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়ছিল সব মেজোরানীর ঘরে বোঝাই হতে লাগল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বললেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব শজনের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেছি লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালেভদ্রে লেখার শখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিই নে, সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা



বলবার জো ছিল না। বলতে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাকতেন যে বুঝতুম যে, উল্টো ফল হল। এ-সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠকতে হয়।

মেজোরানী সেলাই ভালোবাসেন; একদিন যখন সেলাই করছেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বললুম, এ তোমার কী কাণ্ড! এ দিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!

মেজোরানী বললেন, তাতে দোষ হয়েছে কী? কত খুশি হয় বল্ দেখি। ছোটোবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর-তো কোনো নেশা নেই--- এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই-- এইখেনেই ও মজবে!

আমি বললুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোরানী হেসে উঠলেন; বললেন, ওলো সরলা, তুই যে দিখে বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরমশায়ের বেতকাঠির মতো। মেয়েমানুষ অত সোজা নয় - সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজোরানীর সেই কথাটি ভুলব না, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজবে।

আজ আমার কেবলই মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই, কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জোলার এ ধারে নিত্য বাজার বসে, আর জেলার ও ধারে প্রতি শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেছে। আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এতো বড়ো হাটবাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে; এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেককথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবর্দস্তি চলবে না।

আমি একটু অহংকার করেই বললুম, আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাকত তা হলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবি করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরামাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেয়; তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতন্ত্রের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের



মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক একদিন গান ধরতেন—

যখন দেখা দাও নি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমরা কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি—নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে- আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না। আর মুহূর্তে মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে- -ঐ আমার ভক্তকে ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওব মধ্যে প্রতি ক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমরা কাছে এনেছিলেন। একদণ্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বললেন, এ কী মন্ত্র তোমার, ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পলতেয় এক মুহূর্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কে? একে একে সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগবে।

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে একরকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন: তিনি বলতেন, ঘাড় জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন! কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল, তার উর্ধ্বে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল তোলা ঘাড়ের উপর- - হায় রে, সে কথা আর কেন?

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো সত্যমিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত। কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষই বন্ধ হয়ে গেছে, বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের আত্মকথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।



আমি রাগ করে বললুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের?

সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বললে, মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও তো গতি করা চাই।

আমি বললুম, পাপই যদি হয়ে থাকে, এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি।

সে বললে, আজ্ঞে, কম কী! ডাক্তার খরচায় জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। কিন্তু দান-দক্ষিনে ব্রাহ্মণভোজন না হলে তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে। মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে হবে?

একে তো পঞ্চুবরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁষে কাটিয়েছে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনোরকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি শুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্ছে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না; সুখ যেমন নেই তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাস্টারমশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করছেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বউকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে এক মাস যখন কেটে গেছে তখন সকালবেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেছে। যখন তার বড়ো ছেলেমেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'বাবা, তুই কোথায় গিয়েছিলি', সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না—কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কি পাপ করেছিলুম?

এ দিকে যে ব্যবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ-যে মাস্টারমশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষ কালে মাস্টারমশায় তাকে বললেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও, নইলে তোমার ঘর-দুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের ব্যবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল; মনে করলে দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টারমশায় যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে, এমন উপকারের মূল্য কী? মাস্টামশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ; তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।

হ্যাণ্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টারমশায়কে খুব বড়ো করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাস্টারমশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা



খাটো করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি; ভক্তি আমার পাওনার অতিরক্তি।

পঞ্চু কিছু ধুতি-শাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষিদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু-বা ধান, কিছু-বা পাট, কিছু-বা অন্য ফসল, যা হাতে হাতে আদায় করে আনত সেটা দামে কাটা যেত না। দু মাসের মধ্যেই সে মাস্টারমশায়ের এক কিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, মাস্টারমশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এইরকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্‌ট্রেন্স পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, সে আমি পারব না।

তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান হয়, গরিবের লোকসান।

মাস্টারমশায় ছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তারা বললে, দেশের জন্যে—

মাস্টারমশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দুপয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না—ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত— আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা



যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সক ই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন?

আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েছি; এমন-কি, অন্য এলেকার হাটেও আমাদের সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়; তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

সায়ান্স ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি!

মাস্টারমশায় বললেন, শুনবে? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যে-রকম ব্যাবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে— আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টারমশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে; সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন ব'লে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?

আমি বললুম, না, সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে।

মাস্টারমশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।



তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরং' বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টারমশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?

ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে এক-শো টাকা জরিমানা করেছে।

কেন, ওরা অপরাধ কী?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জামিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামাজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে— লাগাও জুতি। এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল, তার পরে এক-শো টাকা জরিমানা।— এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক।

কাপড়ের কী হল?

পুড়িয়ে ফেলেছে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল, বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন; তিনি একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব বিলিতি ব্যাবসার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।

আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।

পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষি দেবে না।

কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষি দেবে না?

সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।

আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে!

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব—

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষি বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষি দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল।



তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন—

না গো তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গ বিভাগ করবে, বলবে তোমাদের সুবিধের জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাকবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিকবে।

মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, এ-সব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে, এ কথা যে লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে, সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়?

সন্দীপ হেসে উঠে বললে, আপনার এ কথা মাস্টারমশায়ের মতো কথাই হয়েছে। এ-সব কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখছি বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়োরকম করে সাধন করছে তারা ব্যাবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন ক'রে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

মাস্টারমশায় বললেন, সত্যফল-লাভ।

সন্দীপ বললেন, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে । আর যা সত্য , যা আপনি জন্মায়, সে হচ্ছে আগাছা, কাঁটাগাছ; তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাস্টারমশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।

তিনি বললেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারছি। আমি অনেক দিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন-কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে তোমার দুর্বলতা আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।



আমি কৌতুক করে বললুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি প্যারাডাইস লস্ট্‌'এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন।

মাস্টারমশায় বললেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায়?

আমি বললুম আপনি বলেছিলেন. যে বিঘেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাটিয়ে দেবার জন্য ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করছে। ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর এক-শো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি ওকে কে বাধা দেয়।

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিসের দারোগা থেকে উকিল-ব্যারিস্টর পর্যন্ত শকুনি-গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমি মরব।

কেন, তোর কী করবে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে-সুদ্ধ নিয়ে পুড়ব।

মাস্টারমশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাকবে, তুই ভয় করিস নে; তোর ঘরে বসে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যাবসা কর্. কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেস্ট্রি করে আমি দখল করে বসলুম। তার পর থেকে ঝুঁটোপুটি চলল।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চুছাড়া তার ওয়ারিশ কেউ ছিল না এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি করে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক হয়ে বললে, আমার মামী তো বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয় পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেছে, দ্বিতীয় পক্ষের তো সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয় পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয়, মৃত্যুর পূর্বের। সতিনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায়; কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা এ-সব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারও কারও জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চুর এই দুর্গ্রহ নিয়ে আমি যখন খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুরে থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠলুম; জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাকছে?



বললে, রানীমা।

বড়োরানীমা?

না, ছোটোরানীমা।

ছোটরানী! মনে হল এক-শো বছর ছোটোরানী আমাকে ডাকে নি।

বৈঠকখানা-ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চললুম। শোবার ঘরে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য হলুম, যখন দেখা গেল সর্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখি নি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত, যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্ছে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী করলে ভালো হয়?

ঐ জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো না।

জিনিসগুলো তো আমার নয়।

কিন্তু, হাট তো তোমার।

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিস কিনুক-না।

যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কী কথা! ওদের এত বড়ো আস্পর্ধা হবে? তুমি হলে---

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যে—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা, সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিনরাত্রিকে জপমালার মতো ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্মভারের সীমা নেই, অথচ মুক্তিবেগেরও সীমা নেই। কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হল কী? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না; তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েছে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যেরকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখতে



পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাত করে দেখি নি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই-সমস্তই আমি খুব করে দেখলুম, লেশমাত্র কুয়াশা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত-মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন এক দল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কী কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েছে; বারান্দার সামনে দক্ষিণে খোওয়া-ফেলা রাস্তার দুই ধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপি ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্ছে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করছে—আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেছে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারই স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেছি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়ছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সংগীত বাজছে সে কী উদার, কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর!

তার পরে মনে পড়ল দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা-পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরিব রায়তের প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্‌বুদ্‌ উদ্‌গার করছে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মুলতুবি হয়ে পড়ে রয়েছে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই—তাকে আমাদের নিজেরই কামনার



রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা-ভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার জয় হবে; আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সহজ চোখে সব দেখছি; আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম—যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলা আবার এক-একদিন টন্‌টন্‌ করে উঠবে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েছি; তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার—তার দাম কিসের? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।—কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়ো না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলা-পথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক! আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে, কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল। বুঝলুম, নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই। কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করেছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুল-মাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব; আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট, তখন তুলি আর রঙের বাক্স।

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল; বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এ পার থেকে ও পারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল; কিন্তু ঐ অস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে



পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বললুম, বাধা আছে, কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রানী?

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হাঁ।

আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্ সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই, কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম ব্যোম!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।



একটা চাষি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরি শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্‌বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায়? আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যাবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব?

আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব মারো, রাধাভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনো তাই করবে। তাতে তাদের শখ মিটবে না তা জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কি না। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না? আমি বললুম, দায়টাকে কারও ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ো-পড়ো হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মিরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোর করে বললে, হুজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন---

আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে?

তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না হুজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—



বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকা জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আসবামাত্র চৌকি থেকে উঠে তাকে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, টাকা? কত টাকা?

আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলে, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কী করে বলবে যে 'পারব না'?

আমি বললুম, রানী অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, দেব।

আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা দিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব?

আমি বললুম, তার টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং! 'বন্দেমাতরং' এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডারঘরের প্রাচীর খুলবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং!

বন্দেমাতরং!

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব, আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষজাত। বিধাতার ভাণ্ডারের কোনো



লোহার সিন্দুককে আমরা রেয়াত করি নি, আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।

এই পুরুষদের দাবি মেটানোই হচ্ছে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে, সার্থক হয়েছে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, আর শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষজাত এইজন্যেই তো সকর্মক, আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষমানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে; এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম, কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাক্‌রা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হতে পারত।



আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের ছদ্মবেশটা দু দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু-চার হাজারেই ঠেকবে। তাই সই। 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' বলেছে; কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো-আনা, এমন-কি, পনেরো-আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে; লোকটা পুরোনো দাগি, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি, বিশেষত নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায়?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছ প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিশকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং, আর সেও বলছে বন্দেমাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক, যেটুকু পদার্থ টিকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা



সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে; সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে; তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি, কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক, টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনই যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছটা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম দুটো এবং শেষ দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানেব দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্যকালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্‌গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ!

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম। তাবই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চলছে তখন সেটা তর্কে এসে নামবে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কি হবে? এখন আমার কাজের ভিড়, অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক্, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা কবব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।

এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না: ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুকনাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষে যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।



আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী?

নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটিমাত্র পথ আছে।

আমি জানি সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুলবয়। গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে। এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিনেরও অন্ত নেই, অথচ এতবড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক দল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশী; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে— আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি?

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ



এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিংবা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশেব প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল হুহু করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ব'লে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পূজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই পূজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে সেইজন্যেই বলছি এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমিই দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে. আমার আয়ু কতদিনই বা? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকেব দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা বাঙালির যে-একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে ব'লে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এই দুই দেবী তারই দুই-রকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেছে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল; কিন্তু



দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভালো। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে-রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে সে-রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যে-রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই-রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হল আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি—জানি নে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্তলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক-রকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। এই প্রথম বিমলা আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারই কালো চোখের কাজল-মাখা আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে; আর কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরেশাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায়। আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। 'তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে-আসনে বসে ছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারও নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধিবিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার , তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্বনাশ



গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল।

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না— কান্না— কান্না।

এই তো হিপনটিজ্‌ম্‌। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল; তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপর উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা; সে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বললে, তুমি গরিব কিসের? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গহনা দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনোদিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? কিন্তু আর সময় নেই।

সংকোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় ব'লে।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েছে; বোধ হয় সারারাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে দেখছি পাঁচ হাজার, এমন-কি, তিন হাজার হলেও চলে যাবে।



হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে, যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা—'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'।

'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল!' বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর। অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপ্টা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত, কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী? আর, আমি মেয়েমানুষ, অত টাকা পাবই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য, সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক—সেই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফসকাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পুজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পুজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অঘ্রানের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পুজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম— যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই; আজ ওরা বুঝতে পারছে, কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে।

যাক, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকম ভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়—



আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা কালই এনে দেব।

নিখিলের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে; শুনছি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেইসঙ্গে অজস্র মিথ্যেকথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলাকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না, দুই-একজন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিশের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি-চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে, 'স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফর্মাশ দিয়াছে, সে খবরও আমরা রাখি।' আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এত দিনে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম সই করেছে, 'মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।'

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি. এ. গম্ভীর ভাবে বললে আমরাও শুনেছি দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললুম, তাদের অন্যায় জবর্দস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশ দেবতা থেকে পেয়াদা পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের



জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নিচু করবে না।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, এমন কোন দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয়?

আমি বললুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরিডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই?

আমি বললুম, কে বললে নেই? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করছে।

এম. এ. বললেন, তা হলে ঐ দাস-ব্যবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি. এ. বললেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। ঐ-যে ওপারে হরিশ কুণ্ডু আছেন জমিদার, কিংবা সানকিভাঙা চক্রবর্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেছেন, যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ. এ. প্লাক্‌ড্ ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে বেরোল; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম। এই কথা শুনিয়া আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এই-সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে, এরাই তো প্রভু। যারা ষোলো-আনা ইচ্ছে করতে জানে না তারা হয় এদের ইচ্ছেয় চলবে নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আজ চক্রবর্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টু শব্দটি করতে পারে, অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বললুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাই নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।



ঐতিহাসিক হেসে বললেন, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি, পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে; কেননা, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার বেচে-কিনে নেবার মতো কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাত্রে ঘুম হয় নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক আমি এটা শিখেছি যে যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো; আমি পারি নে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম; বললুম, তাই যদি হয়, তবে এই-সব গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সে'ই সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই ধর্ম বলতে শিখেছ, সেইজন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ। আমার লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে।

আমার এ-সব কথা অত্যন্ত সহজ কথা, সরল লোককে বললে বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম.এ. ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষছে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এ দিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবছি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন-কি, সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘটনা ঘটে নি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেছি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মানতে পারব না। আমি নিজে চেষ্টা করে দেখব।

আপনি চেষ্টা করে দেখবেন?

হাঁ, আমি।

এ-সমস্ত মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার, মাস্টারমশায় যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন; চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চারদিন দেরি হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেছেন। তা যদি হয় আমি জানি



সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী-পুজো মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল; তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তারা 'বাহির' বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ে, আলো-অন্ধকারের সমস্ত মিড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চার দিকে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয় আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্তের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই; এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জল স্থল আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে, সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত; মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক-না সে সত্যের মজুরি ধর্মের মজুরি। সেই তারার-আলোয় ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের অমৃতে ডুবে মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মতো হারালি নিখিলেশ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না। সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কী ভয়ানক একলা!

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌচেছে তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাস্টারমশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়ি-ভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো শখ। আমি টবে করে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেছে। কিছুকাল আমি বাগানে যাই নি, আজ মনে মনে একটু হেসে বললুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসি গে।

বাগানে যখন ঢুকলুম তখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া, তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে। ঠিক আমার মনে হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাসছে।

পাঁচিলের যে ধারটিতে গ্যালারির মতো করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে সেই পুষ্পিত সোপানশ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

তার পর কী করা যায়? আমি ভাবছি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কি না, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও



তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা!

সে চমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই পিঁজরের মধ্যে চারি দিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাত-কড়া হব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না, না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি সুখ না পাই নেই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাস্টারমশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলছে। মাস্টারমশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম, মাস্টারমশায়, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই না।

মাস্টারমশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টারমশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা; কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।



আমি বললুম, মাস্টারমশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার করেন নি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাস্টারমশায় ক'দিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায়?

মাস্টারমশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চার দিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাবলুম, যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এতোবড়ো অদ্ভুত কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তা হলে পঞ্চুকেও রাখব; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ করে শুনলে; 'হাঁ'ও বলে না, 'না'ও বলে না; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথখরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথখরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা, সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে—তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যে একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত, আমি লোকটা সরল; কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্মটা খোয়ানো? মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম তা হলে বটে বোঝা যেত। যা হোক, বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে, নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু-একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। সে নাকি ওর পারিষদ্‌দের কাছে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেছে! দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই-যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হলেও আমরা সুখে মরতে পারব।



বিমলার আত্মকথা

এক জন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাত জন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে, চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চার দিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মতো অতবড়ো একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল—আমি তো ডাক দিই নি, সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখলুম, সেই অমূল্যকে, আহা সে ছেলেমানুষ, কচি মুরলী বাঁশটির মতো সরল এবং সরস, সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কিরকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতরো কাজ করে এমনি করে তো তা দেখতে পেয়েছি।

তাই সেদিন নিজের 'পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু, হল কী? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেম মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন; স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরানীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ছোটোরানী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বললেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি'—তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আসবাব, শুধু আলনা, শুধু আয়না, শুধু খাট! এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝর্না একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই, আসবাব!

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন



এতবড়ো একটা ধাঁধা লাগল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে নেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল। কোথায় মিথ্যে? এ যে ভরপুর সত্য, দুই কূল ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই-যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে—ঐ-যে বড়োরানী মালা জপছেন, মেজোরানী থাকো দাসীকে নিয়ে হাসছেন, পাঁচালীর গান গাচ্ছেন—আমার ভিতরকার এই আর্বিভাব যে এই-সমস্তের চেয়ে হাজার গুণে সত্য।

সন্দীপ বললেন, পঞ্চাশ হাজার চাই। আমার মাতাল মন বলে উঠল, পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়, এনে দেব। কোথায় পাব, কী করে পাব, সেও কি একটা কথা। এই তো আমি নিজে এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি। এমনি করেই এক ইশারায় সব ঘটনা ঘটবে। পারব পারব পারব। একটুও সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর চার দিকে চেয়ে দেখি, টাকা কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা, এই-সব সন্ধান করছি! অর্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফতরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েছি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কী করে? মনে দয়া ছিল না। যারা পাহারা দিচ্ছে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তা হলে এখনই আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রানীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল—কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগল, ঘন্টায় ঘন্টায় ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাকলুম। বললুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার, খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বললে, কেন পারব না?

হায় রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি-করে বলেছিলুম, 'কেন পারব না'। অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কী করবে বলো দেখি।

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বললাম, না অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায়?

সে অম্লানমুখে বললে, বাজার লুঠ ক'রে।

আমি বললুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না অছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বললে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চলবে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কিরকম?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।



অমূল্য কোর্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে, আর-কিছু বললে না।

কী সর্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্তও দেরি হল না। ওর মুখখানি এমনতরো যে মনে হয়, একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে; ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বললুম, বল কী অমূল্য! আমাদের রায়মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তার যে---

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এ দেশে পাব কোথায়? দেখুন, আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেইজন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারি নে, এই তো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত!

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে! নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধ'রে; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমর প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে, একে কে বাঁচাবে? আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না? কেন একে বলছে না, 'ওরে বাছা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম'?

জানি জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ শয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই শয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা তো কার্যসিদ্ধি চায় না, সে সিদ্ধি যতবড়ো সিদ্ধিই হোক, মা যে বাঁচাতে চায়। আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যতবড়ো উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্বলতা বলে হাসবে। মেয়েমানুষের দুর্বলতাকে ওরা তখনই মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বল্লুম, যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না, টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম; বললুম, অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়ালো তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে।



ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি, তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি---আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বললুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কী করবে দিদি?

মরণ প্র্যাকটিস করব।

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে। এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম-অরুণলেকাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগলামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলে। কিন্তু এ কী এ! এই কি আমার স্বভাব? কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে; কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে! আজ আমি যা-কিছু করছি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললে; আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই, বন্দেমাতরং! আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরং!

পাঁচ হাজার চাই? আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই? আচ্ছা, কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে; তার পরে মাতালের উৎসব; অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আগুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না; তার পরে টলতে টলতে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে; সমস্ত আগুন এক নিমেষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে—কিছুই আর বাকি থাকবে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম।

ফি বছর আমার স্বামী পুজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিন হাজার টাকা করে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে বাড়ছে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে



পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোটো কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েছে।

ফি বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান; এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না। এইজন্যেই তো দৈবকে মানি। এই টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে। এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই? প্রলয়ংকরী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েছেন; বলছেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে! আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়। মা গো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে।

এর আগে কতদিন বড়োরানী-মেজোরানীকে আমি মনে মনে চোর বলেছি; আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ; তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারি জিনিসপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার স্বামীকে বলেছি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার রাগ হত; আমি বলতুম, দান করতে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন? বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন, আজ আমি আমার স্বামীর সিন্দুক থেকে ঐ বড়োরানীর মেজোরানীর টাকা চুরি করতে চলেছি!

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর জামাকাপড় ছাড়েন, সেই জামার পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্দুক খুললুম। অল্প যে একটু শব্দ হল, মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত-পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখলুম। নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সবক'টা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয়! চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল! হয়তো নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশী চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা!

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকার! চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপতে লাগলুম, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং! দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ! সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারও নয়।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলুম। অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম, সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি; এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজা, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পূজা নয়; এ জিনিস



কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব! চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো! নিজে মরতে বসেছি, কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি!

এ টাকা লোহার সিন্দুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তা হলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব, সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক্, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না; সমস্ত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই-যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকা-চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস-চুরি, ধর্ম-চুরি।

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চললুম। তখন মেজোরানী ঘটিতে করে তাঁর বারান্দার টবের গাছ-কটিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ওলো ছোটোরানী, শুনেছিস খবর?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এখনই আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দায় ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ীর দাসী-চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজোরানী বললেন, তোদের দেবীচৌধুরানীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছে।

আমি চোরের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ঠাকুরপোকে বলছিলুম, তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই তো হল, এখন দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেলেছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন যত ছট্‌ফট্ করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষনি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না, শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল আমার মান-সম্ভ্রম যা-কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্যাদা ঐ বালকের সামনে



আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে। আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করছে! এর উপরে অল্প একটুখানিও আবরু রাখতে দেয় নি!

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোওয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না, প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কী? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি? ছিল বৈকি? সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম, আর সেই শুনেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুলত তা হলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই। আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে গান শুনে স্বর্গ হতে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বললে, টাকা চাই রানী!

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সেই বালক, সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল—সেই মা, সে যে একই মা! আহা, ঐ কচি মুখ ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়ে মানুষ, আমি ওর মায়ের জাত, ও আমাকে বললে কিনা 'আমর হাতে বিষ তুলে দাও', আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই রানী!—

রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না থর্‌থর্ করে আমার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। তার পর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কী ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কী নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেছি, ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবি দু-তিন শো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা!

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই রানীদিদি?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল; মেড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।



চলে যাব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী দু ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল, এই কম কী! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানীদিদি।

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেললে, গিনিগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল তারও মুখ চোখ আনন্দে ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্টো হাওয়ার দমকা সামলাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার মতলব ছিল জানি নে। আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না, আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না, আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যের করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয় নি এমনিভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো, ছল্‌ছল্ করছে তার চোখ।

সন্দীপ অসংকোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বললে, আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বললে, তা হোক, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী, আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুশি তাই করো।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বললে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, মেয়েরা যে দেবী!

সন্দীপ বললে, আমরা পুরুষরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বললে, রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা হলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।



মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্যে ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না; সে বললে রানী, তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমাকে প্রণাম করে বললে, দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি। বলে মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল? তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক করতে পারি নে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথায় ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল। সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল।

আমারই মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধামুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল। আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোর্তিময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললে, বন্দেমাতরং!

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময় শুনতে পাই নে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে; কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই! ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বসতে পারি নে; অথচ



না-বসাটা এতই বেশী লজ্জা যে সেও আমি পারি নে, আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেমনি করে বসে আছি, তিনি খাচ্ছেন, এমন সময় মেজোরানী এসে বসলেন, বললেন; ঠাকুরপো, তুমি ঐ-সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও নি?

আমার স্বামী বললেন, না সময় পাই নি।

মেজোরানী বললেন, দেখো ভাই, তুমি বড় অসাবধান, ও টাকাটা---

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে।

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তা হলে কোনদিন তোমাকেও চুরি হতে পারে।

ওগো, আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিস তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর-খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে, সেইসঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই, ভুলে বোসো না, তোমার যেরকম ভোলা মন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্ছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তাঁর মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই তোমাদের বড়োরানীর মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে, দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশী। কী লো ছোটরানী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরানী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোশামোদ করি। তা, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে হত। কিন্তু, তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোশামদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বড়োরানীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেত, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তা হলে ওর উপরকার হত। বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজোরানী অনর্গল বকে যেতে লাগলেন, তারই মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা ঘণ্টটা চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা ঘুরছে। আর তো সময় নেই, এখনই একটা উপায় করতে হবে। কী হতে পারে, কী করা যেতে পারে, এই কথা যখন বার বার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজোরানীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজোরানীর চোখে কিছুই এড়ায় না; তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কী দেখছিলেন জানি নে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখের সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই। আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম; বলে উঠলুম, আসল কথা, আমার 'পরেই মেজোরানীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।



মেজোরানী মুচকে হেসে বললেন, তা ঠিক বলেছিস লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা, আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে?

আমি বললুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজোরানী হেসে বললেন, শোনো একবার, ছোটোরানীর কথা শোনো। এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকাল জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বললেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামি গয়না ছিল খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজোরানীর কাছে খুলে দিলুম; বললুম, মেজোরানী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মেজোরানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই যে অবাক করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না?

আমি বললুম, ভয় করতেই বা দোষ কী? সংসারে কে কাকে চেনে বলো মেজোরানী।

মেজোরানী বললেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর কি! চার দিকে দাসী চাকর ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজোরানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরি করবার সময় ছিল না; আমি সন্দীপকে বললুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তা হলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বললে, আচ্ছা, বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে। অমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারি নে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়ছি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বললুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সামনে রেখে বললুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।



অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি, না, গয়না বিক্রি বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম ও-সব কথা রাখো, আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স, আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্ণমুখে রেখে দিলে; আমি বললুম, এই-সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রি হবে না, সেইজন্য আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্ছি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশী হবে। এ-সবই যদি যায় সেও ভালো, কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বললে, দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলতে পারি নে এ কী লজ্জা। সন্দীপবাবু বলেন, দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জন করতে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা। দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে এই শক্তি পেয়েছি, কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত, ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারওই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু, আহা, এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের, আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি, কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্বে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তিক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপবাবুকে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সংকুচিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন,সংসারে



যারা ঈশ্বর ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে! বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বললুম, হাঁ।

তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়, আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখদুটো জ্বলে উঠল; বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই!

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালি করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে রানীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েছেন।

আমি তেজের সঙ্গে বললুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণ নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বললে, না, বলব না।

তা হলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনই সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল, সন্দীপবাবু, কী বলতে চাচ্ছিলেন?

আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বললুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, অমূল্যর হাতে একটা কী বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারে নি। আমি একুট শক্ত করেই বললুম, আপনাকে যদি বলবার হত তা হলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না?

না, বলবে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না; একেবারে আগুন হয়ে উঠে বললে. তুমি মনে করছ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তা হলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে— আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্বল, দুর্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ



এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোরজর্বদস্তি খাটবে না, আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যই আজ এই আস্ফালন। আমি একটা কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।

সন্দীপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়।

যেখানে ও আপনার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে আপনার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুতি আছ সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক্, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা্-বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবলই যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানা কড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না—মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না! সেইজন্য সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখদুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল; বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনই সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুলতে লাগল, সমস্ত শরীরের শির দব্ দব্ করছে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারব না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল, কোথায় পালাও রানী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল। আমি বইয়ের শেলফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকামাত্রই সন্দীপ বলে উঠল, ওহে নিখিল, তোমার শেলফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম—মনে আছে তো ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই? বল কী, মনে নেই? সেই যে—



She should never have looked at me,
If she meant I should not love her!
There are plenty.......men you call such,
I suppose......she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them :
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম, কিন্তু সেটা এমন হল না 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। এক সময়ে ঠাউরেছিলুম কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নাই, বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইন্‌স্‌পেক্টর না হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত, সে খাসা তর্জমাটি করেছিল—পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার-পানে দৃষ্টি হানা?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
(যদিচ ভাই, আমি তাদের গনি নেকো মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধল ধ'রে বিদ্ধ ক'রে নয়নকোণে।

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ; নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা-পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে বোধ হয় ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে ফের 'কাব্যজ্বরো মনুষ্যাণাং' আমাকে ধরবে-ধরবে করছে।

আমার স্বামী বললেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি সন্দীপ।

সন্দীপ বললে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বললেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তোলবার উদ্যোগ চলেছে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি?

আমি খবর দিতে এসেছি, পরামর্শ দিতে চাই নে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তা হলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্‌বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্‌বেগের চাপ দাও তা হলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্ছে আর-একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে



আমার প্রজাদের 'পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মুসলমানের ভয়ে, না আরো কোনো ভয় আছে?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা, আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন-পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতেথাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচ দিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষীরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই—চুরি তোমারই, তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেছ—নাহয় নাম তোমার হল, কিন্তু গান আমার। এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জানা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান;
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান?
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে।।

সাহসের অন্ত নেই, সে সাহসের কোনো আবরণও নেই—একেবারে আগুনের মতো নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। বললে, রানীদিদি, তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম, অমূল্য, নিজের জন্য ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, তোমার মা আছেন?

আছেন

বোন?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি।

আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বললে, সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালোবাস অমূল্য?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরি পিঠে খাব দিদিরানী।



নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই-সব জিনিসপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে খাদ এখনো কাটা হয় নি তখন বিষম ধাঁধা লেগে যায়; তখন নিজের স্বাভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন বিষম নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুঝি আর-একজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তা হলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখানে থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপবে একটুও জোর দিতে পারলুম না; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অদ্ভুত। সেইজন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কী করে?

যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই মুক্তির স্বাদ এখনই পাচ্ছি! থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখি গান গেয়ে উঠছে। যে বিমলা মায়ার তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠছে।

মাস্টারমশায়ের কাছে খবর পেলুম, সন্দীপ হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দিনী পুজোর আয়োজন করছে। এই পুজোর খরচা হরিশ কুণ্ডু তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশমশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্ছে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন পৌত্রেরা যদি সেই দেবতাকে আপনার মতো না করে তোলে তা হলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর; সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য-আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তা হলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজান করাই যে মানুষকে



মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি', তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর-এক সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক।

যাই হোক দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়িখানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো করে দেখে, যে মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয়তো বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মতলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু এই ভুল-বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমকে ভুল বুঝুক।

ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজাবই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজী-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।



ইংরেজী-পড়া বললে, এর পিছন কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো?

আমি বললুম, এই-যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজী-পড়া বললে, আচ্ছা ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে, আমাদেরই এবার জিত, যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি; এতদিন ওরা রাজা ছিল, আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। এ কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনছি, চক্রবর্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে; তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরিবের টাকা মারা যাবে এইজন্যেই আমি শেয়ার কিনব না।

কেন মশাই? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু 'দেশের হিত করব' বললেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যাবসা চলে নি—আর খেপে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যাবসা হুহু করে চলবে?

এক কথায় বলুন-না আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিনব যখন তোমাদের ব্যাবসাকে ব্যাবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না ক'বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সে পুরানো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ—দূর হোক সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন ওরা জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

এ কী খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে! কালরাত্রে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল, আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা



ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল। অর্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই ডাকাতেরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেছে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, ডাকাতের পালা শেষ হল, এইবার পুলিশের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই, এখন শান্তিও থাকবে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ কী সর্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্য বললুম, সর্বনাশের এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন! ঠাকুরপো, তুমি না হয় ওদের একটু মন রেখেই চলো-না। দেশসুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।

এই সেদিন শুনলুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেছে! ছি ছি! আমি তো ভয়ে মরি! ছোটোরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয়ডর নেই—আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও—এখানে থাকলে ওরা কোন্ দিন কী করে বসে।

মেজোরানীদিদির ভয়-ভাবনা আজ আমার প্রাণে বর্ষণ করলে। অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ-যে টাকাটা রেখেছ ওটা ভালো করছ না। কোন্ দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে—আমি টাকার জন্যে ভাবি নে ভাই, কী জানি—

আমি মেজোরানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আচ্ছা ও টাকাটা বের করে এখনই আমাদের খাতাঞ্জিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বললে, আমি কাপড় ছাড়ছি।

মেজোরানী বললেন, এই সকালবেলাতেই ছোটোরানীর সাজ হচ্ছে! অবাক করলে! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে! ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে এই ব'লে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দারকে।

সেকি কথা! ও-ই তো জখম হয়েছে।

জখম কিছু নয়; পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েছে, সে ওর নিজেরই কীর্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারি নে, ও বিশ্বাসী।



বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে সেও একদিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এ দিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্‌পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন?

তিনি বললেন, না সে থানায় আছে, এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আসবেন।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করি নি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করি নে। ভয় নেই তোমার, বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না; কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল— চার-শো পাঁচ-শো লোক, এত বড়ো বড়ো বন্দুক-তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম এ-সমস্ত বাজে কথা; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেছে নয় পরাভবে লজ্জা চাপা দেবাব জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে। ওর ধারণা, হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ, এমন-কি, তাদের এক্রাম সর্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ব'লে তার বিশ্বাস।

আমি বললুম, দেখ্ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস নে। হরিশ কুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাস্টামশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না।

আপনি কি মনে করেন, এ কাজ—

আমি জানি নে, কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেছে। দাও, দাও তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েছি, পরশু এরা সব যাবে।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও; মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।



আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠছে, এইজন্যে পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি জানি য়ুরোপ এ কথা মনের সঙ্গে মানে না, কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মানব না। সত্যের জন্যে মানুষ ম'রে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে তা হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে: কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

সমস্ত দিন এই-সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেছি।

রাত্রে কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। বুঝি কেউ কাঁদছে।

থেকে থেকে বাদলা-রাতের দমকা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না।

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ-সব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করছেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব,রাত্রি নিস্তব্ধ—তারই মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই-সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালো মন্দ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই-যে ব্যথার উৎস উঠছে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি একে বিচার করবার কে! হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড়-হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয় উঠল, তার পরেই সে কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিলে, বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।



বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরার কথা। বেহারাকে বলে রেখেছি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু, স্থির থাকতে পারছি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা একবারও আমার বুদ্ধিতে এলই না যে সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ আমরা এত অসহায় যে আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায় হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম। ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেই দিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে! আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।

আমার আজ মনে হচ্ছে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে প'ড়ে তার এক রাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক। সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজল। আমার কেমন বোধ হচ্ছে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে—কার বাক্স, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব তো শেষ কালে আমাকেই দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাবটা দেব? মেজোরানী এতকাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই করেছি। আজ তোমার দিন এল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুলবে। হে ভগবান, এই বার আমাকে বাঁচাও, আমার সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরানীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব!

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাড়ি-ভিতরে মেজোরানীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্‌দুরে বসে পান সাজছেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনটা সংকুচিত হল; তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরানীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বলে উঠলেন, ও কী লো ছোটরানী, তোর হল কী? হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি, অনেক অপরাধ করেছি—করো দিদি আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বলতে লাগলেন, বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, এ কথা আগে বলিস নি কেন? আমার এখানে দুপুর বেলা তোর নেমন্তন্ন রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস নে।

ভগবান এমন-কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হতে পারি নে কি? সব ধুয়ে-মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা-ঘরে যখন ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে আজ সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার



যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম, আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ হেসে বললে, অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে অধিকার আমিই দিয়েছি সে অধিকার আজ ঠেকাই কা করে! বললুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রানী, আর-একজন লোক ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক, আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময় আসবেন, আজ সকালে আমি –

অমূল্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক্ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চমকে উঠলুম; বললুম, তা হলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বললে, না।

বাঁচলুম। আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌছক— অমূল্য রক্ষা পাক।

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বললে, এত খুশী রানী? গয়নার বাক্সর এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে তো ফেলেছ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহংকার মরতে মরতেও ছাড়ে না; ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই, এ গয়নার 'পরে আমার সিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বললুম, এ গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান-না।

সন্দীপ বললে, আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর 'পরেই আমার লোভ। লোভের মতো এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত।—তা হলে এসমস্ত গয়না আমার?

এই ব'লে সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে, মুখ শুকনো, উষ্কখুষ্ক চুল; একদিনেই তার তরুণ-বয়েসের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েছে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বললে, আপনি গয়নার বাক্স আমাব তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন?

গয়নার বাক্স তোমারই নাকি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমি ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য! তুমিও মরবার আগে ধর্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখছি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে।



আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললুম, অমূল্য, কী হয়েছে?

তখনই সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল, সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বললুম, কী হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে? ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে, যাবে কোথায়?

সন্দীপ বললে, এ গয়না আমার, এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মতো বলে উঠল, না না না, কখনোই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না।

আমি বললুম, ভাই, তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক-না।

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুমরে গুমরে বললে, দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, অমূল্য, তোমারও এতদিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করি নে; মক্ষীরানী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমাব জিনিস তুমি যে অমূল্যের হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করছি। এই রইল। এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, আমি চললুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘ'টে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি?

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়, পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে— এখনই তুমি বাড়ি যাও, যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটুলি বের করে বললে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, সে হল না, তাই নোট এনেছি।

অমূল্য, মাথা খাও, সত্যি করে বলো, এ টাকা কোথায় পেলে?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বললুম, কী কাণ্ড করেছ অমূল্য? এ টাকা কি—



অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বলবে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেছি· -- আচ্ছা, তাই স্বীকার। কিন্তু যতবড়ো অন্যায় ততবড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েছি। এখন এ টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুনতে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল। আমি বললুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

সে যে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। সন্দীপও তোমার যতবড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি। আমি তাই করলুম!

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বললে, সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি। জানো দিদি. তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে ছ হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করে নি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরেব মতো ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না। এ যে সুন্দবীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা কবছে ওরে অমূল্য, তোরা একে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস নে, এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য · না না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয় নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেছে, পুলিস সেই নৌকাচুরির কোনো খবর পায় নি, ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। দেখো অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদয় করতে হবে।— আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে?— সন্দীপ বললে, জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে।— আমি বললুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।—সন্দীপ বললে, আচ্ছা, সে হবে।— কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছে থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেছি সে অনেক কথা। সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেছি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।— সন্দীপ বললে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বসল! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বলো বন্দেমাতরং! ঘোর কেটে যাক।— তুমি তো জান দিদি, সন্দীপ কী মন্ত্র জানে। গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার-রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপর বসে বন্দেমাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলছে। সে রাগ প্রকাশ করলে না; বললে, দেখো, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে তো নিয়ে যাও। বলে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেছেন বলুন। সন্দীপ বললে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে, তার পরে আমি বলব। এখন নয়।—আমি দেখলুম, কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায়ে নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকার নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। গিনি এনে দিচ্ছি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেছে! এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিলে না! আবার বলে কিনা, এ গয়না ওরই



দান? আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব! এ আমি কখনও মাপ করতে পারব না। দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।

আমি বললুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি সে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেরি কোরো না অমূল্য, এখনই যাও, এ টাকা যেখান থেকে এনেছ সেইখানেই রেখে এসো। পারবে না লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি যে, আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে।

ও কথা বোলো না দিদি। যে রাস্তায় চলেছিলুম, সে তোমার রাস্তা নয়। সে রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেছ— এ রাস্তা আমার আরো হাজার গুণে দুর্গম হোক, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব, কোনো ভয় নেই। তা হলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম।

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানি নে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি, তোমার কাছে আমার নেমন্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধ্যের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল; বললুম আচ্ছা!

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন! এত লোককে নিমন্ত্রণ! আমার একলায় কুলোল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে! আহা, ঐ, ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য! আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে বাজল সে শুনতে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কী রানীমা?

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে।

কী জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনই জানতুম ফিরে ডাকবে। যে চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেছি অমনি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি। ভোজপুরীটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী



বাণ। আবার, নিঃশব্দভেদী বাণও আছে। এতদিন পরে এই লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার তো এসে পড়ল। এখন একে নিয়ে কী করবে বলো। একেবারে নিঃশেষে মারবে, না তোমার খাঁচায় পুরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি রানী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেমনি। অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরো না।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেছে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেছি; বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল; ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে বলতে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকি নি, অমূল্যকে ডেকেছি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে, এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সুচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্‌ গল্‌ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাকতে বুঝি তৈরী হয়ে আসেন?

এক মুহূর্ত সন্দীপের মুখে রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বললুম, শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সেরকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব-ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দর্জির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেছেন যে—

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না। দেখছি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন; খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না; একেবারে গর্জে উঠল, তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো! তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্তে খাটে না সে-মুহূর্তেই ওর আর জোর নাই; রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়। দুর্বল! দুর্বল ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে! অপমান করো, আমাকে অপমান করো, এইটেই তোমার সত্য। আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্তেই আপনাকে যে-রকম সামলে নেয় আজ তার সে শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিক চেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। আগে হলে আমি এতে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন-না আমি আজ খুশি হলুম। আমি ঐ দুর্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বসলেন; বললেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।



সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বললে, হাঁ, মক্ষীরানী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আসতে হল।

স্বামী বললেন, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে, কেন বলো দেখি। আমি কি তোমার অনুচর নাকি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চলো, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেইজন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো নড়ছি নে।

তা হলে তোমাকে নড়াতে হবে।

জোর?

হ্যাঁ, জোর।

আচ্ছা বেশ নড়ব। কিন্তু জগৎটা তো কলকাতায় আর তোমার এলেকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরো জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি, সেইজন্যেই এখান থেকে নড়ি নে। মক্ষীরানী, আমাব কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চললুম। তোমাকে দেখার পর থেকে মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয়—বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণনৃত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছ। দয়ামায়া তোমার নেই গো; এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে; সেই বিষ পান ক'রে, সেই বিষে জর্জর হয়ে, হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। মাতার দিন আজ নেই। প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া! দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েছ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন। প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া! তুমি যে দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করতে পারি! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো, এরা সবার ভালো করতে চায়—যেন সবই সত্য! কখনোই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে! তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার 'পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে! আমি ভালো নই, আমি ধার্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানি নে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র তাকেই মানি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এই কিছু-আগেই আমি একে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন্ জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন? সে



কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘন্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়, তা নয়, যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময়ে রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা; কিন্তু তবুও—আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটাকে জানি নে, এইটেই স্বীকার করা ভালো; আপনাকেও জানি নে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য; তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন! মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন করবেন।

কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর-এক বুদ্ধি বলছে এই তো মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়; সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি, ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে— সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন; তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে, ধুলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র। সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে বাখতে পারি নে। সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ— মাতলামি স্বর্গের সাজ প'রে এসে তাপসদের সামনে নৃত্য করতে থাকে। বলে, তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর; তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের বরণ করব; আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বললে, এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী। ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তা হলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে প'ড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে; মুহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম, ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে আর তোমার এই পূজারীকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম; আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল; আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম, তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব— এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।



টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। অমি সেটা তুলে ধরে বললুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

অমূল্যের জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে বসেছিলুম, এমন সময় মেজোরানী এসে বললেন, কী লো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকে খাওয়াবার উজ্জুগ হচ্ছে বুঝি?

আমি বললুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই নাকি?

মেজোরানী বললেন, আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয়, আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও তো করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে; আমাদের কোন্ কাছারিতে নাকি পাঁচ-ছ শো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে। লোকে বলছে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হাল্কা হল। এ তবে আমাদেরই টাকা। এখনই অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সামনে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক, তার পরে আমার যা বলবার সে আমি তাঁকে বলব।

মেজোরানী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, অবাক করলে! তোর মনে একটুও ভয়ডর নেই?

আমি বললুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

বিশ্বাস করতে পারো না! কাছারি লুঠ করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি বললেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনই বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোশ সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলা-মন যে দেখি তাঁর যে জামার পকেটে চাবি থাকে সে জামাটা তখনো আলনায়। ঝুলছে। চাবির রিং থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বললুম, কাপড় ছাড়ছি।— শুনতে পেলুম মেজোরানী বললেন, এই কিছু আগে পিঠে তৈরি করছে, আবার এখনই সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখব! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে। ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

কী মনে করে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকটা খুললুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়, যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুলতেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনিই সাজানো রয়েছে। হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই, তবু নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজোরানীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'বলি এত সাজ কিসের,' আমি বললুম, জন্মতিথির।



মেজোরানী হেসে বললেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ। ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখি নি।

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করছি, এমন সময় সে এসে পেন্‌সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেছে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে, কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি, তাব পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয়তো ফিরে আসতে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চলল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারও নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এতবড়ো একটা কথা কেমন করে এবং কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেছেন; তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বলব সে অধিকারটুকু খুইয়েছি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সংকোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করো'সে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু কেশে কথাটা যেই তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দারকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী উদ্‌বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলি নে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম, এরই মধ্যে কখন—

কেন, কী চাই?

শুনছি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্ছিস। তা হলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়োরানী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায় কথায় চমকে চমকে মরব সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই তো ঠিক?

আমি বললুম, হাঁ ঠিক। মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরী হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কী, কে জানে! সব ধোঁওয়া, স্বপ্ন।

এই যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল ব'লে, আর কয়েক ঘন্টা মাত্র আছে, এই সময়টাকে



কেউ এক দিন থেকে আর-একদিন পর্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তা হলে এরই মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই; অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর-একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করছি কিছুই ভাবব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক গে। পরশুদিনের মধ্যেই তো যা হবার তা হয়ে যাবে— জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন-জবাব, সবই।

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি— সে আমার বালকদেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে! সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম! নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম! জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমাব কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চার দিকে নানা গুজব জেগে উঠেছে, পুলিস আনাগোনা করছে, বাড়ির দাসী-চাকররা সবাই উদ্‌বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বললে, ছোটোরানীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দাও।- ঘরের ছোটোরানীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, এ কথা বলি কার কাছে? ক্ষেমার গয়না, থাকোর জমানো টাকা, আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় করে একটি বেনারসি কাপড় এবং তার আর-আর দামি সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল; বললে, রানীমা, এই বেনারসী কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী—থাক্, সে কথা কল্পনা করে হবে কী! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেসরা মাঘের দিন এসেছে, সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে?

অমূল্য লিখেছে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী-চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পর পিঠে ভাজছি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কী-একটা গোলমাল চলছে। হয়তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুলতে



এসে চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই নিয়ে মেজেরানী দাসী-চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েছেন। না, আমি শুনব না, কিচ্ছু শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাকব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আসছে; সে হাঁপিয়ে বললে, ছোটোরানীমা! আমি বলে উঠলুম, যা যা, বিরক্ত করিস নে আমার এখন সময় নেই।—থাকো বললে, মেজোরানীমা'র বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেছেন, সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরানীমা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

হাসব কি কাঁদব তাই ভাবি। এর মাঝখানেও গ্রামোফোন। তাতে যতবার দম দিচ্ছে সেই থিয়েটারের নাকি সুর বেরোচ্ছে; ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি করবে না; তবু থাকতে পারলুম না, বেহারাকে ডেকে বললুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও। বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বললে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠল। অমূল্যবাবু নেই— সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে, তার পরে সে আর নেই! সম্ভব অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব, কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাকব কেমন করে?

অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না; কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কী ভালোবাসার দান! কী পাবনমন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘন্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজোরানী এসে বললেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যা হোক। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে? এই বলে তিনি তাঁর সেই গ্রামাফোনটাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরত শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘোরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েছে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে, তারই পিছন সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।



আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করছে, রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইছে। কেননা আমি যে একলা; একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে, তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল অঙ্গ থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই, যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেইজন্যই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি; কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি—অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর-একদিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক; তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম; একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বললুম, আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু, আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এসো, এসো এসো—তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাঁপনের উপর এসে দাঁড়াও, প্রভু— আমি এই মুহূর্তেই মরি!

আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম; ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হত। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে? থাক্ গে আমার কথা।

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি।



কাল যে অপমান আমার জন্যে আসছে সেই অপমানের ডালি সকলেব সামনে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি প'রে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কত দিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে, আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগবে, তার পরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমাব সঙ্গে আমাব যে মিলন সে মিলন চলার মুখে; যতদূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল ততদূব পর্যন্তই ভালো, তার চেয়ে বেশি টানাটানি কবতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইল পড়ে; এবার বেরিয়ে পড়লুম, চলতে চলতে যেটুকু চোখে চোখে মেলে, হাতে হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তার পরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ— তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পারো প্রিয়ে? সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝর্না ঝরে পড়ছে। লক্ষ্মীর অমৃত ভাণ্ডার ফুরাবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সামনে চলে যাব।

মেজোরানীদিদি এসে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চলল তার মানে কী বলো তো?

আমি বললুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারি নি।

মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর ফিরবে না নাকি?

আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

সত্যি নাকি? তা হলে একবার এসো। একবার দেখো'সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।— এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোবড়ো নানা রকমেব বাক্স আর পুঁটুলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি; এই-সব দেখছ এক-এক-টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলি নি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুনি তোমারই স্বদেশী চিরুণী আর এই।

কিন্তু ব্যাপারটা কী মেজোরানী এ-সব বাক্সয় তুলেছ কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।



সে কী কথা।

ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে, সেইজন্যেই তো এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্যে দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে আবদারেব বাহক ছিলুম আমি; আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করে আনতুম। তার পরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল; মেজোরানী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েছেন, এক-একদিন ধরা পড়ে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েছে। তার পরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে; কত ঝগড়াও হয়েছে; বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে; আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, মনে হয়েছে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে, অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখাপ্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটোখাটো জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েছেন, তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরানী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এ পর্যন্ত কখনো একদিনের জন্যেও এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তার অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না। অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে বুঝলুম এমন আর কোনোদিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাককড়ি ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে ছোটোখাটো সামান্য সংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে, বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বার বার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়; তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি, বিমল কোথা থেকে হঠাৎ



মাঝখানে এসে একে ম্লান করে দিয়েছে, এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝেছিল আমার উপর মেজোরানীর দাবি কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর; সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে তাঁর এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম; বললুম, মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেইদিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

মেজোরানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই মেয়েজন্ম নিয়ে আর নয়! যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই; আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধু নিতে হবে, ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো এই-সব বোঝা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের একেবারে হালকা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বললুম, তাই তো দেখছি; বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজোরানী বললেন, আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসেব বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে, 'আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুটই বা', এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।---কখন বেরোতে হবে ঠাকুরপো?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়, সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে, আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিয়ো; গাড়িতে রাত্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েছে দেখলেই মনে হয়, আব-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চলো। এখনই তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বললে, দারোগাবাবু কাকে সঙ্গে করে এনেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজোরানী রাগ করে উঠে বললেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েছে। বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বললুম, একবার দেখে আসি গে, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজোরানী বললেন, না, সে হবে না। ছোটোরানী কাল বিস্তর পিঠে তৈরী করেছে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখছি।

বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বললুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই; সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক্ গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক গে। নাহয় হল আমার কাজের অবহেলা।



ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দু-পাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করছেই। রোজই একটা-না-একটা নিরীহ লোককে ধরে বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেছে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্-এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে তো ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম।

মেজোরানী বাইরে থেকে বললেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বললুম, পিঠে দুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ো; দারোগা যাকে চোর বলে ধরেছে পিঠে তারই প্রাপ্য, বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে! এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিনী! কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে। আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্ছ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ, আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এসো, তার পরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইবে গিয়ে দেখি দাবোগার পাত্র শূন্য। সে যাকে ধরে এনেছে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এ কী, অমূল্য যে!

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বললে, আজ্ঞে হাঁ। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হলে যে ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।

বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বললুম, ব্যাপারখানা কী?

দারোগা হেসে বললে, মহাবাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘেরাচ্ছি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে একতাড়া নোট সে আমার সামনে ধরলে। বললে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরোল?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বললেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে— চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ কববে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বিপদের সম্ভবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেছে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েছি। উনি বললেন, কোথা থেকে পেয়েছি সে আপনাকে বলব না। আমি বললুম, না বললে আপনি তো ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন,



মিথ্যে বলব। আমি বলি, আচ্ছা, তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি বললুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কী দরকারে গিয়েছিলেন, সমস্ত বলা চাই। উনি বললেন, সে-সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব, সেজন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে?

দারোগা বললেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে, তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দেমাতরম হুজুক উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব।— বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো-উনিশ ছিল; পড়তুম রিপন কলেজে, একদিন স্ট্র্যাণ্ডে এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বঁচাবার জন্য প্রায় জেলখানার সদর-দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম, দৈবাৎ ফসকে গেছে।— মহারাজ, এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারও কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল---

আমি একলা।

অমূল্য যা বললে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্‌ আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্ছা গেল; দু-চারজন বরকন্দাজ ছুটে আসতেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তার পরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়ে ছ হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ-ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বললে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে আমি বলব।

তিনি কে?

ছোটোরাণীদিদি।



বিমলকে ডেকে পাঠালুম। সে একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল; পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি; সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে!

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, বাঁচিয়েছ ভাই।

অমূল্য বললে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার বন্দেমাতরং মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বললে, সব খাই নি, কিছু রেখেছি-- তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে ব'লে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বললুম, এখানে আমার আর দরকার নাই; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার; আমরা নিবোনো; আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বলল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয় আর-একবার মেজোরানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার; নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, বাইরে আর কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজোরানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে ঠাকুরপো, আমি বলি বুঝি তোমার আজও দেরি হয়। আর দেরি নেই, তোমার খাবার তৈরি রয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরে দিকে যেতে যেতে মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি?

সেই ছ হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোরানীর কাছে আমার বলতে ইচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলছে।

লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্দুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেছি, আলমারি খুলেছি, কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে, সে চাবিটা নেই।

মেজোরানী বললেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে এ পকেট ও পকেট নাড়া দিলুম, দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েছে। কে নিতে পারে? এ ঘরে তো--



মেজোরানী বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটোরানী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেছে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেকতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে, এ তার স্বভাব নয়। আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিল না; সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজোরানী তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেছি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল মেজোরানীর সামনে এই চাবি হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আব ঘটল না। বিমল আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুবপোব লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে জানিস?

বিমল বললে, আমার কাছে।

মেজোরানী বললেন, আমি তো বলেছিলুম। চারি দিকে চুরিডাকাতি হচ্ছে, ছোটোরানী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলার মুখ দেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল; বললুম, আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক্, বিকেলে টাকাটা বের কবে নেব।

মেজোরানী বলে উঠলেন, আবার বিকেলে কেন ঠাকুরপো, এইবেলা ওটা বেব করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বললে, টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায়?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোরানী বললেন, ওমা, শোনো একবার! এত টাকা খরচ করলি কিসে?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না; দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজোরানী বিমলকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন; আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীব পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম; জানতুম সে টাকা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা; কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।

মেজোরানী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্লমুখে বললেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই। তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি। পান নেই ঘরে? নাহয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দে-না।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয় নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিমল কোনো সাড়া দিল না। মেজোরানী বললেন, ও কী, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? বেলা যে ঢের হল।



এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কিরকমের যোগ সে কথা জানতেও ইচ্ছা করল না; কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন; আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু-কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্তার ইশারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব, এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েছি। প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে, কারও জীবন একলার জিনিস নয়; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চার দিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টানব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না, এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চার দিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর-সবই নিয়েছে, কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব, এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবর্দস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাত হয়ে গেছি তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খইয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে; আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না; কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার ফর্মাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক— আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতরো



একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে? যে আব্রুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রু যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব; বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব; একদিন এমন হবে যে এই ক্ষতর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে! তার পরে? তার পরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে?

একটা কী খট্ করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘরে ঢুকবে কি না ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল; সে থমকে দাঁড়ালো, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বারবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ্ স্বরে বললে, না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পুজো করতে দাও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য— সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর-বাহিরের নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বসলুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুটলেন। আমি বললুম, না, ও হবে না। তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েছ।

আমার স্বামী বললেন, আমিই যেন কথা দিয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি, তার যে দেখা নেই।

আমি বললুম, না, সে হবে না তুমি শুতে যাও।

তিনি বললেন, তুমি একলা পারবে কেন?



খুব পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা-ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেছেন, তিনি খবর দিতে বললেন।

খবর কাকে দিতে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে এক মুহূর্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, শুনে আসি সন্দীপ কী বলে। ও তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার যখন ফিরে এসেছে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়াটাই বেশি লজ্জা ব'লে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা ভাবছ লোকটা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটুলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বললে, নিখিল, ভুল কোরো না, ভেবো না হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিঁচকাদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তু'র হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না— তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী! এই নাও।

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামীর তাকে ডেকে বললেন, শুনে যাও, সন্দীপ।

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখাবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে অতএব এখনকার মতো চললুম। তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃদয়পিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন করে দেখতে পাই নি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নাই— কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন;



বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্য ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিচ্ছু ভেবো না বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তার কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরে মেজোরানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললেন, করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন?

বেহারাকে বললেন, ডাক্ ডাক্ শিগগির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।

দেওয়ানবাবুর সামনে মেজোরানী কোনোদিন বেরোন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বললেন, আমরা সকলে মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না।

মেজোরানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানী ওলাউঠো হয়েছে, তাঁব মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজোরানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো— তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবাব জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূরে থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘন্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজোরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কতরকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।



মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তার পরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়সওয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চলছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল, সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে, কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো, অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর খবর কী?

সে বললে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

তার পরে কী চুপিচুপি বললে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কি আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুকল। পাল্কির পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আসছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, কী মনে করেন?

ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

ঘরে বাইরে ছবিতে উপন্যাস থেকে সত্যজিৎ বরং তেমন সরে আসেননি। আমরা জানি না, চল্লিশের দশকে ঘরে-বাইরের যে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল তার চেহারা কেমন ছিল। প্রায় চার দশক পরে চিত্রনাট্যটি নতুন করে যে লেখা হয়েছিল তা বোঝা যায়। কেননা না ঘরে বাইরে তোলার সময় সত্যজিৎ অসুস্থতার কারণে শারীরিক ভাবে অনেকটাই সক্ষমতা হারিয়েছিলেন। তাঁর বহির্দৃশ্য চিত্রগ্রহণের ওপর নিষেধ আরোপ করেছিলেন চিকিৎসকরা। তাই তাঁকে চিত্রনাট্য লিখতে হয়েছিল যথাসম্ভব বহির্দৃশ্য বাদ দিয়ে। যেটুকু ছিল তা তুলে ছিলেন সন্দীপ রায়।

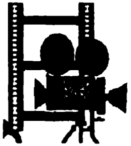
দর্শক লক্ষ্য করলে দেখবেন জীবনের শেষ দশকে তোলা ছবিগুলোতে সংলাপের বহুলতা। তার ফলে ফিল্মের দৃশ্যময়তার তুলনায় প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে বাক্যের বিন্যাস। ব্যঞ্জনা ব্যহত হয়েছে।

ঘরে বাইরে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন একটি নতুন আঙ্গিক। .... প্রধান তিনটি চরিত্র বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ প্রত্যেকেই একাধিক আত্মকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং নিজের মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এধরনের আত্মকথনের দরুণ উপন্যাসেও কথার বহুলতা প্রশ্রয় পেয়েছে বলে মনে হয়। চিত্রনাট্যে বিন্যস্ত করার সময় উপন্যাসের এ অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সত্যজিৎ মনোযোগ দিয়েছিলেন বেশি। মূল গল্প থেকে তিনি যতটুকু সরেছিলেন তাও তেমন



ব্যঞ্জনাসম্পন্ন হতে পারেনি ফলে রবীন্দ্রকাহিনী অবলম্বিত সত্যজিতের ছবিগুলির মধ্যে ঘরে বাইরে কে তেমন উজ্জ্বল মনে হয়না। কাহিনীর কাঠামোটিকে তিনি নিয়েছিলেন কিন্তু এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের যে রাষ্ট্রচিন্তা, তাও যেন মোটামুটি অগ্রাহ্যই করা হয়েছিল। সত্যজিতের সেরা ছবিগুলির মধ্যে ঘরে বাইরে কে স্থাপন করা কঠিন।

দিদি



❑ ১৯৮৫ সাল

দিদি রবীন্দ্র ছোটগল্প। 'দিদি' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায়, চৈত্র, ১৩০১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১৪ রিল। ৩৫ মি মি।

চিত্রনাট্য -নবেন্দু গুপ্ত।

পরিচালক--- স্বদেশ সরকার।

প্রযোজক -মন্দিরা চিত্র প্রয়াস।

চিত্রগ্রাহক-- দীপক দাস ও মনীশ দাশগুপ্ত।

শিল্প নির্দেশনা- -অমিতাভ বর্ধন।

সম্পাদনা---অমর লাহা।

সঙ্গীত পরিচালনা---হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কণ্ঠদানে- -হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী এবং সুমিত্রা সেন।

অভিনয়ে---অনিল চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, শমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, প্রমুখ।

মুক্তি-- ১৯ জুলাই, ১৯৮৫, রাধা ও পূর্ণ

❍ পরিচালক স্বদেশ সরকারের দ্বিতীয় রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'দিদি'।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো-এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপালবাবুর স্ত্রী শশী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিল—স্বামীজাতির মুখে চুরুটের আগুন ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার আগুন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাত-জন্ম বিধবা হওয়া ভালো। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, 'স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।' এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে নির্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়া, নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোলো বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া



আঁটিয়া ধরিল ; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল।

তাই আজ এত দিন পরে এত বয়সে, ছেলের মা হইয়া, শশী বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল --কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, 'এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না।' কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে ; আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্তমনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে - কারণ, স্বামী সর্বস্ব স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেইজন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে, প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসংগত অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে একটি চাকরি লইল।

নিকটবর্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না ; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তন্যপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিনীটি---দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের স্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল ; মরিবার পূর্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুংকারশব্দপূর্বক সে যখন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের



সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাহার চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টি-মধ্যে তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্যোদয় হইবার পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমলস্পর্শে তাহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত--যখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্বক তাহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল তখন শশী আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে-এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল ; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যেমন দিনই আসুক, যত দিনই যাক স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনোই ম্লান হইতে দিব না।'

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল, যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্যসত্য হইয়াছিল—তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মতো দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না।



তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত---নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোনোপ্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যতপ্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয় ; কিন্তু জয়গোপালও সেজন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না, এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই বুঝিল, জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার এলাকার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত, এইজন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া, সমস্ত প্রাণ দিয়া, বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত—বিশেষত, নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণাপ্রকাশপূর্বক জর্জরচিত্তে গর্জন করিয়া উঠিত, তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত ; তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে "সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার" বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্বে এরূপ স্থলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত ; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া আদর করিয়া, চুমো খাইয়া, শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনাবিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনো তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনোরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে ; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত, বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ো বুদ্‌বুদ্‌ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইরূপ বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেকদিন পর্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাহ। তাহার বিষণ্ন গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোনো ফল নাই।

শুনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া, নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া, তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এত বড়ো মিথ্যাকথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম---সে কখন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।"

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত, হঠাৎ দেখিল, সে একটা নিষ্ঠুর ফাঁদ—তাহাদের দুই ভাই-বোনকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন-কি, মহারানীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শত আটান্ন টাকা মুনাফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।



এইরূপে শশী যখন একবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মূর্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল কহিল "কেন, মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি।"

শশী তখন তাহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল ; জয়গোপাল বলিল, "আচ্ছা, শহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।"

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না ; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন-কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল, শহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, "মকদ্দমা-উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে ; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম, সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীন বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিবিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না ; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহাব মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল বাগিয়া কহিল "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কি? আমার ভাইয়ের তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা সে দেখা যাইবে।"

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছু দিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল "স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর্-না বাপু ; ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক স্বামী তো বটে।"

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটা জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল "দিদি, বাড়ি চলো।" সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই বারংবার বলিল "দিদি আমাদের সেই ঘরে চলো-না দিদি।" শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল— "আমাদের ঘর আর কোথায়।"



কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণীবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটিবাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালক-সহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী-স্ত্রীতে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

অনেকদিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব মফস্বল-পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকার-সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনপূর্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীরপ্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাঠশালায় পড়।"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ"।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ পুস্তক পড়িয়া থাক।"

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যান্টলুন পাগড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপরাসি কনস্টেবলে চারি দিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প্ টেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, 'এই সময়ে চক্রবর্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়।'

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।"

সাহেব তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্র স্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কহিলেন, "আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।" জয়গোপাল



বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারি দিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবা মাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশী তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিস্ট্রেট রক্তবর্ণমুখে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "চুপ রও" এবং বেত্রাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গর্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশীর কথা শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "বাছা, এ মকর্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এ সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার।"

শশী কহিল, "সাহেব, যত দিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে।"

শশী কহিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদুলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙালির ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই—এসো।"

ঘোমটার মধ্যে হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া, কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল ; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে "দিদি গো দিদি" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণহস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণহৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ।

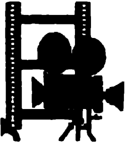
কিন্তু, এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত সকলে "চুপ চুপ" করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

চৈত্র ১৩০১

ছেলেটা



❑ ১৯৮৬ সাল

ছেলেটা—রবীন্দ্র কবিতা। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেটা' কবিতাটি প্রথম পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৯ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১০ রীল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সন্তোষ ঘোষাল।

প্রযোজনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

শিল্প নির্দেশক—প্রসাদ মিত্র।

চিত্রগ্রাহক—রামানন্দ সেনগুপ্ত।

সম্পাদনা—গঙ্গাধর নস্কর।

সঙ্গীত পরিচালক—চিন্ময় চ্যাটার্জী।

অভিনয়ে—শৈলেন মুখার্জী, শান্তিগোপাল, মাস্টার রাজা, মাস্টার গোপাল, সাবিত্রী চ্যাটার্জী প্রমুখ।

পরিবেশনা—ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।

মুক্তি—১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬; নন্দন প্রেক্ষাগৃহে।

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক---
পরের ঘরে মানুষ।
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে --
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি —-
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে—
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।
ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,



দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।
বেলা দুপুর।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে—
তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।
ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে—
ওই সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
'কী আছে দেখিই-না' সব তাতে এই তোর লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে, খাবি খেয়ে, তলিয়ে গেল কোথায়।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে—
তখন সে নিঃসাড়।
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচি বেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারি মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা
সাথিকে লোভ দেখিয়ে বলে,
'একবার দেখ্-না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।'
ভারি ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথি রাজি হয় না;
ও রেগে বলে, 'ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার।'

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।



বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর?'
কেন লজ্জা।
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দ'লে --
লজ্জা করে না?

একদিন পাকড়াশিদের মেজো ছেলে একটা কাঁচা-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বলল, 'দেখ্-না ভিতর বাগে!'
দেখল, নানা রঙ সাজানো,
নাড়া দিলেন নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, 'দে-না ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা ক'রে —
আব দেব আমারে কষির বাঁশি।'

দিল না ওকে।
কাজের চুরি করে আনতে হল।
ওর লোভ নেই- --
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
'চুরি করলি কেন।'
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
'ও কেন দিল না।'
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ ক'রে,
বাগানে আছে গোঁটা পোঁতার এক গর্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে—
পোকামাকড় দেয় খেতে।

গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি - -
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।



ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে—
ভাবলে, 'দেখিই-না কী করে মাস্টারমশায়।'
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর, সেইসঙ্গে কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাখেতের বেড় গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।
একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দু দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্নজল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করম্‌চা—
চুরি করতে উৎসাহ হল না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগ্নে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিল এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে 'দূর দূর করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়া সিধু গয়লানী।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত।
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা।

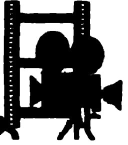


ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্যি এই গয়লানী মাসির' পরে।
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তাঁর ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
'দেখি-না কী হয়' তারই বিবিধ-রকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানীর স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ওই ছেলেটারই।

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ ক'রে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এতবড়ো বাঁদর।'
আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি।'

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

রবিবার



❑ ১৯৯৬ সাল।

রবিবার —রবীন্দ্র ছোটগল্প। রবিবার গল্পটি 'আনন্দবাজার পত্রিকায' শাবদীয সংখ্যায, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। ১১ রিল। ৩৫ মি.মি.।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—নীতিশ মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজনা—ন্যাশানাল ফিল্ম ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশন।

চিত্রগ্রাহক—বাসব সিন্‌হা।

শিল্পনির্দেশনা—নীতিশ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদনা—গোবর্ধন অধিকারী।

সঙ্গীত পরিচালনা—অমল নাগ।

কণ্ঠদানে—কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মিত্র, অমল নাগ, অমল চট্টোপাধ্যায়।

অভিনয়ে—অভীক—রঞ্জিত মল্লিক, বিভা—জয়িতা মুখোপাধ্যায়, এছাড়া শমিত ভঞ্জ, দেবশ্রী রায়, অনুপকুমার, সব্যসাচী চক্রবর্তী, স্মিতা সিংহ, আল্পনা গোস্বামী, দুলাল লাহিড়ী, তপেন চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিবেশনা-ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশন।

মুক্তি—১০ মে, ১৯৯৬; নন্দন প্রেক্ষাগৃহ।

আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁঠি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে পূজা অর্চনা আর এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল্ পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচার-বাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইটকাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে, সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আট ফুট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণি-পীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে, 'গোলা খা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের



অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন-কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারি ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করার জন্যে পূজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেক কাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, "ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্ক নোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরো দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ করে বেগার খেটেছে অনেক দিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারি আর্টস্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট্ অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট্' ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার চেয়ে বেশি-সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বিরুদ্ধদলকে অ্যাখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে দুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ করে মেয়েদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলছে 'আর্টিস্ট'। কেবল নিজেদের



মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে, গা জ্বলে যায়!

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালিমাখা নীলরঙের জামা-ইজের পরে বার্‌ন্‌কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে, ও মুসলমান হয়েছে ; ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকেব চেয়েও বড়ো। হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও আঙুলনির্দেশ করে বললে, 'পজিটিভ্‌লি ভাল্‌গর'।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বযস তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্‌ঝক্‌ কবছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে ইঙ্গিতে আভাসে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা বেশ একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোখে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে এসে বললে 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্যই করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্চকর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনস্ক্রুটেব্‌ল।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।"

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি, মরি, তোমারি গরবে গরবিনী, আমি, রূপসী তোমারি রূপে।"

অভীক বললে, "মুখস্থ বিদ্যার দিগ্‌গজেরা জানেই না আমি কোন্‌ মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাশ করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই বুঝবে না, কেননা



তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাক চোখ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হই-হই করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে-মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এখানে যে!"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেস্কের চৌকিতে গিয়ে বসল, বললে, "দরকার যদি হয় না হয় চুরি করলে, পুলিসে খবর দেব না।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেকক্ষণ তুমি বসে আছ?"

"তা আছি, বসে বসে সাইকোলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস কর কী করে। এখনো সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসার্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিক বাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো? আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন?"

"আ! কী বকছ!"



অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্‌খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর কোনো মানুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল, তিনি কেবলই খিট্‌খিট্‌ করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বড্ড বেশি ক্যাঁক্‌ ক্যাঁক্‌ করে।' বিভা আসমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত, তার বিয়েতে যেতে চাইলেই মা বলে বসলেন 'সেখানে ম্যালেরিয়া।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরো গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেবা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল ; বলেছিল, "যাকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুর ভাবে বাজে সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে।"

শুনে বিভা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল ভগবান নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি সুস্মি এসে বললে, "পিসিমা, বেলা হয়েছে।"

বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেই রকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্যায় হবে তোমার এখনই যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, সুস্মির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন। ডোমিনিয়ন্‌ স্টাটস্‌ অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই। কখনো তোমাকে কাজের কথা বলি নি, আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বিভা বললে, "তাই হোক, বাকি থাকে কেন।"

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কবজিঘড়ি। ঘড়িটা প্ল্যাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া। বললে, "তোমাকে বেচতে চাই।"

"অবাক করেছ, বেচবে?"

"হাঁ, বেচব, আশ্চর্য হও কেন।"

বিভা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললে, "এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল।



মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনো ওর মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করছে। জান সে কত দুঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে?"

অভীক বললে, "এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।"

"আশ্চর্য করেছ তুমি। এই কমাস হল সে টাইফয়েডে—"

"এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত।"

"শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।"

"ভুল বিশ্বাস করে নি।"

"তবে?"

"তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেননা জানি তুমি দর-কষাকষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি?"

"তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।"

এমন মানুষের 'পরে রাগ করা শক্ত। জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ছেলেমানুষি। কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই-যে উচিত-অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ৎসনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিঙ কাগটার উপর খানিকক্ষণ নীল পেনসিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, "আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনবো না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অভীক বললে, "ভিক্ষা! তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, পুরুষের কর্তব্য আমিই বরঞ্চ করছি। এই নাও এই ঘড়ি, এক পয়সাও নেব না।"

বিভা বললে, "মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই ব'লে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।"

"তবে শোনো, তুমি তো জান আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"



"এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক। তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—শীলাকে দেখেছ—কুলদা মিত্তিরের মেয়ে?"

"দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে সেখানে।"

"আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরো পাঁচজনকে ঠেকিয়ে। ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুখে শোনালো ভালো। আচ্ছা মন খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।"

"সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মান বুঝি?"

"নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল তখন রামপ্রসাদ মা'কে খাড়া করে বলেছিলেন, তোমাকে মা ব'লে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না— মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলুম ফুটবলের মাঠ থেকে খড় খড় শব্দ করতে করতে, পিছনের পদাতিকদের নাসারন্ধ্রে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। এমন সময় পাকড়াশিগিন্নি---- ওকে জান তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়-- সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির হুড আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এ রকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।"

"তাই বুঝি তুমি—"

"হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি যত শিগগির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশিগিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো, তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি—"

"আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।"

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা! আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি তুমি আশ্চর্য! আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোনদিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনোকালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না! অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জান---"

"চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার তুমি অট্টহাসি!"



অভীক বললে, "আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারি শীলা সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকোলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সে যেমন করে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘুরত, তবু ছাড়তুম না। মুখে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইন্‌স্‌পিরেশন। আমি আর্টিস্ট, ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেন্‌জার সিগনাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না— সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে!"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।"

"সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, "ওই এক কথা বার বার বলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনেছি। বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইনস্‌পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি আমি পারতুম, আমার যদি সে শক্তি থাকত, তা হলে—"

অভীক ঝোঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখু যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পার নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে; কোনো বাধা মানতে না। তরী তীরে এসে পৌঁছয়, তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরি, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।"

"যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' বলে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্‌, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেই সঙ্গে বলবে 'আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।"

"ওই তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতে বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্‌ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিসুভিয়স।"

বলে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হুর্‌রে।"

"এ কী ছেলেমানুষি করছ। এইজন্যেই বুঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান করে?"

"হ্যাঁ, এইজন্যেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল ওটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি—তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটা তো সুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তোমার কী রকম কথা হল? শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই। জাতকেজাত যেখানে যাকেই দেখব শ্রদ্ধা করে করে বেড়াব? মাল যাচাই নেই, একেবারে Wholesale শ্রদ্ধা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাসুল চাপিয়ে দর-বাড়ানো।"

"মিথ্যে তর্ক কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, 'আমি করব না। একেই বলে 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু পুরুষরা রবে নিরুত্তর'।"

"অভী, তুমি কেবলই কথা কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ। বেশ জান আমি বলতে চাইছিলুম মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা।"

"স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো, না অ-স্বভাবত? আমরা মডার্ন্‌ মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ডগাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড়হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামি করে তুলেছিলে, তাদের খেলো কর নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও, নিজের খুশিকেই করবে সস্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন কালটাই খেলো।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, এ কালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে—যাকে বলে debunking। জন্মেছি এ কালে, বোম্‌ ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না ; নন্দীভৃঙ্গীর বিদ ঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।

"আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই-যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালো লাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না।



তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill, *ঠেলাঠেলিতে* তাকে কি পায়ের নীচে দলে ফেলা হয় না।"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেণ্ডহ্যান্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়, অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী।"

"তুমি পার অভী, নিশ্চয় পার, পুরো মূল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অদ্ভুত তোমার স্বভাব, ছেঁড়া জিনিসে ময়লা জিনিসে তোমাদের আর্টিস্টের একটা কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে। সুসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্ গে এ-সব বৃথা তর্ক। আপাতত ক্রাইসলারের পালাটা যতদূর সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই বলে চৌকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্‌স্‌পিরেশন, কোম্পানিবাহাদুরের-মার্কা মারা। কিন্তু তাই বলে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুতপদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে, আমার অভাব নেই, এমন সুযোগে "

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়।"

বিভা অভীকের হাতের উপর স্নিগ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "যা পারি নে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার দুষ্টুমি কত ক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরো অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পার না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জান, তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাক। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের সঙ্গে গলাগলির গদ্‌গদ দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্বল স্ত্রৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের। আর্টিস্ট খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ তার খেলনাটি নাহয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে?"

"খোলসা করে বললে হয়তো খুশি হবে না। তুমি জান অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিক্‌স শিখছি।"



"সব-তাতেই আমাকে বহু দূরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টীদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্য মামা। নিজে তিনি গণিতে ফার্স্টক্লাস মেডালিস্ট। তাঁর বিশ্বাস—যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম্ হবেন। ওঁর কষা একটুখানি প্রব্লেম আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম, ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খুব খুশি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্ট্‌ফান্ড্ থেকে কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।"

অভীকের মুখ কেমন এক রকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "এমন আর্টিস্টও হয়তো আছে যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পৌছতে পারত।"

"কোনো সুযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পৌঁছতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম?"

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড় নড় করতে করতে চলুক। এখন ও সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাবু শুনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।"

বিভা বললে, "একান্ত আশা করি তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।"

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়— আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রান্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয় আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সবুর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্য। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক ; কানে ঠিক সুর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি—একদিন আসবে যেদিন অর্ধেক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না।"

"পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি



তুমি বুঝতে পার নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" ব'লেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপূজা করব।"

"তুমি পুজো করবে?"

"আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্যে আকাশ শূন্য হয়ে আছে।"

বিভা বুঝল বিভারই ভগবানের বিরুদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট্। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

অভীকের নাস্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতেই ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা-কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে খবর দিলে অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে দুড় দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে অধ্যাপককে বলে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্। একটু বাদেই আসছি।"

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কান্না। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি?"

"না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ বছর কোপেনহেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্স্ কনফারেন্স হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এত বড়ো সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।"

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।"



অধ্যাপক একটুখানি হেসে বললেন, "আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজি নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কষ্টিপাথরের ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশ্বাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে— ঠকাবার জো নেই কাউকে।"

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, "যেখান থেকে হোক বন্ধু একজনকে বের করবই, হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।"

দু-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিষ্পত্তি হল।

অমরবাবু লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া, মাথার সামনেদিককার চুল ফুরফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সঙ্গে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা - অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু, ওঁর খুব অল্পই, কিন্তু যে কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইব্রাউ। কথাবার্তা অল্প বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তাঁর সাইকলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনো তার ব্যত্যয় হয়নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাৎ অকাজের সমস্ত শাস্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই এক মুহূর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্‌পেগাড়ির মধ্যে ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙঘন করে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস করে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্ল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামি গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ করে দেবে আপন স্বদেশকে।"

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরিকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।



অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারখানা কী। বললে, "অসামান্যের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখো; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি অবলা নারী মৃণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে।"

"না, জানেন না।"

"জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না?"

"ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা বুঝলুম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গহনা আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামান্যই হই—কারও বিলেতে যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়োই হোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার, ও যে আমারও।"

"আচ্ছা, ওই হারটা নাহয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবসুদ্ধ সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি। ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর কর যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন, আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি?"

"হয়েছে, বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধুর জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।"

"আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধূর রাস্তা নেই?"

"ও কথা বোলো না। সজীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।"

"মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে, পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাবটাই হয় মারাত্মক। তখন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।"

"ওই যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্‌বন্ধন। প্রসঙ্গটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তবু সম্ভবনার এত কাছ-ঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং, তখন---"

"আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পরহস্তের অভাব নেই।"

"ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনালো না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী বলে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শুকিয়ে মরতে রাজি থাক। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বুদ্ধিমানের মতো অভাব পূরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশকিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদবিটা



বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরতে হয়। সাইকলজি এখন থাক্, আমার প্রস্তাব এই-- অমরবাবুর অমরত্বলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না। আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে। গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন।"

"ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্, অন্য এক সময় হবে। অমরবাবুর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের মানুষরা বড়োলোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল পুণ্যকর্ম করেছি।-- দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফাণ্ডে। দিয়েছি কাউকে না ব'লে। যখন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।"

"এ কী কাজ করলে অভীক! তুমি যাকে বল তোমার পবিত্র নাস্তিকধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা!"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল করে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে বলে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে আর লাউ-কুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে খড়্গাঘাতে। নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজল সাধুবাবা, পাঁচজন সাজল চেলা, কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে তার যে ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে, জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবহরের পূজো না পেলে মা তাঁকে আস্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শুনলুম, সেইদিনই টাকাটার সৎকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে করলুম আমার কন্‌ফেশনাল। পাপ কবুল করে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছিল কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্যে।"

সুস্মি এসে বললে, "বচ্চু বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তারবাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও-সে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্‌বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছে, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে সুস্থ তাদের মনে করবার সময় পাও না।"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি সুস্থ হতভাগ্যকে ভুলে থাকবার জন্যেই এত করে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখো।"

"আর আমার লোভ কে সামলাবে।"



"তোমার নাস্তিকধর্ম।"

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল— ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে— কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিলো।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টীমারের-ছাপ মারা। অভীক লিখেছে—

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তবু বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই বলে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট্ এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরদুঃখের কথা ; কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

অনেক মূঢ় আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমাব মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে, তার সঙ্গে হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস অসন্দিগ্ধ সত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দুঃসাধ্যসাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমানুষ— যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভরতি করে নিয়ে চললুম সমুদ্রের পারে। আর নিলুম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একখানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো— তোমার কাছ থেকে চলে আসার দারুণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।



তুমি মনে মনে কখনো আমাকে ঈর্ষা করেছ কি না জানি নে। এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ সব কথা শোনাবে সেন্টিমেন্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গম্ভীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার দুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি বলে অনেক খুঁতখুঁত করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ এ কথার মতো এতবড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনো হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেই জন্যেই আর কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাও নি, কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, এই নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি— বলেছে 'অলৌকিক'। এরই আকর্ষণে কোনো-এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধুকরী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব— তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে ; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনো না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত
অভীক

আশ্বিন ১৩৪৬



বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা.....

....'রবিবার'-এর রবীন্দ্রনাথকে তাই বলা যায় সম্পূর্ণভাবে পরিণত মনস্ক—চরম আধুনিক এবং বিশ্বজনীন। নীতির চেয়ে সত্য, রীতির চেয়ে জীবন, আচার প্রথা ব্যবহারিক বিধির চেয়ে মানবত্বের প্রকাশ · এই নিয়ে রবিবার। রবিবার এইসব গুণে গুণী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজেকে তৈরি করতে করতে ভাঙতে ভাঙতে একেবারে শেষে এসে যেন মহীরুহের পরিণতি দান করেছেন। এখানে তিনি অনন্য। অন্য রবীন্দ্রনাথ। খুব কম লোক এই রবীন্দ্রনাথকে চেনে।

'রবিবার' তাই মনকে বেশি করে টেনেছে।

মনে হয়েছে, রবিবার-এর কথা আমারও এবং সকলেরও হওয়া উচিত। সকলের হবেও হয়তো যদি একাগ্র করে বলা যায়।

ধর্মই মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিলতে দিচ্ছে না · একথাটা রবীন্দ্রনাথেরই।

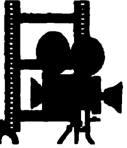
রবিবারের সমস্যাটাও এই নিয়ে। এই ধর্ম। অর্থাৎ একটা বিশেষ আচার, বিশেষ প্রথা, বিশেষ ব্যবহারিক বিধি। .... একেবারে শেষে বিভা যখন অভীকের সঙ্গে মিলবে বলে সব বাধা ভেঙে বাইরে আসবে স্থির করল তখন অভীক তাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এই ই রবিবারের ট্র্যাজেডি, রবিবারের উত্তরণ। কিন্তু বিভা অপেক্ষা করে রইল। তার আদর্শ, তার বিদ্রোহ, তার ভালোবাসা সব নিয়ে। তার স্বপ্ন নিয়েও .... রবিবার এই সমস্যা আর স্বপ্নের গুণে চিরযুবা। রবিবারের সমস্যা এই একাশিতেও প্রতিদিনের ঘটনা। শুধু বাংলার নয় গোটা ভারতবর্ষের।. রবিবার নিয়ে ছবি করব সেই কবে যখন ছবি ব্যাপারটাই ভালোবাসা ছিল—তখন থেকে ভেবে আসছি। এতদিনে রবিবার ছবি করেছি। শেষও করতে পেরেছি। এই-ই আমার অহংকার।

(পরিচালকের নিজের দৃষ্টিকোণে রবিবার সম্বন্ধে ভাবনা।)

—রবীন্দ্রনাথ, রবিবার এবং আমি --শ্রী নীতিশ মুখোপাধ্যায়।

ছেলেবেলা

('জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা')



❑ ২০০১ সাল।

ছেলেবেলা—('ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি' আত্মকথা মূলক গ্রন্থদুটি অবলম্বনে ১৮৭৮ পর্যন্ত অর্থাৎ কবির ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনকালের বর্ণনা অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র)

'জীবনস্মৃতি' 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

জীবনস্মৃতি ১৩১৯ (জুলাই, ১৯১২) সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।

'ছেলেবেলা' ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পরিচালক—সুকান্ত রায়।

প্রযোজনা—প্রদীপ কুন্দলিয়া

মুক্তি—২০০১, নন্দন প্রেক্ষাগৃহ

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতবের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দু'ই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে—তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে



বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে-ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীতজীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্বজনিত। অবশ্য, মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না, কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে-ছবি গুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই, তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।



শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক[১] একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের[২] কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল,[৩] কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'[৪] আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর-একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসিতামাশা। বাড়িতে নূতনসমাগত জামাতাদিগকে সে বিদ্রূপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই, এরূপ জনশ্রুতি আছে। একসময়ে আমার গুরুজনেরা প্ল্যাঞ্চেট-যোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন তাঁহাদের প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের রেখায় কৈলাস মুখুজ্যের নাম দেখা দিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যেখানে আছ সেখানকার ব্যবস্থাটা কিরূপ, বলো দেখি। উত্তর আসিল, আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান? সেটি হইবে না।

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত—কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে--আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

তাহার পরে যে কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য

---

১ "আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ [গঙ্গোপাধ্যায়] এবং আমি।"-- পাণ্ডুলিপি

২ মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—র-কথা

৩ বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায়— ছেলেবেলা, অধ্যায় ৮

৪ দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ



বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই— কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে[১] অকালে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কী কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিসম্যানের কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম, একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিসকর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরূপ নির্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে[২] গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা, আমার মাতার কোনো-এক সম্পর্কে খুড়ি[৩], যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে

---

১ গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয় স্থাপিত ১৮২৩। বিদ্যালয়টি তখন "গবানহাটায় গোরাচাঁদ বশাকের বাটীতে" অবস্থিত ছিল।

২ সারদাদেবী (১৮২৪-৭৫), বিবাহ ১৮২৯-৩০। মতান্তরে (রবীন্দ্র কথা পৃ ১-৪): সারদাদেবীর জন্ম, ইং ১৮২৬; বিবাহ, ফাল্গুন ১২৪০ [১৮৩৪]

৩ সারদাদেবীর "কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী", "তিনি প্রায় মায়ের [সারদাদেবীর]সমবয়সী ছিলেন।"—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মচরিত, পাণ্ডুলিপি



অপরাহ্নের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

ঘর ও বাহির

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার 'পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোরদ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম— তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের-জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা-কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো-আনাকেই



আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত ; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত ; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত ; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক ; কাহারও-বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই, ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুলগতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।[১]

১ দ্র 'পুরোনো বট', শিশু, রচনাবলী ৯



কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারি দিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধদ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি[1] লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

> খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
>   বনের পাখি ছিল বনে।
> একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
>   কী ছিল বিধাতার মনে।
> বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি, আয়,
>   বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
> খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
>   খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
>   বনের পাখি বলে, "না,"
> আমি   শিকলে ধরা নাহি দিব।
>   খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
> আমি   কেমনে বনে বাহিরিব।"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সঙ্গে ঐ বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী

১ দ্র 'দুই পাখি', সোনার তরী, রচনাবলী ৩



আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থকিত ; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতার আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া, ছিটকিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল— সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর-একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্‌, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে ; সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি, মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে-ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম



হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া এই ঢেঁকিশালাটি কোন্‌-একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম-মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম-মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন —আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে-পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে, সে-পর্যন্ত মানুষের সাজসজ্জার প্রয়োজন কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল— সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো-এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সংবৎসরের শস্য রাখা হইত— তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত, এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহির, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই; তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো-একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা[১] সেটাকে রাজার বাড়ি[২] বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, 'আজ সেখানে গিয়াছিলাম।' কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কাছে ; একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায় ; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে। সে বলিয়াছে, না, এই বাড়ির মধ্যেই। আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে— কেবল এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

১ ইরাবতী (১৮৬১-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীব কন্যা, সত্যপ্রসাদেব ভগ্নী
২ দ্র 'রাজার বাড়ি', গল্পসল্প , 'বাজাব বাডি', শিশু, বচনাবলী ৯



ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম।[১] সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে এ-কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার[২] বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে ; সেই বিশ্বাসের যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুলঘরের কোণে যে পাহাড় সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষে আমাদের উঠানের চারি ধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত। সর্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটি-কাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি, গর্ত বড়ো হইতে হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন-কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর-যাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত, একটা রহস্যসিন্দুকের

১ দ্র 'আতার বিচি' ছড়ার ছবি
২ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৭-৮১), দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র



ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত, যেন আর-একটু খুঁড়িলেই হয়—কিন্তু বৎসরের পর বৎসর গেল, সেই আর-একটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দায় একটুখানি টান দেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন—আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটি চাপা পড়িয়া থাকিত না। আর, যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে-চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয়[১] পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি ; শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাস্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন, আর কেহ নয়।

ভৃত্যরাজক তন্ত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তা'তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায়--শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখির দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক হইতেই দেখে। সেইজন্য গুলি খাইবার পূর্বেই যে সতর্ক পাখি চীৎকার করিয়া দল ভাগায়, শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত। রোদন জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক, এ-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক-একবার ভাবি, ভৃত্যদের হাত হইতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে আকারপ্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায়—সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই

১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত



সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে-বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া- বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিলচড় আকারেই মনে আছে--তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর।[১] সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসদ্ভা ব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘটি ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন-চারহাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে, অবশেষে হঠাৎ একসময় দ্রুতগতিতে ডুব দিয়া লইত; যেন পুষ্করিণীটিকে কোনোমতে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহার শরীরের কাপড়চোপড়গুলাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেইগুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্বজগৎটা কোনো দিক দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে, সে বরানগরকে বরাহনগর বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, 'অমুক লোক বসে আছেন' না বলিয়া সে বলিয়াছিল 'অপেক্ষা করছেন'। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে 'অপেক্ষা করছেন' কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায়, বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে—একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের

১ ব্রজেশ্বর, দ্র ছেলেবেলা, অধ্যায় ৩



বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাকার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচরণ কিশোরী চাটুজ্যে[১] আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো-কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটো ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরুসভায় ভীষ্মপিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশকরা থাকিত। প্রথমে দুই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে-বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচিকয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেশনকর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণহস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিস ফরমাশ করিলে সে খুশি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য, কখনো-বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

নর্মাল স্কুল

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে-হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলো ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে

১ কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়



করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে, তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমন-কি, ভালোমানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিঙের মুখশ্রীর প্রভেদ আমি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলই বাড়িয়া উঠিত ; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে, তাহা যেন ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কী ভয়ংকর মাস্টারি যে করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমান নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্মিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি লৌহনির্মিত রেলিং ভরতি হইয়াছে—আমাদের উত্তরবর্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই, করিলেও তখনকার শাসনপ্রণালীতে এখন কোনো ফল হইত না।—ইহা বেশ দেখিয়াছি, শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্বাক্ ও অচল পদার্থ ছাড়া আর-কিছুর উপরে সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং-শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। তাহার পরে নর্মাল স্কুলে[১] ভরতি হইলাম। তখন বয়স অত্যন্ত অল্প। একটা কথা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই চেষ্টা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলো ছিল ইংরেজি, তাহার সুরও তথৈবচ—আমরা যে কী মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কী অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা কিছুই বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না। অথচ ইস্কুলের কর্তৃপক্ষেরা তখনকার কোনো-একটা থিয়োরি অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁহারা ছেলেদের আনন্দবিধান করিতেছেন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে তাকাইয়া তাহার ফলাফল বিচার করা সম্পূর্ণ বাহুল্য বোধ করিতেন। যেন তাঁহাদের থিয়োরি-অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না পাওয়া তাহাদের অপরাধ। এইজন্য যে ইংরেজি বই হইতে তাঁহারা থিয়োরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আস্ত ইংরেজি গানটা তুলিয়া তাঁহারা আরাম বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের মুখে সেই ইংরেজিটা কী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে নিঃসন্দেহ মূল্যবান। কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—

কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।

---

১ ইং ১৮৫৫, জুলাই মাসে "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে" স্থাপিত হয়।—চরিতমালা ১২

"তখন এই বিদ্যালয়টি জোড়াসাঁকোতে তাঁহাদের [রবীন্দ্রনাথের] বাটির সন্নিকটে বাবু শ্যামলাল মল্লিকের বাটিতে অবস্থিত ছিল।"—র-কথা পৃ ১৬৪



অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি— কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয় —Full of glee, singing merrily, merrily, merrily.

ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থায় পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।[১] ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর— আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের[২] কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে। ভাবিতাম, কুকুর বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের খুব ভালো করিয়া শায়েস্তা করিয়া প্রথমে তাহাদের দুই-চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে লড়াইয়ের আসরের মুখবন্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া ওঠে; তাহার পরে নিজেদের বাহুবল কাজে খাটাইলে জয়লাভটা নিতান্ত অসাধ্য হয় না। মনে মনে এই অত্যন্ত সহজ প্রণালীর রণসজ্জার ছবিটা যখন কল্পনা করিতাম তখন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষের জয় একেবারে সুনিশ্চিত দেখিতে পাইতাম। যখন হাতে কাজ ছিল না তখন কাজের অনেক আশ্চর্য সহজ উপায় বাহির করিয়াছিলাম। কাজ করিবার বেলায় দেখিতেছি, যাহা কঠিন তাহা কঠিনই, যাহা দুঃসাধ্য তাহা দুঃসাধ্যই, ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরো সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনি করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির[৩] নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।

কবিতা-রচনারম্ভ

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ[৪] আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে

---

১ "গিন্নি বলিয়া একটা ছোটোগল্প লিখিয়াছিলাম, সেটা নর্মালস্কুলেবই স্মৃতি হইতে লিখিত।"—পাণ্ডুলিপি

২ হরনাথ পণ্ডিত

৩ নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক

৪ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯), গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কাদম্বিনী দেবীব পুত্র



কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।" বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য-জিনিসটিকে এ-পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দরোয়ান যখন তাহাকে মারিতে শুরু করিল আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্য সম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না। এখন দেখিতেছি, পদ্যবেচারার উপরেও মার সয় না। অনেকসময় দয়াও হয় কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিস্‌পিস্‌ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।

ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেনসিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।

হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্‌গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা[১] আমার এই-সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে, একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার 'ন্যাশানাল পেপার'[২] পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কহিলেন, "নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন-না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্য-গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই। কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়া উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী।"

'দ্বিরেফ' এবং 'ভ্রমর' দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা-ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল। দফতরখানার আমলামহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না। এমন-কি, তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল,

১ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-১৯২৩)

২ দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত (? ১৮৬৬) স্বদেশীভাব-প্রচারক ইংরেজি সাপ্তাহিক



নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন। তাঁহাকে আর-কখনো কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু কে সমজদার, কে নয়, তাহা পরখ করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক, নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু 'দ্বিরেফ' শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।

নানা বিদ্যার আয়োজন

তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ,[1] বস্তুবিচার,[1] প্রাণিবৃত্তান্ত[2] হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার[3] বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের[4] সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা,[5] মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর[6] কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত[7] মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই জল টগবগ করে —ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল[8] কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

---

১ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। বস্তুবিচার— ? 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'

২ সাতকড়ি দত্ত-প্রণীত

৩ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-৮৪), দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র

৪ "হীরা সিং নামক একজন শিখ পালোয়ান।" — প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩৮৮

৫ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

৬ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮১৯-? ১৯০১)

৭ ? সীতানাথ ঘোষ (১২৪৮-৯০), দ্র প্রবাসী, ১৩১৮ মাঘ, পৃ [illegible], ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২১৩

৮ দ্র 'কঙ্কাল', গল্পগুচ্ছ ১, রচনাবলী ১৬



ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাস্টার অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্‌ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্‌ভাবন, এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না, এটা যে পাখির বাচ্ছাদের পরম সৌভাগ্য এ কথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে, সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজি ভাষা নয়, এ কথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবলএকবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে-সময়টাতে মাস্টারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে ; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে ; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে ; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।[১]

যখন সকল কথা স্মরণ করি তখন দেখিতে পাই, অঘোরবাবু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন, তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি যত ভালোমানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহার

১ দ্র 'অসম্ভব কথা', গল্পগুচ্ছ ১



সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, পদ্য কি গদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল ; বুঝিতে পারিলেন মকদ্দমাটি নিতান্ত সহজ নহে — ডিক্রি পাইতে হইলে আরো এমন বছর দশ-পনেরো রীতিমতো লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মাস্টারমশায় মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণহাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাইব।" এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয় ; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরা করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যতবড়ো আশ্চর্য হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল ; মাস্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে, এই কণ্ঠনলীর মধ্যে নাই, দেহব্যবচ্ছেদেব কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন, এইজন্যই, তাঁহার কণ্ঠনলীর ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমত বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি আমাদিগকে মেডিকেল কলেজেব শবব্যবচ্ছেদের ঘবে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল ; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই ; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল, সে-দৃশ্যে আমাব সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়েব কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ[১] কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্স্[২] কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিলনা, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাস্টারমহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রত্যহ ধিক্কার দিতেন। এরূপ তুলনামুলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালো বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া করিয়া দুর্বোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি

---

১ Peary Churn Sircar First Book of Reading, Second Book of Reading

২ ? Macculloch's



পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দায় দৌড় করাইয়া, কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা[৩] যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আব মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।

বাহিরে যাত্রা

একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদেব[৪] বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওযা যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপব সেই জোয়ারভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকাব কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়াবাগাছের ছায়াব পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো ; নদীর উপর কালো ছায়া ; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়গ্রহণ করে ; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকালবেলায় এখোগুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে---এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর---ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ ; চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আবরু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত। এ যেন ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা আঁকা সবুজরঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদুগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেকদিন জামরুল গাছের ছায়ায়, ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র
৪ আশুতোষ দেব



বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল—কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।

একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুইজনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "যাও যাও, এখনি ফিরে যাও।"—তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই—ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়তো আজ চল্লিশ বছরের কথা। তার পর সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর একদিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চয়ই এখনো আছে, কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই; কেননা, বাগান তো গাছপালা দিয়া তৈরি নয়, একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া—সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে?

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।

কাব্যরচনাচর্চা

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মতো হইয়া ভিতরের লেখাগুলাকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।

আমি কবিতা লিখি, এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত[১] মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি

১ হেড্‌মস্টার (?) নর্মাল স্কুল



তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি প্রাণীবৃত্তান্ত নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করিয়া তঁহার স্নেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।" লিখিয়া যে থাকি সে কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে--

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না তাহারই প্রমাণস্বরূপে লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম--

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবরসংক্রান্ত--অত্যন্তই স্বচ্ছ।

আর-একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্‌ধৃত করি আশা কবি, ইহাব ভাষা ও ভাব অলংকারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে-

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু[১] ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। কালো চাপকান পরিয়া দোতালায় আপিসঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামি ছিল পাঁচ-ছয়জন বড়ো বড়ো ছেলে; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারিতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লেখ।" কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণগম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "পড়িয়া শোনাও।" আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে--এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত, এই

১ "খোঁড়া গোবিন্দ ময়রা", দ্র 'ভালোমানুষ', গল্পসল্প



কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয়ই আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক - প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

এখনকার দিনে ছোটোছেলের কবিতা লেখা কিছুমাত্র বিরল নহে। আজকাল কবিতার গুমর একেবারে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই-একজনমাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি, কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কবিত্বের অঙ্কুর এখনকার কালে উৎসাহের অনাবৃষ্টিতেও ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের অনেক পূর্বেই মাথা তুলিয়া উঠে। অতএব, বালকের যে কীর্তিকাহিনী এখানে উদ্‌ঘাটিত করিলাম, তাহাতে বর্তমানকালের কোনো গোবিন্দবাবু বিস্মিত হইবেন না।

শ্রীকণ্ঠবাবু

এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম— এমন শ্রোতা আর পাইব না।[১] ভালো লাগিবার শক্তি ইহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত-সমালোচক-পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জিত তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। বেশ মনে পড়ে, তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজ ছবিওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দিতে বাংলাতে তিনি এমনি আলাপ জমাইয়া তুলিলেন অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন "ছবিতোলার জন্য অত বেশি দাম আমি কোনোমতেই দিতে পারিব না, আমি গরিব মানুষ না না, সাহেব সে কিছুতেই হইতে পারিবে না" যে, সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল। কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতরো অসংগত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না, তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল- তিনি কাহারও সম্বন্ধেই সংকোচ রাখিতেন না, কেননা তাঁহার মনের মধ্যে সংকোচের কারণই ছিল না।

১ "ইনি রায়পুরের সিংহপরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়।"— পাণ্ডুলিপি
-- "সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত।"



তিনি এক-একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোটো দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে তাহা আর-কাহারও দ্বারা কখনোই সাধ্য হইত না। আর-কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে এইজন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুশি হইত।

আবার, তাঁহাকে কোনো অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না। আমাদের বাড়িতে একসময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্নমুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বার বার করিয়া বলিলেন, "ও তো কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে।"

কেহ দঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না---ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' হইতে কোনো-একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনোমতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরনার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারে দুঃখকষ্টে ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে, নিশ্চয় তিনি ভারি খুশি হইবেন। মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবু হইলে সে কবিতাদুটির আদর বুঝিতেন।

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল---'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী।' ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ', সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালোলাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইহারই দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত[১] আছে—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়।' এই গানটি তিনি



পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন -- 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'---আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।'

এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন,[২] পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। বহুকষ্টে একবার মাত্র পিতৃদেবের পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়।[২] তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই, আসন্ন মৃত্যুর সময়েও 'কী মধুর তব করুণা, প্রভো' গানটি[৩] গাহিয়া তিনি চিরনীরবতা লাভ করেন।

বাংলাশিক্ষার অবসান

আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছি। বাড়িতে আমরা সে-ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধও পড়া হইয়া গিয়াছে। পদার্থবিদ্যা পড়িয়াছিলাম কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া -- বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে-সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার তো মনে হয়, নষ্ট হওয়ার চেয়ে বেশি ; কারণ, কিছু না করিয়া যে-সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে-সময়টা নষ্ট করা যায়। মেঘনাদবধকাব্যটিও আমাদের পক্ষে আরামের জিনিস ছিল না। যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয় -- তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য-জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহারদ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।

এই সময়ে আমাদের নর্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোনো-একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার পিতামহের[৪] এক ইংরেজি জীবনী[৫] পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমার সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে। পরদিন সকালে যখন যথানিয়মে দক্ষিণের বারান্দায় টেবিল পাতিয়া দেয়ালে কালো বোর্ড ঝুলাইয়া নীলকমলবাবুর[৬]

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত, দ্র ব্রহ্মসংগীত

২ আশ্বিন ১২৯১

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত। দ্র ব্রহ্মসংগীত

৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)

৫ Memoir of Dwarkanath Tagore by Kissory Chand Mittra (1870)

৬ নীলকমল ঘোষাল



কাছে পড়িতে বসিয়াছি, এমন সময় পিতার তেতালার ঘরে আমাদের তিনজনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, "আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই।" খুশিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।

তখনো নীচে বসিয়া আছেন আমাদের নীলকমল পণ্ডিতমহাশয় ; বাংলা জ্যামিতির বইখানা তখনো খোলা এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানা বোধ করি পুনরাবৃত্তির সংকল্প চলিতেছে। কিন্তু মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ ঘরকন্নার বিচিত্র আয়োজন মানুষের কাছে যেমন মিথ্যা প্রতিভাত হয়, আমাদের কাছেও পণ্ডিতমশায় হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ বোর্ডে টাঙাইবার পেরেকটা পর্যন্ত তেমনি একমুহূর্তে মায়ামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে। কী রকম করিয়া যথোচিত গাম্ভীর্য রাখিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে আমাদের নিষ্কৃতির খবরটা দিব, সেই এক মুশকিল হইল। সংযতভাবেই সংবাদটা জানাইলাম। দেয়ালে-টাঙানো কালো বোর্ডের উপরে জ্যামিতির বিচিত্র রেখাগুলা আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল ; যে-মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল সে আজ এতই নিরীহভাবে টেবিলের উপর চিত হইয়া পড়িয়া রহিল যে, তাহাকে আজ মিত্র বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না।

বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "কর্তব্যের অনুরোধ তোমাদের প্রতি অনেকসময় অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, সে কথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।"

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা-জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে - মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তার পরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারি দিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি[১] নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভরতি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল, আমরা অনেকখানি বড়ো হইয়াছি অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠিয়াছি। বস্তুত, এ বিদ্যালয়ে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সে কেবলমাত্র ঐ স্বাধীনতার দিকে। সেখানে কী-যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়শুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ করিত না। এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। তাহার হাতের তেলোয় উলটা করিয়া ass লিখিয়া 'হেলো' বলিয়া যেন

১ "ডিক্রুজ সাহেব [DeCruz] ছিলেন ইস্কুলের মালিক।"—'মুন্‌শী,' গল্পসল্প



আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাভাজন উক্ত চতুষ্পদের নামাক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত, হয়তো-বা হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথার উপরে খানিকটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত, ঠিকানা পাওয়া যাইত না ; কখনো-বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষটির মতো অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত, দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া ভ্রম হইত। এ-সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয় না এ সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে। তাই আমার মনে হইল, এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম -তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিদ্যালয়ে আমার মতো ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতিলাভ করিব সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে ছিল না। ছোটো ইস্কুল, আয় অল্প, ইস্কুলের অধ্যক্ষ[১] আমাদের একটি সদ্‌গুণে মুগ্ধ ছিলেন- আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিতেও আমাদের পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল। বোধ করি বিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ-সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন --আমাদের প্রতি মমতাই তাহার কারণ নহে।

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো--ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত- অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।

পলায়নের একটি সহায় পাইয়াছিলাম। দাদারা একজনের কাছে ফারসি পড়িতেন তাঁহাকে সকলে মুনশি[২] বলিত--নামটা কী ভুলিয়াছি। লোকটি প্রৌঢ়- অস্থিচর্মসার। তাঁহার কঙ্কালটাকে যেন একখানা কালো মোমজামা দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; তাহাতে রস নাই, চর্বি নাই। ফারসি হয়তো তিনি ভালোই জানিতেন, এবং ইংরেজিও তাঁর চলনসই-রকম জানা ছিল, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে যশোলাভ করিবার চেষ্টা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লাঠিখেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য নৈপুণ্য সংগীতবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্য পারদর্শিতা। আমাদের উঠানে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তিনি নানা অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাঠি খেলিতেন-- নিজের ছায়া ছিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বলা বাহুল্য, তাঁহার ছায়া কোনোদিন তাঁহার সঙ্গে জিতিতে পারিত না--এবং হুহুংকারে তাহার উপরে বাড়ি মারিয়া যখন তিনি জয়গর্বে ঈষৎ হাস্য করিতেন তখন ম্লান হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে নীরবে পড়িয়া থাকিত। তাঁহার নাকী বেসুরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মতো শুনাইত-- তাহা প্রলাপে বিলাপে মিশ্রিত একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের গায়ক বিষ্ণু মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেন, "মুনশিজি, আপনি আমার রুটি মারিলেন।"--কোনো উত্তর না দিয়া তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া হাসিতেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, মুনশিকে খুশি করা শক্ত ছিল না। আমরা তাঁহাকে ধরিলেই, তিনি আমাদের ছুটির প্রয়োজন জানাইয়া ইস্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া দিতেন।

১ ডিক্রুজ সাহেব

২ দ্র 'মুন্‌শী', গল্পসল্প



বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এরূপ পত্র লইয়া অধিক বিচারবিতর্ক করিতেন না--- কারণ, তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল যে আমরা ইস্কুলে যাই বা না যাই, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ঘটিবে না।

এখন, আমার নিজের একটি স্কুল[১] আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানাপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকে -- কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র-অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে -- সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেননা সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে, বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ --সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।

জাত বাঁচাইবার জন্য বাঙালি ছাত্রদের একটি স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল। এই ঘরে দুই-একটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। তাহাদের সকলেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। তাহাদের মধ্যে একজন কাফি রাগিণীটা খুব ভালোবাসিত এবং তাহার চেয়ে ভালোবাসিত শ্বশুরবাড়ির কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে-- সেইজন্য সে ঐ রাগিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্য আলাপটারও বিরাম ছিল না।

আর-একটি ছাত্রসম্বন্ধে[২] কিছু বিস্তার করিয়া বলা চলিবে। তাহার বিশেষত্ব এই যে, ম্যাজিকের শখ তাহার অত্যন্ত বেশি। এমন-কি, ম্যাজিক সম্বন্ধে একখানি চটি বই বাহির করিয়া সে আপনাকে প্রোফেসর উপাধি দিয়া প্রচার করিয়াছিল। ছাপার বইয়ে নাম বাহির করিয়াছে, এমন ছাত্রকে ইতিপূর্বে আর-কখনো দেখি নাই। এজন্য অন্তত ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল। কারণ, ছাপা অক্ষরের খাড়া লাইনের মধ্যে কোনোরূপ মিথ্যা চালানো যায়, ইহা আমি মনেই করিতে পারিতাম না। এ-পর্যন্ত ছাপার অক্ষর আমাদের উপর গুরুমশায়গিরি করিয়া আসিয়াছে, এইজন্য তাহার প্রতি আমার বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। যে-কালি মোছে না, সেই কালিতে নিজের রচনা লেখা—এ কি কম কথা! কোথাও তার আড়াল নাই, কিছুই তার গোপন করিবার জো নাই—জগতের সম্মুখে সার বাঁধিয়া সিধা দাঁড়াইয়া তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইবে---পলায়নের রাস্তা একেবারেই বন্ধ, এতবড়ো অবিচলিত আত্মবিশ্বাসকে বিশ্বাস না করাই যে কঠিন। বেশ মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা অথবা আর-কোথাও হইতে একবার নিজের নামের দুই-একটা ছাপার অক্ষর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালি মাখাইয়া কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যখন ছাপ পড়িতে লাগিল, তখন সেটাকে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

সেই সহপাঠী গ্রন্থকার বন্ধুকে রোজ আমরা গাড়ি করিয়া ইস্কুলে লইয়া যাইতাম। এই উপলক্ষে সর্বদাই আমাদের বাড়িতে তাহার যাওয়া-আসা ঘটিতে লাগিল। নাটক-অভিনয় সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাহার সাহায্যে আমাদের কুস্তির আখড়ায় একবার আমরা গোটাকতক বাঁখারি পুঁতিয়া, তাহার উপর কাগজ মারিয়া, নানা রঙের চিত্র আঁকিয়া

---

২ শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মচর্যাশ্রম। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে স্থা[illegible]

১ দ্র 'ম্যাজিসিয়ান', গল্পসল্প (হ চ হ---হরিশচন্দ্র হালদার)



একটা স্টেজ খাড়া করিয়াছিলাম।[১] বোধ করি উপরের নিষেধে সে-স্টেজে অভিনয় ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু বিনা স্টেজেই একদা একটা প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ভ্রান্তিবিলাস। যিনি সেই প্রহসনের রচনাকর্তা পাঠকেরা তাঁহার পরিচয় পূর্বে কিছু কিছু পাইয়াছেন। তিনি আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। তাঁহার ইদানীন্তন শান্ত সৌম্য মূর্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না, বাল্যকালে কৌতুকচ্ছলে তিনি সকলপ্রকাব অঘটন ঘটাইবার কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।

যে-সময়ের কথা লিখিতেছিলাম ঘটনাটি তাহার পরবর্তী কালের। তখন আমার বয়স বোধ করি বারো-তেরো হইবে। আমাদের সেই বন্ধু সর্বদা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এমন সকল আশ্চর্য কথা বলিত, যাহা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম- পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার এত ঔৎসুক্য জন্মিত যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। কিন্তু দ্রব্যগুলি প্রায়ই এমন দুর্লভ ছিল যে, সিন্ধুবাদ নাবিকের অনুসরণ না করিলে তাহা পাইবার কোনো উপায় ছিল না। একবার, নিশ্চয়ই অসতর্কতাবশত, প্রোফেসর কোনো-একটি অসাধ্যসাধনের অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা বলিয়া ফেলাতে আমি সেটাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। মনসাসিজের আঠা একুশবার বীজের গায়ে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলেই যে সে-বীজ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া ফল ধরিতে পারে, এ কথা কে জানিত। কিন্তু যে- প্রোফেসর ছাপার বই বাহির করিয়াছে তাহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমরা আমাদের বাগানের মালীকে দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মনসাসিজের আঠা সংগ্রহ করিলাম এবং একটা আমের আঁটির উপর পরীক্ষা করিবার জন্য রবিবার ছুটির দিনে আমাদের নিভৃত রহস্যনিকেতনে তেতালার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি তো একমনে আঁটিতে আঠা লাগাইয়া কেবলই রৌদ্রে শুকাইতে লাগিলাম তাহাতে যে কিরূপ ফল ধরিয়াছিল, নিশ্চয়ই জানি, বয়স্ক পাঠকেরা সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু সত্য তেতালার কোন্-একটা কোণে এক ঘণ্টার মধ্যেই ডালপালা-সমেত একটা অদ্ভুত মায়াতরু যে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আমি তাহার কোনো খবরই জানিতাম না। তাহার ফলও বড়ো বিচিত্র হইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রোফেসর যে আমার সংস্রব সসংকোচে পরিহার করিয়া চলিতেছে, তাহা আমি অনেকদিন লক্ষ্যই করি নাই। গাড়িতে সে আমার পাশে আর বসে না, সর্বত্রই সে আমার নিকট হইতে কিছু যেন দূরে দূরে চলে।

একদিন হঠাৎ আমাদের পড়িবার ঘরে মধ্যাহ্নে সে প্রস্তাব করিল, "এসো, এই বেঞ্চের উপর হইতে লাফাইয়া দেখা যাক, কাহার কিরূপ লাফাইবার প্রণালী।" আমি ভাবিলাম, সৃষ্টির অনেক রহস্যই প্রোফেসরের বিদিত, বোধ করি লাফানো সম্বন্ধেও কোনো-একটা গূঢ়তত্ত্ব তাহার জানা আছে। সকলেই লাফাইল, আমিও লাফাইলাম। প্রোফেসর একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। অনেক অনুনয়েও তাহার কাছ হইতে ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর কোনো বাণী বাহির করা গেল না।

একদিন জাদুকর বলিল, "কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে

১ দ্র 'মুক্তকুন্তলা', গল্পসল্প



চায়, একবার তাহাদের বাড়ি যাইতে হইবে।" অভিভাবকেরা আপত্তির কারণ কিছুই দেখিলেন না, আমরাও সেখানে গেলাম।

কৌতূহলীর দলে ঘর ভরতি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল তাইতো, ভারি মিষ্ট গলা!

তাহার পরে যখন খাইতে গেলাম তখনো সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপূর্বে বাহিরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত অল্পই মিশিয়াছি, সুতরাং স্বভাবটা সলজ্জ ছিল। তাহা ছাড়া পূর্বেই জানাইয়াছি, আমাদের ঈশ্বর-চাকরের লোলুপদৃষ্টির সম্মুখে খাইতে খাইতে, অল্প খাওয়াই আমার চিরকালের মতো অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন আমার আহারে সংকোচ দেখিয়া দর্শকেরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত, তাহা হইলে বাংলাদেশে প্রাণিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত।

ইহার অনতিকাল পরে পঞ্চমাঙ্কে জাদুকরের নিকট হইতে দুই-একখানা অদ্ভুত পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ইহার পরে যবনিকাপতন।

সত্যর কাছে শোনা গেল, একদিন আমের আঁটির মধ্যে জাদু প্রয়োগ করিবার সময় সে প্রোফেসরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য আমার অভিভাবকেরা আমাকে বালকবেশে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছিলেন কিন্তু ওটা আমার ছদ্মবেশ। যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৌতূহলী তাঁহাদিগকে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত, লাফানোর পরীক্ষায় আমি বাঁ পা আগে বাড়াইয়াছিলাম সেই পদক্ষেপটা যে আমার কত বড়ো ভুল হইয়াছিল, তাহা সেদিন জানিতে পারি নাই।

পিতৃদেব

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা[১] প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন ; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন ; তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে-সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি---ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা---ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বউঠাকুরানীর[২] ঘরে একটা কাচাবরণে-ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রঙকরা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন-বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য সামগ্রীটি বউঠাকুরানীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া,

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

২ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী



প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবিকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা-কিছু বিদেশের, যাহা-কিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া য়িহুদি পোশাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা-পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেন্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান-কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন[১] পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুসীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে, তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।" মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির[২] শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তায় সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাসিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না —কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দফতরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েকদিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাসুলের সংগতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না—চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য, মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ-চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প-কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্‌ গম্‌ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্না ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা

১ ইং মে ১৮৬৮ - ডিসেম্বর ১৮৭০

২ দ্র ঘরোয়া, পৃ ২



পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে[২] লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু[৩] প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।[৪] মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ্ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম—তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুত, গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে-ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে-ভাবে দিন কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে ; তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। শাব দ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহাবা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, একথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই—কারণ, শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মতো প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষারদ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং

২ আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য (পরে, বেদান্তবাগীশ)
৩ বেচাবাম চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথেব বন্ধু
৪ বাংলা ২৫ মাঘ, ১২৭৯



বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর-ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার পক্ষে সে-পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে-বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা ; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না ; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'—এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো-একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ—

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর-কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিতমহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে-ময়ুরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে, এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্ত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনোই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প



নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়— সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না-বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটবাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহা চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

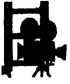
হিমালয়যাত্রা

পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল, ইস্কুল যাইব কী করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্, ব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব, নেড়ামাথার উপরে তাহারা আর-কোনো জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়।

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়ামাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, "মাথায় পরো।" পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন



করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিক-ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত। উনিশ-বিশ হইলে হয়তো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে, সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে-কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয়যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্বে পিতামাতার[১] সঙ্গে সত্য[২] সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের সেকালে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখাটা যে কোথায় তাহা ভালো করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রঙকরা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট—পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তার পর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল। এখনো হয়তো গাড়ি-ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল ; তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম।[৩] পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম।

১ সাবদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায (মৃত্যু ১৮৮৩) ও দেবেন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)

২ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায (১৮৫৯-১৯৩৩), ইনি ববীন্দ্রনাথেব প্রথম কাব্যসংগ্রহ 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩) প্রকাশ করেন।

৩ বাংলা ফাল্গুন, ১২৭৯



একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে, এই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরুদুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্রবৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন না যে, আজ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা শহরের ছেলে, কোনোকালে ধানের খেত দেখি নাই এবং রাখালবালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখালবালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধানখেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া, এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের খেত। রাখালবালক হয়তো-বা মাঠের কোথাও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!" আমি বলিতাম, "এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি। তিনি বলিতেন "সে হইলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সনে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া, মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না ; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সনে সম্বন্ধরক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই, সে কথা আজও বুঝিতে ঠেকে। আমার



সেদিনকার একান্তমনের প্রার্থনায় বিধাতা যদি বর দিতেন যে 'এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে', তাহা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

খোয়াইয়ের মধ্যে একজায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, "ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানেব ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।" তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন "তাই তো, সে তো বেশ হইবে" এবং আবিষ্কারকর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতে জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো-একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দুরবীনের উলটা দিকের দেশ। নদীপাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কারকর্তাটির তো কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম। ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইল সেইদিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন।[১] প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ[২] তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগবিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসংগতি অনুভব করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে, হিসাবে যেখানে কোনো দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেইখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাহার প্রকৃতিগত ছিল—তা হিসাবের অঙ্কই হোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই

১ ৫২ নং বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজেব সেক্রেটারি ছিলেন।

২ আদি ব্রাহ্ম সমাজের আয়ব্যয়ের বিবরণ।



হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছে হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার' পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়'[১] বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিযাছে তাহাব ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুব এলাহাবাদ, কানপুব প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমাব মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর-একজন আসিল—উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস্ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে।" পিতা কহিলেন, "না।" তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, "ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।" আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরেব মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল—টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

১ তু পবে-প্রকাশিত রুদ্রচণ্ড নাটিকা, ববীন্দ্র-বচনাবলী-অ ১



অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিবিবার সময মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন। বোধ করি তাহাকে যে-পুবস্কার দেওয়া হইযাছিল তাহাব চেযে কম দিলেও সে খুশি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার উমেদাবেব আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে, তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। বাড়িতে সুবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারি রাস্তায় আসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহিব হইতেন। এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরা-ঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে-পাখির কাছে শিকারী অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারও ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, বাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা-যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত। কিন্তু শিকার এমনি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের তানপুরার আওয়াজ নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজের কাজ করিত—তাহা আমাদিগকে দূরে ভাগাইয়া দিত, পাড়িয়া ফেলিতে পারিত না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতব দিয়া জ্যোৎস্নাব আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে আমি বেহাগে গান গাহিতেছি:

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে -

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় কবিয়া শুনিতেছেন - সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকটা শুনিযা পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে[২] সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার[৩] ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত

---

১ গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব -বচিত (মাঘ ১২৭৫)। দ্র ব্রহ্মসংগীত

২ বাংলা মাঘ ১২৯৩

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব (১৮৪৯-১৯২৫)



ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parly's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ[১] পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেষ্ট অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের[২] লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন ; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।[৩]

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে-বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের রোম।[৪] দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম, আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই— কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতে উপত্যকা-অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না— পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল

১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -প্রণীত

২ Richd. A. Proctor

৩ "রবীন্দ্র এখানে ভালো আছে এবং আমার নিকটে সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্মও পড়াইয়া থাকি।"—*দেবেন্দ্রনাথের পত্র, বক্রোটা, ২৫ এপ্রিল ১৮৭৩*

৪ *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbon* (1828 ed.)

নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া, শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া, ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। মন তখনো জানিতে পারে না যে এমন আরো অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিসাবি মন মনোযোগের খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। যখন প্রত্যেক জিনিসটাকেই একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে করে তখনই মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়। তাই আমি এক এক দিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া কল্পনা করি। তখনই বুঝিতে পারি, দেখিবার জিনিস ঢের আছে, কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না। এই কারণেই দেখিবার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য লোকে বিদেশে যায়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোটো ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি, সে কথা মনে করিবার হেতু ছিল না। পথখরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী চাটুর্জের[১] হাতে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কিন্তু আমার উপর বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন-কি, পথের যে-অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায়ে যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-

১ কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথের অনুচর



একদিন, জানি না কতরাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রি অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠদ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন। অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত।[১] তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু পূর্বেই জানাইযাছি কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উলটাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিযা দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম; পিতা তাহাতে কখনো উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে কাজ অনেক করিয়াছি—তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না—তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিমশাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

---

১ "ফিরিয়া আসিয়া পিতার কাছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী পড়িতাম" —পাণ্ডুলিপি



আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলিলাম, তিনি বলিলেন, "এ তো খুব ভালো কথা ; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।" এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

আর-একবার যখন[১] আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, "আদিব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।" তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, "বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।" যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে-জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই। যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারও চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছে হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর-কাহারও কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার[২] কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে, এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি 'কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন—সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই—তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর-কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালে বড়োমানুষির অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের শৌখিন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত—এই সব

১ প্রথম নিয়োগ, আশ্বিন ১২৯৬

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)



গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্যপরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রঙও ততই ঘোলা এবং ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল—এবং কৈফিয়ত দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়িমাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর, পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।[১]

প্রত্যাবর্তন

পূর্বে যে-শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে-লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।

ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর শুরু হইল। মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া আমি একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম—সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল—স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে শরীর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পথে যেখানে যত সাহেব-মেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ[২] ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।

ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো-বাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না—মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এইপ্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্যই ছটফট করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিসটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম। যে-জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেইখানেই সকল বন্ধনের অবসান দেখিতাম। মনে করিতাম, ওখানে ইস্কুল নাই, মাস্টার নাই, জোর করিয়া কেউ কাহাকেও কিছুতে প্রবৃত্ত করায় না—ওখানকার নিভৃত অবকাশ অত্যন্ত রহস্যময়—ওখানে কারও কাছে সমস্তদিনের সময়ের

১ "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি"—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের পত্র, বক্রোটা, ১৪ আষাঢ় ১৭৯৫ শক [১৮৭৩]

২ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী (১৮৫৯-৮৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী



হিসাবনিকাশ করিতে হয় না, খেলাধুলা সমস্ত আপন ইচ্ছামত। বিশেষত দেখিতাম, ছোড়দিদি[১] আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বিধান, না করিলেও সেইরূপ। দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুল যাইবার জন্য ভালোমানুষের মতো প্রস্তুত হইতাম--তিনি বেণী দোলাইয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতর দিকে চলিয়া যাইতেন দেখিয়া মনটা বিকল হইত। তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ[২] আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, "এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও।"—তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দু'ই মনে বড়ো বাজিত। তার পরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে সাশির পাল্লার মধ্য দিয়া সাজানো দেখিতে পাইতাম কাঁচের এবং চীনামাটির কত দুর্লভ সামগ্রী—তাহার কত রঙ এবং কত সজ্জা। আমরা কোনোদিন তাহা স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিলাম না—কখনো তাহা চাহিতেও সাহস করিতাম না। কিন্তু এইসকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিসগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরো কেমন রঙিন করিয়া তুলিত।

এমনি করিয়া তো দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরে প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি—খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে—সেই বারান্দা পার হইয়া গোটাচার পাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি—বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—বারন্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার—সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তার পরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শংকরী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত—সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্‌ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম—তার পরে অর্ধরাত্রে কোনো কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতি বৃদ্ধ স্বরূপসর্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর-এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা

---

১ বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৮-১৯৪৮)

২ কাদম্বরী দেবী, বিবাহ ১৩ জুলাই ১৮৬৮



প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত, তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরিয়া কিছুদিন ঘরে ঘরে কেবলই ভ্রমণের গল্প বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বার বার বলিতে বলিতে কল্পনার সংঘর্ষে ক্রমেই তাহা এত অত্যন্ত ঢিলা হইতে লাগিল যে, মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার খাপ খাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। হায়, সকল জিনিসের মতোই গল্পও পুরাতন হয়, ম্লান হইয়া যায়, যে গল্প বলে তাহার গৌরবের পুঁজি ক্রমেই ক্ষীণ হইযা আসিতে থাকে। এমনি করিয়া পুরাতন গল্পের উজ্জ্বলতা যতই কমিয়া আসে ততই তাহাতে এক এক পোঁচ করিয়া নূতন রঙ লাগাইতে হয়।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধানবক্তার পদ লাভ করিয়াছিলাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন এবং যশ লাভ করাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।

নর্মাল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো-একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দলক্ষগুণে বড়ো সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল, যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড়ো নয়। আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণে কাব্যালংকার অংশে যে-সকল কবিতা উদাহৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিস্মিত করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।—

ওরে আমার মাছি!
আহা কী নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর,
কিন্তু কেন বাহির কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি!

সম্প্রতি প্রক্টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহতারা সম্বন্ধে অল্প যে-একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণ বায়ুবীজিত সান্ধ্যসমিতির মধ্যে বিবৃত করিতে লাগিলাম।

আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্জে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, "আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।" শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরের গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল-আঁখি', 'রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে'—এই গানগুলিতে[১] আমাদের আসার যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।

পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্‌দৃত অংশ,[২] তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হইয়া

১ রচয়িতা দাশরথি রায়
২ "ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ হইতে কৈকেয়ীদশরথসংবাদ"—পাণ্ডুলিপি



আসিয়াছে। কিন্তু যে-মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে 'ভুলিয়া গেছি' বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে মার্জনা করিয়াছেন, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন না।

মা মনে করিলেন, আমারদ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর-সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।" তখন মনে-মনে সমূহ বিপদ গনিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন, "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন্-না।" পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ-যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধ হয় কোনো-একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন—বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়ে আরো অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে শুরু করিলাম। সেন্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল,[১] সেখানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি[২] কহিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারি দিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।

সেন্টজেবিয়ার্সের একটি পবিত্রস্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকদের স্মৃতি। আমাদের সকল অধ্যাপক সমান ছিলেন না, বিশেষভাবে যে দুই-একজন আমার ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির গম্ভীর নম্রতা আমি উপলব্ধি করি নাই। বরঞ্চ সাধারণত শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষাদানের কল হইয়া উঠিয়া বালকদিগকে হৃদয়ের দিকে পীড়িত করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার চেয়ে বেশি উপরে উঠিতে পারেন নাই। একে তো শিক্ষার কল একটা মস্ত কল, তাহার উপরে মানুষের হৃদয়প্রকৃতিকে শুষ্ক করিয়া পিষিয়া ফেলিবার পক্ষে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের মতো এমন জাঁতা জগতে আর নাই। যাহারা ধর্মসাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকা পড়িয়াছে তাহারা যদি আবার শিক্ষকতার কলের চাকায় প্রত্যহ পাক খাইতে থাকে, তবে উপাদেয় জিনিস তৈরি হয় না—আমার শিক্ষকদের মধ্যে সেইপ্রকার দুইকলে-ছাঁটা নমুনা বোধ করি ছিল। কিন্তু তবু সেন্টজেবিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে

১ ইং ১৮৭৪ (?), বিদ্যালয়ত্যাগ ১৮৭৬ (?)
২ সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)



বিরাজ করিতেছে, এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডি পেনেরান্ডার[১] সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না— বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না কিন্তু আমার কাছে তাঁহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন--অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল -আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা-তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই।" -বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম--- আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

সে-সময় আর-একজন প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাকে ছাত্রেরা বিশেষ ভালোবাসিত। তাঁহার নাম ফাদার হেন্‌রি। তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন, তাঁহাকে আমি ভালো করিয়া জানিতাম না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে আছে, সেটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা জানিতেন। তিনি নীরদ নামক তাঁহার ক্লাসের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কী।" নিজের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল - কোনোদিন নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া সে কিছুমাত্র উদ্‌বেগ অনুভব করে নাই- সুতরাং এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অভিধানে এত বড়ো বড়ো অপরিচিত কথা থাকিতে নিজের নামটা সম্বন্ধে ঠকিয়া যাওয়া যেন নিজের গাড়ির তলে চাপা পড়ার মতো দুর্ঘটনা—নীরু তাই অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "নী ছিল রোদ, নীরদ-- অর্থাৎ, যা উঠিলে রৌদ্র থাকে না তাহাই নীরদ।"

ঘরের পড়া

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব[২] পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা[৩] না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার

১ De Penaranda

২ দ্র রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ, 'কুমারসম্ভব—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ , অপিচ 'রূপান্তর', ১৩৭২

৩ দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭। পুনর্মুদ্রিত, ব-পরিচয়



অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে।

রামসর্বস্ব[১] পণ্ডিতমশায়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর[২] মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[৩] বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল—তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই—অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল, বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।

আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলাবই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।[৪] তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এই রূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম--যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল[৫] তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো-একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরো বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, "এ বই আমি পড়িবই।"

মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন—আঁচলে-বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাসখেলায় আমার কোনোদিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু সেদিন আমার ব্যবহারে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কোনো-এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

---

১ রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, হেড্‌পণ্ডিত, মেট্রোপলিটান ইন্‌সিটিটিউশন্‌

২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)

৩ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-৮৬)

৪ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫৫০ (সুলভ সংস্করণ ৫, পৃ ৮০৭)

৫ ইং ১৮৭২ মার্চ



কিন্তু এ কার্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল—ধরা পড়িয়া গেলাম। যাঁহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। পিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল ; চাবি-সমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমত সেটা তখনই তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না ; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ[১] বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। এক দিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব অন্য দিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণ কাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্ ম্যাগাজিন, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে. এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর-একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু[২]। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ[৩] পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীর কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথার রঙিন রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জনদ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল!

---

১ "বিবিধার্থ সংগ্রহ, অর্থাৎ পুবাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা, শিল্পসাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিকপত্র", প্রকাশ কার্তিক ১৭৭৩ শক [১৮৫১]

২ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ -কর্তৃক প্রকাশিত মাসিকপত্র ; প্রকাশ এপ্রিল ২৮৬৩, পুনঃপ্রকাশ ফাল্গুন ১২৭৩

৩ 'পৌল ভর্জ্জীনী', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য -কর্তৃক "পল বর্জ্জিনিয়া গ্রন্থের ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ," প্রকাশকাল ১২৭৫-৭৬



অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন[১] আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশেরদ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ[২] সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা[৩] ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।[৪]

বাড়ির আবহাওয়া

ছেলেবেলায় আমার একটা সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনেপড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম না, কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না, তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদূরের আলো। আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা[৫] তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক[৬] লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্বশী[৭] নাটকের একটি অনুবাদ অনেকদিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এখনো ধর্মসংগীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গাও হে তাঁহার নাম
রচিত যাঁর বিশ্বধাম,

---

১ প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭২ (বৈশাখ ১২৭৯)

২ প্রকাশ ১৮৭৩-৭৪

৩ "আমার পূজনীয় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এই সংগ্রহের অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি আসিত। তাঁহাদের পড়া হইতেই আমি এগুলি জড় করিয়া আনিতাম।"--পাণ্ডুলিপি

৪ তু 'প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহ', ভারতী, শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৮৮, বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট, ভারতী, কার্তিক ১২৮৮

৫ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯), দেবেন্দ্রনাথের অনুজ গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র

৬ রচনা মে ১৮৬৬, প্রথম অভিনয় ৫ জানুয়ারি, ১৮৬৭

৭ প্রকাশ ১২৭৫ [১৮৬৮]



দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
ঝরে অবিরত ধারে—

বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্যগম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার জো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারি দিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়া চুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।

আমাদের দেশে এক-একজন এইরকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সর্বজনীন কর্মে সর্বদাই বড়ো বড়ো দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইঁহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ একপ্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই প্রতিভা কেবল এক-একটি বড়ো বড়ো পরিবারের মধ্যে অখ্যাত ভাবে আপনার কাজ করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার মনে হয়, এমন করিয়া শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে—এ যেন জ্যোতিষ্কলোক হইতে নক্ষত্রকে পাড়িয়া তাহার দ্বারা দেশলাইকাঠির কাজ উদ্ধার করিয়া লওয়া।

ইহার কনিষ্ঠ ভাই গুণদাদাকে বেশ মনে পড়ে। তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়বন্ধু আশ্রিত-অনুগত অতিথি-অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ঔদার্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায়, তিনি মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্যকৌতুক আমোদ-উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত। শৈশবের অনধিকারবশত তাঁহাদের সে-সমস্ত উদ্‌যোগের মধ্যে আমরা সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পাইতাম না--কিন্তু উৎসাহের ঢেউ চারি দিক হইতে আসিয়া আমাদের ঔৎসুক্যের উপরে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী-একটা কিম্ভুত কৌতুকনাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন-- প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনো মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের, ঝোঁকে--
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে--
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে!--

১ দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরোয়া



এতবড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই---কিন্তু এক সময়ে জানিতে পাইব, এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।[১]

একটা নিতান্ত সামান্য ঘটনায় আমার প্রতি গুণদাদার স্নেহকে আমি কিরূপ বিশেষভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলাম সে কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দোমালা[৩] বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, "গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।" তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রাইজ পাও নাই?" আমি কহিলাম, "না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যের প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সে কথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না --হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম--কিন্তু সেটা ভালো হইল না। আমার তো মনে হয়, ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে। ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণদাদা এ-বাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন। কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল--কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড়োবেশি বিচ্ছেদ ছিল না। গুণদাদা কাছারিঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন। সেই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। তিনি প্রায় আমাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলিতেন। ক্লাইভ ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিয়া গলায় ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার কাছে শুনিয়া আমার ভারি আশ্চর্য লাগিয়াছিল। এক দিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস তো গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর-এক দিকে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে এ কী বেদনার রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল। বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত নিষ্ফলতা কেমন করিয়া থাকে। আমি সেদিন অনেক ভাবিয়াছিলাম।--এক-একদিন গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য, তিনি খুব কঠোর সমালোচক ছিলেন না; এমন-কি, তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে, এক-একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষির মাত্রা এত অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতা সম্বন্ধে কী-একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো-একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল 'নিকটে', ঐ শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না অথচ কোনোমতেই তাহার সংগত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে 'শকটে' শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল

১ মার্চ ১৮৭২

২ বস্তুত এই অদ্ভুতনাট্যটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। দ্র. জ্যোতিস্মৃতি পৃ ..

৩ মধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত। প্রকাশ ৩১ বৈশাখ ১২৭৫। ১৮৬৮



না—কিন্তু মিলের দাবি কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না ; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ পর্যন্ত তাহার আর-কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্‌ক্‌ লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ[১] লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্তবাতাসের মতো কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলই মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল, এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারি দিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি—

সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে তবু সেই-সব বারান্দা, সেই-সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব-আয়োজন ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই দশজনের জন্য ছিল—এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়োমানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। আমরা আজকাল যাহাদের নকল করিয়া ঘর তৈরি করি ও ঘর সাজাই, নিজের প্রণালীমত তাহাদেরও সমাজ আছে এবং তাহাদের

১ দ্র প্রথম সর্গ, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮০। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৭৯৭ শক [১৮৭৫ খৃ]



সমাজ আছে এবং তাহাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত। আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য, দেশহিতের জন্য, দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি— কিন্তু কিছুর জন্য নহে, সুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা, মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ সৃষ্টি করা, এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এতবড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী[১] মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে-সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা-কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই-সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সে দিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার[২] বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।

সাহিত্যে যেমন তাঁহার ঔদার্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ডাঙায়তোলা মাছের মতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছবিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর

---

১ "হাওড়া জিলার আন্দুলে ইঁহার নিবাস। এম এ, বি এল পাস করিয়া হাইকোর্টের এটর্নী হন।" —ব-কথা, পৃ ১৯৬। দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৫৩-৫৬

২. বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১



বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

গীতচর্চা

সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম--তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

তিনি আমাকে খুব-একটা বড়োরকমেব স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; তাঁহার সংস্রবে আমাব ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে-সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবলপক্ষেরা সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা কবিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়েরদ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে-শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত, আমি এ কথা জোর কবিয়া বলিতে পারি--স্বাধীনতারদ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাতনিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনেরদ্বারা, পীড়নেরদ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র-দেওয়ারদ্বাবা, আমাকে যাহা-কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধিব ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমাব এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে-শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় কবি না ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ভবাই ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পুনিটিভ পুলিসেব পায়ে আমি গড় কবি ইহাতে যে-দাসত্বেব সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর-কিছুই নাই।

এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুব তৈরি কবায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহাব সেই সদ্যোজাত সুবগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।[১] তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস

১ "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।"—পাণ্ডুলিপি



না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

সাহিত্যের সঙ্গী

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমারসম্ভব, কিছু আর দুই-একটা জিনিস এলোমেলোভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন ব্রজবাবু।[১] তিনি আমাকে প্রথমদিন গোল্ড্স্মিথের ভিকর অফ ওয়েকফীল্ড্ হইতে তর্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরো অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনোকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে-লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্‌বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা-কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ, উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত, আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই, এইরকমের কিছু-একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারি দিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর[২] সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শন[৩] পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরানী এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই

১ ব্রজনাথ দে, "মেট্রোপলিটান্ ইনস্‌টিটিউসনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।" দ্র বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪৬২

২. বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ ৯৪)। দ্র 'বিহারীলাল', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ (সুলভ সং ৫)

৩ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশ, ১২৮১



তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে-হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন[১] দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনই প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারি দিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত, তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভৃত ছোটো ঘরটিতে পঙ্খের কাজ করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্ গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন, এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি—আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সংকোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে-সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে',[২] 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে'[৩]। তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।

কালিদাস ও বাল্মীকির কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

মনে আছে, একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ-স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে—হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ-স্বরের দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইবার জন্যই 'দেবতাত্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নগাধিরাজ' পর্যন্ত কবি এতগুলি আকারের সমাবেশ করিয়াছেন।

বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি—কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারীকবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে, 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' আমি 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্'। আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন—তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই-একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট। আমারও মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে আমার গলায় যথোচিত মিষ্টতা নাই। কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ট দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু আত্মসম্মানলাভের পক্ষে আমার এই একটিমাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল, কাজেই কাহারও কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না—তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

১ দ্র বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্য, প্রকাশ ১২৯৫

২ প্রকাশ, ভারতী, আশ্বিন, ১২৮৭, পৃ ২৯৮। দ্র কবিতা ও সঙ্গীত, পঞ্চম গীত

৩ প্রকাশ, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯, পৃ ১৬৫। দ্র মায়াদেবী, কাব্যগ্রন্থের শেষ গান



রচনাপ্রকাশ

এ-পর্যন্ত যাহা-কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর[১] নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ[২] নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোনদিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথম যে-গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা[৩] নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী[৪] কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু[৫] এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী', কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।[৬]

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন, "একজন বি. এ. তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন।" বি. এ. শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। বি. এ! শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিসম্যানকে ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে-দশা আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম

১ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিকপত্র, প্রকাশক যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১২৮২। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে রাজসাহী হইতে শ্রীকৃষ্ণ দাস-এর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১২৭৯।

২. 'বনফুল' 'প্রলাপ' (১২৮২-৮৩)

৩ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২) -প্রণীত। দ্র উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৮৬

৪ প্রকাশ, কার্তিক ১২৮০

৫ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। গেজেটের সম্পাদক ১২৬৮

৬ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'—জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, কার্তিক ১২৮৩
"হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর দুঃখসঙ্গিনী ও রাজকৃষ্ণ রায়ের অবসরসরোজিনী"—পাণ্ডুলিপি



খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কীর্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। 'কুক্ষণে জনম তোর, রে সমালোচনা!' উদ্‌বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি. এ সমালোচক বাল্যকালের পুলিসম্যান্‌টির মতোই দেখা দিলেন না।

ভানুসিংহের কবিতা

পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়-কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের[১] বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না— বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল।[২] চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা[৩] লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম— তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

---

১ Thomas Chatterton (1752-70)

২ দ্র 'চ্যাটার্টন— বালককবি', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬

৩ Rowley poems, Thomas Rowley, an imaginary 15th-cent. Bristol poet and monk



তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল[১] ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন।[২] তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই[৩] লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহাব কিছু-না-কিছু ভিন্নতা ঘটিযাছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহেব কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুব নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।[৪]

স্বাদেশিকতা

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদেব পবিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার কবিয়া বাখিযাছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদাবা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদেব বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা[৫] বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কমকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান'[৬] রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

---

১ বাংলা ১২৮৪-৮৮

২ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০)
দ্র 'রুসিযা প্রবাসীব পত্র', 'য়ুবোপ-প্রবাসীব পত্র', ভারতী, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ১২৮৭

৩ The Yatras, or, the popular Dramas of Bengal (Trubner & Co, London, 1882)
বস্তুত ইহাতে ভানুসিংহ ঠাকুবেব উল্লেখ নাই। দ্র জীবনীকোষ, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কাব

৪ দ্র ববীন্দ্রনাথেব বেনামী বচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুবেব জীবনী'—নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯২,
দ্র ভানুসিংহ ঠাকুবেব পদাবলী, পাঠান্তব-সংবলিত সংস্কবণ, ১৩৭৬

৫. বাংলা ১২৭৩ চৈত্রসংক্রান্তিতে 'চৈত্রমেলা' নামে প্রথম অনুষ্ঠিত
সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সহকাবী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র

৬ দ্র জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'পুরু-বিক্রম' নাটক [১৮৭৪], প্রথম অঙ্ক



লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ[১] লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে[২]। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্টি রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্‌স্‌ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন[৩] মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা[৪] হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু[৫] ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত।[৬] সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্‌-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান করিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিতে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে-বীরত্বের প্রহসনমাত্র

---

১ দ্র 'অত্যুক্তি', ববীন্দ্র-বচনাবলী ৪

২ ইং ১৮৭৭ সালে লিখিত। দ্র জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব 'স্বপ্নময়ী' নাটক, বা ব-পরিচয়, পৃ ৬৬
তু হিন্দুমেলায় প্রথম কবিতাপাঠ 'হিন্দুমেলায উপহাব', ১৮৭৫, র-পবিচয়, পৃ ৬০

৩ কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

৪ সঞ্জীবনী সভা, সাংকেতিক নাম— হা ম্‌ চূ পা মু হা ফ (? ১৮৭৬), দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৬৭-৭০

৫ রাজনাবায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)

৬ "ঠন্‌ঠনের একটা পোড়োবাড়িতে এই সভা বসিত"— জ্যোতিস্মৃতি



অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলাব টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অ ৩্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকেব নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের ম !লের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল--আমরা হত-আহত পশুপক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান[১] জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত

১ "আজি উন্মদ পবনে' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান"--ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১৩ সংখ্যক। দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৭০



তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল ; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের[১] তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু

১. Capt D L Richardson (Hindu College, 1835-43)



তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতী

মোটরে উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিয়াই, না ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নহে কিন্তু বোধ করি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই সেটা উলটাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হইত। আমাদের ইস্কুলঘরের ক্ষীণ আলোতে নির্জন ঘরে বই পড়িতাম ; দূরে গির্জার ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিত—প্রহরগুলা যেন একে একে নিলাম হইয়া যাইতেছে; চিৎপুর রোডে নিমতলাঘাটের যাত্রীদের কণ্ঠ হইতে ক্ষণে ক্ষণে 'হরিবোল' ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে, তেতালার ছাদে সারিসারি টবের বড়ো বড়ো গাছগুলির ছায়াপাতেরদ্বারা বিচিত্র চাঁদের আলোতে, একলা প্রেতের মতো বিনা কারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

কেহ যদি মনে করেন, এ-সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছ্বাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য হইয়া যায় কিন্তু প্রথম বয়সে যখন তার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সদাসর্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণবয়সের আরম্ভে এও সেইরকমের একটা কাণ্ড। যে-সব উপকরণে জীবন গড়া হয়, যতক্ষণ গড়াটা বেশ পাকা না হয়, ততক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে।

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী[১] পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা[২] লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া

১. প্রকাশ, শ্রাবণ ১২৮৪ [১৮৭৭]
২. দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য', ভারতী, শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, ১২৮৪
তু 'মেঘনাদবধ কাব্য', ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯



নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম।[১] যে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সে লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে-কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে---লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে--যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে--তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠ করিবার সময় যখন সংকোচ অনুভব করি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড়ো বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসত্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া গেছে। বড়ো কথাকে খুব বড়ো গলায় বলিতে গিয়া নিঃসন্দেহই অনেক সময়ে তাহার শান্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়াছি। নিশ্চয়ই অনেক সময়ে বলিবার বিষয়টাকে ছাপাইয়া নিজের কণ্ঠটাই সমুচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই ফাঁকিটা কালের নিকটে একদিন ধরা পড়িবেই।

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।[২] আমি যখন মেজদাদাব নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু[৩] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তখন আমাব মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে--বই কিনিবার মালিক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ্‌ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিযা অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

যে-বয়সে ভারতীতে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম সে-বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক—বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই। কিন্তু তাহার একটা সুবিধা আছে ; ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার প্রবল মোহ অল্পবয়সের উপর দিয়াই কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে পড়িল, কে কী বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা— লেখার কোন্‌খানটাতে দুটো ছাপার ভুল হইয়াছে, ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা—এই সমস্ত লেখাপ্রকাশের ব্যাধিগুলা বাল্যবয়সে সারিয়া দিযা অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্তে লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছাপা লেখাটাকে সকলের কাছে নাচাইয়া বেড়াইবার মুগ্ধ অবস্থা হইতে যতশীঘ্র নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের

১ দ্র ভারতী, পৌষ-চৈত্র, ১২৮৪

২ প্রকাশ "সংবৎ ১৯৩৫" [১৮৭৮], দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী অ ১

৩ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কবিকাহিনীর প্রকাশক



অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে। লিখিতে লিখিতে ক্রমশ নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্‌ভাবিত করিয়া লইতে হয়। এইজন্য দীর্ঘকাল বহুতর আবর্জনাকে জন্ম দেওয়া অনিবার্য। কাঁচা বয়সে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীর্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গিমার আতিশয্য এবং প্রতি পদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেইসঙ্গে সত্যকে সৌন্দর্যকে বহুদূরে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা, কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

যাহাই হউক, ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে-একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবাব, উল্লাস করিবার সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

আমেদাবাদ

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর-একটি অযাচিত বদান্যতায়[১] আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ ছিলেন। আমার বউঠাকরুন[২] এবং ছেলেরা[৩] তখন ইংলন্ডে -সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড়ো ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক-ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে- -কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল। লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল,

১. তু 'হিমালয়যাত্রা' পৃ ৩০৯
২. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১), সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী, বিবাহ ১৮৫৯
৩. সুরেন্দ্রনাথ (১৮৭২-১৯৪০), ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) ও কবীন্দ্র (১৮৭৫-৭৯)



সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এই শাহিবাগ-প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোলতার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাত্রে আমি সেই নির্জন ঘরে শুইতাম—এক-একদিন অন্ধকারে দুই-একটা বোলতা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত—যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীক্ষ্ণভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।[১] তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি[২] এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্‌শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা-কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ-একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভালো মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।

বিলাত

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম।[৩] অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র[৪] প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতশবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎশক্তি এবং বিনয়েরদ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায় কাঁচাবয়সে এ কথা মন বুঝিতে চায় না। ভালোলাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভব—সে যেন দুর্বলতা—এইজন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবারে এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।

ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ সতেরোবছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজোবউঠাকরুন তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে[৫] বাস করিতেছিলেন—তাঁহার আশ্রয়ে গিয়ে বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।

---

১ সর্বপ্রথম গান 'নীবব বজনী দেখো মগ্ন জোছনায'—ভগ্নহৃদয়, রবীন্দ্র-বচনাবলী অ ১। দ্র গীতবিতান

২ দ্র পূর্বপাঠ, ভাবতী, অগ্রহাযণ ১২৮৭, ববীন্দ্র-বচনাবলী অ ১

৩ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮, 'পুনা' স্টিমাবে যাত্রা। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীব পত্র, প্রথম—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

৪ দ্র 'য়ুবোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয যুবকেব পত্র', ভাবতী, বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন, ১২৮৬ বৈশাখ-শ্রাবণ ১২৮৭। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীব পত্র, ববীন্দ্র-বচনাবলী ১

৫ Brighton, Sussex। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীব পত্র, ষষ্ঠ



তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, বরফ পড়িতেছে।[১] বাহিরে গিয়া দেখিলাম, কনকনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না এবং পৃথিবী সাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে-মূর্তি দেখিয়াছি এ সে-মূর্তিই নয়—এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর-কিছু—সমস্ত কাছের জিনিস যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে, শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য বিরাট সৌন্দর্য আর-কখনো দেখি নাই।

বউঠাকুরানীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল। ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকলরকম খেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারিতাম না। Warm শব্দে a-র উচ্চারণ o-র মতো এবং worm শব্দে o-র উচ্চারণ a-র মতো—এটা যে কোনোমতেই সহজজ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে, সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কী করিয়া। মন্দভাগ্য আমি, তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরেজি উচ্চারণবিধির। এই দুটি ছোটো ছেলের[২] মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্‌ভাবন করিতাম। ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্‌ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার পরে আরো অনেকবার ঘটিয়াছে—এখনো সে-প্রয়োজন যায় নাই। কিন্তু সে-শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য তো আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভরতি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার।" (What a splendid head you have !) এই ছোটো কথাটা যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি, এটাকে পাঠকেরা আমার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে, আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তার নানাপ্রকার কার্পণ্যে দুঃখ অনুভব করিয়া নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো-একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি, হয়তো উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ, ইহাই আমার বিশ্বাস।

---

১ দ্র 'বরফ পড়া' বালক, আশ্বিন ১২৯২

২ সুরেন্দ্র ও ইন্দিরা



এ-ইস্কুলেও আমার বেশিদিন পড়া চলিল না—সেটা ইস্কুলের দোষ নয়। তখন তারক পালিত মহাশয়[১] ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এমন করিয়া আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিয়া আমাকে আনিয়া প্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দিলেন। সে-বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই—বরফে-ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর-কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি; আকাশের রঙ্ ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন; দশ দিক আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না। দৈবক্রমে কী কারণে একটা হারমোনিয়ম ছিল। দিন যখন সকাল-সকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা আপনমনে বাজাইতাম। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত, কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। এক-একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য-অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলই তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। এক-একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত—ভালো কোনো একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহ সঞ্চার করিতাম, আবার এক একদিন তিনি বড়ো বিমর্ষ হইয়া আসিতেন।—যেন যে-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখদুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত, অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম, ইঁহারদ্বারা

১ স্যব তাবকনাথ পালিত (? ১৮৪১-১৯১৪);



আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না তবুও কোনোমতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে-কয়দিন সে-বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন, "আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না।" আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই, তবু তাঁহার সে-কথা আমি এ-পর্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে পালিতমহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসায় লইয়া গেলেন।[১] ইনি বাড়িতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইঁহার ঘরে ইঁহার ভালোমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিস কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে তাহা বুঝিতে পারি, কারণ ছাত্রবেচারাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটে না- -কিন্তু এমন মানুষেরও স্ত্রী মেলে কেমন করিয়া সে-কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কার-জায়ার সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর —কিন্তু স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। সুতরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিযা মিসেস বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময়ে বউঠাকুরানী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর[২] হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে, তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না, এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই একদিন খাতা-হাতে ছাতামাথায় নীল সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্তব্য পালন করিতে গেলাম। জায়গাটি সুন্দর বাছিয়াছিলাম কারণ, সেটা তো ছন্দও নহে, ভাবও নহে। একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে—সম্মুখের ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে—পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া ভগ্নতরী[৩] নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্বাসিত তবু সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কর্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। আবার তাগিদ আসিল—আবার লন্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল।[৪] একদিন

১. দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, সপ্তম

২ Torquay, Devonshire। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, নবম

৩. দ্র 'ভগ্নতরী', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬, শৈশব সঙ্গীত, রবীন্দ্র রচনাবলী-অ ১

৪. দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, দশম



সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্ককেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড়ো মেয়েটি আছেন। ছোটো দুইজন মেয়ে, ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, আমারদ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকর-বাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়—এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো কাজটিও মিসেস স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্বেই আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতাজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কী ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয়, সে কথা মুহূর্তেব জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্তব্য তো আছেই। গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন, অবকাশের কালে আমোদপ্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্তব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল-চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল, আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস স্কটের এটা যে খুব ভালো লাগিত তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক-একবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, "আমার মনে হয়, এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না।" কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষি কাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে গেলাম, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "না না, ও-টুপি চালাইতে পারিবে না।" তাঁহার স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্তের জন্য শয়তানের সংস্রব ঘটে, ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই-সমস্তের মধ্যে একটি জিনিস দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনি পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদপ্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।



কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুশি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে।"---লন্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তারপরিবারের কেহ-বা পরলোকে কেহ-বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্[১] শহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে ; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন।"---বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়তো আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি স্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকা গাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি-জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্ধক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো-কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, "আপনি বোধ করি পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।"

যতদিন ইংলন্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই, তাহা বলিতে পারি না কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড়ো করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুশি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি---তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কবিতাটি বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন, "এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও।" আমি নিতান্ত ভালোমানুষি করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল, তাহা আমি ছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা

---

১. Tunbridge Wells, Kent---দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, অষ্টম



শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। আমি মনে করিলাম, এইখানেই পালা শেষ হইল--কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন, ভারতবর্ষীয় সংগীতের একটা বুঝি আশ্চর্য নমুনা শুনিতে পাইবেন--তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপানো কাগজখানি বাহির হইত--আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম-- স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম, এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর-কাহারও পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম, "Thank you very much How interesting !" তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড়ো একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে, তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লন্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোকগাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এ দিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম, এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে স্টেশনে গেলাম। সেদিন বড়ো দুর্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই স্টেশনেই এ-লাইনের শেষ গম্যস্থান---তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম, স্টেশনগুলি সব ডান দিকে আসিতেছে। তাই ডান দিকের জানালা ঘেঁষিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকাল-সকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে--বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লন্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য স্টেশনের পূর্ব স্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্ল্যাটফর্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানা হইতে বঞ্চিত--রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল। মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম যে স্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল, তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। স্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক স্টেশন কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, সেইখান হইতেই তো এ গাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে। সে কহিল, লন্ডনে। বুঝিলাম এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন



পাওয়া যাইবে। সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া স্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics[১], সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন, এইজাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে —আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত স্ফূর্তির সঞ্চার হইল যে তাহার পর হইতে Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে-নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, "এ কী রবি, ব্যাপারখানা কী!" আমি আমার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব-যে সগর্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না —বিশেষত রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "এসো রবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।"

আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানাঘরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, "এবার তবে নৃত্য শুরু করা যাক।" আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং শরীরমনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত, তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবি, আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়।" এ-প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।" সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না —সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল —হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু খাইতে পাইব কি। তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে, খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে

১. The Data of Ethics by Herbert Spencer (June, 1879)



স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্‌ করিতেছে ; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকালবেলায় ইঙ্গভারতীয় বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, "যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত ; তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।" সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধ দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ঐ ঘরে তিনি আছেন।" আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগরাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই-তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, "দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।"

লোকেন পালিত

বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি-সাহিত্য-ক্লাসে[১] তখন সেখানে লোকেন পালিত[২] ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে বছর-চারেকের ছোটো। যে বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতেছি সে বয়সে চার বছরের তারতম্য চোখে পড়িবার মতো নহে ; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ, বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে ; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপিচুপি সারিলে কাহারও আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না—কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভর্ৎসনাকটাক্ষ আমাদের সরব হাস্যালাপের উপর নিষ্ফলে বর্ষিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আজ আমার মনে অনুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাতপীড়া সম্বন্ধে আমার চিত্তে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনোদিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিধাতার প্রসাদে বিদ্যালয়ের পড়ার বিঘ্নে আমাকে একটু কষ্ট দেয় নাই।

১ ইংবেজি সাহিত্য পডাচ্ছেন হেন্‌বি মব্‌লি। আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র।"—ছেলেবেলা, অধ্যায় ১৪

২. লোকেন্দ্রনাথ পালিত (জন্ম ? ১৮৬৫), তারক পালিতের পুত্র



এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে-আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল।[১] তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে—পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না ; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে-সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে হাস্যোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত যে-আলোচনা শুরু হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণযৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক[২] হইয়া অবিশ্রামগতিতে যখন গদ্যপদ্যর জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই।[৩] তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সংগীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে শুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে-সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। সরস্বতীর পদ্মবনে বন্ধুত্বের পদ্মটির 'পরেই দেবীর বিলাস বুঝি সকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেণুর পরিচয় বড়ো বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের সুগন্ধি মধু সম্বন্ধে নালিশ করিবার কারণ আমার ঘটে নাই।

ভগ্নহৃদয়

বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া[৪] ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল[৫], তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার

১ দ্র উত্তরকালীন প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ', শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ (সুলভ সং ৬)

২ সাধনা—অগ্রহায়ণ ১২৯৮-কার্তিক ১৩০২

"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।"—পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, আত্মপরিচয় . রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭

৩ দ্র 'পত্রালাপ'—সাধনা (ফাল্গুন ১২৯৮ ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৯) রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮ (সুলভ সং ৪)

৪ দেশে প্রত্যাবর্তন? ফেব্রুয়ারি ১৮৮০

৫ জুন ১৮৮১। দ্র প্রথম ৬ সর্গ—ভারতী, কার্তিক-ফাল্গুন ১২৮৭



কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী[১] আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠারোবছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশবছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্‌ধৃত করি-- "ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয় আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল—তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।"

আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর-একটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমেরদ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুদ্‌গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।

তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে - কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা-কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত যাইতে দেয় না—তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না—এইজন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথী। মঙ্গলকর্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনই তাহাদের বিকার ঘুচিয়া যায় —তখনই তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে - -আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

১ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাধারমণ ঘোষ। দ্র 'ত্রিপুরার রাজবংশ ও রবীন্দ্রনাথ' - প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮



নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্স্‌পীয়র, মিলটন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে-একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন-সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ, এইজন্য ইংরেজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব-একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিযাছিল, শেক্স্‌পীয়রের সমসাময়িক-কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না। মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজন্যই এই সাহিত্যের প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণপরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে আর-একদিন যখন পোপ-এর কালের ঢিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসি-বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউকে, উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

তাই ইংরেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে



বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারি দিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।

অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্যসুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না— কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এইজন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। এখনো সেই ঝোঁকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই ; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাদুর্ভাব সর্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে— সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনো ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে-সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সাহিত্যকলার মর্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে— এইজন্যই সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তখনকার কালের ইংরেজি-সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি[১] আমাদের কাছে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে
হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন তাহার সার্থকতা হইল, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এ স্থলে কোনো সত্য বস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মতো ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সত্য-উপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই, যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থূল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার বাধা ছিল না।

তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম[২], মিল[৩] ও কোঁতের[৪] আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। য়ুরোপের এই মিল্-এর যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টারূপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছুদিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া-পাওয়া জিনিস। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা

১ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

২ Jeremy Bentham (1748-1832)

৩ John Stuart Mill (1806-73)

৪ Auguste Comte (1798-1857)



মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনারূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি। এক দল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন। পাখিশিকারে শিকারির যেমন আমোদ, গাছের উপরে বা তলায় একটা সজীব প্রাণী দেখিলেই তখনই তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য শিকারির হাত যেমন নিশপিশ করিতে থাকে, তেমনি যেখানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীহ বিশ্বাস কোথাও কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া আরামে বসিয়া আছে তখনই তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাস্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল। আমি তখন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিদ্যা সামান্যই ছিল—তিনি যে সত্যানুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটা পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আর-একজন ব্যক্তির মুখ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড়ো দুঃখ পাইতে হইত। এক-একদিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।

আর-এক দল ছিলেন তাঁহারা ধর্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া যত কলাকৌশল, যতপ্রকার শব্দগন্ধরূপরসের আয়োজন আছে, তাহাকে ভোগীর মতো আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালোবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভয় দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না; তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর-কোনো লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।

যেমন ধর্ম সম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধেও কোনো সত্য থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজনা থাকিলেই যথেষ্ট। তখনকার কবির[১] একটি শ্লোক মনে পড়ে—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে,
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা নিতান্তই অনাবশ্যক; দুঃখবৈরাগ্যের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী—এইজন্য কাব্যে সেই জিনিসটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল—ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্য আজও আমরা ধর্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি। সেইজন্যই

১ ঃ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর



বহুল পরিমাণে আমাদের দেশহিতৈষিতা দেশের যথার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

বিলাতি সংগীত

ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি—মাডাম নীল্‌সন[১] অথবা মাডাম আল্‌বানী[২] হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো ওস্তাদ গায়কেরাও গান গাহিবার প্রয়াসটাকে ঢাকিতে পারেন না—যে-সকল খাদসুর বা চড়াসুর সহজে তাঁহাদের গলায় আসে না, যেমন-তেমন করিয়া সেটাকে প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কোনো লজ্জা নাই। কারণ, আমাদের দেশে শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে নিজের বোধশক্তির জোরেই গানটাকে খাড়া করিয়া তুলিয়া খুশি হইয়া থাকেন ; এই কারণে তাঁহারা সুকণ্ঠ গায়কের সুললিত গানের ভঙ্গিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন;
বাহিরের কর্কশতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণতাতেই আসল জিনিসটার যথার্থ স্বরূপটা যেন বিনা আবরণে প্রকাশ পায়। এ যেন মহেশ্বরের বাহ্য দারিদ্র্যের মতো—তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য নগ্ন হইয়া দেখা দেয়। য়ুরোপে এ-ভাবটা একেবারেই নাই। সেখানে বাহিরের আয়োজন একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই—সেখানে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মানুষের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকে না। আমরা আসরে বসিয়া আধঘণ্টা ধরিয়া তানপুরার কান মলিতে ও তবলটাকে ঠকাঠক্ শব্দে হাতুড়িপেটা করিতে কিছুই মনে করি না। কিন্তু য়ুরোপে এইসকল উদ্‌যোগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাখা হয়—সেখানে বাহিরে যাহা-কিছু প্রকাশিত হয় তাহা একেবারেই সম্পূর্ণ। এইজন্য সেখানে গায়কের কণ্ঠস্বরে কোথাও লেশমাত্র দুর্বলতা থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যতকিছু দুরূহতা; য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে তাই দেখিলাম—সেই গায়িকাটির গান-গাওয়া অদ্ভুত, আশ্চর্য। আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি-না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। বিশেষত, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখির ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক মনে হইয়াছিল। মোটরে উপর আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল—বিশেষত 'টেনর' গলা যাহাকে বলে সেটা নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মতো নয়—তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে, য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন—ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকলরকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে

---

১ Christine Nilsson (1843-1922), Swedish prima donna

২ Dame Albani (1852-1930), Candadian prima donna



গানের সুর খাটানো চলে—আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য—সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত ; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনোপ্রকার সুব্যবস্থা নাই।

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ারদ্বন্দ্বসম্পাতের দিক ; আর একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারংবার মনের মধ্যে বলিয়ছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মোষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে ; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

বাল্মীকিপ্রতিভা

আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ্[১] ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই—তাহা আমার কল্পনার মধ্যে ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। এই আইরিশ মেলডীজ্ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে। আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এইসকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের মজার রকমের হইয়াছে। এমন-কি, তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।

১ 'Insh Melodies' by Thomas Moor (1779-1852)। দ্র রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ—'সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী, মাঘ ১২৮৪ ও কার্তিক ১২৮৬



এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।[১] ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি ; কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে—এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র--স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জন সমাগম[২] নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল[৩] ইহাই শেষবার।[৪] এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা[৫] সরস্বতী সাজিয়াছিল—বাল্মীকিপ্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না---কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে ; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ—ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে—ইহার

১ প্রথম অভিনয়ের প্রোগ্রাম (?) রূপে প্রকাশ, শক ফাল্গুন ১৮০২ (১৮৮১)। দ্র গ্রন্থপরিচয়-অ ১

২ প্রথম আহূত, শনিবার, ৬ বৈশাখ ১২৮১ [১৮৭৪]

দ্র 'সেকালের কথা', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ ; জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৫৭, গ্রন্থপরিচয় ১৭

৩ শনিবার, ১৬ ফাল্গুন, ১২৮৭ [১৮৮১]

৪ তু 'কালমৃগয়া'র অভিনয়কাল, নিম্ন পাদটীকা ৫

৫ প্রতিভাসুন্দরী দেবী (১৮৬৫-১৯২২), হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উল্লেখ করা যায় যে, বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনয়ে শরৎকুমারী দেবীর কন্যা সুশীলা দেবী লক্ষ্মী সাজিয়াছিলেন।



একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা— কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া[১], দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল[২]—ইহার করুণরসে শ্রোতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম[৩] বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা'[৪] বলিয়া আর-একটা গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারংবার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই-একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দুটি গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে

---

১ প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (ডিসেম্বব ১৮৮২)

২ 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সম্মিলন উপলক্ষে প্রথম অভিনয, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩ দ্র বাল্মীকিপ্রতিভা, ২য় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৮৮২

৪ প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৯৫। দ্র প্রথম সংস্করণেব বিজ্ঞাপন—ববীন্দ্র-রচনাবলী ১



সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়[১]। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না ; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে ; তখন নবযৌবনের নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না, তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়িবছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। তাঁহার কোনো ভয় ছিল না। যখন নিতান্তই বালক ছিলাম তখন তিনি আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুট করাইয়াছেন, আনাড়ি সওয়ার পড়িয়া যাইব বলিয়া কিছুমাত্র উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নাই। সেই আমার বাল্যবয়সে একদিন শিলাইদহে যখন খবর আসিল যে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন—হাতে আমার অস্ত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বাঘের চেয়ে আমারই বিপদের ভয় বেশি, বনের বাহিরে জুতা খুলিয়া একটা বাঁশগাছের আধ-কাটা কঞ্চির উপর চড়িয়া জ্যোতিদাদার পিছনে কোনোমতে বসিয়া রহিলাম—অসভ্য জন্তুটা গায়ে হাত তুলিলে তাহাকে যে দুই-এক ঘা জুতা কষাইয়া অপমান করিতে পারিব সে পথও ছিল না। এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন—কোনো বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যাসংগীত[২]

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে[৩] সেই অবস্থার কবিতাগুলি 'হৃদয়-অরণ্য' নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসংগীতে 'পুনর্মিলন'-নামক কবিতায়[৪] আছে—

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে-বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।—

হৃদয়-অরণ্য নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা

১ ইং ১৮৭৭ সালে। দ্র রবীন্দ্রকথা, পৃ ১৯২ ; শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬, পৃ ৪৪৫
২ প্রকাশ ১২৮৮ (১৮৮২)—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১
৩ মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত—কাব্যগ্রন্থ (১-৯ ভাগ, ১৩১০)
৪ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১। তু ভারতী, চৈত্র ১২৮৯



হইয়াছে— কেবল সন্ধ্যাসংগীতে-প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন— তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেইসময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহার দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা কবিয়া মনে মনে হিসাবে মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেটে জিনিসটা বলে— ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি-একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

ইহাকে কেহ যেন গর্বোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্বের অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্ব ছিল— কারণ গর্বই সে-সব লেখার শেষ বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে অহংকার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ সে ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার গর্ব অনুভব করিতে পারেন কিন্তু সে আর-একটা জিনিস। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না— আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে— তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক তখন ছিলেন— অক্ষয়বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরো প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী[১] কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক, যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

১ প্রকাশ : অবোধবন্ধু মাসিকপত্রে, ১২৭৪-৭৬, গ্রন্থাকারে, ১২৭৬



তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়—তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘনঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম, আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন-খুশি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

আবার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব—মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

ব্যারিস্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম, এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন।[১] এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম।[২] সঙ্গে আরো একজন আত্মীয়[৩] ছিলেন। ব্যারিস্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে, বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না—বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড়ো গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে-হাস্যটা ষোলো-আনা আমারই প্রাপ্য নহে; এইজন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক, লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইব্রেরির ভূভারবৃদ্ধি না করাতে আইনদেবতা আমাকে সদয় চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মসূরি পাহাড়ে ছিলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বরং মনে হইল তিনি খুশি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্বাদেই ঘটিয়াছে।

---

১ দ্র দেবেন্দ্রনাথের পত্র, গ্রন্থপরিচয় ১৭

২ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা—বৈশাখ ১২৮৮ [১৮৮১]

৩ ভগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়



দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ[৪] পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫] প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরেরদ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্তদ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতিমহাশয় 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো—বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর[৬] গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব কবিতে পারে, এ দেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন গুন করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম, 'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে'—তখনই দেখিলাম, সুর যে-জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জলস্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু-বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!' সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা

৪ দ্র 'সঙ্গীত ও ভাব', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৫ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)
৬ রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮২৯)



লিখিয়াছিলাম, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'—সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের ই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।

গঙ্গাতীর

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।[১] আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা নহে—তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা ঊর্ধ্বফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া সংকীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয়তো সে ভালোই—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো, এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

১ ইং ১৮৮১ সালে, মসুরিতে পিতার সহিত সাক্ষাতের পরে



আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম-যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম ; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম— জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম ; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

আমরা যে-বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে-- কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই-চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের সাশিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড়-পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা— সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে ; আর-একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে-সজ্জিত নরনারী কেহ-বা উঠিতেছে কেহ-বা নামিতেছে। সার্শির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূরদেশের, কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারি দিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসংগীতেরপালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলাম[১]—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।

এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক-না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়। কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারা আমার কবিতাকে

১ 'গান আরম্ভ', সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১। দ্র 'কবিতা সাধনা' ভারতী, পৌষ ১২৮৮



যখন ঝাপসা বলিতেন তখন সেইসঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে যোগ করিয়া দিতেন—ওটা যেন একটা ফ্যাশান। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভালো সে ব্যক্তি কোনো যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে, ও বুঝি চশমাটাকে অলংকাররূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারা চোখে কম দেখে, এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু কম দেখার ভান করে, এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সাত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষার প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে ; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকৃতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে, তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই যেমন দুই শক্তির লীলা, কাব্যসৃষ্টির মধ্যেও তেমনি। যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্য লেখা বোধ হয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম[১] হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই, তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে[২] আমি বলিয়াছি—রমেশ দত্ত[৩] মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু

---

১ বাংলা ১২৮৮ [১৮৮২]
"ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসবের মধ্যে রচিত"—*বিজ্ঞাপন, ১ম সংস্করণ*

২ 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১। দ্র গ্রন্থপরিচয় ৯, পৃ ৫৫৫ (সুলভ সং ৫, পৃ ৮১০)

৩ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)



দাঁড়াইয়া ছিলেন[১] ; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইহারই প্রাপ্য—রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন, "না।" তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রিয়বাবু

এই সন্ধ্যাসংগীত রচনারদ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন।[২] তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্য দিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দেরদ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

প্রভাতসংগীত[৩]

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসংগীত ছাড়া কিছু-কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে—সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক-ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে[৪] প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই 'বউঠাকুরানীর হাট' নামে এক বড়ো নভেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।[৫]

১ ২০ নং বীডন স্ট্রীট বাড়িতে কমলা দেবীর সহিত প্রমথনাথ বসুর বিবাহে, শ্রাবণ, ১২৮৯ [১৮৮২]

২ প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬)

৩ প্রকাশ, বৈশাখ ১৮০৫ শক [১৮৮৩] রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

৪ ভাদ্র ১৮০৫ শক [১৮৮৩]। রবীন্দ্র-রচনাবলী-অ ১

৫ দ্র ভারতী, কার্তিক ১২৮৮-আশ্বিন ১২৮৯। গ্রন্থপ্রকাশ, পৌষ ১৮৮৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১



এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানে একটু একটু করিয়া বউঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই-যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়াছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে-শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-ইস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি[৩] নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিংবা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, "আচ্ছা মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।" আমাকে স্বীকার করিতেই হইত দেখি নাই—তখন সে বলিত, "আমি দেখিয়াছি।" যদি জিজ্ঞাসা করিতাম "কিরূপ দেখিয়াছ" সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে

৩ প্রথম প্রকাশ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৯

"আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলাম।... একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"—পাণ্ডুলিপি



বিজবিজ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষত, তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালোমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "এসো এসো।" সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুতরকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে আমার সময় নষ্ট হইবে, তখন আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল, এই আমার মিথ্যাজাল কাটিয়া গেল, এতদিনে এই সম্বন্ধে নিজেকে বার বার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছি। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারি দিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম[১]—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন, তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম, এ আমার হইল ভালো—সদর স্ট্রীটে শহরের ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া, গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

১ দ্র 'প্রভাত-উৎসব', ভারতী, পৌষ ১২৮৯



কিন্তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন-না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক্, তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাতসংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ প্রতিধ্বনি নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।[২] সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থনির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হায় রে, যেদিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিষ্কার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

কিছু-একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে 'বুঝিলাম না' তখন বিষম মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে 'কিছু বুঝিলাম না' তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, 'সে তো জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কী।' হয় ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয়, নয় খুব একটা ঘোরালো করিয়া বলিতে হয়, প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ এমনি করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষকে যে কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে কথার যে মানে আছে। এইজন্য তো ছন্দোবন্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলটপালট করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড়ো হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে, বিজ্ঞানও নহে, কোনোপ্রকারের কাজের জিনিস নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মতো অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর-কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও কিন্তু সেটা গৌণ। খেয়ানৌকায় পার হইবার সময় যদি মাছ ধরিয়া লইতে পার তো সে তোমার তো বাহাদুরি কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলেডিঙি নয়—খেয়ানৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেকদিনের লেখা—সেটা কাহারও চোখে পড়ে না সুতরাং তাহার জন্য কাহারও কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালোমন্দ যেমনি হোক এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের বাঁধা লাগাইবার জন্য সে-

---

২ 'প্রতিধ্বনি', প্রভাতসংগীত , দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ ৭৬



কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে-একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

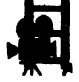
ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে—প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি, কেননা ইহা যে দেখা গেছে, একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর-একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাঁহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে— এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ-হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানেই আমাদের প্রীতি ; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট ; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আরো কিছু অধিক বয়সে প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করি—

" 'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটাকে



চায়—যেমন নবোদ্‌গতদন্ত শিশু মনে করেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।

"ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায়, মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনো-কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়া নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাতসংগীত আমার অন্তপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছাস, সেইজন্যে ওটাতে আর-কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।"

প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়—বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়—তখন পূর্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত, অনুরাগ পূর্বরাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সংকীর্ণ। তাহা একগ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাপিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে—বাহিরের সহিত, প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্বাঙ্গীণ সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিকে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে সুখদুঃখ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে-একে খণ্ডে-খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর-একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে, তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীলমেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনই এক নিমিষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে অনাবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতর দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্‌ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম

তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া, আবার আরো একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।

যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা[১] নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।[২]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ[৩] স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্যপরিষৎ[৪] যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র[৫] মহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভায় সভাপতি করা হইয়াছিল। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন. "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—'হোমরাচোমরা'দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন,[৬] কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে যে-কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের

১ প্রকাশ, (?) এপ্রিল ১৮৮৫। রবীন্দ্র-বচনাবলী-অ ২

২ "সদরস্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমাব আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পডিবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়াব নিউকোম্ব প্রভৃতিব গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত"—পাণ্ডুলিপি।

৩ 'সারস্বত সমাজ', প্রথম অধিবেশন, ২ শ্রাবণ ১২৮৯

দ্র 'কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলনী', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯

৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদ্, প্রতিষ্ঠা বৈশাখ ১৩০১

৫ রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)

৬ অন্যতম 'সহযোগী সভাপতি' রূপে



আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।[১] পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের ছিল।

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল—হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এ পর্যন্ত ব'ংলা 'দশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।

মানিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট্ অফ ওয়ার্ডস্ ছিল সেখানে আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম- -দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনাবশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে-সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেনসিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক-একদিন সেইরূপ কোনো-একটা বই উপলক্ষ করিয়া তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলাসাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব, যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া, ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন—অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন-কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে 'যমের কুকুর'[২] নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম ; তখনকার কালের আর-কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। ম্যুনিসিপাল-সভায় সেনেট-সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল[৩] ছিলেন কৌশলী,

১ 'ভৌগোলিক পরিভাষা' (?), ১২৯০
২ ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯
৩ কৃষ্ণদাস পাল (? ১৮৩৮-৮৪)



আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এসিয়াটিক সোসাইটি[১] সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী, আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম· বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্-একদিন সে মনে করিয়া বসিত— লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইঁহার মৃত্যুর[২] অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু[৩] ঘটে— সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগবেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর-একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এইজন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

কারোয়ার

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্নাটের প্রধান নগর। তাহা এলাচলতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে— সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য ; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন, পাহাড় এবং এই নির্জন সংকীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

---

১ ইং ১৮৪৬ সালে রাজেন্দ্রলাল ইহার "আসিস্টান্ট সেক্রেটারি ও লাইব্রেরিয়ানের পদ" পান, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ইহার প্রেসিডেন্ট হন।

২ ১১ শ্রাবণ ১২৯৮

৩ ১৩ শ্রাবণ ১২৯৮



সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি[১] লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হইবে না।—

যাই যাই ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে কোন্ দূরে, নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে দিয়ো না দিয়ো না বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও।
অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি,
তোমরা সুদূরে চলে যাও।...
তোমরা চাহিয়া থাকো, জ্যোৎস্না-অমৃত-পানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি ;
অপার দিগন্ত ওগো, থাকো এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি।
গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ---
কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায় ;
নিশীথের মাঝে শুধু মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়!
গাও বিশ্ব, গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান,
শতলক্ষ যাত্রী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে--

---

১ 'পূর্ণিমায়', ভারতী, পৌষ ১২৯০। দ্র ছবি ও গান, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১



বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

এ কথা এখানে বলা আবশ্যক, কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'[১] নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া, একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব-কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে এক দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রত্যাহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ

১. রচনা ১২৯০, গ্রন্থপ্রকাশ ১২৯১ (১৮৮৪)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১



করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার[১] ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।[২] সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর স্থান কী তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদে গো নন্দরানী—
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে—সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না—সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়—সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য—পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট—কেননা, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ[৩] হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।

ছবি ও গান

ছবি ও গান[৪] নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

---

১ ৩০-সংখ্যক কবিতা, নৈবেদ্য (১৩০৮), রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮ (সুলভ ৪)

২. দ্র 'ডুব দেওয়া' ভারতী, বৈশাখ ১২৯১ , রবীন্দ্র-রচনাবলী অ ২

৩. মৃণালিনী [ভবতারিণী] দেবীব সহিত। মৃণালিনী দেবী (১২৮০-১৩০৯)

৪. গ্রন্থপ্রকাশ, শক ফাল্গুন ১৮০৫ [১৮৮৪]। ববীন্দ্র-বচনাবলী ১ "এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসবে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা"—বিজ্ঞাপন, প্রথম সংস্করণ দ্র রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি', সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২৪. পৃ ২৩৬। গ্রন্থপবিচয



চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলার রোডের একটি বাগান-বাড়িতে[৩] আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্‌তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমাব কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা কবিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে ; আমিও সেইদিন নবযৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশবছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলোকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা-কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রভাতসংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর-একরকম করিয়া শুরু হইল। একটা জিনিসের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সে-সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিস আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয় ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা তো অত সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গান-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক-একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে। ছোটো শিশু যেমন ধুলা বালি ঝিনুক শামুক যাহা-খুশি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে, কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে ; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দ দ্বারা জগতের আনন্দখেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এইজন্য সর্বত্রই তাহার আয়োজন ; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা সুরে ভরিয়া ওঠে তখনই আমরা সেই বোধেরদ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার-লক্ষ তার

৩. ২৩৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোড-এর বাড়ি, সত্যেন্দ্রনাথ ভাড়া লইয়াছিলেন।



নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই—তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।

বালক

'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'-এর মাঝখানে বালক[১] নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসংবরণ[২] করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র[৩] বলেন্দ্র[৪] প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি[৫] গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কী আমার জীবনে কী আমার গদ্যে পদ্যে, কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখনো যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূরপ্রবাসের অতিথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত।—কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙরছেঁড়া নৌকা—কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে দুই-একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমারদ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না—তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ-পর্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বাচুলওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া

---

১. প্রকাশ, বৈশাখ ১২৯২। সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

২. বৈশাখ ১২৯৩ হইতে বালক ভারতী-র সহিত যুক্ত হয়

৩. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুব (১৮৬৯-১৯২৯) দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র

৪. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯) দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র

৫. বালক, আষাঢ়-মাঘ ১২৯২, প্রথম ২৬ অধ্যায়। গ্রন্থপ্রকাশ [১২৯৩ [১৮৮৭]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)



আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু যে-পাখি উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক—ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, সে বি. এ. পড়িতেছে কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, "স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন, তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে।" বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আপনি বোধ হয় এ-সমস্ত বিশ্বাস করেন না।" আমি বলিলাম, "আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সারুক।" স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসংকোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহার অন্য যে-ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এ-সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম, আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

এ দিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার[১] মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো-কোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মানুষের 'আমি' বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়, আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র[২]

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা।[৩] তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন।[৪] বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো-এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব— সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার

১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (? ১৮৫৮-১৯০৮)। দ্র পত্র নং ২, ৩ ছিন্নপত্র

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)

৩. ইং ১৮৭৬, জানুয়ারি মাসে "রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায়"—চবিতমালা ২২। দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্র', রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৪০৭ (সুলভ ৫)

৪. চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) সেই বৎসর সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন



ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবাবয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান যোদ্ধৃ কবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবীরের বামপার্শ্বের প্রেয়সী সঙ্গিনী তরবারির প্রতি তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথবাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথবাবু যুবক ছিলেন তাহা নহে, তখনকার সময়টাই কিছু অন্যরকম ছিল।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল, তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন[১] সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড়ো হইয়াছি; সে-সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি—কিন্তু সে-আসনটা কিরূপ ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না; ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়া ছিল; তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতি ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর-

১ ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৮৮১



কিছু ; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন— সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহারস্বরূপ ছিল ; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি ; তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, সুতরাং তাহাকে ভালো বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশ ভূষা ব্যবহারেও সেই অর্ধস্ফুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল ; চুল ছিল বড়ো বড়ো এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের শৌখিনতা প্রকাশ পাইত ; অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন[১] মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন— আমিও তাহাতে দুটা-একটা লেখা দিয়াছি।[২]

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার[৩] বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান[৪] ও কোনো বৈষ্ণব-পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য-ভাবোচ্ছ্বাস[৫] প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিংবা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি[৬], তখন তিনি ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি-কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত— ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া ; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে।[৭] বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া

---

১ প্রকাশ শ্রাবণ ১২৯১

২ 'বৈষ্ণব কবিব গান' (কার্তিক ১২৯১), 'বাজপথেব কথা' (অগ্রহায়ণ ১২৯১), ভানুসিংহ ঠাকুবেব জীবনী (শ্রাবণ ১২৯২)

৩ প্রকাশ, শ্রাবণ ১২৯১, মাসিকপত্র, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রেব জামাতা বাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায

৪ 'মথুবায়' (মাঘ ১২৯১) ~~দ্র~~ কড়ি ও কোমল

৫ দ্র 'বৈষ্ণব কবিব গান', ববীন্দ্র-বচনাবলী ~~অ~~ ২। বস্তুত ইহা নবজীবন পত্রিকায প্রকাশিত হয়।

প্রচার-এ 'কাঙালিনী' (কার্তিক ১২৯১) ও 'ভবিষ্যতেব বঙ্গভূমি' (অগ্রহাযণ ১২৯১) কবিতা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্র কড়ি ও কোমল

৬ ইং ১৮৮২ সালে "বঙ্কিমের বাসা কলিকাতাব বউবাজার স্ট্রীটে ছিল... দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সমযে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। ১৮৮২ খৃস্টাব্দেব ৩ জানুযাবি সন্ধ্যায় ববীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদেব জোড়াসাঁকোর বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল"—চবিতমালা ২২

৬ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯), বঙ্কিমচন্দ্রেব অগ্রজ

৭ বাংলা? ১২৯১। দ্র 'পিতাপুত্র', বঙ্গ-ভাষাব লেখক, পৃ ৬৪৫ ৪৬



আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই[১] আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে-ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে,[২] কতক বা কৌতুকনাট্যে[৩], কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী[৪] কাগজে পত্র আকারে[৫] বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে[৬] ; তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিযা ফেলিয়াছিলেন।

জাহাজের খোল

কাগজে[৭] কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।[৮]

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাইকাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাইকাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই ; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে।[৯] তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে-খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে—ঋণে এবং

১ থিযোসফিকাল সোসাইটিব প্রথম কেন্দ্রস্থাপন বোম্বাইয়ে, ১৮৭৯ , কলিকাতা শাখা, এপ্রিল ১৮৮২

২. দ্র 'পত্র। সুহা ৱব শ্রীযুক্ত প্রিঃ স্থলচববরেষু' ও প্রথম সংস্করণ কডি ও কোমল-এব অন্যান্য কয়েকটি পত্রাকাবে লিখিত কবিতা।

৩ 'আর্য ও অ নার্য', 'সূক্ষ্মবিচাব', 'আশ্রমপীডা', 'গুরুবাক্য' ইত্যাদি--- হাস্যকৌতুক, ববীন্দ্র-বচনাবলী ৬ (সুলভ ৩) দ্র বালক (১২৯২) এবং ভাবতী (১২৯৩)

৪ প্রকাশ, ? ১৮৮৩, সাপ্তাহিক পত্র, সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র

৫. 'পত্র। শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু'---সঞ্জীবনী, ১২৯১-৯২ দ্র কডি ও কোমল, প্রথম সংস্কবণ, পৃ ১৩১-৩৭

৬. দ্র 'নব্য-হিন্দু-সম্প্রদায়', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮০৬ [১২৯১] ভাদ্র 'একটি পুরাতন কথা', 'কৈফিয়ৎ'—ভারতী, অগ্রহায়ণ পৌষ ১২৯১। তৎকালীন অন্যান্য প্রবন্ধ

৭ Exchange Gazette সংবাদপত্রে

৮ দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৯১-২০৬

৯. দ্র বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৩৫২



সর্বনাশে। কিন্তু তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন ; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

এক দিকে বিলাতি কোম্পানি[১] আর-এক দিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা-বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ[২] তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার স্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রীসংগ্রহে লাগিয়া গেল,[৩] সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বৈ কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না—কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না ; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকুমাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয়, এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল, তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না, তখনই তাঁহার ব্যাবসা বন্ধ হইয়া গেল।

---

১. 'ফ্লোটিলা কোম্পানি' পবে ক্ষতিগ্রস্ত হইযা উহাবা 'হোব্‌মিলাব কোম্পানি'কে সমুদয স্বত্ব বিক্রয কবে। দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃ ১২৪-৩২

২. ই ১৮৮৪, ২৩ মে তারিখে প্রথম জাহাজ 'সবোজিনী' লইযা কার্য আবম্ভ , ক্রমে 'ভাবত', 'লর্ড বিপণ', 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'স্বদেশী' নামক জাহাজ নির্মাণ।

দ্র 'সরোজিনী প্রয়াণ', ভারতী, শ্রাবণ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ ১২৯১ অপিচ বিচিত্র প্রবন্ধ, রচনাবলী ৫

৩ দ্র 'বরিশালের পত্র', বালক, শ্রাবণ ১২৯২ (সুলভ ৩)



মৃত্যুশোক

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।[১] অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।" তখনই বউঠাকুরানী[২] তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না— সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম ; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ[৩] ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ- -শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির

১ সাবদাদেবীব মৃত্যু, ২৫ ফাল্গুন, ১২৮১, [৮ মার্চ ১৮৭৫]— ববীন্দ্র-কথা
২. কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব পত্নী
৩ কাদম্ববী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব পত্নী



মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ; জগতে তাহার আর অন্ত নাই - তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর[২] সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়---কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না ; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল---এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া![৩]

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি---যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে---তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির

২. কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ৮ বৈশাখ ১২৯১ [১৯ এপ্রিল ১৮৮৪]---রবীন্দ্র-জীবনী ১ (১৩৭৭), পৃ ১৯৭

৩. তু 'কোথায়' (ভারতী, পৌষ ১২৯১) কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১) 'পুষ্পাঞ্জলি' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২) এবং 'প্রথম শোক' ('কথিকা', সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৬) লিপিকা



দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারি দিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ-দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের[১] বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতলায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টর্লনি মনুমেন্ট্টা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল—পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন

১. Thacker Spink & Co



ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ

এক-এক বৎসরে বিশেষ এক-একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি, জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক-একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি।[১] বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে, তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিযাছে; অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্ পাগলী ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না—পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।[২]

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে—বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল—একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না; সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপনমনে।[৩]

---

১ তু 'বর্ষার চিঠি', বালক, শ্রাবণ ১২৯২। দ্র গ্রন্থপরিচয় ১৭

২ দ্র 'আকাঙ্ক্ষা', কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)

৩. দ্র 'সারাবেলা', কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২



মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপনমনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এ দিকে সেই কর্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ —সে আমার সমস্ত দিনেব আলোকময় অবকাশের গোলা-বোঝাই-করা শরৎ— আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশেব উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষেরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

'কড়ি ও কোমল'[১] মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।[২]

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি[৩] তখন আশুর[৪] জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাস করিয়া কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া ব্যারিস্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত কেবল কয়টা দিন মাত্র আমরা জাহাজে

১ দ্র পৃ ৫১১, পাদটীকা
২ দ্র 'প্রাণ', কড়ি ও কোমল-এর প্রথম কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ৪)
৩ দ্র পৃ ৪৮৬, পাদটীকা ৩
৪ স্যার আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)



একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তারদ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয় সম্বন্ধ[১] স্থাপিত হইল। তখনো ব্যারিস্টরি ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণবিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন।[২] তখন দেখিতাম, সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে-সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেল্‌ফের মরক্কো-চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন্-একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূলকথা।

আশু বলিলেন, "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই 'পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে, তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন-যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল[৩]

জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই যে আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম, সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের যাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারি দিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অনুভব করে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারি দিকে পাড়ি আছে এবং

১. হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর সহিত বিবাহ হয়, শ্রাবণ ১২৯৩ [১৮৮৬]

২ দ্র আশুতোষ চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ 'কাব্যজগৎ', 'কথার উপকথা'—ভারতী ও বালক, ১২৯৩

৩. প্রকাশ, ১২৯৩ [১৮৮৬]— রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ২)



ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; স্নিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চমস্বরে ডাকিতেছে—কিন্তু এ তো বাঁধাপুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে। মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা-ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল— আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না।[১] আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারি দিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!'[২]

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।[৩]

এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই।

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপরে চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে, কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই—এ দিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং

---

১ তু 'আত্মশক্তি নামক গ্রন্থ, (১৩১২), রচনাবলী ৩
২ দ্র 'দুরন্ত আশা', মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)
৩ দ্র 'কাঙালিনী' (প্রচার, কার্তিক ১২৯১), কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)



বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই-সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে-একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।[১] সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা-কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।

---

১. দ্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', বঙ্গভাষাব লেখক। আত্মপবিচয গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধ রূপে পুনর্মুদ্রিত।



ছেলেবেলা

ভূমিকা

গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল, ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি। ভাবলুম, ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তর-বাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয়নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমা-সরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি---কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোরবয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে, কেমন ক'রে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই 'ছেলেবেলা' আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বৃদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণযোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা---সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী এ হল কাকলি ; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে---ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল, একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা— হাল্কা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিঙ-'পরে ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গ্লির ও পার থেকে
তপ্সি মাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হ'ত তাঁর সাধা।
জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি-পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘেব-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লাল পেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে-
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—
থাক্‌ত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে থাকত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছা হ'ত, যদিই কোনো ছলে
ভর্‌তি হওয়া সহজ হ'ত এই পাঁচালির দলে,
ভাব্‌না মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে -
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ-হারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে সব গাঙ,
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াঙ-
জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেলা,
সব দিয়ে এক হাল্কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাব্‌নাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি—
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪



১

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড় ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্‌ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আফিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ-বা পাল্কি চ'ড়ে কেউ-বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধ ঘোমটা ওয়ালা; কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি; তার মানে লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পব-পুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও ; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগ্‌লানো, দাড়ি চোম্‌ড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হ'ত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো-বা কাঁচা-শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে, আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ' ; সে যতই হাঁ-হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনাবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি ; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টার-মশায়[১] মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হত মাস্টার-মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি নটা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আব্রু-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লন্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কী জানি

১। 'মাস্টার অঘোরবাবু—জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তদশখণ্ড পৃঃ ২৮৬ (সুলভ, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫)



কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকী সুর, দড়াম্ করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সব চেয়ে ছিল বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত, লোকটার ধম্মজ্ঞান একটুও নেই ; দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়্‌সুড়্ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ি-ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হ'ত, ঝর্‌ঝর্ কল্‌কল্ করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

২

পাল্কিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাত-কাটা মের্‌জাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধন-দৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পাল্কির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে; দাগ ধরেছে যেখানে-সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন এ কালের নাম-কাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পাল্কিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইজন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন-ক্রুশো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।

তখন আমাদের বাড়ি-ভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই ; নানা মহলের চাকর-দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক।



সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি; দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে ; বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে ; মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে ব'সে হাপর ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে-পালখের-কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে, পাওনার দাবি জানাতে ; উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে ; চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্‌দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে ; পাল্কির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত— রাজা যেতেন স্নানে চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাল্কি, হাওয়ায়—তৈরি বেহারাগুলো—আমার মনের নিমক খেয়ে— মানুষ চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বই পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্! ব্যাস্, সব চুপ। তার পরে এক সময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি ; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্-ছপ্। ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, 'সামাল সামাল, ঝড় উঠল।' হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল—একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বার বার বলতে লাগলুম, 'তার পর?'

সে বললে, 'তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফ-জোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টক্‌টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, আও বাচ্ছা! সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছট্‌ফট্ করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।'

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আবদুল, সে মরে গেল নাকি?'

আবদুল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী, ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা,



দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?'

আবদুল বললে, 'জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়, ভারী বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স্ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগল-ছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগালো। ছাগল ছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তার পরে?'

আবদুল বললে, 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।'

কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পাল্কির ভিতর আমার সফর। পাল্কির বাইরে এক একদিন ছিল আমার মাস্টারি, রেলিঙগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক একটা ছিল ভারি দুষ্টু, পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই ; ভয় দেখাই যে, বড়ো হলে কুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না—কেন-না থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরো একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল নইলে পুজো হয় না—

সিঙ্গিমামা কাটুম্,
আন্দিবোসের বাটুম,
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম্‌কুড়্ কুড়্
আখ্‌রোট বাখ্‌রোট খট্ খট্ খটাস্—
পট্ পট্ পটাস্।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস্ শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস্ শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।[১]

৩

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুথবু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনো ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-ধড়াস্ সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা[২] বলতেন, আগে চাই বাংলাভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের

১। দ্রষ্টব্য 'কাঠের সিঙ্গি'—ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড (সুলভ একাদশ খণ্ড)

২। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর



সব পোড়োরা গড় গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হুই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনো বি এ ডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয় নি।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হ'ত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে, তবু তোশাখানা দফ্‌তরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

সেই তোশাখানার দক্ষিণভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জ্বলছে মিট্‌মিট্ করে, গণেশ-মার্কা ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারই আশেপাশে টিক্‌টিকি রয়েছে পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই ; মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পাল্কিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানের বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতামোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচা-পাকা—মুখের উপর টান-পড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব-মনিব ছিলেন, লক্ষ্মীমন্ত, নাম-ডাক-ওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি, গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। 'বাবুরা বসে আছেন' না ব'লে সে বলত 'অপেক্ষা করে আছেন'। শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেল-ভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাত বার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ্ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গিতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চালচলনে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি ক'রে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি?' কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাই নে।' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেল্‌ফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বৈ কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের



ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনো শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি—চুল জামা গেছে ভিজে—গলার মধ্যে একটু খুস্‌-খুসুনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি ব'লে ভিতরে ভিতরে বদ-হজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকার-মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন ব'লে মনে হয় নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'আচ্ছা, যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।'

আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কী লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হ'ত, তার উপরে খেতে হত কান-মলা ; হয়তো-বা-মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল চিরকালের জন্যে আরাম হ'ত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে—তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি ; ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল ; তার সঙ্গে এলাচ-দানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া ব'লে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক্‌-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোড়া-কাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জল-বসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।

মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নিরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে, তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার খরচার সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা ; বিশেষ করে এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল দেওয়া ঘি-তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনো বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি-গন্ধের-আমেজ-দেওয়া এই তিলে ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চট্‌চটে করে তোলে কি না জানি নে ; নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায়? আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনো টিকে আছে? না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাত-কাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্জে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর-সমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা—'ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' তার মুখে হাসি মাথায় টাক ঝক্‌ ঝক্‌ করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাৎলানো। কিশোরী চাটুজ্জের সব চেয়ে বড়ো আপশোস ছিল এই যে দাদাভাই, অর্থাৎ কি না আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভর্তি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা হত একটা নাম থাকত।



রাত হয়ে আসত, মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্‌চকে, মস্ত তক্তপোষের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে, তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, 'জ্বালাতন করলে! যাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।' আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হ'ত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে। তখনো শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নীচে ফুকরে উঠত।

৪

আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম, কিন্তু বিশ্রাম নেই। উনুনে যেন জ্বলা কাঠ নিভেছে, তবু কয়লায় রয়েছে আগুন।—তেলকল চলে না, স্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানা-ঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহুরে গোষ্ঠে। সমস্তদিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন এখনো তার নাড়ীগুলো যেন দব্‌দব্‌ করছে। রাস্তার দু ধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে, কেবল সামান্য কিছু ছাই চাপা। রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়া গাড়ি ছুটেছে দশ দিকে, তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম।

আমাদের সেকালে দিন ফুরোলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়। ঘরে বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম্‌ থম্‌ করত। ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার দারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে দিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত 'বরীফ'। হাঁড়িতে বরফ দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হ'ত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইস্‌ক্রিম। রাস্তার দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কিরকম করত তা মনই জানে। আর একটা হাঁক ছিল 'বেলফুল'। বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির খবর আজ নেই, কেন জানি নে। তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে-মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে ব'সে, সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত। বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হ'ত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচ্‌কিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে। ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস-ফেরা দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমা-হলের সামনে। নাটক-অভিনয়ের একটা ফূর্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু, কী আর বলব, আমরা সে সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ।

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হ'ত, 'যাও, খেলা করো গে।' অথচ ছেলেরা খেলায় যদি



উচিত মতো গোল করত তা হলে শুনতে হ'ত, 'চুপ করো।' বড়োদের আমোদ-আহ্লাদ সব সময় খুব যে চুপচাপে সারা হ'ত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনো কখনো ঝর্‌নার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে ঝুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপ-পাশ থেকে গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোট একটি ক'রে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম, যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি।[১] তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান ; গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল ; মেয়েরা লুকোনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে—সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস্ ফিস্ ক'রে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—

'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে'...

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী-ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহি-গলা-ওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধূম ছিল। আমাদের মেজকাকা[২] ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি। পালারচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায়, ও পাড়ায়, এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়-যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তামাকের ধোঁওয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙ করা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল্ পিল্ করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগ্‌বগ্ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে নটা ; পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়াপড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধ'রে ব'লে, 'মা ডাকছে, চলো শোবে চলো।' লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়-লণ্ঠন। আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিম্ টিম্ করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম্ করতাল।

১। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমারী দেবীর স্বামী

২। গিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'বাবুবিলাস' নাটকের লেখক



সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে বার বার ভরসা দেওয়া হ'ল, সময় হ'লেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কেন-না, তাঁরা বড়ো, আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন। আর-একটা কারণ, ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু ঠেলাঠেলির দরকার হ'ত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হ'ল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়-লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। এক দিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দর লোকেরা যাদের বলে 'বাজে লোক'। তেমনি আমার পালা-গানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খোগড়া-কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্‌শো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা ; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ ক'রে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা — যে মানুষ বড়োদের সমান সারে ব'সে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনসুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান! ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোষে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোনো দিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সে কালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ দু-কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভ'রে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর। মাঝে মাঝে পাল-পার্বণে যখন মর্জি হ'ত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত। এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর, হরেক রকমের ঝক্‌ঝকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়—বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে, ছোটো রাস্তা থেকেও।

৬

চাকরদের বড়োকর্তা ব্রজেশ্বর। ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম—বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ি নয়! সে বলত—তেনারা, ওনারা, খাতি হবে, যাতি হবে, মুগির ডাল, কুলির আম্বল। 'দোমনি' ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো



বড়ো চোখ, তেল-চুক্‌চুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম। তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল, তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না ; খুনও হয়, জখমও হয়, লুঠও হয়, পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু, এ হ'ল খবর, এতে গল্পের মজা নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মস্ত মস্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাক্‌রেদ। তাদের নাম শুনলেই লোক সেলাম করত। প্রায়ই ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুন-খারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এ দিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ ব'লে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যবসা। গল্প শুনেছি, সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্যা, পুজোর রাত্তির, কালী কঙ্কালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে যখন নিয়ে এল জমিদার কপাল চাপ্‌ড়ে বললে, 'এ যে আমারই জামাই।'

আরো শোনা যেত রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপ্‌কিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ দুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো সুট্‌ করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালো মানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হ'তে পারে তাও দেখালে। খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রন্‌পা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হ'ত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হ'ত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না, তবু এক সময়ে এই রন্‌পায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি দু হাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক্‌ ধুক্‌। পরদিন ছুটির ফাঁকে পাল্কিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায় গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই-হুই হাঁই-হুই, গা করছে ছম্‌ ছম্‌। ধূ ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে। দূরে, ঝিক্‌ ঝিক করে কালীদিঘির জল, চিক্‌ চিক্‌ করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটলধরা ঘাটের দিকে ডালপালা ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায় ঘন বেতের ঝোপে। যত এগোচ্ছি,



দুর্ দুর্ করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তার পরে?- –

'রে রে রে রে রে রে!'

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই ঘর্ঘর শব্দে। এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাঙ করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝায় করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উল্টিয়ে তলিয়ে গেছে, এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন। যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভর্তি করে। তার পূর্বেই তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয় নি, সে আমরা জানি। তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না।

বিলিতি সংগীতে গুণ হচ্চে তাতে সুর সাধানো হয় সমান কেউ ছিল না। বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও টিলেমি থাকে না।

এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়। দুই-একটা নমুনা দিই- -

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি-পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি-
ঠাকুরঝি!
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি- -
ঠাকুরঝি।

আরো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন –

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।
...
গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।



অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়, যেমন—

এক যে ছিল কুকুর-চাটা
শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হাল্কা গোছের হিন্দিগান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হাল্কা বাংলাভাষা হিন্দিবুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না, আপনা-আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়—এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়াম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁদের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেন-না সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আন্‌মনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজগামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল।

আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন; হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে ; গুন্ গুন্ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না ; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করত, গান ধরতেন—

'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজার। চেনাশোনার, খোঁজ-খবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথানিয়মে। সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তম্বুরা কাঁধে ক'রে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হুঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হুঁকো তুলে।

সেকালে ছিল অতিথির জন্যে এই যেমন তামাক, তেমনি পান। তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ—পান সাজতে হ'ত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চট্‌পট্ পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে,



ঠিকমতো মসলা ভ'রে, লঙ্গ দিয়ে মুড়ে, সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায়; উপরে পড়ত খয়েরের-ছোপ-লাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা। ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ীর মধ্যে গোলাপ জলের গন্ধ। বাড়িতে যাঁরা আসতেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম 'আসুন মশায়' ডাক পেতেন এই অম্বুরি তামাকের গন্ধে। তখন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে নেওয়ার। সেই ভরপুর পানের গামলা অনেকদিন হল সরে পড়েছে। আর সেই হুঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমতো রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিযমের শেখায়। সকালবেলার সুরে চলত--'বংশী হমারি রে'।

তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন--জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই। সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে। ভালো লাগল কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া' ; রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। মুশকিল হল, এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না ব'লে-কয়ে। বাঘ-মারা ব'লে তাঁর খ্যাতি। বাঙালি বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত ; কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরই ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন ব'লে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন, সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পান নি ; কামড়ের গল্পটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে। তখন সে কথা ভাবি নি, এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি। তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্য ঘনঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অন্য বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝ না।' কোনো দিন আবাদের কাজ করা হয় নি।

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ খেতে তার খবরটা দেওয়া যাক।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শির্ শির ক'রে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাক্সাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান ; সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালান-ঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায় শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগাগোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহুরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভ'রে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ এরই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা ক'রে তাতে এক মোন সর্ষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি ক'রে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকালবেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হ'ত



ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল, ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শৌখিন গিন্নিরা রঙ সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরো কত কী--যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগমবিলাস নাম দিয়ে ব্যবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হ'ত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন মলন চলতে থাকত ; অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে। এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেল্লা লাগে।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট্ খট্ ক'রে। তাদের নাড়াচাড়া ক'রে ক'রে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল[১] মাস্টারের ঘড়ি ধরা সময় ছিল নিরেট; এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খট্‌খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, একদিনের জন্যেও মাথা ধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে, শ্লেট নিয়ে, যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায় - পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে। সঙ্গে ছিল 'প্রাকৃত বিজ্ঞান'। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত[২], বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে 'মুগ্ধবোধ' মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানা রকম পড়া যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে ; জালের মধ্যে ফাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফস্‌কিয়ে যেতে চায় ; আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দার আর-এক ধারে বুড়ো দর্জি, চোখে আতশ কাঁচের চশমা, ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে---চেয়ে দেখি আর ভাবি, কী সুখেই আছে নেয়ামৎ। অঙ্ক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায়, চোখের উপর শ্লেট আড়াল ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপ্‌ছিপে ছোকরা দারোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সক্কালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে—ঘেউ ঘেউ ক'রে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি[৩]। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে

১। নীলকমল ঘোষাল— জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ২৮৪

২। সীতানাথ ঘোষ?

৩। দ্রষ্টব্য 'আতার বিচি'—ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড



গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল, ভাত, মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়ো বউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্দুরে ; তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না। মনে হ'ত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পাল্কি-গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিম্‌নাস্‌টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলট-পালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়ে ছবি-আঁকার মাস্টার।

ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরে পাঁচমিশালি ঝাপ্‌সা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইঁটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢল্‌ঢলে ; পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি ; অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না -

'রাজপুত্তুর চলেছে, তেপান্তর মাঠে'...

৮

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি, যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। পূর্বেই জানিয়েছি অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিশে তার আরামের পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোণা দেওয়ালের প্যাক্‌বাক্সে।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধ্যেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময় কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভর্তি করবার জন্যে নানা দামের নানা মাল মসলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুনুনি করা, ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিশেই হোক অর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসি-তামাসা ছিল খুবই হাল্কা দামের। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন, যাঁকে আচার্জিনী বলে ডাকা হ'ত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদ্‌কুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহশান্তি



স্বস্ত্যয়নের হিসেব হ'ত খুব ফলাও খরচার। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাকটা পুঁথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি ; শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবীর থেকে ন কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বার-বিসর্গ-সুদ্ধ। মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদ মুনি ছাড়া আর কারো মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ্ টপ্ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে। দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হাল্কা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হ'ত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হ'ত, রোদ-খাওয়া সর্ষের তেলে ম'জে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হ'ত সাবধানে. তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেয়াখয়ের—কী বলব—'চুরি করতুম' বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেন-না, রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে, এমন কি না হলেও, অপহরণ করে থাকেন ; আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর বউদিদির[১] আমসত্ত্ব পাহারা, তা ছাড়া আরো পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'[২]। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু, আমার সুপুরি কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়-বেগে। উস্কিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেকদিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যখন হ'ত নাড়ু কোটা, যখন দাসীরা সন্ধ্যেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুন বাজার থেকে বোতলে ভরা, গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরো-একটি ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ওইখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলেদেরও ওইখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত

১। কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

২। "বইটি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী লইয়া বিরচিত।" -- প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত প্রথম প্রকাশ : প্রথম খণ্ড ১৭৯১ শক (১৮৬৯), দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০৬ শক (১৮৮৪)।



তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ওইখানেই স্বরে-অ-স্বরে-আ'র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সব চেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তার পরে বই-পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে যণ্ডামার্কা মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার -বোধ করি সীসের-ফলকে খোদাই- করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়েছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।[১]

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ওই ছাদে নানাভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কত দিন দেখেছি, তখনো সূর্য ওঠে নি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেকদিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ওই ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত সমুদ্দুর -পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচে তলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক- চলাচল ; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায়—যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়। খড়্‌খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিট্‌কিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা ; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা, পেট ভ'রে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে; গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে।

রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। -সেদিনকার দুপুর বেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।--

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত, যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বউ। দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমতো বেলোয়ারি চুড়ি। সেদিনকার সেই বউ আজকের দিনে এখনো বউয়ের পদ পায় নি ; সেকেন্ড ক্লাসে সে পড়া মুখস্ত করছে। আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্‌শ ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মরুভূমি, ধূ ধূ করছে চার দিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল। আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে-ঢোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলাদেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে

১। তুলনীয় 'শিশুবোধক'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত ও কলিকাতা, আহিরিটোলা, হইতে প্রকাশিত।



সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে।

এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লাল চিহ্ন দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিম্মায়। তখনকার দিনে দোকানিরা ঘিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠে নি। যদি জুটে যেত কচুরি সিঙাড়া, এমন কি, আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু, যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরো বাঁকিয়ে বলত 'দেখো বাবু, আজ কী এনেছি', প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনেবাদাম-ভাজা! সেটাতে আমাদের যে রুচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টুঁ শব্দ করি নি। এমন কি, যেদিন তালপাতার ঠোঙা থেকে বেরোত তিলে-গজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন-খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে—পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বট গাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

৯

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ। ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।

সন্ধেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুল-ঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়া তৈরি পথের সিগ্‌ন্যাল। এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচ ওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা, একটু দেয় নতুনের আমেজ।

আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগ্‌ডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম করে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িঙ যেমন বেমালুম রঙ মিলিয়ে থাকে, আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।

তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাঠিম ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো। শহরে ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কমজোরি। মাঠ-জোড়া ফুটবল খেলার লম্ফঝম্প তখনো ছিল সমুদ্রপারে। এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ[১], কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে, দিদি[২] বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বউকে পাশে

১। কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী

২। 'ছোড়দিদি' বর্ণকুমারী দেবী



নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগ-কাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা খইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বউঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বউঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন : এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি তাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্‌তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতো-জোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হ'ত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে? আমি কি চৌকিদার!'

তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে ; তাঁরা বলবেন নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে? কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকলদিকেই তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।

এইবার আমার নির্জন বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক পালা—এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা[১]।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।

অন্দরমহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেককাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা[২] সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকরুনকে[৩] সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই - এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরোবার মতো কাপড় তখনো মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে, তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বউঠাকরুন।

বেণী দুলিয়ে তখনো ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা—অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইস্কুল যখন প্রথম খোলা হল, আমার বড়দিদির[৪] ছিল

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। মেজ বউঠাকরুন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
৪। সৌদামিনী দেবী



অল্প বয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি! ধব্‌ধবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পাল্কিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম, এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি ব'লে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচ-রকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের ; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশ-করা বউবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা! জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম্ সুর তৈরি করে যেতেন ; আমাকে রাখতেন পাশে। তখনই তখনই সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক-গ্লাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বউঠাকরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা ; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু ক'রে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বউঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিলের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ ; আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় সুর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরো বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট্ শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন। মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মানুষ ; তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সন্ধ্যেবেলার সভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলুম রাত জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ব্রহ্মদত্যির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিসু গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে, ঝিল্‌মিল্ করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সব চেয়ে চোখে পড়ত সামনের



গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, দুটো হয়। সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে—

'বলো হরি হরিবোল।'

১১

খাঁচায় পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সব চেয়ে খারাপ লাগত পাড়ায় কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে বাঁধা কোকিলের ডাক। বউঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিষ উঠত ফোয়ারার মতো। আরো ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খাবার জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরোত ফড়িঙ, ছাতুখোর পাখিদের জন্যে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বউঠাকরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না। একে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল, কোনোদিন যার শেষ হল না। সে কথা বলছি।—

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দর্জির দোকান থেকে যত সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হ'ত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে: বলত এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারি নে। বার বার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি। জবাবে শুনেছি জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বউঠাকরুনকে জানিয়েছি এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি, আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বউদিদিদের রঙ-করা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের-সেলাই-করা ঢাকনি-পরা বউঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বউঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেন-না তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবাখেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরো কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরো একটু আগেকার দিনে।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হ'ত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন, আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে ওটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি হচ্ছে'। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন—ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ছিল আকাশে বাতাসে চরে-বেড়ানো মন, সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরো উপরের ক্লাসে উঠেছিল, আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।



পুরোনো নীলকুঠি[১] তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউ গাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দাবরাব একেবারে থম্ থম্ করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান। কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল! কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর-- যেখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত, ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা। হতভাগা রায়তদেব দোহাইপাড়া কান্না উপরওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদেব শাসনেব পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাতনিবা কখনো কখনো দুপুর রাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন্ দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফলনের আমের বোল—ঝরেও গেছে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সেব ছেলে, বিশেষত মেয়ে, যদি অক্ষর গুণে দু-ছত্র পদ্য লিখত, তা হলে দেশের সমজদাররা ভাবত এমন যেন আর হয় না, কখনো হবে না। সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি, কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তার পরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দ অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে, অমনি তাদের সেই নাম-মোচা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সেব এক ভাগনে[২] একদিন বাতলিয়ে দিলেন চোদ্দ অক্ষরে ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে। স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। আর, হাতে হাতে সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল ; এমন-কি, তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি।

মনে আছে—ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফর্মাস করলেন লিখতে; ভাবলেন নর্মাল স্কুলের নাম উঠবে জ্বল্‌জ্বলিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলেদের, শুনতেও হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিন্দুকরা জানতে পারে নি, তার পরে যখন সেয়ানা হয়েছি তখন ভাবচুরিতে হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এ চোরাই মালগুলো দামি জিনিস।

মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম ; তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন। আত্মীয়রা বললেন---ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বউঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উল্টো। কোনো কালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই

১। তুলনীয় 'জন্মদিনে'। ১৯ সংখ্যক কবিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড।

২। জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়



মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন কোনো কালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত, তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বউঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টুঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে।[1] সেই এবড়োখেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল ব'লেই আমি পড়ি নি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে, যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বন্দুক ছোঁড়া জ্যোতিদাদা কস্ত করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘ-শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিলে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তখনই বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা এই আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি। একবারও ফসকায় নি তার তাক।[2]

ঘন জঙ্গল। সেরকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশ গাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে। আমার পায়ে জুতোও নেই—বাঘটা তাড়া করলে তাকে যে জুতোপেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমা-পরা চোখে পড়ল। মারলেন গুলি। দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ায়। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুঠো যা সামনে পায় কামড়ে ধ'রে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্যে সবুর করে ছিল, সেটা ওদের মেজাজে নেই ব'লেই জানি। তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সঙ্গে ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো! এত ঘুম কেন!

আরো একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে হাতির পিঠে চ'ড়ে। আখের খেত থেকে পট্ পট্ করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, ভারিক্কি চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে, শুঁড় দিয়ে টেনে, গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে। তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম—সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত-পা-মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চ'ড়ে ব'সে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়গোড় ভাঙার ছবিটা। ভয় করাটা চেপে রাখলুম

১। দ্রষ্টব্য ১৯ সংখ্যক কবিতা—জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

২। ঐ



লজ্জায়। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে, ও দিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। মাহুত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের 'পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার সব চেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল দেখা নজর, এ ঘাড়ে গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুরবেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে ফসল ছিল না! ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর ক'রে দেখবার জায়গা এই বটে, সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

আর-একটা কথা বাকি আছে, শুনতে মজা লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে।[১] টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামান্‌দিস্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে বাঁধা একটা চাকায়। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হুকুম করলেন, ছুতোর এল কাঠ-কোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুলপিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরোয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে, তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন ; তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন-কি সেতারে এস্‌রাজেও তার চড়াই নি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বউঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই।[২] জ্যোতিদাদা তাঁর তেতালার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।[৩]

১২

এইবার তেতলাঘরের আর-এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।

একদিন গোলাবাড়ি পাল্কি আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা, কখনো এখানে, কখনো ওখানে। বউঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

১। দ্রষ্টব্য ১৯ সংখ্যক কবিতা—জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

২। ৮ বৈশাখ, ১২৯১

৩। 'শান্তিধাম', রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ের উপরে



পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হ'ত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত—কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ্য করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষ'য়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বউঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে যত্ন ক'রে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হ'ত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে-ঠাণ্ডা-করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন বঙ্গদর্শন[১] এর ধুম লেগেছে—সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

'বঙ্গদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হ'ত না, কেন-না, আমার একটা গুণ ছিল—আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজ্‌লিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বউঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

১৩

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারে বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায় নি। মুষড়ে যায় নি তার দুই ধারে পাখির বাসা; আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁষে দেয় নি কালো নিশ্বাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে ; মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

নিজের সুর ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদলদিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে—থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙি নৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বউঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো। যা-তা তর্ক নিয়ে কথা কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

১। প্রকাশ ১২৭৯ বৈশাখ (ইং ১৮৭২ এপ্রিল)



তার কিছু দিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান-সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা-দেওয়া উঁচু-নিচু ঘর ; মার্বেল পাথরে বাঁধা মেজে ; ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা-বারান্দায়, ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে ; সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারির[১] সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে—এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ-তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বউঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল—শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল তেতালার বসতি ; আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার ষোলো বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে 'ভারতী'[২]। আজকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠেছে কাগজ বের করবার টগ্‌বগানি। বুঝতে পারি সে নেশার জোর, যখন ফিরে তাকাই সেদিনকার খ্যাপামির দিকে। আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারো নজরে পড়লা না—এর থেকে জানা যায় চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল 'বঙ্গ দর্শন'। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা ; বড়দাদা[৩] যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প[৪]—সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমনি করে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা ব'লে নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেতালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারী ভারী তত্ত্বকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনাবার লোক ছিল কম ; যদি কেউ রাজি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ওঁকে ছাড়ত না—ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্ত্বকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন, কেবল তাঁর মটন-চপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অঙ্কচিহ্নওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত

১। জীবনস্মৃতির 'আমেদাবাদ' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত—রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড

২। প্রকাশ ১২৮৪ শ্রাবণ (ইং ১৮৭৭)

৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভিখারিণী'—ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র



বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন—কিন্তু সে গানের জন্য নয়, অঙ্ক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্যে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ-বানানো, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে সাজিয়ে তুলতেন ; তার অনেকগুলো রেখেছেন, অনেকগুলি রাখেন নি—ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন ; যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হ'ত না। তাঁর সেই-সব ফেলা-ছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন লিখতেন, শুনিয়ে যেতেন ; শোনবার লোক জমত তাঁর চার দিকে। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশ-ভরা, সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন।

জোড়াসাঁকোব বাড়ির প্রাণের একটি ঝরনাতলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা ; শুকিয়ে গেল এর স্রোত; বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে—ঐ বারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন-করা শরতে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাচ্ছি—

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।

আর মনে আসে একটি তপ্তদিনের ঝাঁ ঝাঁ দুই প্রহরের গান —

'হেলাফেলা সারাবেলা,
এ কী খেলা আপন-সনে'।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বাব এ পার-ও পার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববাব জো থাকত না। বড়ো বয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথাটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয়। মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো; তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনবার মতো বটে, শুনিয়েওছি অনেকবাব। ছেলেবেলায় যখন গিয়েছি ড্যাল্‌হৌসি পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা একা ঘুরে বেড়াতে কখনো মানা করেন নি। পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার সকলের চেয়ে মজা ছিল, মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেক দূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী যে হতে পারত সেটা এতখানি করে মার কাছে বলেছি। তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত, এও একটা শোনবার মতো জিনিস ছিল বটে। ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে। আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও



এ-সব গল্পের থেকে খুব বেশি তফাত নয়।

সতেরো বছরে পড়লুম যখন, 'ভারতী'র সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হল।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেইসঙ্গে পরামর্শ হল—জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চাল-চলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে ; মেজবউঠাকরুন আর তাঁর ছেলেমেয়ে আছেন ইংলন্ডে, ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মান রক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে। বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ-হাঁ করছে, সমস্তদিন ভূতে পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল ; সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ; সেখানে ইতিহাসের মাথা তোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণ'[১] এর গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে ; রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠছে ; ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচ্‌কাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোধ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো ; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের ক'রে ; তার মাথার খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোশ পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি, তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া ক'রে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা। কিছু মনে থাকে, অনেকখানি ভুলে যাই ব'লে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়। আশি বছর পরে এসে নিজেবই যে একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে, আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না ; অনেকখানি সে মন-গড়া।

১। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড



এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে[১] ঝক্‌ঝকে ক'রে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিযে দিলুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমাব সব চেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাক নাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে সেটা ভালো লাগল তাঁব কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবীব সুরে। বললেন, 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই।

মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না ; তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি, সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরেব বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রাব মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষ কালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রিব দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

১৪

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মাল-মসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু-কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষরকম গড়ন-পিটন ঘটে, তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল, তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মশায়ের পুত্র, বি: এ. পাশ-করা। তিনি

১। অন্নপূর্ণা তবখড়কব বা আনা তরখড়, ডাক্তাব আত্মাবাম পাণ্ডুরঙ'এর কন্যা



বুঝে নিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই যে, পাস-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে এ কথাটা তখনকার দিনের মুরুব্বিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিদ্যার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বংশে তখন ধন ছিল না, কিন্তু নাম ছিল, তাই রীতিটা টিকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ-সাহেবের বেঙ্গল একাডেমি'তে। আর কিছু না হোক, ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে, অভিভাবকদের এই ছিল আশা। ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকল রকম একসেসাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।- -পড়াশোনা করবার জন্যে আমরা জন্মাই নি। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আসা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেই রকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন 'কুমারসম্ভব'। ঘরে বন্ধ রেখে আমাকে দিয়ে 'ম্যাক্‌বেথ' তর্জমা করিয়ে নিলেন। এ দিকে রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে দিলেন 'শকুন্তলা'। ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মাল-মসলা ; আর ছিল বাংলা বই যা তা, তার বাছ-বিচার ছিল না।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরম্ভ হ'ল বিদিশি কারিগরি কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমতো নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে- -কিছু-কিছু চেষ্টা হ'তে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে , জড়িয়ে রইলাম আপন ঘরের জালে। ইস্কুল মহলের আশেপাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত সাহেব[১] আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে বিদেশে এসেছি। মিসেস্ স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তখন লন্ডন য়ুনিভর্সিটিতে ভর্তি হয়েছি ; ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেন্‌রি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান-দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে, প্রাণ পেয়ে উঠত--আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক—মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হ'ত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেন্‌ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উল্টেপাল্টে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম।

নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না—ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি। তখনকার ডাক্তারি মতে, এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি য়ুনিভর্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা

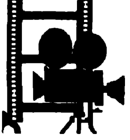
১। তারকনাথ পালিত



পাওয়া সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মাল-মসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যেবেলায়, রাত এগারোটা পর্যন্ত, পালা ক'রে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন।

বিলেতে গেলেম, বারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি। নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

চতুরঙ্গ



চতুরঙ্গ—রবীন্দ্র উপন্যাস। চতুরঙ্গ উপন্যাসটি ১৩২১ সালের সবুজ পত্রে 'জ্যাঠামশাই, 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' একরূপ নামে পরপর প্রকাশিত হয়। চতুরঙ্গ উপন্যাসটি ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রঙীন। সবাক।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সুমন মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজনা—অভীক সাহা, ক্যাম্পফায়ার ফিল্মস।

চিত্রগ্রাহক—ইন্দ্রনীল মুখার্জী।

সম্পাদনা—অর্ঘ্যকমল মিত্র।

সঙ্গীত পরিচালনা—দেবজ্যোতি মিশ্র।

কণ্ঠদানে—আমানত আলি, কার্তিক দাস বাউল, পরমা ব্যানার্জী, অরিজিৎ চৌধুরী।

অভিনয়ে—লীলানন্দ স্বামী—কবীর সুমন, দামিনী—ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শচীশ—সুব্রত রায়, জ্যাঠামশায়—ধৃতিমান চ্যাটার্জী, শ্রীবিলাস—জয় সেনগুপ্ত প্রমুখ।

এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ।
'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী ও
'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।

জ্যাঠামশায়

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে ; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা শোভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম ; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল, আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম, চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু, একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরো তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না। তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি তো ভারি অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা



স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন; থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয়ভক্তি করিতেন--গো ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উলটা দিকে। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না, তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা, জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝর্নার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছল্‌ছল্‌ করিত। তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তার সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন; মাইডিয়ার নরেন, চরণকেশ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জান না, অতএব ওটা বাজে কথা; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ,



তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয়, কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি; তার পরে শেষ কথা এই যে আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয়-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন-সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কাবণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

৩

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বঁড়শি তখন গলায় বাধিয়াছে, বিঁধিয়াছে; তাই এক পক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হবিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন; দাদার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না; মুর্গি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ইঁহারা এত দূর গিয়াছিলেন যে, মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহাতে না আছে পুণ্য না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিশের বিজ্ঞাপন বা চোখ-রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী' তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয় বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উলটা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।



বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেশকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নেই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর!

হাঁ, আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমবা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?

হাঁ, আমার এই চামাব মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইযা ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য বহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল, আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভিতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না, শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

৪

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইঁহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী, আচারভ্রষ্ট, এবং সেই কারণে সেবায়েত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন, তিনি



দেবদেবী মানেন না; খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না; মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নেই।

মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েত-পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে-ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কী?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাক-ঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কী হে? জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা। দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্‌যোগ কবিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসন-বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়াপরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষেব একটা স্বাভাবিক সুবদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই, শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই-যে শয়তানি চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কতবড়ো চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্‌কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুডবাই শচীশ।"

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।



শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল—তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিস-পত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সে দিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারংবার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ ধরিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত এবং সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্‌ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন এবং পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন।

৫

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কী?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননির 'পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাস্টারি করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর-দুয়ার, তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এ দিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন তো একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর। কিন্তু, বইগুলো?

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।



জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনই লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, এসো, আমার মা এসো। ধুলায় কেন বসিয়া!

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না; তাঁর চোখে ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল!

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না। আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগলা জগাই বলিত, আজও আমি সেই পাগল আছি। —বলিয়া জগমোহন নিঃসংকোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন; মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষ-ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নেই।

ননিবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী। সাত জন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উলটাপালটা; আর আমার কথা যদি বল, কখন নাই, কখন খাই, তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালা অনুভব করে নাই, এমন-কি, মা থাকিতেও না। কেননা মা তো তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত; সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু, জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া!

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননিবালাকে কোথাও কিছু সংকোচ করিতে দিলেন না। ননির বড়ো ভয় ছিল জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না, সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না; সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না, এই তাঁর পণ।

জগমোহন জানিতেন, এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননিও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দু-চার দিনের মধ্যেই শুরু হইল। ঝি আগে মনে করিয়াছিল, ননি জগমোহনের মেয়ে; সে একদিন আসিয়া ননিকে কী-সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননির মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।



জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি, এ কী কাণ্ড জগাই! পাপ বিদায় করিয়া দে।

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?

কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাসপাতালে পাঠাইব? হরিমোহনের এ কেমন কথা!

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস কাকে রে!

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালের ওপাশেই বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে, ইহা সহ্য করা যায় কী করিয়া!

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সে কথা তিনি সর্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সেজন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান। জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মতো অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলা পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননিবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননিকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, তাই বটে! তুই এখানে!

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিংবা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, ননি!

এমন সময় জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিলেন, বেরো! আমার ঘর থেকে বেরো!



পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিশ ডাকিব।

পুরন্দব একবার ননির দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননি মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কী। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, শচীশ জানিত পুরন্দরই ননিকে নষ্ট করিয়াছে; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এইজন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত, কলিকাতা শহরে আর---কোথাও পুরন্দরেব উৎপাত হইতে ননির নিস্তার নাই, একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারতপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননি একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দব একদিন লাথি মাবিয়া ননিকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তাব পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল, একে তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে, তাব পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ তো কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই-সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁব এক প্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে, ইহা তাঁব কাছে বড়োই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে, এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননির একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী কান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণ মূর্তি ধরিযা তাড়া করিলেন যে, সে আর সে দিকে ঘেঁযিল না।

ননি দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিস্ট্‌মাসের ছুটি। জগমোহন এক মুহূর্ত ননিকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিশ ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যুবকটি বলিল, আমি ননির ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন।

অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমাব? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না, কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননির ভাই বটে। শচীশই যে ননির পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।



ননি মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী, দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননিকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটা শহরে চলিয়া যাই; সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব; যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায়?

উপায় আছে। আমি ননিকে বিবাহ করিব।

বিবাহ করিবে?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইন-মতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।

৬

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উস্কোখুস্কো আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কী সর্বনাশের কথা শুনিতেছি?

জগমোহন কহিলেন, সর্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মতো—তার সঙ্গে ঐ পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?

শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিযাছি; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি—আমার আয়ের অর্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি; আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ! আমি তোমার মতো ধার্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো। আমি রাগের শোধও লই না। অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, এ কী শুনি! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি!

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই? ঐ মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই—

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীর মতো! এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মতো বলিয়া বেড়াইতেছে যে, শচীশ যদি ননিকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন



পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করেন তা নয়, অথচ তাঁর ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত; একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননিকে বলিলেন, মা, আমার মনের মতো করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননি লজ্জায় মুখ নিচু করিল।

না মা, লজ্জা করিলে চলিবে না, আমার বড়ো মনের সাধ, আজ তোমার সাজ দেখিব এ তোমাকে পুরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুমকি-দেওয়া বেনারসি শাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননির হাতে দিলেন।

ননি গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না! আমি নাহয় বয়সেই বড়ো হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়ো। এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননি তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননির মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন, ননির দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননির দেহ পড়িয়া আছে; তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন সেইগুলি পরা, হাতে একখানি চিঠি, শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন;

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

—পাপিষ্ঠা ননিবালা

শচীশ

১

নাস্তিক জগমোহনের মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই :

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্মা-



পরা চাপরাসির ভয়ে লোক ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি--

জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?

কাদের?

ঐ-যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তাঁর মেসে গিয়া বলিলেন, চল্।

শচীশ বলিল, আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ?

আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো—

'আজ্ঞা হাঁ' বৈকি! যদি দরকাব হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে নবকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছাব! নাস্তিক!

ভবা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইযা বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইযা যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিযা আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-এক জন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম—কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্বে বলিল, হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে, তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশাইয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল



তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই. এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরো জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন-সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন; সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়, এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফসকাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই—সে যে আবর্জনা।

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্-এক জায়গায় শচীশ—আমাদের শচীশ-লীলানন্দস্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে, আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দস্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এ দিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া? শত্রুর দল যে হাসিবে! শত্রু তো এক-আধ জন নয়।

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই, কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তাহা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল, তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।



৪

গেলাম লীলানন্দস্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, শচীশ!

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে?

শচীশ বলিল, শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনই লোকসমাজে আমার নামে রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন -থাক্, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘন্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজী বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম; সে নমস্কার কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, তামাকটা সাজিয়া দাও তো হে শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোষ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসাটা অসংগত মনে করি না কিন্তু কী জানি- সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামীজি জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই--মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যাসমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ, এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না।



বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিযা এই তামাক সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে অবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষবকে উলটাইয়া দিযা শচীশ কিছু বা স্নেহেব কৌতুকে কিছু-বা আমার চেহাবার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়, জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমাব এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না—মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল, সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন; আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি—

শচীশ কহিল, তাঁর সেবার দরকাব নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দবকার যে আমারই।

বুঝিলাম, শচীশ এমন-একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারে নাই। মিলনমাত্র যে-আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত'; সে-আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্‌, আমাব তো নাই; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না—আমি যে আমি।

বুঝিলাম,তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব!



৫

আমাদের মতো এতবড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দস্বামীর নাম চার দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিযা তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন; সমস্ত দলবল-সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিযা তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়; তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে এক রকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবাশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই—কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম—চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনবাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি, গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্‌টিয়ারি করিয়াছি, পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিযা দেশের লোকেব মনটাকে খালাস করিব; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলেব গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি; ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল, আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

৬

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রধান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চসুরের ডাক— 'বামি'। আমরা ভাবের যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে



এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যালোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম, রসের লোক তো ঐখানেই—যেখানে সেই বামির আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি—সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে একদিন যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনাফার হঠাৎ-প্লাবনে উপচিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল, এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়া পরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গণৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্‌-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্‌-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দস্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরা পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন। দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।



এইজন্যই সময় নাই! বটে! পরদিন দামিনী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন কী করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবাব দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীব পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি কবিয়া ভক্তিব দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর কবিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকাব বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিযাছে —তবু তার তপস্যা এমনি করিযা চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবাব কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই সুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইযা রাখিল!

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিযা উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, আমার মাথা ধরিযাছে। যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিযা গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভুষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না, তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া উঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, ধন্যি বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামিজী হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরো বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে—ও বেচারার দোষ নাই।



আমরা প্রথম আসিয়া কয়েক দিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল, তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুকরো টুকরো হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরো এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্‌টন্ করিতে থাকিত। এক-একবার ভাবিতাম, দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না—ইহার মধ্য হইতে একে- বারে এক ছুটে দৌড় দিব; সেই যে চামারদের ছেলেগুলোকে লইয়া সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাটের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

৮

গুরুজি প্রতি বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন? সে যে বড়ো শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির



দিন ছিল, সম্বৎসর ইহার জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কী অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া!

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

৯

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ! একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজী বলিলেন, আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামেব মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন—আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে—

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে সাঁঝের আলো।
মিলিয়ে গেল এক নিমিষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামিজী অন্তরা ধরিলেন---

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও—তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সুমদ্র-ভার সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল---অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার



চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই—সে কিছুই জানে না কেবল তার ব্যথা আছে সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিংবা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্‌ঝপ্‌ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিযা মাথা ঠেকিয়া গেল, আর এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম —সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলের উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি; আমার জাগ্রৎচৈতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

জানি না কতক্ষণ পরে—সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়—অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নেই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম। তার গায়ে রোঁয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?

দামিনী

১

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্যবাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।



গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন, মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল।

কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না! গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু সেটা আমবা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না দেখিতে পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মতো আমাদিগকে এ-দিক ও-দিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর আমি— আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর সুরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—

দামিনী কহিল, না।

কেন বলো, দেখি।

পাড়ায় নাড়্‌কুটিতে যাইব।

নাড়্‌কুটিতে? কেন?

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই—

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দমকা হাওয়ার মতো চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে তো অবাক। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে, আর ঐ একটুখানি মেয়ে ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ!

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া



একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন, আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ঐ কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুম্‌ঝুমির মতো বার বার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কী করিতেছ? ও ঘরে আসিবে না?

দামিনী কহিল না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে, তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই তো গেল চিল। আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলিন্যও তেমনি। সে একটা মূর্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা, কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন?

কোন্‌খানে?

গুরুজির কাছে।

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না।

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে—

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে— আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে, বাহির হইতে, যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে; আর



তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি- —নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ, এটুকু জানে যে, তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরী বীণার ঝংকারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে, কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না; তারা যা, আমরা তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি -এইজন্য তারা যদি-বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো-বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু-- যাক, এ সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ-সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত- -অন্তত, সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁষে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া; দামিনী শচীশকে কেবলই এড়াইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উলটা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কি দেখিল কী হইল সেই-সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা তাহা বকে- -পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয়তো সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিতাম, শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উৎসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে সেখানকার যমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে শচীশের চোখ-কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে শুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল, গোয়ালাবাড়ি হইতে এক ভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মুলতুবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন-কি, বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির 'পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইজন্য রাখিয়া আত্মমর্যাদা-উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।



কিন্তু, আশ্চর্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না; বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু?

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, একবার—

দামিনী বলিল, উঁহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন-না।

শচীশের সামনে দামিনীর এই প্রকার অনুরোধে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুশকিল হইয়াছে—কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া বাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড়ো দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সামনে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেই দিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিসটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল— সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কী যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে—

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিন জনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত— আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয়, অথচ উপলক্ষ সাজিয়া, যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি!

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন



ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কী-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়ে শচীশ বলিল, ভাই বিশ্রী, প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না।

ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই, আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বলো শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেইজন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। সেইদিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

এক দিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেক দিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন, এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, শিবতোষ বাড়ি ঘর-সম্পত্তি সমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে, গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এ দিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।



একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস্ করিয়া উঠিয়া আসিলাম; আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল, আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ, কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল। বুঝিলাম, ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোনো দামিনী, একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উস্‌খুস্ করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি তো সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্ করিয়া জ্বলিল; সে কহিল, কেন আছি! আমি কি সাধ করিয়া আছি! তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কী?

তোমাদের কোনো ভক্ত-বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত-বা আর এক মতলবে আর-কে বন্দোবস্ত করিবেন—মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?

শচীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।



সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণহাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন এক রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর, দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরো বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে, হয়তো আমি শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন তো। শ্রীবিলাসবাবুকে কী যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয় কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব?

তোমার মাসির ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন?

প্রথম, তিনি আমার আপন মাসি নন; তার পরে, তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার—

দায় কি কেবল খরচের? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।



আমি কি চিরদিনই সমস্তক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব?

সে জবাব কি আমার দিবার?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে?

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই; আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই। সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন!

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার 'পরে তার কোনো রকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো - দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুই চারিটি পাতা উলটাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না। লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সুদ্ধমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলোকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা, তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক। বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া?

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?



আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বার বার আসে আর যায়, মনে করে 'বসিয়া পড়ি', অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেইখানে গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম, শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলই নিঃশব্দে উলটাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা কবিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু, কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপুরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী! দামিনী!

দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কী চেহারা! প্রচণ্ড-ঝড়ের-ঝাপটা-খাওয়া-ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কী কথা আপনি বলিতেছেন?

না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এত বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনই নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম করো তুমি।



শচীশ বলিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোন অপরাধ করিব না। এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল, এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি, গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না, কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে, একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন, তাঁর দিনে বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলো ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেক বার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনোমতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি, এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারে বন্ধ। আমার যে কয়েকটি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুর-ছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।



৬

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা-ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কী হইয়াছে?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয় — আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গিয়াছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে।

সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এইরকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল — তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চালতা গাছ ঝুঁকিযা পড়িয়াছে সেইখানটার ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিনে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময়ে শচীশের কী মনে হইল, সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিযা যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল দামিনী!

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়হাত করিয়া কহিল, প্রভু, আমার একটা কথা শোনো।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?

আমি থাকিতে পারিলাম না; বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি।



আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে-পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে-পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে! প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিন জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বলো আমি তোমার কী করিতে পারি।

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস- যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু! আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না। তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

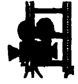
আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীবিলাস

১

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়াচুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে শিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই।



থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্‌-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা— বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে শিশুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে— যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। এই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু আমার দামিনী!

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদগর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী— কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই—গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম 'সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ' এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়—

সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এত বড়ো অমানুষ আমি নাই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই! দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দস্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত-পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে, আমিই ছিলাম এক্‌জিক্যুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট্‌স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্‌।

শচীশকে বলিলাম, চলো এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরী হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী করিতে হইবে বলো।

শচীশ বলিল, তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্‌বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল হুল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল, মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।



দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ তো, শহরে এখনই নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

২

যাই বল, আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পাবি না। একদিন তো জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট্ স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার, যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো—সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবার—

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো, এ তোমার ভূগোলবিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উলটা কথাই শোনা গেল! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন। সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই



সেই আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নাই; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্‌—চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত— যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দস্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকিরফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদী পার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখা-চখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে



পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে--

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি এক পাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো। আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি?

আমি বলিলাম, দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেইজন্যই বড়ো দুঃখে কিংবা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যেরকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত—ঐ শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বৈকি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি।

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই। ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর্‌।

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে



আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে, সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুর্‌দুর্‌ করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে, ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া? দামিনী ভাবিল, দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী! দামিনী! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলো অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়্‌ ধড়্‌ করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি, শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইযা আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্‌জ্বল্‌-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দেব দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এই কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল



ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব — চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

৪

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিক্‌ঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন।

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানারকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ্‌ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড় ভাঙিয়া হুড়্‌মুড়্‌ দুড়্‌মুড়্‌ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চিৎকার করিতেছে।

এইরকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয় যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোন্‌ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এময় সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কে ও!

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গর্‌গর্‌ করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল, দেবতার পেয়াদাগুলা তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে।



অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়্‌পড়্‌ শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চিৎকারশব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারী একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি চুরমার হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে



তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে—বলিয়া দামিনী বুকে দম্ দম্ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনই দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, এ কী! তোমার অসুখ করিয়াছে না কি?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে টীটি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু-বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে, কিন্তু ভাইরা কেহ-কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘাড় নাড়িল; বলিল, তারা বড়ো গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয় 'এখানে জায়গা নেই'। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হইলে কোথায় যাইবে?

দামিনী বলিল, লীলানন্দস্বামীর কাছে।

লীলানন্দস্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজী কি তোমাকে লইবেন?

দামিনী বলিল, খুশি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দস্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক—কিন্তু—

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।

দামিনী বলিল, বলো, শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে—

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, ও কী কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

আমি বলিলাম, মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

বাজে কথা! কাকে তুমি বল বাজে কথা?



এই যেমন, লোকে কী বলবে, ভবিষ্যতে কী ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর, আসল কথা?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে।

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, আমর দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্তত‌পক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই, সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু, এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না; অন্তত, তার কোনোরকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমন-কি, তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না-করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান?

আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন আমার ইংরেজী বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু, নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল - অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু, অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়ালক'টার মধ্যে বার বার ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ করিবার সময় পায় নাই; বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে। 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।



কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্যসাধন নয়, এ যে অসাধ্যসাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন, দিনগুলাও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগলামি কবিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক—

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তার পর?

তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগলা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারও চিঠি খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ—ত্রুটি মার্জনা' এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভিতু মানুষ। সে হয়তো এতক্ষণে নদীর ও পারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা



তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?

এবারে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে, পাড়াব লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরো ধুম হইল কাগজে। পরবারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নবরক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করো'সে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না আমার কাজ অন্যত্র।

দামিনী বলিল, আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ তো বলিল, 'আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করো', কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না—ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা—কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুই জনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা; প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে এক্‌জামিন-পাসের পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করিলাম—পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই,এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না—চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয়, সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না, কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার—স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়েবামুন বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত



করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব ক'টাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলই উলটা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

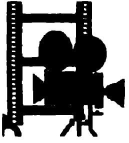
সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সঙ্গে কারও মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও----সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

মুসলমানীর গল্প



মুসলমানীর গল্প —রবীন্দ্র ছোটগল্প। মুসলমানীব গল্প' শীর্ষক বচনাটি 'ঋতুপত্র' পত্রিকায় আযাঢ ১৩৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পরিচালক—প্রণব চৌধুরী।

প্রযোজনা—পিত্রাশীষ মার্কেটিং এন্টাবপ্রাইজ।

চিত্রগ্রাহক—প্রদীপ চক্রবর্তী।

সম্পাদনা—নীলাঞ্জন মণ্ডল, অসিত বোস।

সঙ্গীত পরিচালনা—দেবজ্যোতি বোস।

কণ্ঠদানে—শুভমিতা।

অভিনয়ে—কমলা—মুমতাজ সরকার। এছাড়া সুদীপ মুখার্জী, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, বিপ্লব চ্যাটার্জী প্রমুখ।

খসড়া

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলই চোখের জলের দোহাই পাড়তে হত। শুভ কর্ম ও অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট্‌ খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে।

এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত 'পোড়ারমুখী বিদায় হলেই বাঁচি।' সেই রকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন-মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে।

কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, সেই সঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে।

তার কাকী কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ্‌ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে। কোন সময় কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারি দিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে। ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোন্‌দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল এক রকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেই জন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।"

ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন—বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার



পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্‌ ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল— তার এক স্ত্রী আছে, আর-একটি নবীন বয়সের সন্ধানে সে ফিরছে। কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ।

কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ।"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম জানো তো মা!"

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হল তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনাবাদ্দি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, "বাবাজি, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।"

শুনে সে আবার ভগ্নিপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।"

কাকা বললে, "বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তার পর মেয়ে এখন তোমার—তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও। আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।"

ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই।"

ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে সব লাঠি হাতে।

কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার। সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই।

কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, "বাবাসকল তফাত যাও, আমি হবির খাঁ।"

ডাকাতরা বললে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যাবসা মাটি করলেন কেন।"

যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হল।

হবির এসে কমলাকে বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমাব কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।"

কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মসুলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো—যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।"

কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখো,



আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।"

হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।"

কমলা কেঁদে বললে, "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।"

হবির বললে, 'বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। নাহয় একবার পরীক্ষা করে দেখো।"

হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, " আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।"

বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।"

কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কাকী এসে দেখে বলে উঠল, "দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!"

কাকা বললে, "উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।"

মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তার পর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল। চিরদিনের মত বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পুজা-আর্চা, হিন্দুঘরের আচার-বিচার, মেনে চলতে পারবে।"

এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ণ। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয় নি, কিন্তু সে মাকে পূজা করত অন্তরে। সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে এই রকম সমাজবিতাড়িত অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেত না। সেখানে কাকী তাকে 'দুর ছাই' করত—কেবলই শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে ম'লেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকীর ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। রাজপুতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারি দিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।



অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে-মনে বাঁধা পড়ে গেল।

তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে, "বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পূজো করি, তিনিই আমার দেবতা—তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি—আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না—আমার নাহয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এ দিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে—ওর নাম হল মেহেরজান

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হল পূর্বের মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে দুঃখ তাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়।

কিন্তু তারই পিছন পিছন তার এক হুঙ্কার এল, "খবরদার!"

"ঐরে, হবির খাঁর চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিলে।"

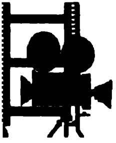
কন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকাবাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।

সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কারও জাত বিচার করেন না।—

"কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভয় নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করে নি। কাকীকে বোলো অনেক দিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়েছি, সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব তা ভাবি নি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখনো দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

২৪-২৫ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৬২

ল্যাবরেটরি



ল্যাবরেটরি —রবীন্দ্র ছোটগল্প। ল্যাববেটবি গল্পটি ১৩৪৭ সালেব শাবদীয়া সংখ্যা, আনন্দবাজাব পত্রিকায প্রথম প্রকাশিত হয়।

পবিচালক—রাজা সেন।

চিত্রগ্রাহক—দীপাঞ্জন ঘোষ।

সম্পদনা—অর্ঘ্য কমল মিত্র।

সঙ্গীত পরিচালনা—পার্থ সেনগুপ্ত।

অভিনয়ে—রবিনা ট্যান্ডন, অর্পিতা চ্যাটার্জী, সব্যসাচী চক্রবর্তী, সাহেব, জুন মালিয়া প্রমুখ।

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র, অর্থাৎ ব্রিলিয়ান্ট্, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারি।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁট মাপের।

রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডান হাত বাঁ হাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এ-সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি-নামক একটা অ্যাব্স্ট্রাক্ট্ সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যান্টের দুই ভরা পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' বলে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানা-ঘরের দাগ দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়ে ছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে—এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল, আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

এক রকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে



লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মন প্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে, আমেরিকা থেকে, এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাত পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সট্‌বুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরোনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনাফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমন সময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত--জ্বলজ্বলে তার চোখ--ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দু-বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি?"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনো বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে--সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্ঠি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, "বল কী! শয়তানের?"



মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্‌ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা, আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনো ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামি ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ঝক্ করছে ক্যারেক্টরের তেজ —বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে, 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ি আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী ব'লে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমত। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে



ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।''

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্‌-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে—নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটা চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল—মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সে সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরো কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারী ছেলে নয়,

কেবল সেই মাড়োয়ারী ছেলে নয়, আরো দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদূষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে বই টেক্সট্‌বুক কমিটির



অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে ব'লে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালু-চুল-ওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দর-হানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্‌ছম্‌ করে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, 'হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্ট্‌গ্রাজুয়েটি মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।'

কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট, কখনো-বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার দুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই—গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, এ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা



মেয়েরা ঠাকুর-দেবতার দালালদের দালালি নিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কি মান?"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুর্‌রে। শিলা ভাসে জলে! মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এস্‌সি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো।—তা, তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুরীমশায়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদীর তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ্‌, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রাখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখ টাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশাল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্ঠি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী! পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে? যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ি সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"



সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহাহা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ি ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্‌কে পাঠিয়ে দিই ঢেকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর-কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমত মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুক্‌ধুক্। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোওয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বয়সে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা, একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে।"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বল — সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমাব একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ককে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায়। আর-কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিকে আছে কী করে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতই ফলেছিল, বলেছিলুম ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক ছিলুম না, সেটা আমাব বাঁচোয়া। মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে



গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এ-সব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে—এটা একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বৈকি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল। আর কি! তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ককষার খেলা।"

এই বলে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দুঘণ্টা ধরে রঙে-চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি বলে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যান্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঐ অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?"

"চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মরতে মরতে এই যে ও সেরে উঠেছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশ-গুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরো বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাবুর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দূর সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। ইস্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন—"



"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না। ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসার্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ! পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।" কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

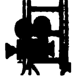
"কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না।"

"সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কি আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্‌ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, "ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডাম্স্, বললুম ইম্‌বেসীল। ব্যস্, ইখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।"

"পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা—লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু



আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো ; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরো বড়ো।"

চৌধুরী জিগ্গেসা করলেন, "কোন্খানে সব চেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকছে।"

"বলব? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল ব'লে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার থই পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধূপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক পুজো ছিল যখন, এই সব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমল কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর অমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি লিখে সহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত?"

"সত্যি কথা বলব? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুর ঘুর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্গেসা করি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দু-চার জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দু-চার জন?"

"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কি সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠি-লিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনো আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ, মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস



আমার নেই তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এইখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাছ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদিসৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝোপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

সাদা শাড়ি প'রে, মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে, সোহিনী মুখের উপর একটা শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ করা স্যান্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায়, আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানে এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়!"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়! ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ!"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালের সব-সেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজন যাজন, আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি যে মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এ-সব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের



মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়েন্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। এক সময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ!"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজ্‌রা তাকে বলে ক্োয়াইটানিয়েঙ্‌। চমৎকার ফুলের শোভা—কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি. ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কী জানেন?"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই। এ কথা তুমি বিশ্বাস কর কি।"

বলা বাহুল্য, এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনো জড়ো হয় নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে অমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে? বসন্তের নানা ফুলের যেন-- থাক্‌, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধুনি বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পূজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল স্টীমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকক্ষণ তাকে দেখা যাবে সকালবেলার ছায়ায় আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে লাগত। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর



সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধি-বিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে. তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ ব'লে। নীলার জীবনে কখন এক সময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে, তার চুলে। বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স্‌, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে!"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার!"

সোহিনী মনে মনে বললে, "নাঃ, আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল।—কোন্‌ ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।"

"কোন্‌ ফুল বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও বুঝেছি। তার পাঁচটি পাঁপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে?"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা! পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"



ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? পা ছুঁয়ে প্রণাম কর।"

"থাক্ থাক্" ব'লে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা ভাপা দই।

বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এ-সব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"

ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি, বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গিতে চলছিল—রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনি-মুক্তো-পান্নার-মিশোল-করা একহারা হার-জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল, কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়াদেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার আরো-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরো ভালো।"

"আপনি জানেন, দামি যন্ত্র-সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এসিয়ার এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে।



দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখায় ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচাবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না।"

"কেন!"

"ওঁর পিসিমা যেমন শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনো আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।"

"কেন।"

"বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙন-ধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন, যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে, কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাব্লিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব? আমার ট্রাস্ট্ সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন? কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট্ করতে চাও কেন।"

"শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে? মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই—



আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তার পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের-জোড়-লাগানো বুদ্ধি আমি কখনো দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা বলে ধরা পড়ব এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার—জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এ-সব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে, দু বেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জানো না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খেয়ে চট্‌ করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ রে, সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিক বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।—চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে?"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে?"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি?"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনো অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।"



সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।"

এক সময়ে একটু শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। সুখন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্‌ করে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালীর মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর মুখে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা'টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেশন-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দুঃখে যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্‌। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছু খেয়ে আসা হয় নি।"

কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছে দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমন সময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক ; ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে, হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম! খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা, কেন বকছেন! না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐ রে, পিসিমা দি সেকেণ্ড! এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে পড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জান, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না ; যারা সাত মুল্লুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা, বলো দেখি মিসেস—দূর হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী বলে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন! ডাকুন আমাকে সোহিনী বলে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি। শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিস্ট্রি রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।"



"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই—ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই বলে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"নাঃ, ঐ ছোকরাটার সামনে এ-সব কথার আলোচনা করতে নেই। বারুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিসি শুরু করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্‌কম্‌বাস্‌টিব্‌ল।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম, খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"রেবু, ওঠ্ বলছি ওঠ্। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পেরেচার চড়িয়ে দেয় হু হু করে। সাবজেক্টটা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা! যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্ দেখি, তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্ দুটো গ্যাল্‌ভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্ দেখি। সেই তোমার টাক-পড়া মাথার প্রোফেসর—নাম করতে চাই নে—দেখি কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলি নি কি তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে 'ভবিষ্যৎ'? হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে, তারা সকলেই তোমার এক বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝন্‌ঝন্ করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ সোহিনী, সুহি?—না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি করে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর



জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই!"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে, করলে কী! পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরো বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।"—

ব'লে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের একটি মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নীচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন—পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়েজামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদগতি আর সদগতি আমার দেশের।"

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু? এটা হবে ট্রাস্ট্ সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।"

সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনা করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনো নিই নি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনো হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেক রকম আছে, পুরুষ-বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যাবা মানুষ কোনো কালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার! আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশি হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।"

"লোভ নেই আপনার একটুও।"



"এত বড়ো নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে? —খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর দুই গালে দুটো চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

"কোন্‌, খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"

"বাড়বে বৈ-কি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব! যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশি করা! এ তো বাঁধাদস্তুরের দান-দক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘুরি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশি হবে, সন্দেহ নাই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্‌স্‌-পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামি বই, নানা মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড্‌স্‌, নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে এক বৎসরের বৃত্তির। খরচের জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে সেটা তো আপনি ধরে দেন নি।"

"আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।"

"খুশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটর। জর্মনি থেকে স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসর্চের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারি নে—সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড-মিস্ত্রি। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে এক চুল তার নড়চড় হত না, কলকব্জার তত্ত্ব বুঝে নিতে তার বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন বড়ো বড়ো কারখানার কাজ দেখাতে। এ দিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেন্টরা তাকে ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের



ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নষ্ট করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনো সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। সস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক-না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই ; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানলার বাইরে থেকে দেখেছি উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশনিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় নড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করেছেন, তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল্‌।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মুভ্‌মেন্ট্‌ খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও-না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমত না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা?"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাব্লিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা



বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে, সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়ার স্টাডি সার্কলে ভর্তি হতে চাস?"

"হাঁ, চাই।"

"আচ্ছা, তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর, কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?—মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল করে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা! ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নে? সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়?"

"দেখ্ নীলা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

"ইচ্ছা হয় তো করিস।"

"সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে—তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন?"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে—তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ! তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন!"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো, কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"



চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বৈকি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চমৎকার।"

"চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনার দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি? মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আড্ডি ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। বিশ-পঁচিশ বছর প্র্যাক্‌টিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী! নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্ট্‌রাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো 'ব্যাস'।"

"আচ্ছা, তাই ভালো।"

"যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্কুবিহারী, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপস্‌কে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত



এই সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মান্‌ব না আপনার অদৃষ্ট, মান্‌ব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নীচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন—আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, আর মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "এক সময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই—সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

ব'লেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে 'পরিস্থিতি' সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা?"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই-করা।"



"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিস্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা, সে আলোচনা থাক্‌। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ, পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার?"

"হাঁ, জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি?"

"হাঁ, সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরো কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বেআইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি—আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমাব মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না পৌঁছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদ্‌গদকণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"



রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরো দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাসো না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি, বাসি! কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী। ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হ্যায়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেব। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?"

ব'লে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন অশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন্ বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, 'যাব না, যাব না, যাব না।' হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই।—জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট্ করব তোমাকে, তোমার নাম আছে দেশ জুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বৈ তো নয়।"

ব'লে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"



দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।"

ব'লে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।"

বলে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চারি দিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান!

বার বার করে বললে, "আমি খুলি নি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্ত বুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, "আওরত! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বার বার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে।

ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাট-করা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইণ্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানী ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"



বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন', রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল---নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে, 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ', তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

রেবতীর মনে হল—এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জ্বালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।

বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনো না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না।"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জান না তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরো বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিষ্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দু হাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।



পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে—তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে ; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এ দিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যখন বলত 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে—'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব।' ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনো অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীর মনকে আরো অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানা রকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই আমাদের কাছে এর দাম কিসের—আসল দামি জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি!' ব'লে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন বলেই মনে করে—ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা। মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুল্‌স্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমাব।"



"ভাষার তুমি মস্ত সমজদার কিনা। এ তো কেমিষ্ট্রি ফর্‌মুলা নয়—খুঁত খুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবু?"

"ঐ-সব মস্ত মস্ত সেন্টেন্‌স আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত! তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে—'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন'—গ্র্যান্ড্‌! তোমার ভয় নেই, আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে, কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয় ; Dear friends, allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club–the Great Awakener ইত্যাদি। এমন দুটো সেন্টেন্‌স্‌ বললেই বাস্‌—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে—ঐ যেখানটাতে আছে—'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্ন-শৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'—যাই বল, ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে? তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা দুলিয়ে নাচবে। এখনো সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন ক'রে সাহেবি পোশাকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচ্‌মচ্‌ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ, এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম ; আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে করে আপিসে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য! কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair?"

নীলা বললে, "ডক্টর ভটচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন এটা বাজে কথা, না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সত্যি কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানীক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম?"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"



"এখনই?"

"হাঁ, এখনই।"

ব'লেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। ওর মুশকিল এই যে, অনুকরণ করবার কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এই সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন!

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মন্‌ড্‌হারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্তার ভটচাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছট্‌ফট্‌ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহরণের রিহর্সলমাত্র—লঙ্কাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা।

হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকারবিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট্ প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ প'রে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপা-টিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝি? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে , এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরো একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জান মা? অতিথি আজ পঁয়ষট্টি জন,



এ ঘরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের ঘরে—ঐ শুনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জান?—তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়্‌ফড়্ করছে। শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে?"

"তা জান না বুঝি? আসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট্ হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমত পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টীমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না?"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না মা! আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনো আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি। বলে দিচ্ছি, তোদের সে পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কি শুনেছ কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তর সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি-ফণ্ডে কোনো ছিদ্র আছে কি না। তাই নয় কি নীলু।"

নীলা বললে, "তা, সত্যি কথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরো অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস? এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ মা!"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টর ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেস্ট্রি করে গেছেন।"



"ওহে বন্ধু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পঁয়ষট্টি জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল।—কী রে রেবি, বেবি মুখখানা যে পার্চ্‌মেণ্টের মতো সাদা হয়ে গেছে।—ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যবসা ধরেছ নাকি মা।"

"গয়লা ধরার ব্যবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি, কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম—গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেষ্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "ম'রে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

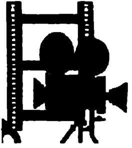
সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন ১৩৪৭

হিন্দী ভাষায় নির্মিত রবীন্দ্র কাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র

- ➤ মিলন — ১৯৪৭ সালে 'নৌকাডুবি' উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক নীতিন বসু নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ গিরিবালা — ১৯৪৭ সালে 'মানভঞ্জন' ছোটগল্প অবলম্বনে পরিচালক মধু বসু নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ জলজ্বলা — ১৯৫১ সালে 'চার অধ্যায়' উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক পল্ জিল্স নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ ফুলওয়াড়ী — ১৯৫৩ সালে 'মালঞ্চ' উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক প্রফুল্ল রায় নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ কাবুলিওয়ালা — ১৯৬১ সালে 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্প অবলম্বনে পরিচালক হেমেন গুপ্ত নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ ডাকঘর — ১৯৬৫ সালে 'ডাকঘর' নাটক অবলম্বনে পরিচালক জুল ভেল্লানি নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ উপহার — ১৯৭১ সালে 'সমাপ্তি' ছোটগল্প অবলম্বনে পরিচালক সুধেন্দু রায় নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ সমাপ্তি — 'সমাপ্তি' ছোটগল্প অবলম্বনে পরিচালক অমর মল্লিক নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।
- ➤ চার অধ্যায় — ১৯৯৭ সালে 'চার অধ্যায়' উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক কুমার সাহনি নির্মিত হিন্দী চলচ্চিত্র।

চার অধ্যায়



❑ ১৯৫১ সাল।

চার অধ্যায়---রবীন্দ্র উপন্যাস। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি ১৩৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সাদা কালো। সবাক

পরিচালনা---পল্ জিল্স।

অভিনয়ে---দেবানন্দ, গীতাবালি।

❑ ১৯৯৭ সাল।

রঙিন। সবাক।

পরিচালনা--- কুমার সাহ্নি।

রচনা
কাণ্ডি। সিংহল
৫ জুন ১৯৩৪

ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংযত ঝপাটায় সংসারকে তিনি যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়। এজন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সব-চেয়ে বেশী। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হয়েছে, এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।

একটা কথা সে বাল্যকাল থেকে বুঝেছে যে, দুর্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল, যারা পরেব অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া -দেওয়া ক্ষেত্রেব মধ্যে নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তাবাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপেই ওর মনে অল্পবয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাসগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় তিনি বিশেষভাবে যশস্বী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিয়েছেন যেহেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে-সম্বন্ধে দক্ষতাও সামান্য। ভুল করে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করে নিজের ক্ষতি করা বার বারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয় নি। ঠকিয়ে কিংবা অনায়াসে যারা উপকার আদায় করে তাদের কৃতঘ্নতা সব-চেয়ে অকরুণ। যখন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে মানুষটি অনায়াসে স্বীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বুদ্ধির ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পানি নি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্তী হলেও তাঁর স্ত্রী কখনো ভুলতে পারতেন না, যখন-তখন তীক্ষ্ণ, খোঁচায় উসকিয়ে দিয়ে তার দাহকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া অসাধ্য করে তুলতেন। বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতেও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ—যেমন সকরুন স্নেহ মায়ের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সব-চেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের



কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধিবিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষে মায়ের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে, তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এরকম অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, "এরকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাই অন্যায়।"

নরেশ বললেন, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।"

"চুপ করে থাকাতে আরাম আরো কম"—বলে এলা দ্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিয়ে চলবার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা। অনকূল ঝোড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নৌকো এগিয়ে দেয় না, নৌকো দেয় কাত করে।

এই পরিবারে আরো একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে। সে তার মায়ের শুচিবায়ু। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বসবার জন্যে এলা মাদুর পেতে দিয়েছিল—সে মাদুর মা ফেলে দিলেন, গালচে দিলে দোষ হত না। এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাকতে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা এই-সব ছোঁয়াছুঁয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে? এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে; এ তো কেবল যন্ত্রের মতো অন্ধভাবে মেনে চলা।" সাইকলজিস্ট বাবা বললেন, "মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না—এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরষদেরও এই দশা।" আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে এলা বার বার মাকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারে নি, বার বার তার উত্তর পেয়েছে ভর্ৎসনায়। নিয়ত এই ধাক্কায় এলার মনে অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নরেশ দেখলেন পারিবারিক এই-সব দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে উঠছে, সেটা তাঁকে অত্যন্ত বাজল। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোরভাবে আহতহয়ে নরেশের কাছে এসে জানাল, "বাবা, আমাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাও।" প্রস্তাবটা তাদের দুইজনের পক্ষেই দুঃখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা বুঝলেন, এবং মায়াময়ীর দিক থেকে প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। আপন নিষ্করুণ সংসারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়।

মা বললেন, শহরে পাঠিয়ে মেয়েকে মেমসাহেব বানাতে চাও তো বানাও কিন্তু ঐ তোমার আদুরে মেয়েকে প্রাণান্ত ভুগতে হবে শ্বশুরঘর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না।" মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বার বার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।



এলা যখন ম্যাট্রিক পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হল। নরেশ মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব সুন্দরী, পাত্রের তরফে প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত। মেয়ে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

সুরেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মানুষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন খরচ দিয়ে। দু-বছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণী হয়েছেন। সুরেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে। তাঁরই উপরে পড়ল এলার ভার। একান্ত যত্ন করেই ভার নিলেন।

সুরেশের স্ত্রীর নাম মাধবী। তিনি যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে স্ত্রীলোকদের পরিমিত পড়াশুনাই ছিল প্রচলিত; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেয়ে কম বৈ বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দূরে দূরে যখন ঘুরতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এমন-কি, গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

এমন সময় সুরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো শহরে যখন আছেন এলা এল তাঁর ঘরে; রূপে গুণে বিদ্যায় কাকার মনে গর্ব জাগিয়ে তুললে। ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্মী এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী-পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এর ফল ভালো হচ্ছে না। মাধবী মিথ্যা আরামের ভান করে ক্ষণে ক্ষণে বলতে লাগলেন, "বাঁচা গেল—বিলিতি কায়দার সামজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু। আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি।" ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারি দিকে প্রায় একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। সুরেশের মেয়ে সুরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস লিখতে লাগিয়ে দিলে তার বাকি সময়টুকু। বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নিয়ে সুরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চার দিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মুখ বাঁকা করে বললেন, "বাড়াবাড়ি।"

স্বামীকে বললেন, "এলার কাছে ফস করে মেয়েকে পড়তে দিলে! কেন, অধর মাষ্টার কী দোষ করেছে? যাই বল না আমি কিন্তু —"

সুরেশ অবাক হয়ে বললেন, "কী বল তুমি! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা?"

"দুটো নোট বই মুখস্থ করে পাস করলেই বিদ্যে হয় না"—বলে ঘাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মুখ বাধে—'সুরমার বয়স তেরো পেরোতে চলল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোখে যে ফ্যাকাশে কটা রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন, এ-সব কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।

যত শীঘ্র হয় এলার বিয়ে হয়ে যাক এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেশি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এসে জোটে—এমন সব পাত্র, সুরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য মাধবী লুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়।

ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদ্‌বিগ্ন হলেন সুরেশ, কাকী হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তিনি



জানেন সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ। নানারকম বয়সোচিত দুর্যোগের আশঙ্কা করতে লাগলেন, এবং দায়িত্ববোধে অভিভূত হল তাঁর অন্তঃকরণ। এলা স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ এলেন সেই শহরে। দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মানত রাজ-চক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত। একদিন সুরেশের ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক সুযোগে এলা অপরিচয়সত্ত্বেও অসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে, 'আমাকে আপনার কোনো-একটা কাজ দিতে পারেন না?"

আজকালকার দিনে এরকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্যের নয় কিন্তু তবু মেয়েটির দীপ্তি দেখে চমক লাগল ইন্দ্রনাথের। তিনি বললেন, "কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাই স্কুল মেয়েদের জন্যে খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ?"

"প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন।"

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বললেন, "আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি। তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।"

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

সে বললে, "আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।"

ইন্দ্রনাথ বললেন, "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।"

এলা মাথা তুলে বললে, "এই প্রতিজ্ঞাই আমার।"

কাকা গমনোদ্যত এলাকে বললেন, "তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুললে দোষ কী।"

কাকী স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে। তুমি যা ই মনে কর-না কেন, অমি বলে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।"

এলা খুব জোর করেই বললে, "আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব।"

এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হল, এখন কাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য—চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেন্ডহ্যান্ড। কিছু আছে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাতা উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভৃতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের



এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবক্স। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জলে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল—তবে কি শুনতে তারিখের ভুল হয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। এ-জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ য়ুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন; বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়ান্সে। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্যের বিশেষ সুপারিশে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল যেখানে ল্যাবরেটরি নেই। বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেনশন ভোগ করে জীবলীলা সংবরণ করবেন, নিজের এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ফরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "এলা, তুমি যে এখানে?"

এলা বললে, 'আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।"

"সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।"

"কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন?"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্য। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি লিখেছেন? আপনার কলমে বেনামি চলে না; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করবে না।"

"বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।"

"কিরকম?"



"তুমি লিখছ—ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সকরুণ আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ—দূর থেকে ভর্ৎসনা করলে কানে পৌঁছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হোক। বলেছ—তোমরা মায়ের জাত; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পার, মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক—তোমরা মায়ের জাত, ঐ কথাটাকে লবণাম্বুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হতে, এর পরে রায়বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হত না।"

"আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি—অমন ছেলে আছে কোথায়! একদিন ওদের সঙ্গে কালেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা—পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালো-মানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী—তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল, রঙটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই-সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যাপারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো—কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল, সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল্ এলাদি। মাঝে মাঝে কারও সুরে মধুর রস লেগেছে—কেনই বা লাগবে না? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মৃগয়া করবার দিকে ঝোঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সব-চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—"

"অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—"

"হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটো আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমশায়, সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।"

"বৎসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল। ডাক্তারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলুম। ঐ ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা বলে থাক—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।"

"এ-সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।"

"দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে। তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।"



"আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছে করি।"

"আচ্ছা। তা হলে এখানে নয়, চলো ঐ পিছনের ঘরটাতে।"

পর্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

"আপনি একটা অন্যায় করছেন—এ কথা না বলে থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতি-পরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারও আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারও আছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললে, "কী অন্যায়?"

"আপনি উমাকে বিয়ে করতে হুকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।"

"কে বললে চায় না?"

"সে নিজেই বলে।"

"হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।"

"সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।"

"তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।"

"প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, না-হয় ভাঙত, না-হয় করত অপরাধ।"

"ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।"

"ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।"

"তা হলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না—কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।"

"কাল-পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।"

"মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।"

"আপনি নিষ্ঠুর!"

"কেননা, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন, তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।"

"আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।"

"সেইজন্যেই ওকে তফাত করতে চাই।"



"ভালোবাসার শাস্তি?"

"ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তা হলে বসন্ত রোগ হয়েছে বলেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।"

"সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

"সুকুমার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে?"

"ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়?"

"অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ; সৌজন্যকে প্রশ্রয় বলে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই-এক ফোঁটা চোখের জলেই সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে?"

"রাগ করব কেন? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের অনুরোধে ন্যায়বিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেয়েরা আমাকে দেখতে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের হুকুম সেই ভোগীলালের মত কী?"

"সেই নিষ্কণ্টক ভালোমানুষের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে। ওরকম মুগ্ধ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলার সব-চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

"এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন কেন?"

"শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।"

গম্ভীর মুখে এলা বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, "আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।"

"এতখানি ক্ষতি করতে বল কেন?"

"আপনি জানেন না।"

"জানি নে কে বললে? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রঙ লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা কোরো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।"

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বললে, "তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।"

"আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।"

"সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই—তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।"



"আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।"

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"

"আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধশিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ কোরো না সংসার-পিঁজরেয় বেঁধে।"

"কিন্তু তবে আপনি যে ঐ উমা---"

"উমা! কালু!---ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ ওরা সইতে পারবে কী করে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টিসৎকার, সময় থাকতে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্ছি---। সে কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরশু রাত্রে।"

"হাঁ, ঢুকেছিল।"

"তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি?"

"আমার বিশ্বাস ডাকাতের কবজি দিয়েছি ভেঙে।"

"মনটার ভিতর আহা উহু করে ওঠে নি।"

"করত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মানত আমি শেষ পর্যন্ত মোচড় দিতে পারতুম না।"

"চিনতে পেরেছিলে সে কে?"

"অন্ধকারে দেখতে পাই নি।"

"যদি পেতে তা হলে জানতে, সে অনাদি।"

"আহা সে কী কথা। আমাদের অনাদি! সে যে ছেলেমানুষ।"

"আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"আপনিই! কেন এমন কাজ করলেন?"

"তোমারও পরীক্ষা হল, তারও।"

"কী নিষ্ঠুর।"

"ছিলুম নীচের ঘরে, তখনই হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগলছানাটাকে পিস্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসতুত বোন বাহাদুরি করে মারলে গুলি। যখন দেখতে জন্তুটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিস্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তা হলে তখনই তাকেমারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুজিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বুঝতে পেরেছ?"



"পেরেছি।"

"যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস?"

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

"যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না?"

"তার পক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বলতে আমার মুখে বাধবে না।"

"যদিই সম্ভব হয়?"

"মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্যন্ত জানি?"

"জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

"আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।"

"আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করি নি।"

"মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।"

"আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

"লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না?"

"করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।"

ভারি গলায় অওয়াজ এল, "কী হে ভায়া।"

"কানাই বুঝি? এসো এসো।"

কানাই গুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্যই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, "ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "কথা না বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের 'পরে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।"

"কী বল তুমি ভায়া। এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।"

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইন্দ্রনাথ বললে, "যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি। এমন-কি, এমন কথাও বলেছি, যে একদিন তোমাকে হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরো কিছু ভাঙবে।"



"বলতে বলতে কথাটাকে সত্য করে তুলছেন কেন? কী জনি, এখানকার সঙ্গে হয়তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।"

"থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বারো-আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাতা ভরতি হল।"

"মাস্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে বলে নয়।"

"অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।"

"ভায়া, আজ এই পর্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে কোরো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, বোলো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।"

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললে, "মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।"

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, "তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই?"

"সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ঐ সামনের টেবিলেই বসে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার করছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন বৃষভেরই পুষ্যি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।"

"আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই?"

"বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি হয় তা হলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুশমন তা হলে ওদের মারবে কে? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় শয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়া কাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বললে, টাকা চাই পঁচিশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম করলে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠলুম, শয়তান, এতবড়ো আস্পর্ধা তোমার। এখনই ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে।—সময় হাতে একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফন্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।"

"তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে—মাছির আমদানি শুরু হল।"



"সন্দেহ নেই, ভায়া, এখনই ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে-—ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।"

"চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?"

"অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি না। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা, তার বারো-আনা কুইনীন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ঐ গুটিকা প্রচার করার কাজে। তোমার নিবারণ ফার্স্ট ক্লাস এম. এসসি., লজ্জা ত্যাগ করে পড়ুক ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরো গোটাকতক নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্মিলন সাধনা করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ঐ সাবডিবিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারই প্রপিতামহের পোড়ো ভিটের 'পরে। তোমাদের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সব-চেয়ে মাথা উঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে—কেউ-বা ওদের বোকা বলুক, কেউ-বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর-কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকলজি অনুশীলন করবার জন্যে।"

কানাই বললে, "তুমি যে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হোক বা কাল হোক নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যাবা দেউলে হয় তারা বোঝে না বলে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়—দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সাব্লাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না—এ-কথা মান কি না?"

"মানি বৈকি।"

"তা হলে ওকে তোমাদেব মধ্যে রেখেছ কোন সাহসে?"

"কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই নে।"

"অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হোক বা না হোক, তুমি কেয়ার কর না।"

"সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।"



"ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তা হলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।"

"জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন?"

"ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসার্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না ভায়া। ওর প্রত্যেক সিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।"

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চার দিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারি দিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

"ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাই নে আমি।"

"আমি কাঙালের মতো করে কিছুই চাই নে বলেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদীশিখরে উঠেছিল আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে—তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর পায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে? আমি তা কখনোই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

"তবে!"

"তবে! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে—আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

"আর আমরা?"



"তোমরা কি খোকা! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে?"

"না যদি পারি তবে?"

"তবে কী। তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে। তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা—বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয়।"

"কোন্ কথাটা?"

"তোমার মনে কি রাগও নেই? এত ইম্পার্সোন্যাল তুমি!"

"রাগ কার 'পরে?"

"ইংরেজের 'পরে।"

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"তা হোক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।"

"সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পাবে না—লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয়; ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

"অদ্ভুত তুমি।"

"ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই, এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।"

"সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।"

"অত্যন্ত ভুল। আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে?"

"রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি



নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

"কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।"

"নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও; পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।"

"ঐ আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ। ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে। সেইসঙ্গে স্পষ্টভাষায় খবরও দেব যে, পুলিসকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তোমার দলের বোকারা আমাকে লিঞ্চ্ করে না বসে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনো চুল রয়েছে অযত্নে। বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লালরঙ-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য। খদ্দরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড; তার একপাশে কলম পেনসিল সাজানো দোয়াত-দান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটোগ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী।"

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, "অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।"

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, "জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনো।"

"ভালোই। তা হলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে—এ রকম দ্বন্দ্ব মনুর নিয়মে অধর্ম। এককালে আমি ছিলুম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম?"

"অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না?"

"কী বলে তবে?"

"শব্দ পাচ্ছি নে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সামনেটাতেই ঐ-যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন?"



"ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি- -ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবোধ আছে।"

"আমাকে দিলে না কেন?"

'নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার?"

"ওটাকে সহ্য করবার এমনই কী দরকার ছিল?"

"যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।"

"কী বল তুমি অন্তু! বিশ্বসংসারে তোমার ঐ একটি বৈ জামা আর নেই?"

"বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা?) বহু নরনারীর লজ্জারক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনো তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদেব পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল— কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।"

"সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে?"

"আশ্চর্য হও কেন? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তা হলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।"

"ছি ছি অন্তু, কেন আমাকে বললে না?"

"দুঃখ কোরো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরো দুটো আছে আপদ্ধর্মের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।"

"সৃষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ঐ চেহারাতেই—সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।"

"স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উলটিয়ে দিতে চাও?"

"হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণগরিমার উপরে সাহিত্যিক রঙ চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই শামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।"

"এ ঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।"

"আচ্ছা তবে বলো জরুরি কথাটা কী?"



"হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।"

"অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।"

"একটু ভেবে বলো কার রচনা—

তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

"কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।"

"পূর্বশ্রুত বলে মনে হচ্ছে না তোমার?"

"চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুখানি। অন্য লাইনটা গেছে কোথায়?"

"আমার বিশ্বাস ছিল, অন্য লাইনটা আপনি তোমার মনে আসবে।"

"তোমার মুখে যদি একবার শুনি তা হলে নিশ্চয় মনে আসবে।"

"তবে শোনো—

প্রহরশেষেব আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমাব চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

অতীনের মাথায় করাঘাত করে এলা বললে, "আজকাল কী পাগলামি শুরু করেছ তুমি।"

"সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে না পৌঁছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম—কাজের ক্ষতি করব।"

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেজের উপর ফেলে দিয়ে এলা বলল, "থাক্‌ পড়ে আমার কাজ। আলোটা জ্বেলে দিই।"

"না থাক্‌—আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনো আঁকড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে, সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনো দেহে মনে শৌখিনতার রঙ লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়। ফেলে দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদ্‌বর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুই ধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি খদ্দর পরেন না কেন?—মনে পড়ছে?"

"খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পার, আমার ছবি বোবা।"

"আমি আজ সেদিনরে পুনরুক্তি করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।"



"শুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন জীবনের ধুয়ো, পুনঃপুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।"

"তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তা হলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না—ভদ্রপাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশলাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জ্বলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত তা হলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার—ও একটা ছুতো, সত্যি কি না বলো।"

"ওগো, কতবার বলেছি—অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চার দিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম, এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

"আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।"

"আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।"

"অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম-বিদ্রোহ, পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র, যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।"

"অন্তু, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এতবড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।"

"আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।"

"অন্তু, ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ যখন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনো জানতুম থার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেণ্ড ক্লাসে। আমার দেহমনকে



প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন-কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব, তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই করুণা। উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।"

"কেন স্বীকার করলে?"

"নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ঐ স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারি নি।"

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে? সমাজ? জাতিভেদ?"

"ছি, ছি, এমন কথা মনেও কোরো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।"

"যথেষ্ট ভালোবাস নি?"

'ঐ যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অন্তু। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে দুর্বল বলে অপবাদ দিয়ো না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।"

"কেন হত না?"

"রাগ কোরো না অন্তু, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি!"

"স্পষ্ট করেই বলো।"

"অনেকবার বলেছি।"

"আবার বলো, আজ সব বলা-কওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আজ জিজ্ঞাসা করব না।"

বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদিমণি।"

"কী রে অখিল, আয়-না ভিতরে।"

ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। জেদালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রঙ, চঞ্চল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা, বুক বের করা; শর্টের দুই দিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওয়ালা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নৌকো, কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বৈদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হওয়া-যন্ত্র; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে তারই নকলের চেষ্টা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপ-মা-মরা ছেলের দুরসম্পর্কের আত্মীয়, অনেক উৎপাত সহ্য করে। কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চৌর্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝতে



প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, "তোর অন্তুদাদাকে প্রণাম করবি নে?"

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "শাবাশ, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি কোরো না ভাই, উদবৃত্তই বেশি।"

এলা অখিলকে বললে, "তোর কী কথা আছে বলে যা।"

অখিল বললে, "কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।"

"তাই তো। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস?"

"কাউকে না।"

"তবে কী চাস?"

"পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।"

"কী করবি ছুটি নিয়ে?"

"খরগোশের খাঁচা বানাব।"

"খরগোশ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে?"

অতীন হেসে বললে, "খরগোশ তো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য, আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা করে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ করে মনুর আধুনিক অবতার পর্যন্ত। এই কাজে তাদের ভীষণ শখ।"

"আচ্ছা অখিল, যা তোর ছুটি।"

দ্বিতীয় কথাটি না বলে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, "ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্‌জিঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম; মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুন্যাল হয়ে উঠেছে, অন্তু-অখিল রায়ট হবার লক্ষণ।"

"ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মানলে কেন?"

"মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতুম। থাক্ সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?"

"একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখ না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো?"

"কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারি নি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।"

"আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নিধুম জ্বলছে। এখনো তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।"

"এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্ছ না বলেই বুঝছ না। দলের কাছে



ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ, তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা বোলো না আমার জীবনে এখনো অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তবুও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্ত সুর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর?"

"ফিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অকৃতজ্ঞ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।"

"কেন? কী ক্ষতি হত তাতে?"

"আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে? মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোজা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্রাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিলে না; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।"

"এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।"

"নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।"

"মাথায় বড়ো।"

"হাঁ মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না-থাক্, আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।"

"কোনো নীচ উৎপাত করে নি?"

করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়, তারা বিশ্রী হয়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নীচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।"

"বোকাদের ভোলাবার জন্যে?"

"হাঁ গো, তোমরা বোকা! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক



দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারও মনে, তবু তারা বড়ো।"

"এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বার বার ভাবিয়েছে, সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেরও শাশুড়ির অসহ্য অন্যায় আধিপত্য। শাশুড়ির অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।"

"হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে—তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।"

"এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ির নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধূর 'পরে অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ি। কিন্তু শাশুড়িকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ঐ মায়ের খোকারা। অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বড়ো, কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়—মেয়েকে ভয় করে সেই স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যাথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন?"

"অন্তু, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই-সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না।"

"না ভুলতে পারব না। তুমি বললে কি না, পুরুষেরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না। তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ। হতভাগা যে-পুরুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তা লজ্জিত।"

"অন্তু, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই—সেটা বড়ো ইচ্ছা।"

"এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয়। সেই কল্পনার তুলির ছোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ শক্তির কর্ম, সেইজন্যেই এটা সহজ নয়। ঐ যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্যে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয়



নি। আপনার জীবনলোকে রূপের সৃষ্টিতে রস জোগাতে পারল না এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিন্নীপনা করে সেই মুখরা; নয় তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এইসব অকিঞ্চিৎকরের সীমাসংখ্যা নেই।"

"সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্তু। লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেয়েদের? বঞ্চনা করে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয়? পৃথিবীতে সব-চেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যাবসা সেই ব্যাবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি, এ-কথা যখন বইয়ে পউলুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি, সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে। যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই-সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মুখে বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।"

"ভালোই তো; তোমার সেই বক্তিব জন্যে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু অমাকে কেন? ভক্তি না হলেও আমার চলবে। মেয়েদের সম্বন্ধের যে ফর্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোষে।"

"তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পাবতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।"

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জ্বলে উঠল অতীনের দুই চোখ। পায়চারি করে এল ঘরের এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি, দেশের কাছে হোক যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বলো তো তাই বলো, বরদান বলো যদি তা বলতে পার; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ—দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।"

বিবর্ণ হয়ে এল এলার মুখ। বললে, "কী বলছ, ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি-বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই—সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে—অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয়



তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ডানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে?"

ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, "তুমি ভুললে কেন, অন্তু?"

"ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

"তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?"

"কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও সেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, জগতে একটিমাত্র কর্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা কজনে। তোমাদের সেই শানবাঁধানো সরকারি কর্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলই ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।"

"সরকারি কর্তব্য?"

"হাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকে দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্‌টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আসচর্য হয়ে ভাবলে - একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।"

"অন্তু, 'ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।"

"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তা হলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"

"অন্তু, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না? কেন আমাকে অপরাধী করলে!"

"সে তো তোমাকে বার বার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাকবে—ডাকবে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।"

"পায়ে পড়ি, অমন করে বোলো না।"



"বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক শোনাচ্ছে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে পাওয়া বলে! যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!"

"আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অন্তু।"

"কী বলছ! আজ পেয়েছে! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হল, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথগাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথায় পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমত চিনবে সে আশা আর রইল না—তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলায় বোড়ের মধ্যে!"

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, "তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। আমার চারি দিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন?"

"সেইজন্যেই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার 'পরে আমার বিশ্বাস সেইজন্যেই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস কবতে পারে নি। তুমি যদি সাধাবণ পুরুষ হতে তা হলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।"

"ধিক সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবি কর, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন? কাপুরুষ আমি। অসম্মতিব নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি বহুপূর্বে যখন সময় হাতে ছিল? ভদ্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।"

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বললে, "চলো অন্তু, ঘরে চলো।"

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে, "ভয়! এতদিন পরে শুরু হল ভয়! জিত হল আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনো মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সময় বলে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।"



"দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।" এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।

জানালা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "সর্বনাশ! ঐ দেখতে পাচ্ছ?"

"কী বলো দেখি?"

"ঐ যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু—এখানেই আসছে।"

"আসবার যোগ্য জায়গা সে চেনে।"

"ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ঐ মানুষটা।"

"আমি ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।"

"ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি বলে নিজেকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করি কোনোমতেই পারি নে। ওর ড্যাবা চোখ দুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।"

"ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ কোরো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না?"

"ওকে ভয় করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপাস জন্তুর মতো। মনে হয়, ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে—কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে তুমি আমার অবুঝ মেয়েলি আশঙ্কা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে। শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরো ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষা সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে।"

"এলা, ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ংকর বলে যে তা নয়, আমি ওঁর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে।"

"দেখো অন্তু, জীবনে অনেক দুঃখবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো দুর্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" অন্তুর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনই উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

"জানো অন্তু, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।"

"আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি?"

"না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ঐ শোনো পায়ের শব্দ। উপরে উঠে এল বলে।"

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, "বটু, এখানে নয়, চলো নীচে বসবার ঘরে।"



বটু বললে, "এলাদি—"

"এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নীচে।"

"কাপড় ছাড়তে? এত দেরিতে? সাড়ে আটটা—"

"হাঁ হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিয়েছি।"

"কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।"

"তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।"

"আপনি?"

"আমি ছাড়া।"

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, "আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্যপ্রয়োগে। এক্‌সেপশন পিছল পথের আশ্রয়, বেশিকাল সয় না বলে রেখে দিলুম।" বলে তর তর করে নেবে চলে গেল।

ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বললে, "চিঠি।" ওর অসমাপ্ত সৃষ্টিকাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে।

"তোমার দিদিমণির?"

"না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।"

"কে?"

"চিনি নে।" বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রঙ দেখেই অতীন বুঝলে, এটা ডেন্‌জর সিগ্‌ন্যাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি পড়ে দেখলে—"এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।"

কর্মের যে শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে সম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার ঘরে-বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণা। লাফ দিয়ে অতীন চলতি ট্রামগাড়িতে চড়ে বসল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা স্তরে ভরে ওঠা ডোবা; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোরুরগাড়ির চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্‌শেওড়ার বেড়া। ক্বচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচি ধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে, তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকার সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া রাবিশে



এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না।

"আপনি যে!"

কানাই বললে, "গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি।"

"ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে, বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাঁদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।"

"চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন?"

"বানালে এ ব্যাবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছোল, শেষ বাহুল্য খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালায়।"

"এবার বুঝি আমার পালা?"

"ঘনিয়ে এসেছে। কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে। সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"সেটা পুলিশের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল।"

"আপনি?"

"হাঁ, সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায়। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে। সেই সময়ে সরিয়েছি।"

অতীন মাথার হাত দিয়ে বললে, "সবটা পড়েছেন?"

"নিশ্চিত পড়েছি। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বৈকি। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয়।"

"কাজটা কি ভালো করেছেন?"

"কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারও নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মন্ত্রিপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তা হলে ঐ খাতাখানাই তোমার গ্রহস্বস্ত্যয়নের কাজ করত।"



"বলেন কী? সবটাই পড়েছেন?"

"পড়েছি বৈকি। কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তা হলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।"

"আপনার এই ব্যাবসার কথা দলের সবাই জানে?"

"কেউ না।"

"মাস্টারমশায়?"

"বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।"

"আমাকে বললেন যে!"

"এইটেই আশ্চর্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না করতে পারে তা হলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, তাই ডায়াবি রাখি নি, যদি লখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।"

"মাস্টারমশায়- -"

"মাস্টারমশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও কোরো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলে যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিশের পাঁশতলায়। কাজটা গর্বিত কিন্তু নিষ্পাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে কোরো না যেন। তোমার এ-বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেক্কা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তা হলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি—এর অক্ষর তোমাব জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইস্কুলবাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিশের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর, কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো। বাঙালি মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষার সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রূঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র কোরো না, প্রাণ থাকতে এদেশে ফিরে এসো না। বাইসিক্‌লটা রইল বাইরে। ইশারা যখনই পাবে সেই মুহূর্তে চড়ে বোসো। এসো বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।" কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল ভোরের আলোয়; সেখান থকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই; পথের শেষভাগে নিজেকে



কেবলই ঠকিয়ে খেয়েছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারে বারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, যার অন্ত নেই।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গোরুর গাড়ি চলেছে তার আর্তস্বর শোনা যায়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, "অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।"

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, "এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি?"

সে বললে, "কিছু জানি নে, কী করেছি।"

"এ ঠিকানা কেমন করে জানলে?"

এলা গম্ভীর অভিমানে বললে, "তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।"

"যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।"

"তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে ওঠে। শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি?"

"ধন্য তুমি!"

"তুমি ধন্য অন্তু! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে!"

"ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার অমোঘশক্তি।"

"মাস্টারমশায়ও তা জানেন।"

"এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভুতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি।"

"তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি।"



"কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।"

"জানি সে-কথা, মানব আমার দুর্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ!"

"এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্যে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।"

"না না, তোমার কেন হবে বিপদ। যা হয় তা আমার হোক। তা হলে আমি যাই অন্তু।"

"কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ঐ মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই পোড়ো ঘরটার মধ্যে। এসো, আরো কাছে।"

"রোসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।"

"হায় রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা!"

এলা একবার চারি দিক ঘুরে দেখলে। মেঝেব উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরানো ক্যাম্বিসের থলি। লেখাপড়া কববার জন্যে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসি মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীনের কোনো-এক দোসর আছে। এক থাম থেকে আর-এক থাম পর্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাঁতসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পঘন গন্ধ।

ঠিক এমন না হোক এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায় নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে। একদা এক জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় পোড়ো চালের খড়-বাখারি জ্বালানো চুলোব ভস্মাবশেষ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গারে আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেবা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, "আমার ঐশ্বর্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে, তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়---দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বস্‌তি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হুজুরশ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা ঘরে গোরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।"

"অন্তু, কোণে ঐ-যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি?"

"অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষ্মীর ঝাঁটার মুখে



রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যাবসা। এই পোড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ঐ যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করি নে; ওগুলোতে রঙ গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ঐ বাক্সের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বস্তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস—বেলোয়ারি চুড়ি, চিরুনি, ছোটো আয়না, পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হয় নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবাব চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্বপুরুষের ঘরে যা ছিল মজুত আজ তারই চোদ্দো আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।"

"এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের?"

"আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ঐ আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনো বিনা মূলধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভাবনা যে তার নেই তা বলতে পারি নে।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা?"

"হুকুম নেই বলবার।"

"তা হলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায়?"

"কল্পনা করতে দোষ কী। মানস-সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।"

"ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, "এতদিন ওগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তা-গলির নির্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে।"

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।"

"তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া, তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।"

"যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।"

অতীন হেসে উঠে বললে, "নিজেরই পাগলামির ফুল-স্টীমে এই অস্থানে পৌঁচেছি সে খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেবে এসো; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো—এসো এসো বঁধু এসো, আধো আঁচরে বোসো।

"হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন?"



"খেপব না? বললে কিনা ভুজমৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ!"

"সত্যি কথা বললে রাগ কর কেন?"

"সত্যি কথা হল? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ মাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ়, তবে জাঁক করে বলব, সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা।"

"অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বোকো না। তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি, এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।"

"এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধ-ভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেখানে আলুথালু চুলে চোখদুটো পাকিয়ে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।"

"এত কথাও বলতে পার, অন্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।"

"মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে নাকি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝোড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তম্ভ গাঁথতে বেরিয়েছ কেবল গায়ের জোরে।"

"তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি কেন ভুল করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ?"

"ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্‌চার। ওটা আমার নিদেনকালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বোলো না ওটা দেশকে ভালোবাসে।"

"দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু?"

"দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে-কথাটা ভুলে সামান্য আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অন্নপূর্ণা!"

"আমরা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারি নে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরো আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ কোরো না। জানি তোমার খুবই দরকার।"

"খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।"

"আমি মানছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।"



"ওটা তোমাদের সহজবুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।"

"আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমস্তই তোমার জন্যে এ-কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তা হলে বাঁচি।"

"কিছুতেই বুঝব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছে। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের যেমন তেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ঐ সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই। কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না! মনে মনে বললুম, আরো বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন ফাটা মাথাকাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটিতে, তখন ভেঙে পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।"

এলার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, "আঃ, তোমার সঙ্গে পারি নে, অন্তু! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে। অন্তু, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদেব মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।"

"বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস। আমাব কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা কোরো না। আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নাই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারি নে।"

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁষে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, "যেদিন মোকামায় খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য হাতে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। তার অনতিকাল পর থেকেই মনটা কেবল আকাশকুসুম চয়ন করে বেড়াচ্ছে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?"

"একটুও না।"

"তা হলে শোনো। ভারী মাল নীচের ডেক থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস—এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি কুলির অপেক্ষায়। নেহাৎ ভালোমানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বললে, কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্ছি।—হাঁ হাঁ, করেন কী, করেন কী, বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন,



আমার বাক্সটা ঐ আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে। তুলতে হল। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারী। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থার্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিল্কের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অট্টহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব ছিল তোমারই হাতে।"

"ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মনে করতে লজ্জা বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত! তখন তুমি হাসি চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে? মেয়েদের কী বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই?"

"থাক বা না থাক্ তাতে তো কিছু আসে যায় নি। সেদিন যে-পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্স্ নয়, লজিক্ নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যাব উপর মুদগরপাত কবে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ঐ ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ?"

"আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু?"

"বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা বলে?—আলো কমে গিয়েছে, এসো আরো কাছে এসো। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিই নে কেন? ঐ-যে তোমার দুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো পাড় দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারি দিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যেব মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চার দিকে ভ্রূকুটি করে ঘিরে আছে বড়োনামওআলা বড়োছায়াওআলা বিকৃতি।"

"কী বলছ, অন্তু!"

"অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্‌তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক্ পিক্‌নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন-কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ার খৃস্টশিষ্যকে ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরে তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খ্রীস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।"



"কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?"

"রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্চারাল ইকনমিক্স চর্চা করতে বলেন নি।"

"শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অন্তু?"

"অনেকদিন আগেই কানে-কানে বলে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই। দেবী! সবাই দেবী তোমরা! নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।"

"দেখো অন্তু, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোব করে ফিরে আস নি?"

"তা হলে বলি। অনেক কথা জানতুম না, অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।"

"তার পরে কি তোমার মত বদলে গেল?"

"শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সেই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল— অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো —নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কতজনই বা!"

"তখনো ওদের ছাড়লে না কেন?"

"আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চার দিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে

বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

"কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেন কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।"

"সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু, আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।"

"তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।"

"তবু বলো।"

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে- তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

"আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?"

"তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে---এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশউদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।"

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, "ফিরে এসো অন্তু।"

"আর ফেরবার পথ নেই।"

"কেন নেই?"

"অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।"

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ফিরে এসো, অন্তু। এত বছর ধরে যে বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।---অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

"উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই? নিশ্চয় আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না।



"আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না। গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিনী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।"

"বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিনী করতে পারব না।—থাক্ থাক্, ও-সব কথা থাক। এ-জীবনের নৌকোডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনো বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে।"

"কী বলব?"

"বলো তুমি ভালোবেসেছে।"

"হাঁ বেসেছি।"

"বলো আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনো।"

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললে, "আবার বলছি অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে— নাও এই আমাব গলার হার।"

এই বলে পায়ের উপর রাখল হার।

"কিছুতেই না।"

"কেন, অভিমান?"

"হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে পরতুম গলায় আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।"

এলা অতীনেব পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে।"

"লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।"

"তবে সে-পথ তোমারও নয়। ফিরে এসো, ফিরে এসো।"

"পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।"

"অন্তু, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।"

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল, "চললুম।"

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে; বললে, "আর-একটু থাকো।"

"না।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"কিছু জানি নে।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।"

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, "ছেড়ে দাও।" বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলায় ডাক শুনতে পেল, "এলা।"



চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।"

"সে কথা থাক্। এখানে কেন এলে?"

"বিপদ আছে জেনেই এসেছি।"

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে?"

"বটু।"

"তবু বুঝলে না মতলব?"

"বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

"তোমাকে মারতে পারলে এখনই মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্সি আছে বাইরে।"

চতুর্থ অধ্যায়

"আবার অখিল!---পালিয়েছিস বোর্ডিং থেকে! তোব সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বার বার বলছি, এ বাড়িতে খবরদার আসিস নে। মরবি যে।"

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে, "একজন দাড়িওয়ালা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল। তাই তোমার এ ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।---ঐ শোনো পায়ের শব্দ।" অখিল তার ছুরির সব-চেয়ে মোটা ফলাটা খুলে, দাঁড়াল।

এলা বললে, "ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।" ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এল, "ভয় নেই, আমি অন্তু।"

মুহূর্তে এলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল---বললে, "দে দরজা খুলে।"

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, "সেই দাড়িওআলা কোথায়?"

"দাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও খোঁজ করো গে দাড়ির।" অখিল চলে গেল।

এলা পাথরের মূর্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অন্তু, এ কী চেহারা তোমার?"

অতীন বললে, "মনোহর নয়।"

"তবে কি সত্যি?"

"কি সত্যি?"

"তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে।"

"নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে।"

"নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয় নি?"

"ও-কথাটা থাক্। সময় নষ্ট কোরো না।"

"কেন এলে, অন্তু, কেন এলে? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে।"

"ওদের নিরাশ করতে চাই নে।"

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, "কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে। এখন উপায় কী?"



"কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে যাব। ইতিমধ্যে যতক্ষণ পারি ঐ কথাটাই ভুলে থাকতে চাই। নীচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।"

খানিক পরে উপরে এসে বললে, "চলো ছাদে। নীচের তলাকার আলোর বাল্‌বগুলো সব খুলে নিয়েছি। ভয় পেয়ো না।"

দুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে।

"এলা, মন সহজ করো। যেন কিছু হয় নি, যেন আমরা দুজনে আছি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন? কাঁপছে যে। দাও গরম করে দিই।"

এলার হাত দুখানি নিয়ে অতীন জামার নীচে বুকের উপর চেপে রাখলে। তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

"ভয় করছে, এলী?"

"কিসের ভয়?"

"সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।"

"ভয় তোমার জন্যে অন্তু, আর কিছুর জন্যে নয়।"

অতীন বললে, "এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি একশো বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীর্ণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা দুঃখকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে—যেন আমরা মুহূর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে দুদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?"

"তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অন্তু—তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্‌বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন, তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।"

"ভীরু, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সব চেয়ে নিশ্চিত জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনই আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে—মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন—

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast silence."

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল।



বললে, "পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলেছে অন্তিম অঙ্কের দিকে। তারই একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে। আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয় নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইশুঁটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো, ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাৎ মতিলাল হাত পা ছুঁড়ে শুরু করলে, আজ নবযুগে অতীনবাবু নবজন্মের দিন—আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি কর, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, ছি ছি অতীনবাবু, বক্তৃতার ভ্রূণহত্যা?—নবযুগ, নবজন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধাবুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে— কিছুতে রঙ ধরল না"

"অন্তু, নির্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।"

"তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিলে, আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। স্নেহযত্ন, কুশলসম্ভাষণ, বিশেষ মন্ত্রণা, অনাবশ্যক উদ্‌বেগ, মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজও তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার, তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না-করতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি এসে উপস্থিত। আমি মুগ্ধ, তবু বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাসের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।"

"আঃ চুপ করো, চুপ করো অন্তু।"

"অনেক বাজে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং— সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।"

"মানছি, মানছি, একশো বার মানছি। তুমিই সে-সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন?"

"কোন্ মনস্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না; এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল? জানি, তুমি ভাবছ এতটা কী করে সম্ভব হল।"

"হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না—জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।"

"তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ঐ আঙুলগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের



অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল ছেঁড়বার সময় এল, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হোক।"

"বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া কোরো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ়—তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।"

"থাক, থাক, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্যেই আজ এসেছি।"

"সেইজন্যে?"

"হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।"

"না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া-আগুনের মধ্যে? জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তা হলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।"

"কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুধা! তুমি জান না, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার। শুশ্রূষা দিয়ে তার কী করতে পার, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে!"

"সত্য হারাও নি অন্তু। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।"

"হারিয়েছি, হারিয়েছি।"

"বোলো না, বোলো না অমন কথা।"

"আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠত।"

"অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়। নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।"

"স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ-সব কথা। সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক্ যত-সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?"

"অন্তু, মন দিতে পারছি নে।"

"আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ঐরকম গোটাকয়েক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারী ভারী দিনই তো বহু বিস্তর।"

"আচ্ছা, বলো অন্তু।"

"জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শখ হল পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরিশ ঘোষের ভঙ্গিতে আউড়িয়ে গেল—

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে



অনুরোধ করলে। ভবেশ বললে হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না।---তোমার ঘরে ঐ পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাটল। আশান্বিত মনে ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুললে, মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে? যত বলি থামো, সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধুবিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।"

"কোন্‌টা লক্ষ্য কোন্‌টা উপলক্ষ বাইরে থেকে বিচার কোরো না অন্তু। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্তু? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অন্তু নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।"

"সখী, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যেঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে? অতিশয়োক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্নেহের কণ্ঠে অন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইয়েছে মান।"

হঠাৎ অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, "পায়ের শব্দ শুনছি যেন।"

এলা বললে, "অখিল।"

আওয়াজ এল, "দিদিমণি।"

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী।"

অখিল বললে, "খাবার।"

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্তী দিশি রেস্‌টোরাঁ থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে যায়।

এলা বললে, "অন্তু, চলো খেতে।"

"খাওয়ার কথা বোলো না। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিকত না। ভাই অখিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তার পরে পলায়নেন সমাপয়েৎ— দৌড় দিয়ো যত পার।"

অখিল চলে গেল।

দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাতকানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম, সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ।---প্রশ্ন উঠল, 'ক'টা বেজেছে?' উত্তর 'সাড়ে দশটা।' সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে অতীনবাবু? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক।---কোথায়? না, মেথরদের বসতিতে; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।---সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী।---বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল---আপনি কি তবে বলতে চান---তীব্রস্বরে বলে উঠলুম---কিছু বলতে চাই নে।---এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারী করে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে



বললুম, তবে আজ আসি। দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউন্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে আমিই খুঁজে আনছি—বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউন্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলত হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।"

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে থামল। অখিল এল ছাদে। বললে, "কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, "কে এল?"

"অতীন বললে, "বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।" অখিল জোরের সঙ্গে বললে, "না, দেব না।"

অতীন বললে, "ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেন; অনেকবার দেখেছ?"

"না চিনি নে।"

"খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।"

এলা বললে, "অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিস নে।"

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, "বটু এসেছে না কি?"

"না বটু নয়।"

"বলো-না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।"

"থাক্ সে-কথা, যা বলছিলুম বলতে দাও।"

"অন্তু, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।"

"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।—তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাতে দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তর জীবনলীলা শুরু হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাম্ভীর্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে এই নাও জন্মদিনের উপহার—সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবি করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।"

অখিল এসে বললে, "বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরি কথা।"

"ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ঐখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনই পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।"

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, "সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।"

অতীন বললে, "অখিল, আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতে হবে। যদি তোমাকে



কখনো কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। বোলো এই রাত এগারোটার সময় আমিই তোমাকে জোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।"

এলা আর-একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "আমার জন্যে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্তুদা রইল, কোনো ভয় নেই।"

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলেছে এলা বললে, "আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।"

আদেশের স্বরে অতীন বললে, "না, কিছুতেই না।"

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল—কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাত্রে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অখিল গেল চলে!

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী হল, অন্তু?"

অতীন বললে, "অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।"

"আর সেই লোকটি?"

"তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজে ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস শুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা? আমাকে ভয় নেই তোমার?"

"তোমাকে ভয়, কী যে বল।"

"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ির গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তার পরে বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফত সে-মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনারের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় কোরো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

"আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে?"

"নাই বা বাঁচালে?"

"তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই—ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর—তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।"

"তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কি করেছি?"

"অনেক কথা জান তুমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।"



"কখনোই না।"

"কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসে নি? হুকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।"

এলা চমকে উঠে বললে, "সত্যি, বলছ অন্তু, সত্যি?"

"একটা খবর পেয়েছি আমরা।"

"কী খবর?"

"আজ ভোররাত্রে পুলিশ আসবে তোমাকে ধরতে।"

"নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিশ আমাকে ধরতে আসছে।"

"কেমন করে জানলে?"

"কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিশ আমাকে ধরবে, লিখেছে—সে এখনো আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"কী উপায়ে?"

"বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তা হলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।"

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, "কী জবাব দিলে তুমি?"

এলা বললে, "আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম পিশাচ। আর-কিছু নয়।"

"খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।" মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, "একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।"

অতীন কঠিন সুরে বললে, "যাও এখনই শুতে নাও, হুকুম করছি শুতে যাও।"

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল।—"অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।"

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, "শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।"

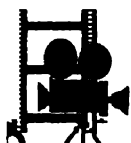
"ঘুম হবে না।"

"ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।"

"কিচ্ছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফর্ম এনেছ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্তু। অন্তু!"

দূরের থেকে হুইস্‌লের শব্দ এল।

ডাকঘর



❑ ১৯৬৫ সাল।

ডাকঘর— ববীন্দ্রনাথেব রূপক সাংকেতিক নাটক। ডাকঘব নাটকটি ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয।

সাদা কালো। সবাক।

পরিচালনা—জুল ভেম্রানি

১

মাধব দত্ত : মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না---কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল ; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না। কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে

কবিরাজ : ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে; কিন্তু আয়ুর্বেদে যেরকম লিখছে তাতে তো- -

মাধব দত্ত · বলেন কী!

কবিরাজ · শাস্ত্রে বলছেন, পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্‌ভবান্·

মাধব দত্ত : থাক্ থাক্, আপনি আর ঐ শ্লোকগুলো আওড়াবেন না ওতে আরো আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কী করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ : (নস্য লইয়া) খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধব দত্ত : সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ : আমি তো পূর্বেই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত : ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ : তা কী করবেন বলেন। এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ---কারণ কিনা শাস্ত্রে বলছে, অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে ·

মাধব দত্ত : থাক্ থাক্, আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে— অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ : কিছু না, কারণ, পবনে তপনে চৈব—

মাধব দত্ত : আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্ না কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দুঃখ ও বেচারা চুপ করে সহ্য করে -কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ : সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি---তাই তো মহর্ষি চ্যবন বলেছেন, ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশুফলপ্রদং। আজ তবে উঠি দত্তমশায়।

[*প্রস্থান*



ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধব দত্ত : ঐ রে ঠাকুরদা এসেছে। সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা : কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত : তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।

ঠাকুরদা : তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই—তোমার খেপবার বয়সও গেছে—তোমার ভাবনা কী।

মাধব দত্ত : ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা : সে কিরকম।

মাধব দত্ত : আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল।

ঠাকুরদা : সে তো অনেকদিন থেকে শুনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না।

মাধব দত্ত : জান তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু বিশ্রামের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুরদা : তাই এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ, ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।

মাধব দত্ত : আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল—না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করছি, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

ঠাকুরদা : বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধব দত্ত : আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা : আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব দত্ত : কবিরাজ বলছে তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যেরকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনোরকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা—তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা : মিছে বল নি—একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম একটু সেরে আসি, তার পরে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে নেব।

[*প্রস্থান*

অমল গুপ্তের প্রবেশ

অমল : পিসেমশায়।

মাধব দত্ত : কী অমল?

অমল : আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত : না বাবা!

অমল : ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো-না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পারব না?



মাধব দত্ত : না বাবা!

অমল : আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত : কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল : কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত : বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে।

অমল : পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধব দত্ত : বেশ! তাও বুঝি জান না!

অমল : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়ি নি—তাই জানি নে।

মাধব দত্ত : দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল : বেরোয় না?

মাধব দত্ত : না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে—আর-কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে—বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল : না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না—পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।

মাধব দত্ত : সে কী কথা অমল! যদি পণ্ডিত হতে পারতুম, তা হলে আমি তো বেঁচে যেতুম।

অমল : আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত : শোনো একবার! দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?

অমল : আমাদের জানলার কাছে বসে সেই-যে দূরে পাহাড় দেখা যায়—আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধব দত্ত : কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এতবড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল।

অমল : পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ঐ ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না?

মাধব দত্ত : তারা তো তোমার মতো খেপা নয়—তারা শুনতে চায়ও না।

অমল : আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব দত্ত : সত্যি নাকি? কী রকম শুনি।

অমল : তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরাজুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয়?



মাধব দত্ত : হয় বৈকি। কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল : বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধব দত্ত : খুঁজে যদি না পাও?

অমল : খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব। তার পরে সেই নাগরাজুতোপরা লোকটা চলে গেল—আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুরগাছের তলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে—তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে—পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত : পিসিমা কী বললে?

অমল : পিসিমা বললেন, তুমি ভালো হও, তার পর তোমাকে ঐ ঝরনার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভালো হব?

মাধব দত্ত : আর তো দেরি নেই বাবা!

অমল : দেরি নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধব দত্ত : কোথায় যাবে?

অমল : কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধব দত্ত : আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি—

অমল : তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

মাধব দত্ত : তুমি কী হতে চাও বলো।

অমল : এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না—আচ্ছা আমি ভেবে বলব।

মাধব দত্ত : কিন্তু তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল : বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত : যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

অমল : তা হলে তো সে বেশ হত। কিন্তু আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না—সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত : আমার কাজ আছে, আমি চললুম—কিন্তু বাবা দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল : যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

২

দইওআলা : দই—দই—ভালো দই।

অমল : দইওআলা, দইওআলা, ও দইওআলা!

দইওআলা : ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল : কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা : কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?



অমল : আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওআলা : আমার সঙ্গে।

অমল : হাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা : (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল : কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওআলা : আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল : আমি জানি নে। আমি তো কিচ্ছু পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা : আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল : তোমাদের গ্রাম? অনে---ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা : আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল : পাঁচমুড়া পাহাড় শামলী নদী- -কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা : তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল : না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনোকালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম- -একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে।

দইওআলা : ঠিক বলেছ বাবা।

অমল : সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা : কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ! আমাদের গ্রামে গোরু চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল : মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়--তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওআলা : বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয় - কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল : সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা : যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল : আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে---ঐরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা : মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল : না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই---ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা : হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!



অমল : না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওআলা : বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল : আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা : না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল : তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওআলা : কিচ্ছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

[*প্রস্থান*

অমল : (সুর করিয়া) দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই। দই, দই, দই— ই, ভালো দই। এই যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও-না প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী : অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল : কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী : যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল : কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী : একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল : রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে। কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না—আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।

প্রহরী : কবিরাজ বারণ করেছে? আচ্ছা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।

অমল : তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী : এখনো সময় হয় নি।

অমল : কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

প্রহরী : সে কি হয়। সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল : বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা—আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে—দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়—পিসেমশাই কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনে ঐ কোণে ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে—তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং ঢং. ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?



প্রহরী : ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল : কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্ দেশে?

প্রহরী : সে কথা কেউ জানে না।

অমল : সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই---যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী : সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা।

অমল : আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী : হবে বৈকি।

অমল : কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী : কোন্‌দিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবে।

অমল : না, না, তুমি তাকে জান না, সে কেবলই ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী : তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল : আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

প্রহরী : অমন কথা বলতে নেই বাবা।

অমল : না---আমি তো বসেই আছি---যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমি তো বেরোই নে---কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং---আর আমার মন কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী!

প্রহরী : কী বাবা?

অমল : আচ্ছা, ঐ-যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে---ওখানে কী হয়েছে?

প্রহরী : ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল : ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী : ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর।---এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল : রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী : আসে বৈকি। দেখো, একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল : আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলেমানুষ।

প্রহরী : ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকু-টুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল : বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী : তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অতবড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন?---ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে।

অমল : আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী : রাজার যে অনেক ডাক-হরকরা আছে---দেখ নি বুকে গোল গোল সোনার তক্‌মা প'রে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অমল : আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী : ঘরে ঘরে, দেশে, দেশে।---এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।



অমল : বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।

প্রহরী : হা হা হা হা! ডাক-হরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই বৃষ্টি নেই, গরিব নেই বড়োমানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো—সে খুব জবর কাজ!

অমল : তুমি হাসছ কেন! আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগছে। না না, তোমার কাজও খুব ভালো—দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘন্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—আবার এক-এক দিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

প্রহরী : ঐ যে মোড়ল আসছে—আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তা হলেই মুশকিল বাধাবে।

অমল : কই মোড়ল, কই, কই?

প্রহরী : ঐ যে, অনেক দূরে। মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল : ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে?

প্রহরী : আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্ছে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব।

[*প্রস্থান*

অমল : রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়—এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু আমি তো পড়তে পারি নে! কে পড়ে দেবে? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পড়ব। কিন্তু ডাক-হরকরা যদি আমাকে না চেনে! মোড়লমশায়, ও মোড়লমশায়—একটা কথা শুনে যাও।

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল : কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল : তুমি মোড়লমশায়, তোমাকে তো সবাই মানে।

মোড়ল : (খুশি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বৈকি। খুব মানে।

অমল : রাজার ডাক-হরকরা তোমার কথা শোনে?

মোড়ল : না শুনে তার প্রাণ বাঁচে? বাস রে, সাধ্য কী!

অমল : তুমি ডাক-হরকরাকে বলে দেবে আমারই নাম অমল—আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল : কেন বলো দেখি।

অমল : আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল : তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখবে?

অমল : রাজা যদি চিঠি লেখে তা হলে—

মোড়ল : হা হা হা হা! এ ছেলেটা তো কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তাঁর পরম বন্ধু! কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়তো আজই আসে কি কালই আসে।

অমল : মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?



মোড়ল : বাস রে। তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!—মাধব দত্তের বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দু-পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসো-না, ওকে মজা দেখাচ্ছি। ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।

অমল : না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল : কেন রে? তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব—তিনি তা হলে আর দেবি করতে পারবেন না—তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনই পাইক পাঠিয়ে দেবেন!— না, মাধব দত্তর ভারি আস্পর্ধা—রাজার কানে একবার উঠলে দুরস্ত হয়ে যাবে।

[*প্রস্থান*

অমল : কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ—একটু দাঁড়াও-না ভাই।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা : আমার কি দাঁড়াবার জো আছে। বেলা বয়ে যায় যে।

অমল : তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না—আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।

বালিকা : তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকালবেলাকার তারা—তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল : জানি নে কী হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা : আহা, তবে বেরিয়ো না—কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়—দূরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল : না, না, বন্ধ কোরো না—এখানে আমার আর-সব বন্ধ কেবল এইটুকু খোলা। তুমি কে বলো-না—আমি তো তোমাকে চিনি নে!

বালিকা : আমি সুধা।

অমল : সুধা?

সুধা : জান না? আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল : তুমি কী কর?

সুধা : সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুলতে চলেছি।

অমল : ফুল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে—যতই চলেছ, মল বাজছে ঝম্ ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তা হলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা : তাই বৈকি! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি নাকি বেশি জান!

অমল : জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয়, আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুলদিদি হবে?

সুধা : কী বুদ্ধি তোমার! পারুলদিদি আমি কী করে হব! আমি যে সুধা—আমি শশী মালিনীর



মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম তা হলে কেমন মজা হত!

অমল : তা হলে সমস্ত দিন কী করতে?

সুধা : আমার বেনে-বউ পুতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম। আমার পুষি মেনি আছে, তাকে নিয়ে—যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না।

অমল : আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো-না, আমার খুব ভালো লাগছে।

সুধা : আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল : আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা : ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল : আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ঐ ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা : আচ্ছা বেশ।

অমল : তুমি তা হলে ফুল তুলে আসবে?

সুধা : আসব।

অমল : আসবে?

সুধা : আসব।

অমল : আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা : না, ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে।

[*প্রস্থান*

ছেলের দলের প্রবেশ

অমল : ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একটুখানি এইখানে দাঁড়াও-না।

ছেলেরা : আমরা খেলতে চলেছি।

অমল : কী খেলবে তোমরা ভাই?

ছেলেরা : আমরা চাষ-খেলা খেলব।

প্রথম : (লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

দ্বিতীয় : আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল : সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা : হাঁ, সমস্ত দি—ন।

অমল : তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা : হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল : আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

ছেলেরা : তুমি বেরিয়ে এসো-না, খেলবে চলো।

অমল : কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা : কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি! চল্‌ ভাই চল্‌, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অমল : না ভাই, তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করো—আমি একটু দেখি।



ছেলেরা : এখেনে কী নিয়ে খেলব?

অমল : এই যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে-- -এ সব তোমরাই নাও ভাই-- ঘরের ভিতরে একলা খেলতে ভালো লাগে না—এ-সব ধুলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে—এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা : বা, বা, বা, কী চমৎকার খেলনা! এ যে জাহাজ! এ যে জটাইবুড়ি! দেখছিস ভাই? কেমন সুন্দর সেপাই!—এ-সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে? তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

অমল : না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, সব তোমাদের দিলুম।

ছেলেরা : আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল : না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা : কেউ তো বকবে না?

অমল : কেউ না, কেউ না। কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোনো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা : বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা- -আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই? ঐ-যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে—ঐ টেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ!

অমল : হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আসছে। জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে --আমার পিঠ ব্যথা করছে।

ছেলেরা : এখন যে সবে এক প্রহর বেলা—এখনই তোমার ঘুম পায় কেন? ঐ শোনো এক প্রহরের ঘন্টা বাজছে।

অমল : হাঁ, ঐ যে বাজছে ঢং ঢং ঢং—আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।

ছেলেরা : তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসব।

অমল : যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই। তোমরা তো বাইরে থাক, তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন?

ছেলেরা : হাঁ চিনি বৈকি, খুব চিনি।

অমল : কে তারা, নাম কী?

ছেলেরা : একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ—আরো কত আছে।

অমল : আচ্ছা, আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে?

ছেলেরা : কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল : কাল সকালে যখন আসবে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ে না।

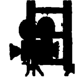
ছেলেরা : আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল : পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না? কবিরাজ বারণ করেছে?

মাধব দত্ত : হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ থেকেই তো তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।



অমল : না পিসেমশায়, না—আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধব দত্ত : সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ—আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে যায়—এতেও কি কখনো শরীর টেকে! দেখো দেখি, আজ তোমার মুখখানা কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

অমল : পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে যাবে।

মাধব দত্ত : তোমার আবার ফকির কে?

অমল : সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশবিদেশের কথা বলে যায়—শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত : কই আমি তো কোনো ফকিরকে জানি নে।

অমল : এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো-না সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে।

ফকিরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল : এই-যে, এই-যে ফকির—এসো আমার বিছানায় এসে বসো।

মাধব দত্ত : এ কী। এ যে—

ঠাকুরদা : (চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধব দত্ত : তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে!

অমল : এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির?

ফকির : আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম—সেইখান থেকেই এইমাত্র আসছি।

মাধব দত্ত : ক্রৌঞ্চদ্বীপে?

ফকির : এতে আশ্চর্য হও কেন? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ? আমার তো যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।

অমল : (হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা। আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির?

ঠাকুরদা : খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব দত্ত . এ-সব কী পাগলের মতো কথা হচ্ছে তোমাদের!

ঠাকুরদা : বাবা অমল, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্রকে ভয় করি নে—কিন্তু তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তা হলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।

অমল : না, না, পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না।—এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব না—কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব—নদী-পাহাড়-সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধব দত্ত : ছি, বাবা, কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই—শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল : ক্রৌঞ্চদ্বীপ কিরকম দ্বীপ আমাকে বলো-না ফকির!

ঠাকুরদা : সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ—সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।



অমল : বাঃ, কী চমৎকার। সমুদ্রের ধারে?

ঠাকুরদা : সমুদ্রের ধারে বৈকি।

অমল : সব নীল রঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুরদা : নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে— সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল : পাহাড়ে ঝরনা আছে?

ঠাকুরদা : বিলক্ষণ! ঝরনা না থাকলে কি চলে! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কী নৃত্য! নুড়িগুলোকে ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল : আমি যদি পাখি হতুম তা হলে—

ঠাকুরদা : তা হলে একটা ভারি মুশকিল হত। শুনলুম, তুমি নাকি দইওআলাকে বলে রেখেছ বড়ো হলে তুমি দই বিক্রি করবে—পাখিদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যাবসাটা তেমন বেশ জমত না। বোধ হয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত।

মাধব দত্ত : আর তো আমার চলল না। আমাকে সুদ্ধ তোমরা খেপিয়ে দেবে দেখছি। আমি চললুম।

অমল : পিসেমশায়, আমার দইওআলা এসে চলে গেছে?

মাধব দত্ত : গেছে বৈকি। তোমার ঐ শখের ফকিরের তলপি বয়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখির বাসায় উড়ে বেড়ালে তার তো পেট চলে না। সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে, তাদের গ্রামে তার বোনঝির বিয়ে—তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাশ দিতে যাচ্ছে—তাই বড়ো ব্যস্ত আছে।

অমল : সে যে বলেছিল, আমার সঙ্গে তার ছোটো বোনঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুরদা : তবে তো বড়ো মুশকিল দেখছি।

অমল : বলেছিল, সে আমার টুকটুকে বউ হবে—তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকালবেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুরদা : বা, বা, খাসা বউ তো। আমি যে ফকির মানুষ আমারই লোভ হয়। তা বাবা ভয় নেই, এবারকার মতো বিয়ে দিক-না, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বোনঝির অভাব হবে না।

মাধব দত্ত : যাও, যাও। আর তো পারা যায় না।

[*প্রস্থান*

অমল : ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা : শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।



অমল : পথে? কোন্ পথে! সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুরদা : তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল : আমি সব জানি ফকির!

ঠাকুরদা : তাই তো দেখতে পাচ্ছি—কেমন করে জানলে?

অমল : তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি—সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবল আসছে-তার পরে আখের খেত—সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা : অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তুব তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল : আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?

ঠাকুরদা : জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল : সে তো বেশ! আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে?

ঠাকুরদা : বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল : না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক বলে ভিক্ষা চাইব—আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে, না?

ঠাকুরদা : সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

অমল : আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুরদা : কে বলো দেখি?

অমল : ছিদাম।

ঠাকুরদা : কোন্ ছিদাম?

অমল : সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে। ঠিক আমার মতো একজন ছেলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।



ঠাকুরদা। সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল : সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানা-ই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না---সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা : ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ঐটুকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না ও' ওকে কানা বল আর না-ই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে।

অমল : ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে সব দেশের কথা আমাকে বল সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হালকা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুরদা . ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল : ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতেই পাবে না ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল আমি ওকে বললুম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা : বাবা, **ঘরে** বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ?

অমল : না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে---এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে---একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকরদা। তা না-জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে তা হলেই হল।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মাধব দত্ত : তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফেসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি?

ঠাকুরদা : কেন, হয়েছে কী?

মাধব দত্ত : শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা : তাতে হয়েছে কী?

মাধব দত্ত : আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা : সকল কথাই রাজার কানে ওঠে, সে কি আমরা জানি নে?

মাধব দত্ত : তবে সামলে চল-না-কেন। রাজাবাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আনো কেন? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুশিকিলে ফেলবে।

অমল : ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা : অমনি বললেই হল! রাগ করবে। কেমন রাগ করে দেখি-না। আমার মতো ফকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ ক'রে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।



অমল : দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়—যদি—

ঠাকুরদা : (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ : আজ কেমন ঠেকছে?

অমল : কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ : (জনান্তিকে মাধব দত্তের প্রতি) ঐ হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ঐ-যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধরদত্ত বলছেন—

মাধব দত্ত : দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধরদত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন ব্যাপারখানা কী।

কবিরাজ : বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত : না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খুব করেই চারি দিক থেকে আগলে সামলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই নে—দরজা তো প্রায়ই বন্ধ রাখি।

কবিরাজ : হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে—আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। না-হয় দিন দুই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই থাক্-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত : অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন—কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখলুম, তাকে ভালোবাসলুম, এখন বুঝি তাকে রাখতে পারব না।

কবিরাজ : ওকি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে! এ কী উৎপাত! আমি আসি ভাই! কিন্তু তুমি যাও, এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেইটে খাইয়ে দেখো—যদি রাখবার হয় তো সেইটেতেই টেনে রাখতে পারবে।

[*মাধব দত্ত ও কবিরাজের প্রস্থান*

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল : কী রে ছোঁড়া!

ঠাকুরদা : (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আরে আরে, চুপ চুপ!

অমল : না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।



মাধব দত্তের প্রবেশ

মোড়ল : ওহে মাধব দত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধব দত্ত : বলেন কী, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল : তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত : ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল : না-না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেইজন্যেই দেখছ-না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে? ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল : (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি!

মোড়ল : এ কি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল : আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি?

ঠাকুরদা : হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি?

অমল : কিন্তু, আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে---আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে। মোড়লমশায়, বলে দাও-না, এ চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল : রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো—রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

মাধব দত্ত : (হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করিবেন না।

ঠাকুরদা : পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর!

মাধব : আরে! ঠাকুরদা, তুমিও খেপে গেলে নাকি!

ঠাকুরদা : হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।

অমল : ফকির, ঐ-যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না?

মোড়ল : হা হা হা হা! উনি আরো একটু না খেপলে তো শুনতে পাবেন না।

অমল : মোড়লমশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেছ---তুমি আমাকে ভালোবাস না। তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করি নি—দাও, আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।

মোড়ল : না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো।

অমল : এতক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়। ঐ যে ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং। সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে?

ঠাকুরদা : ওরা যে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি।

বাহিরে দ্বারে আঘাত

মাধব দত্ত : ওকি ও! ও কে ও! এ কী উৎপাত?



(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত : কে তোমরা?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত : মোড়লমশায়, এ তো ডাকাত নয়!

মোড়ল : কে রে? আমি পঞ্চানন মোড়ল : তোদের মনে ভয় নেই নাকি? দেখো একবার, শব্দ থেমেছে। পঞ্চাননের আওয়াজ পেলে আর রক্ষা নেই। যত বড়ো ডাকাতই হোক না--

মাধব দত্ত : (জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) দ্বার যে ভেঙে ফেলেছে, তাই আর শব্দ নেই।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত : মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন।

মোড়ল : কী সর্বনাশ!

অমল : কত রাত্রে দূত? কত রাত্রে?

দূত : আজ দুই প্রহর রাত্রে।

অমল : যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং-- তখন?

দূত : হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক-বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

রাজকবিরাজের প্রবেশ

রাজকবিরাজ : একি! চারি দিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।—(অমলের গায় হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ?

অমল : খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজমশায়। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ, সব খুলে দিয়েছে—সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

রাজকবিরাজ : অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরোতে পারবে?

অমল : পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি কিন্তু সে যে কোন্‌টা সে তো আমি চিনি নে।

রাজকবিরাজ : তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো। (মোড়লকে নির্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে তো এ-ঘরে রাখা চলবে না।

অমল : না, না, কবিরাজমশায়, উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আস নি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।

রাজকবিরাজ : আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ-ঘরে রইলেন।

মাধব দত্ত : (অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন—তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব।

অমল : সে আমি সব ঠিক করে রেখেছি, পিসেমশায়—সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।



মাধব দত্ত : কী ঠিক করেছ বাবা?

অমল : আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব দত্ত : (ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!

অমল : পিসেমশায়, রাজা আসবেন, তাঁর জন্যে কী ভোগ তৈরি রাখবে।

দূত : তিনি বলে দিয়েছন তোমাদের এখানে তাঁর মুড়ি-মুড়কির ভোগ হবে।

অমল : মুড়ি-মুড়কি! মোড়লমশায়, তুমি তো আগেই বলে দিয়েছিলে, রাজার সব খবরই তুমি জান! আমরা তো কিছুই জানতুম না।

মোড়ল : আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তা হলে রাজার জন্যে ভালো ভালো কিছু----

রাজকবিরাজ : কোনো দরকার নেই। এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব---ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও---এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত : (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা : চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।

সুধার প্রবেশ

সুধা : অমল।

রাজকবিরাজ : ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা : আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না?

রাজকবিরাজ : আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা : ও কখন জাগবে?

রাজকবিরাজ : এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা : তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ : কী বল্‌ব?

সুধা : বোলো যে, 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'।



নির্ঘণ্ট

চলচ্চিত্রের নাম অনুসারে

পরিচালকের নাম অনুসারে



প্রযোজকের নাম অনুসারে